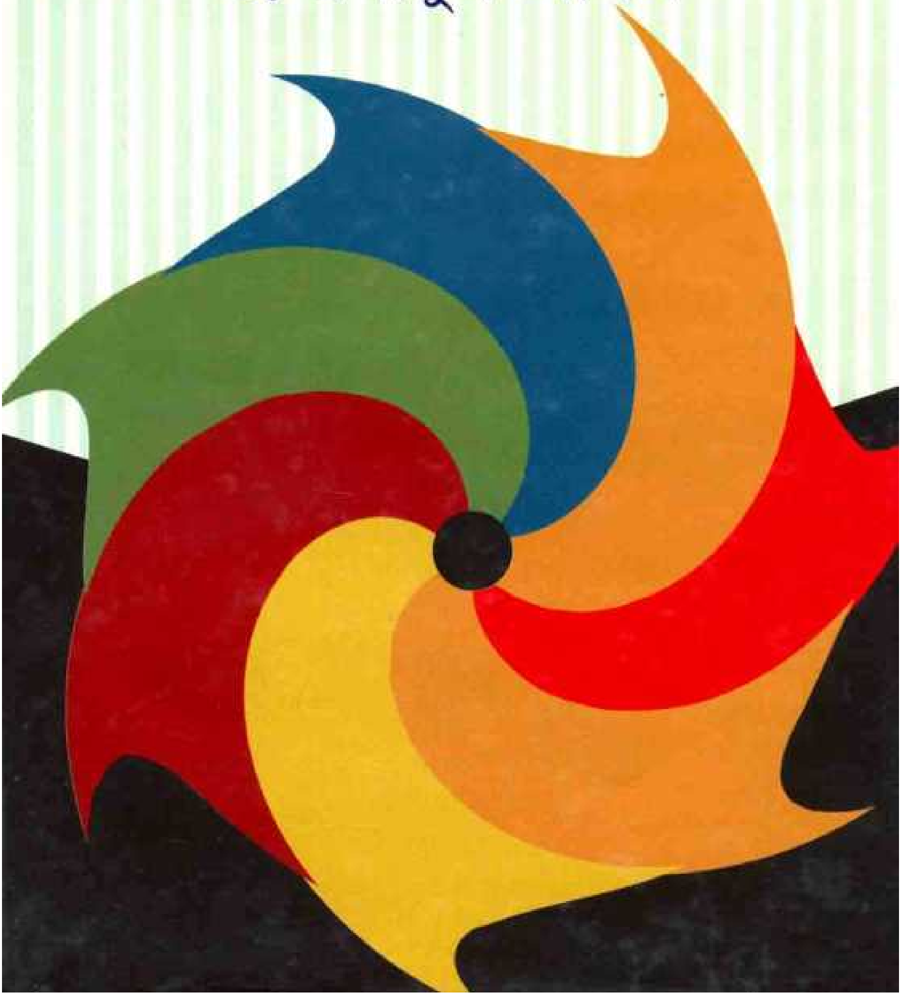
দর্শনের ভূমিকা

[দর্শনের মূলনীতি ও সমস্যাবলি]

ড. রশীদুল আলম



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বি.এ. পাস (কোড ৪৩১), সাবসিডিয়ারি এবং অনার্স কোড নং ১৭১১ অনুসরণে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত।

দর্শনের ভূমিকা

[দর্শনের মূলনীতিসমূহ ও সমস্যাবলি]

ড. রশীদুল আলম

এম.এ. (ট্রিপল : দর্শন, বাংলা ও ইংরেজি),
পি.এইচ.ডি. (ক্যাল.), ডি-লিট. (রবীন্দ্র ভারতী)
সাবেক অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়;
সাবেক অধ্যক্ষ, নওগাঁ ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁ;
সাবেক অধ্যাপক, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা বিভাগ,
আদিনা ফজলুল হক কলেজ, রাজশাহী;
মৌলভী বাজার কলেজ, সিলেট;
নওগাঁ ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁ

বি. এ. (পাস) কোড নং	৪৩১
বি. এ. (অনার্স) কোড নং	১৭১১

মেরিট ফেয়ার প্রকাশন

দর্শনের ভূমিকা [দর্শনের মূলনীতিসমূহ ও সমস্যাবলি]
ড. রশীদুল আলম

স্বত্ব : ড. রশীদুল আলম

মেরিট ফেয়ার ৬৮

প্রকাশক
এম. মহসিন রুবেল চৌধুরী
মেরিট ফেয়ার প্রকাশন
৩৮/৪,বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৩

সংযোজিত ও পরিমার্জিত চতুর্দশ সংস্করণ
(প্রথম মেরিট ফেয়ার সংস্করণ)
নভেম্বর, ২০০৭

প্রচ্ছদ : মশিউর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহতাব উদ্দীন সুমন
লেটেস্ট কম্পিউটার টেকনোলজি
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ : এঞ্জেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স ৫ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম : ২০০ টাকা

পরিবেশক : কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Darshaner Bhumika (Introduction to Philosophy) Written By Dr. Rashidul Alam, Published by M. Mohsin Rubel Chowdhury, Merit Fair Prokashon, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Tk. 200.00 Only.US $ 15 ISBN : 984-70131-0067-6

উৎসর্গ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের
দর্শন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক
প্রয়াত ডক্টর মফিজ উদ্দিন আহমদ-
এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত

"ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃজনে,
দিন ও রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য
তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত নিহিত রয়েছে"

—কোরআন শরীফ, সূরা ঃ ৩ আয়াত ঃ ১৯০

মেরিট ফেয়ার প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত লেখকের বই

০১. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা
০২. দর্শনের ভূমিকা [দর্শনের মূলনীতিসমূহ ও সমস্যাবলি]
০৩. সহজ মনোবিজ্ঞান পরিচয়
০৪. নীতিশাস্ত্র পরিচয়
০৫. সমাজ দর্শন
০৬. ভারতীয় দর্শন
০৭. রবীন্দ্রকাব্যে আমি'র ক্রমবিকাশ
০৮. আমার দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশ
০৯. সহজ যুক্তিবিদ্যা পরিচয় (অবরোহ)
১০. সহজ যুক্তিবিদ্যা পরিচয় (আরোহ)
১১. BERTRAND RUSSELL,S LOGFAL ATOMISM

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

আমার রচিত 'দর্শনের ভূমিকা' শীর্ষক বইটি দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দের নিকট সর্বাদিক সমাদৃত একটি পাঠকসহায়ক বই। ইতোপূর্বে বইটির ১৩টি সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ– এ বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে। বইটির পূর্বের সবগুলো সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ সাহিত্য সোপান, বগুরা থেকে প্রকাশিত হলেও বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে **মেরিট ফেয়ার প্রকাশন** ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

আমি সর্বাত্মকভাবে চেয়েছি বইটি থেকে অনুসন্ধিৎসু উৎসাহী পাঠক সর্বাদিক উপকার লাভ করুক। এ কারণে বইটির ভাষাগত আঙ্গিকে আমি কিছুটা পরিবর্তন এনেছি। পূর্বের সংস্করণের লেখাটি সাধু রীতিতে লিখিত হলেও সমসাময়িক চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে বইটিকে চলিত রীতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

স্নেহভাজন প্রকাশক এম. মহসিন রুবেল চৌধুরী যথাসাধ্য পরিশ্রম করে এ কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে বলে তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

পূর্বের মতোই বইটি সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হবে– এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

তারিখ : ১৫/১১/২০০৭ ইং

বিনীত
ড. রশীদুল আলম

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের অধ্যাপনা আরম্ভ করি তখন একথা ভাবতেও পারিনি যে, বাংলায় যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করা যায় বা বাংলায় এসব বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া চলে। আজ তা বাস্তবে সম্ভব হয়েছে। সম্ভবত ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি (তারিখ মনে নেই) 'A Guide to General Philosophy' নামে একটি সহায়িকা বই লেখার প্রয়াস পাই ও বইটি নিজের চেষ্টায় নওগাঁ থেকে প্রকাশ করি। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলার মাধ্যমে ডিগ্রিতে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। নওগাঁ ডিগ্রি কলেজের একজন ছাত্র (মোঃ আসাদ আলী মণ্ডল বি.এ.) আমাকে দর্শনের বিভিন্ন পত্রের উপর পরীক্ষায় পাসোপযোগী অনেকগুলি প্রশ্ন বাংলায় লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, তার আগ্রহাতিশয্যে অসম্মতি জানাতে পারিনি। এ কাজ শেষ করার পরে বাংলাতে বই লেখার জন্য প্রেরণা অনুভব করি। তখন কোনো প্রকাশক বাংলায় দর্শনের কোনো পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করার সাহস পায়নি, হয়তো এই ভেবে যে, ডিগ্রি পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা চালু নাও থাকতে পারে (অবশ্য এ সময়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা কিছুটা চালু হওয়ার পথে)। কয়েকজন প্রকাশকের অনুরোধে আমি পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাতে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার সহায়িকা গ্রন্থ লেখা আরম্ভ করি। এ কাজ সমাপনান্তে আমার মধ্যে প্রত্যয় জন্মে যে, বাংলাতে দর্শনের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। দীর্ঘ ৬/৭ বছরের চেষ্টায় আমি উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় সব ক'টি বই তাদের হাতে দিতে সমর্থ হয়েছি। আমার বইগুলো নিখুঁত হয়েছে– একথা বলার স্পর্ধা আমার নেই, থাকা উচিত নয়, কেননা, এই ধরনের প্রয়াস সতত ত্রুটিকণ্টকিত। তবে আমি একথা জেনে আশ্বস্ত হয়েছি যে, গ্রন্থগুলো ছাত্রছাত্রীদের অনেকটা প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়েছে। আর আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যও বাংলার মাধ্যমে দর্শনের পঠন-পাঠনে সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারব।

'দর্শনের ভূমিকা' আমার লেখা স্নাতক পর্যায়ের গ্রন্থগুচ্ছের মধ্যে অন্যতম। এতে দর্শনের মৌলিক সমস্যাগুলোর যথাজ্ঞান আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। সাধারণ দর্শন সম্পর্কে ইতোমধ্যে বাংলাতে কয়েকটা ভালো বই বেরিয়েছে। আমি যখন প্রথম লেখা শুরু করি তখন একটা বা দুটো সাধারণ দর্শনের বই বাংলাতে বেরিয়েছে দেখে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে 'সহজ মনোবিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি বই লিখি, পরে প্রয়োজনের তাগিদে 'নীতিশাস্ত্র পরিচয়' তারপরে 'মুসলিম দর্শনের ভূমিকা' লিখি।

কাজেই প্রয়োজন না থাকলেও স্নাতক পর্যায়ের সিরিজ পূর্ণ করার জন্য 'দর্শনের ভূমিকা' রচনায় হাত দেই। বিভিন্ন ধরনের ব্যস্ততার জন্য বই লেখা শেষ করতে এক বছরেরও বেশি সময় লাগে। এখানে প্রকাশ থাকে যে, এ গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত হয় ১৯৬৯-এ। গ্রন্থ রচনা কিছুটা এগুলেই ছাপার জন্য প্রেসে দেওয়া হয়। তিন-চার ফর্মা ছাপা শেষ হলে প্রদেশব্যাপী প্রেস ধর্মঘট শুরু হয়, পরে আসে নির্বাচনের কাজ। পরিশেষে স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ সংগ্রাম। ফলে বিভিন্ন

কারণে গ্রন্থ প্রকাশ এর পূর্বে সম্ভব হয়নি। তা না হলে অন্তত দু'বছর আগেই এ গ্রন্থ পাঠক-পাঠিকাদের দরবারে হাজির করা যেত। আল্লাহর অপরিসীম করুণায় শেষ পর্যন্ত বইটা শিক্ষার্থী ও পাঠকের সামনে হাজির করতে সমর্থ হলাম। সংশ্লিষ্ট সকল মহলকেই জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গ্রন্থ রচনাকালে আধুনিক দর্শনে মুসলিম দার্শনিকদের অবদানের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলবার প্রয়াস পেয়েছি, তবে সর্বত্র বলতে পেরেছি বলে মনে হয় না। কারণ দুটি সম্পূর্ণ বই লেখার পরে আগাগোড়া সংশোধন করা সম্ভব হয়নি, বিভিন্ন কিস্তিতে ছাপাখানায় লেখা পাঠাতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কর্মব্যস্ততার জন্য কোনো কোনো জায়গায় মুসলিম দর্শনের সাথে আধুনিক দর্শনের চিন্তার সাদৃশ্য দেখানোর ব্যাপারে চিন্তা করেছি; কিন্তু লেখার সময় বেমালুম ভুলে গিয়েছি। তবে গ্রন্থ অধ্যয়নকালে পাঠক নিশ্চিত বুঝতে পারবেন যে, দর্শন চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দেয়, নতুন করে চিন্তা করতে শেখায়। প্রাচীন দর্শন মুসলিম দর্শনকে অনুপ্রাণিত করেছে। মুসলিম দর্শন আধুনিক দর্শনকে অনুপ্রাণিত করেছে; এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কাজেই এ ধরনের দর্শন গ্রন্থে আধুনিক দর্শন আলোচনাকালে মুসলিম দর্শনের সাথে তার যোগসূত্রের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পাঠক কি মনে করবেন জানি না, তবে গ্রন্থ রচনাকালে মহামতি ইমান্যুয়েল কান্টের "You will learn from me not thought, but how to think, not philosophy, but how to philosophise" উক্তিটির যথার্থ উপলব্ধির প্রয়াস পেয়েছি, জানি না কতটুকু সমর্থ হয়েছি।

গ্রন্থ রচনার সময়ে আমার আওতাভুক্ত অনেকগুলো প্রসিদ্ধ দর্শন গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি, গ্রন্থের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জি'তে সেগুলির উল্লেখ করেছি। এ ছাড়াও গ্রন্থের মধ্যে পাদটীকায় বিভিন্ন মৌলিক চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত লেখকদের ঋণ স্বীকৃত হয়েছে। আমি মৌলিক চিন্তাবিদ নই। 'বিদ্যাসাগরীয়' প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা ভাষা-ভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্য দর্শনের বই লেখার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। কাজেই গ্রন্থের ভেতর মূল প্রেরণা বিম্বিত হলেই আমি কৃতার্থ বোধ করব। দর্শনের সমস্যা আলোচনাকালে যদি এমন কিছু বলে থাকি, যা পাঠকদের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে স্বাধীন চিন্তার দীপিকা হিসেবে দর্শনের মূল প্রেরণার খাতিরে তা সয়ে যেতে তাদের অনুরোধ করি। দর্শনে সহিষ্ণুতার স্থান অতি উচ্চে। 'দর্শনের ভূমিকা' রচনার ক্ষেত্রে নওগাঁ ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক প্রভাত কুমার মানী (পদার্থবিদ্যা), অধ্যাপক মুহম্মদ ফজলুর রহমান (রসায়ন), অধ্যাপক জসীম উদ্দিন সরদার (উদ্ভিদবিদ্যা)– এই তিন শ্রদ্ধেয় সহকর্মীর ঋণের কথা স্বীকার না করলে অকৃতজ্ঞের কাজ হয়।

তাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞানের নানা বিষয় আলোচনা করেছি; গ্রহণের শক্তি থাকলে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অনেকখানি ছাপ গ্রন্থের মধ্যে সুস্পষ্ট হতে পারত। তবে এতে তাঁদের কাছে আমার ঋণের অংক মোটেই হ্রাস পায়নি। গ্রন্থ প্রকাশের আনন্দঘন মুহূর্তে তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের মোঃ আহাদ আলী মণ্ডল, বাবু রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, মোঃ আবদুল হামিদ ও মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ বন্ধু তাঁদের সৌহার্দ্যমূলক উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়ে এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের জানাই আন্তরিক প্রীতি।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে আমার বর্তমান সহকর্মী অধ্যাপক আব্বাস আলী এম.এ. (ফাস্ট ক্লাস), স্নেহভাজন ছাত্র মীর ফরিদ আখতার বি.এ. ও আমার সহধর্মিনী লুৎফা

আলম (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী) প্রভৃত সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকেই জানাই মুবারকবাদ। গ্রন্থ প্রকাশের সকল দায়িত্ব ছিল বগুড়া সাহিত্য কুটিরের পরিচালক অক্লান্ত কর্মী, বন্ধুবর শামছুল হক সাহেবের উপর। তিনি যোগ্যতার সাথেই তাঁর কাজ শেষ করেছেন। তাঁকে জানাই প্রীতিসিক্ত ধন্যবাদ। গ্রন্থের শব্দসূচি তৈরি করেছেন আমার সহকর্মী অনুজপ্রতীম বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক অধ্যাপক মজীরউদ্দিন মিয়া। তাঁর প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, বাংলা ভাষা-ভাষী অনুরাগী, ভক্ত, দর্শন অধ্যয়নেচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের হাতে আমার এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস তুলে দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। বিচক্ষণ পাঠক-পাঠিকাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির ভরসা রাখছি।

নওগাঁ ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁ
১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৩

আরজ গুজার—
রশীদুল আলম

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

দর্শনের ভূমিকা

(মূলনীতিসমূহ ও সমস্যাবলি)

প্রথম খণ্ড

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা
INTRODUCTION

"Whence are we and why are we? Of what sceneThe actors or spectators?"
– P. B. Shelley

- দর্শন কাকে বলে
- দর্শনের উৎস
- দর্শনের বিবর্তন
- দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

দর্শন কাকে বলে?
What is Philosophy?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কারণ দর্শন এত বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে যা আসল কথার বাঁধনে বেঁধে প্রাথমিক পাঠকদের কাছে উপস্থিত করা অসম্ভব। দীর্ঘদিনের দর্শন পরিক্রমার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় জীবনের বহুমুখী সমস্যা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমুদয় সমস্যাকে একসঙ্গে আনতে হলে বহুদিনের পঠন-পাঠনের প্রয়োজন, আর ব্যাপারটি সময়সাপেক্ষ ও বহু শ্রমসাধ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে এইটুকু বলা চলে যে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কীয় যে কোনো প্রশ্ন দর্শনে উপস্থিত হতে পারে, হয়ে থাকে ও ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। অর্থাৎ জীবন ও জগতের মৌলিক সমস্যা দর্শনে আলোচিত হয়ে থাকে। তবে এই আলোচনার ধারা হবে যুক্তিনির্ভর। সাহিত্য সরস শব্দের মাধ্যমে, ধর্ম বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে এবং দর্শন যুক্তির মাধ্যমে জীবজগতের সমস্যাবলি আলোচনা করে থাকে। এখানে লক্ষ করার বিষয় হলো আলোচ্য বিষয় নয়, বরং আলোচনার পদ্ধতিই দর্শনে বড় কথা। দর্শনের আলোচ্য বিষয় হিসেবে যে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে কিন্তু তা দর্শন পদবাচ্য হতে হলে যৌক্তিক হওয়া চাই। যুক্তির শক্তি ও গ্রহণযোগ্যতা অনুসারেই দর্শনের মানের উৎকর্ষতা নির্ভর করে। কাজেই বলা যায় যে, আলোচ্য বিষয়ে নয়, যুক্তির সৌকর্য ও গ্রহণযোগ্যতাই দর্শনের বড় কথা।

দর্শনে দৃষ্টিভঙ্গির স্থান শীর্ষে। একই বিষয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হতে পারে। যেমন জগতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে যদি জড় ধরা হয় তাহলে তার পরিণতি যা দাঁড়াবে, পক্ষান্তরে তাকে যদি মানসিক বা আধ্যাত্মিক ধরা হয় তাহলে বক্তব্যের পরিণতি ভিন্ন হবে। এই দৃষ্টিকোণ নির্বাচন দার্শনিকদের শ্রেষ্ঠত্ব/শক্তি নিরূপণে সহায়তা করে। সক্রেটিসের ধারণা/প্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান পাওয়া যায়– এই দৃষ্টিকোণ দর্শনে বিপ্লব আনয়ন করেছে এবং পরবর্তীকালের দর্শনের নতুন দিক-নির্দেশ করেছে। এ ক্ষেত্রে দেকার্ত, লক, কান্ট প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

এই দৃষ্টিকোণের জন্য দর্শনের অজস্র সংজ্ঞা পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সংজ্ঞা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের নির্দেশক। একটি সংজ্ঞা দিয়ে দর্শনকে বুঝানোর উপায় নেই। প্লেটোর কাছে দর্শন সত্যদৃষ্টি, কান্টের কাছে দর্শন জ্ঞান বিশ্লেষণ, হার্বার্ট স্পেন্সারের কাছে দর্শন 'বিজ্ঞানসমূহের একত্রীকরণ' ইত্যাদি, ইত্যাদি। দর্শনের প্রাথমিক পাঠকদের জন্য এ ধরনের বিষয় অবতারণা বিভ্রান্তি সৃষ্টির সহায়ক। সুতরাং সংজ্ঞার সাহায্যে সহজে দর্শনকে প্রাথমিক পাঠকদের গোচরে আনা যায় না।

তাহলে কি প্রাথমিক পাঠকদেরকে দর্শন কি– এ কথা বুঝানোর মোটেই উপায় নেই? নিশ্চয়ই আছে। যদি আমরা এইভাবে বলি বা বুঝানোর চেষ্টা করি যে, দর্শন হলো এমন একটি বিষয় যা জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় বিভিন্ন প্রশ্নের যুক্তিনির্ভর আলোচনা করে, তাহলে মোটামুটি একটি ধারণা দেওয়া যেতে পারে। কোনো জটিল, ব্যাপক ও গভীর বিষয়ে এ অপেক্ষা অধিক আশা করা দুরাশা মাত্র।

দর্শনের উৎস

Origin of Philosophy

মানুষ বুদ্ধিদীপ্ত জীব। মানুষের মানসিক সংগঠন এমনই যে, সে তার পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে না ভেবে থাকতে পারে না। চিন্তা মানুষের স্বভাব ধর্ম বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক লক্ষণ। যেভাবে চিন্তা করুক না কেন মানুষকে চিন্তা করতে হবে– চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। মানুষের এই স্বভাব ধর্ম বিচারপ্রবণতা বা চিন্তাশীলতা থেকেই যে দর্শনের উৎপত্তি সে বিষয়ে মতদ্বৈততার অবকাশ নেই। তবে একথা সত্য যে, একই ধরনের চেতনা বা সমস্যা দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে নি কিংবা দার্শনিক চিন্তার প্রারম্ভ ও বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর একই খাতে প্রবাহিত হয় নি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তা-ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা স্পষ্টত দেখতে পাই যে, ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতা, যোগ-জিজ্ঞাসা, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দার্শনিকদের চিন্তায় বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য এনে দিয়েছে। তাই দেখি, প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের দার্শনিকের মধ্যে চিন্তা ও বিষয়বস্তুর পার্থক্য; এমনকি একই যুগের দুইজন দার্শনিকের মধ্যেও অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাশীল মনীষী ও দার্শনিকদের চিন্তা ও বিষয়বস্তুর প্রভেদ যাই থাকুক না কেন, মানবজীবনদর্শনে পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার চেতনা অনিবার্য। তাই বলা হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক মানুষ জন্মসূত্রে দার্শনিক। ডক্টর হেনরি স্টিফেন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, "প্রশ্নটি দর্শনের অস্তিত্বের বা অনস্তিত্বের নয়, প্রশ্নটি হলো ভালো দর্শন বা মন্দ দর্শনের– প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের কোনো-না-কোনো ধরনের দর্শন

থাকবেই।"[১] ডক্টর পলসনও অনুরূপ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তির, অন্তত পক্ষে স্বাভাবিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত মানুষের দর্শন আছে। মানবগোষ্ঠীর সরল, অকপট লোকেরও একটা বিশেষ দর্শন আছে। জগৎ ও মানুষের উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ক জিজ্ঞাসার একটা জবাব তার আছে। এই দিক দিয়ে প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীসমূহের দর্শন রয়েছে।"[২] কানিংহামও বলেন, "জীবন ও তার প্রয়োজন থেকে সরাসরি দর্শনের উন্মেষ ঘটে! যদি কোনো ব্যক্তি আদৌ ভাবনা-চিন্তার জীবন অতিবাহিত করে তবে সে কিছুটা দার্শনিক।"[৩] কাজেই উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জীবনজগতের সমস্যাবলি মানুষকে ভাবিয়ে তোলে, সীমাহীন বিশ্বের বৈচিত্র্য তার মনে এক অখণ্ড যোগসূত্রের স্পৃহা জাগিয়ে দেয়। জীবনজগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান, অজ্ঞানতার অস্পষ্টতা থেকে যুক্তির আকৃতি দর্শন। দর্শন তাই মানুষের বুদ্ধিময় সত্তার প্রকাশ।

এবার আমরা দর্শনের উৎপত্তির কারণগুলি আলোচনা করব।

(ক) বিস্ময় (Wonder) : গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মতে, দর্শনের উৎপত্তি বিস্ময় থেকে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বিশালতায় বিমুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। তাঁরা প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন, এক বা একাধিক মূলনীতির সাহায্যে বিশ্বচরাচরের বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রথম গ্রিক দার্শনিক থেলিস (Thales) জলকে জগতের মূল উপাদান বলে মনে করতেন, অ্যানিক্সিম্যান্ডার (Anaximander) অসীম বায়ুমণ্ডলকে পরমসত্তা বলে স্থির করলেন, অ্যানিক্সিমিনিসের (Anaximenes) মতে, বায়ুই সকল বস্তুর উৎপত্তির কারণ, হিরাক্লাইটাসের (Heraclitus) মতে, অগ্নিই একমাত্র সত্তা; এম্পিডক্লিস (Empedocles) মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুকে চারটি মূল উপাদান বলে অভিহিত করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, গ্রিক দর্শন বিস্ময় থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

(খ) জ্ঞানানুরাগ (Love of Wisdom) : মানুষ জ্ঞান-পিপাসী। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোকের পথে তার অভিসার। মানবসভ্যতার বিপুল গতিবেগের পশ্চাতে রয়েছে দুর্নিবার জ্ঞানস্পৃহা। গ্রিক দার্শনিক মহামনীষী সক্রেটিস খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে জ্ঞানানুরাগকে দর্শনের মূল প্রেরণা বলে ঘোষণা করেন। মানবদর্শনের বিরাট সাফল্যমণ্ডিত মুখর আঙিনায় সে ঘোষণা ধ্বনি আজও প্রতিধ্বনিত। বস্তুত জ্ঞানানুরাগই মানুষকে জ্ঞানের উৎসাহ যুগিয়ে থাকে। ইংরেজি 'ফিলোসফি' শব্দটির অর্থও জ্ঞানানুরাগ। জ্ঞানের সাধক সক্রেটিস নিজেকে দার্শনিক অর্থাৎ জ্ঞানানুরাগী বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন– গ্রিক পণ্ডিতগোষ্ঠী সোফিস্টদের মতো জ্ঞানী বলে পরিচয় দিতেন না। তিনি বলতেন 'নিজেকে জানো' (Know thyself)। জ্ঞানানুরাগ কথাটি অত্যন্ত

---

১. The question is not one of Philosophy or no Philosophy, but one good philosophy or bad– every rational being has a philosophy or some kind. H. Stephen. – Problems of Metaphysics-2.

২. Every nation and every man, atleast every normally developed man, has a Philosophy. The plain man of the people, too has a Philosophy. He gives an answer to the question regarding the origin and destiny of the world and man. In this sense peoples living in a state of nature have their Philosophy also. – Dr. Paulsen, *Introduction to Philosophy*-3.

৩. Philosophy grows directly out of life and its needs. Every one who lives, if he lives at all reflectively, is in some degree a Philosopher. – Cunnigham, *Problems of Philosophy*.

ব্যাপক ও ব্যঞ্জনাময়। এ শুধু বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের নির্দেশক নয়– জীবনের মূল্যায়ন ও আদর্শের ইঙ্গিতও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। মানুষ তার পরিবেশ তথা বাহ্য জগৎকে জেনেই ক্ষান্ত থাকতে পারে না, সকল সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু, 'আত্মজ্ঞান' তার সকল বিচার-বিবেচনাকে ছাপিয়ে ওঠে। জীবনজগতের জ্ঞান ও মূল্যায়ন তার 'আত্মজ্ঞান' (Know thyself)-কে কেন্দ্র করেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে– এই আত্মজ্ঞানই সকল জ্ঞান, সকল মূল্যবোধের আধার। মূল্যবোধের আলোকে আধুনিক দর্শন জীবনজগতের চিরন্তন জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছে ও পরাবৈজ্ঞানিক সমস্যাবলির সমাধানের প্রয়াস পাচ্ছে।[১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সক্রেটিসের জ্ঞানানুরাগ পদ্ধতি দর্শনের মূল প্রেরণা, আর আধুনিক দর্শনে এই প্রেরণা জীবনজগতের একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হয়েছে।

(গ) জীবন জিজ্ঞাসা (Great Questions Concerning Life) : মহাগ্রন্থ কোরআনে বর্ণিত জীবন জিজ্ঞাসা মুসলিম জাতির মধ্য জীবনজগতের সমস্যাবলি সমাধানের তাগিদ সৃষ্টি করেছিল। নৈসর্গিক ঘটনাসমূহের পর্যালোচনা, ঐতিহাসিক ঘটনাবলির গবেষণা এবং মানবমনের বিভিন্ন গবেষণার বিশ্লেষণে জ্ঞানানুরাগীদের জন্য জীবন দর্শনের সংকেত রয়েছে; এই সর্বাত্মক জ্ঞানানুসন্ধানের তাগিদ মুসলিম জাতিকে জীবনভিত্তিক দর্শনের সৌধ গড়ে তুলতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাই দেখা যায়, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, নৈসর্গিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যাবলি মুসলিম দর্শনের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মুসলিম দর্শন সর্বপ্লাবী জীবন-জিজ্ঞাসার বাহন হিসেবে একদিকে যেমন প্রাচীনকালের জ্ঞানানুরাগী বা দার্শনিকদের সমস্যাবলির মন্থন করেছে, অপরদিকে তেমনিভাবে আধুনিক দর্শনের মৌল সুর বেজেছে। আল-কিন্দি, ইবনে সিনা, আল-গাযালি, ইবনে খালদুন প্রমুখ দার্শনিকদের দর্শন অধ্যয়ন করলে এবং মুতাযিলা, আশারিয়া ও সুফিদের আলোচ্য বিষয়ের দিকে নজর দিলে, সে বিষয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আধুনিক দর্শনের বিপ্লবাত্মক সংশয় আল-গাযালির দর্শনে সম্যক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। দেকার্ত আরবি ভাষায় শিক্ষিত ও পারদর্শী হলেও তাঁকে আল-গাযালির প্রত্যক্ষ শিষ্য বলা যেত। প্রয়োগবাদী ও মানবতাবাদী, আধুনিক দর্শনের এই দুটি ধারা ইসলামী জীবন চেতনার রসে সঞ্জীবিত, একথা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। সুতরাং প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনের সংযোগসেতু মুসলিম দর্শনের সর্বাত্মক জীবন-জিজ্ঞাসাই দর্শনের প্রেরণা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

(ঘ) সংশয় (Doubt) : আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের উন্মেষ সংশয়ে মধ্যযুগের ইউরোপের ধর্মযাজকদের বিচারবিযুক্ত ধর্মীয় যথেচ্ছাচার মনে সন্দেহের তরঙ্গাভিঘাত তুলেছিল। সেই সন্দেহাকুল মানসিক চাঞ্চল্য আধুনিক যুগের বিচারমূলক দর্শনের পথ তৈরি করছিল। আধুনিক দর্শনের জনক দেকার্ত (১৫৯৫-১৬৫০ খ্রিঃ) সেই সংশয়াহত মানসিকতার সৃষ্টি। তাঁর দর্শনেই আমরা আধুনিক দর্শনের মুলসুর নিনাদিত ম্যাগনাকাটার সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনি সংশয়ের রথে চড়েই নিশ্চয়তার মনজিলে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন ইন্দ্রিয় সংবেদন, প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞান ও চিরাচরিত জ্ঞান মিথ্যা থেকে পারে কিন্তু সংশয়-ক্রিয়া সংশয়াতীত। কোনো কিছু সন্দেহ করতে গেলে চিন্তা করতে হবে, চিন্তা ছাড়া সংশয় বা সন্দেহ করা সম্ভব নয়। আর চিন্তা অস্তিত্বের

---

[১] H. M. Bahattacharya– *Principles of Philosophy*-8

নির্দেশক, আমি আছি বলেই আমি চিন্তা করতে পারি। দেকার্তের বক্তব্য হলো, "আমি চিন্তা করি, কাজেই আমি অস্তিত্বশীল" (Cogito ergo sum)। এইভাবেই আত্মসচেতনতার মধ্যেই তিনি মানুষের চিন্তার সংশয়াতীত নীতি আবিষ্কার করেছিলেন। মানুষের মনে খোদা সম্পর্কীয় আন্তর ধারণা (innate idea) রয়েছে, কাজেই খোদার অস্তিত্ব সংশয়ের উর্ধ্বে, মানুষের মনে জাগতিক বস্তুসমূহের ধারণা বর্তমান। কাজেই বস্তুসমূহের অস্তিত্ব তর্কাতীত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেকার্ত সার্বজনীন সংশয় থেকে যাত্রা করে আত্মা, খোদা ও জগতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেন এবং মূল ও শর্তাধীন সংশয় দূর করেন।[১] মধ্যযুগের মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে সংশয় প্রথম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও আধুনিক যুগের সর্বপ্লাবী সংশয় সে যুগে স্ফুরিত হবার সুযোগ লাভ করে নি। এ যুগের সংশয়ের তরঙ্গাভিঘাত মানব-মনের অলি-গলি উপচে বয়ে গেছে। "বর্তমান যুগের মতো এমন সময় ছিল না যখন এত অধিক সংখ্যক লোক এত অধিক বিষয়ে এতখানি অনিশ্চিত ছিল।"[২] ধর্ম, নীতি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি– এক কথায়, জীবনের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই তার চিন্তাধারা সংশয়াহত– জীবনজগতের বহু বিষয়ের অতীতে ধারণা সম্পর্কে সে দ্বিধাদীর্ণ। সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য– সকল দিকেই আমাদের সংশয়ের প্রভাব অমোঘ। আমরা সংশয়সায়রে হাবুডুবু খাচ্ছি। এই সর্বাত্মক সংশয় আমাদেরকে চঞ্চল করে তুললেও জিজ্ঞাসার অনেক নতুন দিগন্ত দেখিয়েছে, নতুনভাবে ভাববার অবকাশ দিয়েছে, নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করেছে।

(ঙ) প্রয়োগবাদী বা মানবতাবাদী কারণ (Pragmatic or Humanistic Origin) : বিভিন্ন প্রেরণা বিভিন্ন যুগে মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে, এমন কি একাধিক প্রেরণাও বিশ্বের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে একই যুগে প্রভাবিত করতে দেখা যায়। বর্তমান যুগে একই সঙ্গে বিভিন্নমুখী চিন্তাস্রোত মানবমনে প্রবহমান। বর্তমান যুগে 'উপযোগিতা' মানুষের চিন্তায় এক উল্লেখযোগ্য আসন দখল করেছে। প্রয়োগবাদ এমন একটি মতবাদ, যে মতবাদ অনুসারে সত্যের মাপকাঠিই কার্যকারিতা। কোনো ধারণা, কোনো যুক্তি, কোনো মতবাদ সত্য কি মিথ্যা তা নির্ভর করে প্রয়োজন চরিতার্থতায় বা কার্যকারিতায়। প্রয়োগবাদীরা সবকিছুই কার্যকারিতার আলোকে বিচার করে থাকেন। ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসে না, এমন কোনো কিছুকে তাঁরা আমল দিতে রাজি নন। কার্যকারিতা তাঁদের মতবাদের বড় কথা।

জীবনজগৎ সম্পর্কিত কোনো মতবাদই তাঁদের কাছে গ্রহণীয় নয়, যদি তা কোনো বাস্তব প্রয়োজন মিটাতে সমর্থ না হয়। এ যুগের একদল দার্শনিক উপযোগিতার ভিত্তিতে দর্শনের মোড় পরিবর্তন করতে মনোযোগী। অনেক শিক্ষিত লোকের মুখেও উপযোগিতার ধুয়া বারংবার উচ্চারিত হতে শুনা যায়।

প্রয়োগবাদের পাশাপাশি অন্য একটি অধিকতর শক্তিশালী মতবাদ মানুষের চিন্তায় ঠাঁই পেয়েছে। এর নাম মানবতাবাদ (Humanism)। ব্যবহারিক সার্থকতাকে দর্শনের উৎস হিসেবে মনে করলেও মানবতাবাদ প্রয়োগবাদ অপেক্ষা ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রয়োগবাদ মানবজীবনের ব্যাপক পটভূমিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় নি, মানবমনের

---

[১] J. N. Sinha, *Introduction to Philosophy.*

[২] There never was a time when so many people were so uncertain about so many things as at present. – Patric, *Introduction of Philosophy.*

আশা, আকাঙ্ক্ষার সামান্য স্পর্শ করেছে মাত্র, কিন্তু মানবতাবাদে মানুষকে কেন্দ্র করেই সকল বিচার-বিবেচনা আবর্তিত হয়েছে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য' বলে স্বীকৃত হয়েছে। মানবচিত্তের আকুলিব্যাকুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাসীন হয়েছে। বর্তমান যুগের মানুষের বিস্ময়কর সাফল্য প্রকৃতিকে আপনার সেবায় নিয়োগের বাহাদুরি তাকে দিয়েছে বিপুল নবসৃষ্টির দুর্বার গতি, কিন্তু অতৃপ্তির বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস হতাশায় পরিণত হয়ে তাকে নৈরাশ্যের অতল গহনে টেনে নিয়েছে। তার সৃষ্টির বিজয় বৈজয়ন্তী তার মনে যুগপৎ আশা ও বিভীষিকার সঞ্চার করেছে। আধুনিক মারণাস্ত্র মানুষের পক্ষে সর্ববিধ্বংসী ভয়াতুর চিত্র তুলে ধরেছে, তার মনে নৈরাশ্যের অমানিশা এনে দিয়েছে। মানুষকে এই ভয়াবহ অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এক নতুন দর্শনের উদ্ভব ঘটল। এটাই মানবতাবাদ। মানবজীবনের সকল মূল্যবোধের অগ্রাধিকারের আমানত এই মানবতাবাদ, মানবতার মহিমা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত ও সরব।

দর্শনের বিবর্তন

Development of Philosophy

দর্শন প্রগতিশীল : দর্শন মানুষের চিন্তার সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা, চৈতন্যের বিবর্তনের ইতিহাস। মানুষের চিন্তাভাবনা বর্তমান যুগে যে সু-উচ্চ মনজিলে উপনীত হয়েছে পূর্বে মানুষ তা ভাবতেও পারত না। মানুষের জীবনের জটিলতা দর্শনকে গভীরতর করে তুলছে। কাজেই চিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের তাৎপর্যের বিস্তার সাধিত হচ্ছে। দর্শনের বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই একথার সত্যতা অনুভূত হবে।

গ্রিক দর্শনের বিষয়বস্তু ও বিবর্তন : আমরা গ্রিক দর্শন পাঠে জানতে পারি যে, গ্রিক দর্শনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও দর্শনে কোনো পার্থক্য ছিল না, এরা সমার্থক বলে বিবেচিত হতো। এই সময়ে গ্রিস দেশে যে সমস্ত দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মানুষের জ্ঞানমূলক, আদর্শমূলক, সম্পর্ককেন্দ্রিক জ্ঞানমূলক, আদর্শমূলক, সম্পর্ককেন্দ্রিক কোনো সমস্যা তাঁদের মনে সাড়া জাগাতে পারে নি। জাগতিক উপাদান নিরূপণে তাঁদের অধিকাংশ শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। থেলিস, অ্যানিক্সিমেন্ডার, অ্যানিক্সিমেনিস, হিরাক্লাইটাস, এম্পিডক্লিস, ডেমোক্রিটাস প্রমুখ দার্শনিকের আলোচ্য বিষয়ের দিকে তাকালে এটা বুঝা যাবে। এক কথায়, বলা চলে সক্রেটিস-পূর্ব গ্রিক দর্শন ছিল বস্তুনিষ্ঠ (Objective) ও তত্ত্বনিষ্ঠ (Theoritical)। সক্রেটিস ও প্লেটো গ্রিক দর্শনের মোড় ঘুরিয়ে এটাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করলেন। বস্তুনিষ্ঠ দর্শন এখন আত্মনিষ্ঠ হয়ে উঠল, ব্যবহারিক বিচার-বিবেচনা নিছক তত্ত্বকে রঙিন করে তুলল। তাঁরা আত্মজ্ঞানের ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেন।

সক্রেটিস ও প্লেটো : মহামনীষী সক্রেটিসের 'আত্মানাং বিদ্ধি' (Know thyself) সকলেরই জানা। প্লেটো ও তদীয় গুরু সক্রেটিস বাহির থেকে ভিতরের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে উপদেশ দান করেছেন, বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতের দিকে আমাদের দৃষ্টি সীমিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষই তাঁদের শিক্ষায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু অ্যারিস্টটল অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

অ্যারিস্টটল : অ্যারিস্টটলের সমন্বয়ধর্মী দর্শনে দুটি বিপরীত দৃষ্টিকোণ একই সঙ্গে ঠাঁই পেয়েছে। তিনি অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে (Self and not self) একই মহাসত্যের দুটি দিক বলে অভিহিত করেন। তবে অ্যারিস্টটলের পরে এই সমন্বয় প্রয়াস টিকতে পারে নি, একবার অন্তরের দিকে একবার বহির্জগতের দিকে আন্দোলিত হয়েছে। অ্যারিস্টটলের পরবর্তীকালে স্টোয়িক (Stoics) এবং নব্য প্লেটোবাদীদের দর্শন অধিকতর আত্মনিষ্ঠ হয়েছে, জীবনের নৈতিক দিক অন্যান্য দিককে নিষ্প্রভ করে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠেছে।

মধ্যযুগের দর্শন : ইউরোপ মহাদেশ দর্শনের এই সাবলিল ধারা মধ্যযুগে খ্রিস্টানীয় ধর্মতত্ত্বের বিশুষ্ক বালুচরে আটকে গেছে। প্রাচীন গ্রিকদের অবাধ চিন্তাধারা মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাসের তলে চাপা পড়ে গেছে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সর্বপ্লাবী দর্শন যাজক সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়ে তাদের আসল চেহারা বিকৃত হয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন মানবমনের স্থবির ও বিকৃত রূপ ফুটিয়ে তুলছে। প্রকৃতির ন্যায় বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও এ যুগের দর্শন বাস্তবধর্মী না হয়ে অনেকটা কল্পলোকবিহারী ও পারলৌকিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের স্বর্গ থেকে নির্বাসন আদি পাপ, স্বর্গ ও নরক, অদৃষ্ট এবং ঈদৃশ বিষয়াবলি আলোচ্য যুগের দর্শনে প্রাধান্য লাভ করেছিল। মানুষের ভাবী জীবনের অলৌকিকতা তার বর্তমান জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বাস্তবের বুকের উপর অবাস্তব আসন গেড়ে বসেছিল।

মধ্যযুগীয় দর্শনে মুসলিম অবদান : মধ্যযুগের অজ্ঞানতার অন্ধকারে মুসলিম দার্শনিকরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে বিশ্বের দিকে দিকে ছুটেছিলেন। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্মদাতা। রোজার বেকন বলেন, "ইবনে রুশদ প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও গৃহীত মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যা আধুনিক দর্শনের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তা আরব চিন্তাবিদদেরই অবদান।"[১]

আরব চিন্তাবিদদের বাস্তবধর্মী ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কারমুক্ত মনোভাব ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের অলৌকিকতা ও পরজগৎমুখী প্রবণতার মূলে সজোরে নাড়া দিয়েছিল। জীবনবিমুখ অতিলৌকিক দর্শনের মোহপাশ কেটে তাঁরা বাস্তববাদী ও বিচারবাদী দার্শনিক হয়েছিলেন।

আধুনিক দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও মুসলিম প্রভাব : কাজেই আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন মধ্যযুগীয় নির্বিচারবাদী দর্শন থেকে স্বতন্ত্র। এই যুগের দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা বিচারমূলক বাস্তবধর্মী জীবনকেন্দ্রিক। জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্যাবলি, চেতনার সাথে যুক্ত নিয়মাবলির সমালোচনার মাধ্যমেই আধুনিক দর্শন অগ্রসর হয়। কোনো কিছু গ্রহণ করার পূর্বেই এটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠিত মতবাদ ও নির্বিচারমূলক তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আধুনিক দর্শনকে স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও আত্মনিষ্ঠ করেছে। যদিও এই বৈশিষ্ট্য এক একজন দার্শনিকের বেলায় এক এক রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ সম্পর্কে যদিও আমার রচিত 'মুসলিম দর্শনের ভূমিকায়' বিস্তৃত

---

[১] Nature was interpreted by Averroes. The critical attitude and revolt against authority, the two main characteristics of Modern Philosophy, were roused mainly by the teachings of the Arab thinkers. – Roger Bacon.

আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। দর্শন এত অধিক পরিমাণে বিচারধর্মী হয়ে পড়েছে যে, অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বিচার করলে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন দুঃসাধ্য, আবার প্রজ্ঞার দিক দিয়ে দর্শন বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল বুদ্ধিমূলক তত্ত্বালোচনায় পর্যবসিত। তবে আধুনিক দর্শন একদেশদর্শী নয়, সর্বাত্মক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইউরোপীয় দর্শনের বিবর্তন কৌতূহলোদ্দীপক, বাহির থেকে ভিতরের দিকে নিবদ্ধ, বহির্জগতের বৈচিত্র্য থেকে অন্তর জগতের ঐক্যানুভূতির দিকে ধাবিত হয়।

দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

Definitions of Philosophy

সংজ্ঞা : বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এখানে আমরা দর্শনের কতগুলি প্রসিদ্ধ সংজ্ঞার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এই সংজ্ঞাগুলির আলোচনায় একটি বিষয় আমাদের কাছে পরিস্ফুট হবে; প্রত্যেকটি সংজ্ঞা দর্শনের এক বা একাধিক এলাকার ওপর জোর দিয়েছে।

প্লেটো : প্রাচীন জগতের প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটো বলেন, "চিরন্তনের এবং বস্তুর মূল স্বরূপের জ্ঞানলাভ করাই দর্শনের লক্ষ্য।"

প্লেটো প্রদত্ত দর্শনের এই সংজ্ঞাটিতে দর্শনের সকল দিকের নির্দেশ নেই। দর্শনে আলোচ্য অধিবিদ্যা বা পরাবিজ্ঞান (metaphysics) মাত্র এই সংজ্ঞাতে স্থান পেয়েছে; রূপবিজ্ঞান, জ্ঞানবিদ্যা ও আদর্শবিদ্যা এতে উপেক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এই সংজ্ঞাটি সঙ্কীর্ণ।

অ্যারিস্টটল : জগদ্বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেন, "সত্তা স্বরূপত যা এবং এই স্বরূপের অঙ্গীভূত যে সকল বৈশিষ্ট্য তার অনুসন্ধান করে যে বিজ্ঞান তাই দর্শন– দর্শন মূলনীতিসমূহের বিজ্ঞান।"[১]

সংজ্ঞা দোষ : প্লেটোর সংজ্ঞাটির মতো অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞাদ্বয়ও সঙ্কীর্ণ। সংজ্ঞা দুটিতে রূপবিজ্ঞান উপেক্ষিত হয়েছে। বিশাল পরিদৃশ্যমান জগৎ দর্শনের অন্যতম মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কিন্তু অ্যারিস্টটলের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হয় নি। তাঁর মূলনীতিসমূহ (First Principles) সুস্পষ্ট নয়। অ্যারিস্টটল মূলনীতিসমূহ বলতে চিন্তনের মৌলিক নীতিসমূহ বুঝিয়ে থাকেন, তবে তাঁর সংজ্ঞা দর্শনকে জ্ঞানবিদ্যার সমার্থক বলে প্রতিপন্ন করে, আর যদি তিনি মূলনীতিসমূহ বলতে বিশ্বচরাচরের মৌলিক নীতিসমূহ বুঝিয়ে থাকেন, তবে দর্শন ও অধিবিদ্যার মধ্যে প্রভেদ থাকে না। কাজেই অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞা দর্শনের যথার্থ সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা চলে না।

হবস : দার্শনিক হবস বলেন, "কারণ থেকে কার্যের এবং কার্য থেকে কারণের জ্ঞানই হলো দর্শন।"[২]

সংজ্ঞার দোষ : হবসের এই সংজ্ঞা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। এই সংজ্ঞাতে দর্শনের রূপবিজ্ঞান এলাকার প্রতি প্রয়োজনাতীত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। একথা সত্য যে, বৈজ্ঞানিকের কার্যকারণ নিয়ম আবিষ্কার বর্জন করে দার্শনিক সর্বজনগ্রাহ্য দর্শন দাঁড়

---

[১] Philosophy is the science which investigates the nature of beings as it is in itself, and the attributes which belong to it in virtue of its own nature-Philosophy is the science of the 'First Principles– Aristotel.

[২] Philosophy is a knowidege of "effects from their causes and causes from their effects"– Hobbes.

করাতে পারেন না। তথাপি দর্শন পরিদৃশ্যমান জগৎ ছাড়াও পরমতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও আদর্শবিদ্যার আলোচনা করে থাকে।

কেবল পরিদৃশ্যমান জগৎ, বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ নিয়ম জীবনজগতের সামগ্রিক রূপ ব্যাখ্যা করতে পারে না। সুতরাং সংজ্ঞাটি অতিশয় একদেশদর্শী।

কোঁতে : কোঁতে বলেন, "দর্শন হলো বিজ্ঞানের বিজ্ঞান।"[৩]

সংজ্ঞার ত্রুটি : দর্শনের এই সংজ্ঞাটিও উপরোক্ত সংজ্ঞাটির মতো একদেশদর্শী। সংজ্ঞাটি দর্শনের বিশাল ক্ষেত্রের মাত্র একটি এলাকার নির্দেশক। কাজেই আমরা এই ধরনের সংজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি না।

পলসন বলেন : "সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি হলো দর্শন।"[৪]

সংজ্ঞার ত্রুটি : পলসন প্রদত্ত সংজ্ঞাটিতেও পরিদৃশ্যমান জগৎ দর্শনের এলাকা হিসেবে বিশেষিত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানের এলাকা অতিক্রম করে মানবজীবনের মহাজিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে ফেরে। বাস্তবিক দর্শন সর্বাত্মক জ্ঞানানুসন্ধান– এটা জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা। সুতরাং পলসনের সংজ্ঞাটিতে দর্শনের সর্বাত্মক চেহারা অনুপস্থিত।

ভুন্ডের সংজ্ঞা : "বিভিন্ন বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞানকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতায় একীভূত করাকে দর্শন বলে।"[১]

সংজ্ঞার ত্রুটি : এই সংজ্ঞাটিও পূর্বোক্ত সংজ্ঞার মতো একদেশদর্শী বিজ্ঞানের ফলাফল নিয়ে দর্শনের যাত্রা, একথা মেনে নিলেও দর্শন যে বিজ্ঞান অপেক্ষা ব্যাপক ও বিস্তৃত সে সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই। এছাড়া বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ড, দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি অখণ্ড। বিজ্ঞান সত্তার আংশিক আলোচনা, দর্শন সামগ্রিক আলোচনা। পরিসরের কথা ছেড়ে দিলেও দৃষ্টিকোণের মৌল পার্থক্য একে-অপরকে বিশেষভাবে পৃথক করে। এতদ্ব্যতীত দর্শন জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন হিসেবে পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অবস্থিত পরমসত্তা, আদর্শের স্বরূপ এবং জ্ঞানের স্বরূপ ও ভিত্তি সম্পর্কেও আলোচনা করে, কাজেই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ।

হার্বার্ট স্পেন্সারের সংজ্ঞা : "বিভিন্ন জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ সংহতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাধারণ সত্যসমূহের অন্তর্নিবিষ্ট দৃঢ়ীকৃত রূপই হলো দর্শন।"[২]

সংজ্ঞার ত্রুটি : এই সংজ্ঞাটিও দর্শন ও বিজ্ঞানের মৌল পার্থক্য প্রকাশে অপারাগ। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর যে পার্থক্য বিদ্যমান, এই সংজ্ঞাতে তা অনুপস্থিত। কাজেই এই সংজ্ঞা একদেশদর্শী। এতে দর্শনের সর্বাত্মক চেহারা ফুটে ওঠে নি।

কান্ট : কান্ট বলেন, "দর্শন হলো জ্ঞানসম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও সমালোচনা।"[৩]

ত্রুটি : কান্টের এই সংজ্ঞাটি জ্ঞানবিদ্যা ও দর্শনকে সমার্থক মনে করে। আমরা

---

[৩] Philosophy is the science of sciences – Comte.

[৪] Philosophy is the sum-total of all scientific knowledge. – Paulsen.

[১] Philosophy is the unification of all knowledge obtained by the special sciences in a consistent whole– Wundt.

[২] Philosophy is the completely unified knwledge-generalisation in Philosophy comprehending and consolidating the widest generalisations of sciences. – Herbert Spencer.

[৩] Philosophy is the science and criticism of cognition. – Kant.

পূর্বে লক্ষ করেছি, জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের একটি অঙ্গ। শুধু জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, সীমা ও বৈধতার আলোচনা দর্শনের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের আলোচনাকালে দর্শন জ্ঞানতত্ত্বের সাথে রূপবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা ও আদর্শবিদ্যা সম্পর্কেও আলোচনা করে। কাজেই কান্টের সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

ফিকটে : ফিকটে বলেন, "দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।"[১]

ত্রুটি : কান্টের সংজ্ঞার সাথে ফিকটের সংজ্ঞার কোনো পার্থক্য নেই। উভয় সংজ্ঞাই দর্শনের শুধু জ্ঞানাত্মক দিকটির ওপরই গুরুত্বারোপ করে, কিন্তু দর্শনের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশে সংজ্ঞাটি অপারগ। সুতরাং এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী।

শেলিং : শেলিং বলেন, "জগৎ কি হবে যার ফলে মন জগৎকে জানতে পারে এবং মন কি হবে যার ফলে মন জগৎকে জানতে পারে তার ব্যাখ্যা প্রয়াসকে দর্শন বলে।"[২]

উৎকর্ষ : শেলিং প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সমর্থ। জগত ও মনের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং তার পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ দর্শনের লক্ষ্য। সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক।

হেগেল : হেগেল বলেন, "দর্শন হলো পরম ধীশক্তি বা পরম চিন্তনের বিজ্ঞান।"[৩]

উৎকর্ষ : হেগেলের এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও পরম ধীশক্তির আত্মোপলব্ধিকে কেন্দ্র করে যেভাবে বিশ্বজগৎ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জড়-জীব চৈতন্যের বিকাশ সাধন করছে, তাতে দর্শনের সার্বিক চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে বিজ্ঞান শব্দটি লৌকিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। হেগেলের দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা করলে এতে দর্শনের স্বরূপের প্রকাশ অনুধাবন করা যাবে।

কুল্পে : কুল্পে বলেন, "অধিবিদ্যার সাহায্যে জ্ঞান ও বিশ্বাসের বৌদ্ধিক সংহতি দর্শনের লক্ষ্য।"[৪]

উৎকর্ষ : এই সংজ্ঞাটি দর্শনের সর্বাত্মক চেহারা নির্দেশক। এতে অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক ও তার জ্ঞানমূলক সংহতি এবং অভিজ্ঞতার মূলীভূত মহাসত্য ও জীবনের আদর্শগত দিকেরও ব্যঞ্জনা বর্তমান। কাজেই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক।

মারভিন : মারভিন বলেন, "দর্শন হলো সত্যের প্রতি অনুরাগ– সকল সত্য যার অন্তর্ভুক্ত এমন জ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডার, যাতে সকল সত্য এক মহান অখণ্ডতার মধ্যে সুবিন্যস্ত।"[৫]

উৎকর্ষ : মারভিনের সংজ্ঞাটি সার্থক। একথা অতীব সত্য যে, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ, সত্যের প্রতি আকর্ষণ তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয় যখন আমরা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে জীবনজগতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ করি। অখণ্ড সত্যের সাথে সংহত, সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করতে না পারলে কোনো বস্তু বা কোনো ঘটনা কিংবা

---

[১] Philosophy is the science of knowledge– Fichte.

[২] Philosophy is the attempt to determine what the world must be in order that it may be understood by mind, and what the mind must be in order that it may understand the world- Schelling

[৩] Philosophy is the science of Absolute Idea– Hegel.

[৪] Philosophy aims at a rational unification of knowledge and belief by means of metaphysics- Kulpe.

[৫] Philosophy is love for the truth–the complete body of knowledge that includes in it all truths- all truths organised into one great system– Marvin.

কোনো অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা হতে পারে না। সার্বিক জ্ঞানই আমাদের জীবনের সকল আবেদন মিটাতে সমর্থ; নির্বিচারবাদের প্রভাব থেকে বাঁচতে হলেও আমাদের জ্ঞানের সম্যক আলোচনা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিচারের নিক্তিতে মারভিনের সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সার্থক।

ওয়েবার বলেন : "দর্শন হলো প্রকৃতির সম্পর্কে সামগ্রিক মতামতের সন্ধান, বস্তুসমূহের সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস।"[২]

সংজ্ঞাটির উৎকর্ষ : এই সংজ্ঞাটিও সন্তোষজনক। দর্শন জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা, একথা সংজ্ঞাটিতে স্বীকৃত হয়েছে; জীবনজগতের এমন কোনো দিক নেই যা দর্শনের আলোচ্য বিষয় নয়। দর্শনের পরিধি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. কেয়ার্ড অত্যন্ত সহজ ভাষায় দর্শনের আসল চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষের অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই, সমগ্র বিশ্বসত্তার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা যার দিকে দার্শনিক অনুসন্ধান কার্য প্রসারিত হয় না।" সত্য বলতে কি, এই একটি বাক্যের মাধ্যমেই দর্শনের প্রাণের সুর বেজে উঠেছে।

---

[২] Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of things. — Weber.

দ্বিতীয় অধ্যায়
দর্শনের স্বরূপ ও পরিসর
NATURE OF PHYLOSOPHY AND SCOPE

"The actions of men are the best interpreters of their thoughts."- **Locke**

- ❑ দর্শনের স্বরূপ
- ❑ দর্শনের পরিসর
- ❑ দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি
- ❑ দর্শনের মূল্য

দর্শনের স্বরূপ
Nature of Philosophy

দর্শন সার্বজনীন জীবন জিজ্ঞাসার বৌদ্ধিক প্রকাশ : আপনার স্বরূপ ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে মানব-মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা। আমি কে? আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কোথায় যাব? এই বিচিত্র জগৎ কোথা থেকে আসল? কোন খেয়ালীর স্বপ্ন এই জগৎ? এই দৃশ্যমান জগৎই কি একমাত্র জগৎ, না এর অন্তরালে কোনো শাশ্বত জগৎ বিদ্যমান? ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অনুভূতির সাহায্যে আমি যা জানছি, তা কি সত্য? আমার মানসপটে সত্য-সুন্দর কল্যাণের যে আদর্শ বিম্বিত, তা কি অলীক? জীবন ও জগৎকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে এই জাতীয় সার্বজনীন প্রশ্নের অজস্র আকুলি- বিচিত্র তরঙ্গাভিঘাত। দর্শন এই সার্বজনীন জীবন জিজ্ঞাসার বুদ্ধিদীপ্ত আর্শী- জিজ্ঞাসাদীর্ণ মানবমনের বৌদ্ধিক বাঙ্ময় প্রকাশ।

দর্শন যুক্তিনির্ভর : দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মিল থাকতে পারে এবং আছেও। ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্যের সঙ্গে দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের প্রভূত সাদৃশ্য রয়েছে। শুধু বিষয়বস্তুর গুণেই দর্শন পদবাচ্য হয় না, হয় যুক্তিনির্ভর হওয়ার জন্য। দার্শনিক তার আলোচনায় যে দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেন তা থেকেই তার যুক্তি উৎসারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন কোনো দার্শনিক জগতের আদিকারণকে প্রজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করেন, তার প্রতিপাদ্য বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি যেভাবে যুক্তির অবতারণা করবেন, আর একজন দার্শনিক যিনি জড়কে জগতের আদি কারণ হিসেবে গ্রহণ করেন তার যুক্তি থেকে পৃথক হবে। এর কারণ দৃষ্টিকোণ। প্রত্যেক দার্শনিক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তার আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করেন। যুক্তির শক্তি ও অবতারণার কৌশল বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। যুক্তির সামর্থ্য ও সাবলীলতা দৃষ্টিকোণকে বিকশিত করতে এবং তার সঙ্গে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সহায়ক হয়। যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও বিষয়বস্তুর স্বচ্ছ বিশ্লেষণ দার্শনিকের সামর্থ্যের নির্দেশক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দৃষ্টিকোণনির্ভর যৌক্তিকতা দর্শনকে প্রধানত অন্যান্য বিষয় থেকে পৃথক করে থাকে।

ব্যুৎপত্তি : ইংরেজি ভাষায় দর্শনের অর্থ জ্ঞানানুরাগ :[১] বাংলা 'দর্শন' ইংরেজি 'ফিলোসফি' ও আরবি 'হিকমত' শব্দদ্বয় মূলত জীবনজগতের তত্ত্বগত আলোচনার নির্দেশক। জীবনজগতের রহস্যজাল ছিন্ন করে সত্যের সন্ধান লাভই দর্শনের মর্মবাণী, অজ্ঞানতার তিমিরাবরণ ভেদ করে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হওয়াই দর্শনের মূল লক্ষ্য। সুতরাং জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানস্পৃহা– সার্বজনীন জীবন-জিজ্ঞাসা অর্থে দর্শনের মর্মকথা প্রকাশ করে।

দর্শন বহুমুখী জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় : দর্শন জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা বলে মানুষের লৌকিক জ্ঞান, বিজ্ঞানীদের গভীর গবেষণা, ধর্মতাত্ত্বিক ও নীতিবিদদের ধর্মীয় ও নৈতিক ধারণার আলোকেই দার্শনিক জীবনও জগতের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। মানবজাতির সাধনার অবদানেই গড়ে ওঠে দর্শনের চিন্তাসৌধ। তাই দর্শন মানুষের বহুমুখী জ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয়। মানুষের চেতনার বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত জ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণ করে দার্শনিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা গঠন করেন। এটাই দর্শন। মানুষের লৌকিক জ্ঞান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আদিম যুগের বিরোধী শক্তি-তাড়িত মানুষ থেকে আজকের গগনচুম্বী প্রসাদবাসী সভ্যতাগর্বী সাধারণ মানুষ জীবন ও জগতের সমস্যা সম্পর্কে কিছু কিছু সমাধান খুঁজে পেয়েছে। মানুষের চেতনার ক্রমপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গিও স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর, বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর হয়েছে, অস্পষ্টতার কুহেলী জাল বিদীর্ণ হয়ে স্পষ্টতর আলোক দেখা দিয়েছে। মানুষ অলৌকিকতার মোহপাশ কেটে বাস্তব জীবনের পটভূমিতে জীবন-সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়েছে। যুগে যুগে মানুষের লৌকিক জ্ঞান-চিন্তার বিসর্পিল পথে স্পষ্টতা, যৌক্তিকতা ও বাস্তবতার অভিমুখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। লৌকিক জ্ঞান যুগচেতনার দর্পণ, যুগমানসের প্রকাশ।

দর্শন অখণ্ড, বিজ্ঞান খণ্ড : দর্শন জীবন ও জগতের অখণ্ড, সামগ্রিক ব্যাখ্যার বলিষ্ঠ প্রয়াস। দর্শনের এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিজ্ঞানের অবদান অপরিমেয়। বিভিন্ন বিজ্ঞান জীবনজগতের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করে। পদার্থবিজ্ঞান জড়বস্তুর প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যাপৃত। বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে দ্রব্যের যে পরিবর্তন ঘটে তাই রসায়নশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়; জ্যোতির্বিদ্যা সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদির গতি ও ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে; প্রাণিবিজ্ঞান প্রাণের স্বরূপ, ক্রমবিকাশ ও কার্যধারার বিশ্লেষণ করে; মনোবিজ্ঞান মনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় নিয়ম আবিষ্কার করে; অর্থনীতি মানুষের অভাববোধ ও অভাব দূরীকরণ, সম্পদ ও কল্যাণ সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণ করে। এইভাবে প্রত্যেক বিজ্ঞান নিজ নিজ গণ্ডির ভিতর থেকে জীবন ও জগতের সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পায়। প্রত্যেক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট, অনুসন্ধান পদ্ধতি সুপরিকল্পিত। নিজ এলাকার বাইরে কোনো বিজ্ঞানের প্রবেশাধিকার নেই। কাজেই বিজ্ঞান জীবনজগতের খণ্ডবিচ্ছিন্ন জ্ঞান

---

[১] ইংরেজি Philosophy শব্দ Philo ও Sophia শব্দের সমাহার। Philo মানে অনুরাগ এবং Sophia মানে জ্ঞান। কাজেই Philosophy শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞানানুরাগ। অবশ্য জ্ঞানানুরাগ এখানে সামগ্রিক জ্ঞান, এই বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। জীবন-জগতের বিভিন্ন সমস্যা মানব মনে যে বিস্ময় সৃষ্টি করে, সেই বিস্ময়াহত অবস্থা থেকে মুক্তির আকুতি হলো জ্ঞানানুরাগ। অন্য কথায় বলা যায়, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি-প্রয়াসই দর্শন।

দান করে। কিন্তু দর্শন বিজ্ঞানলব্ধ খণ্ড বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নিয়ে পরিতৃপ্ত নয়। দর্শনে চাই জীবন-জগতের সামগ্রিক জ্ঞান। প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগে সন্ধানরত বিজ্ঞানসমূহের সিদ্ধান্তে সমন্বয় সাধন করে দর্শন জীবন ও জগতের সার্বিক ধারণা গঠন করে। বস্তুত বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ড, দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি অখণ্ড।

দর্শন জীবনের উপলব্ধিজাত : জীবনের গভীর উপলব্ধি থেকে দর্শনের জন্ম। তাই দর্শনকে মানবজীবনের ভাষ্য বলা হয়ে থাকে। মানবজীবনের স্বরূপ, উৎপত্তি, তাৎপর্য, লক্ষ্য ও সম্ভাবনা দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আধুনিক দর্শন মানবকেন্দ্রিক, বাস্তবধর্মী। পারলৌকিক নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা অপেক্ষা মানবজীবনের বিষয়মুখী দিক আধুনিককালের দর্শনে বিপুলভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রাচীনকালে বহির্জগতের সমস্যাবলি মানুষের চিন্তায় অতিমাত্রায় প্রকট ছিল। সেকালে ধেয়ানী মানুষ জগতের স্বরূপ, উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করতেন। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস থেকে দর্শনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, মানুষ নিজের সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে। মধ্যযুগের দর্শনেও দেখা যায় মানুষের ঐহিক জীবন অপেক্ষা পারত্রিক জীবনকে অধিক গুরুত্ব দিতে। আধুনিক যুগের দর্শনের এর ব্যতিক্রম সূচিত হয়েছে। মানবজীবনের বহুমুখী সমস্যা দর্শনের এলাকাভুক্ত হয়েছে। আধুনিককালে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিতে মানবজীবনের জটিলতার গ্রন্থি-উন্মোচনে দর্শন এগিয়ে এসেছে, জীবনবিরোধী চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বলদৃপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আজকের বিভিন্ন মতবাদ-পীড়িত, আদর্শের সংঘাতদীর্ণ অশান্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল দেশের সকল জাতির চিন্তাশীল মনীষীরা উপায় বের করার চেষ্টায় নিবেদিতপ্রাণ– তাঁরা ভাবছেন কীভাবে মানুষে মানুষে প্রীতি, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে পৃথিবীকে মানুষের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়, ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকতর উপযোগী করে তোলা যায়। মানুষের জীবনের গভীরতর উপলব্ধি থেকে দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলে তা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

জীবনের মতো দর্শনও প্রগতিশীল : দর্শন জীবনের গভীর সমস্যা থেকে উদ্ভূত বলে জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। মানবসভ্যতার অগ্রাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, নতুন নতুন সমস্যা মানুষকে বিব্রত করে তুলছে। এই সকল নবজাত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দর্শনের পরিধি প্রসারিত হয়ে পড়ছে। দর্শনে পূর্ণতার দাবি অচল। কারণ জীবন ও জগতের পরিপূর্ণ স্বরূপ এখনও মানুষের গোচরীভূত হয় নি। চিন্তার জগতে মানুষ ক্রমাগত নবদিগন্ত আবিষ্কার করছে, নিত্যনতুন সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করছে। কে জানে শেষ কোথায়। শেষ কথা বলবার স্পর্ধা মানুষের আজও হয় নি, হয়তো কোনোদিন হবেও না। তবে লক্ষণীয় এই যে, দর্শন ক্রমশ অধিকতর মানবিক হয়ে উঠছে।

দর্শনের পরিসর

Scope of Philosophy

পরিধির বিশালতা : দর্শনের পরিসর বলতে দর্শনের আলোচ্য বিষয়কে বুঝিয়ে থাকে। দর্শন জীবন ও জগতের সমস্যাবলির সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। দার্শনিক জ্ঞানের অখণ্ডতা তার বিশাল বিস্তৃতির নির্দেশক। মানুষের জ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই,

মানুষের আলোচনার এমন কোনো বিষয় নেই, যা দর্শনের এলাকাভুক্ত নয়, তবে বিজ্ঞান যেমন প্রকৃতির কোনো নির্দিষ্ট বিভাগের বিশেষ জ্ঞান, দর্শন তেমন কোনো বিভাগের কোনো বিশেষ জ্ঞান নয়। দর্শন জীবন ও জগতের বিভিন্ন বিভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় নিয়োজিত হয় না, বরং এক সামগ্রিক অখণ্ড দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা প্রদান করে। দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে ড. কেয়ার্ড (Dr. Caird) যথার্থই বলেছেন, "মানুষের অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই, সমগ্র বিশ্বসত্তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা যার দিকে দার্শনিক অনুসন্ধান কাজ প্রসারিত হয় না।"[১]

দর্শনের পরিসর যে অত্যন্ত ব্যাপক তা উপরের আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে। দর্শনের সুবিশাল ক্ষেত্রকে প্রধানত চারটি এলাকায় চিহ্নিত করা যায়। যথা– (ক) জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology), (খ) রূপবিজ্ঞান (Phenome-nology), (গ) অধিবিদ্যা (Ontology or Metaphysics) এবং (ঘ) আদর্শ বিদ্যা (Axiology)।

(ক) জ্ঞানবিদ্যা দার্শনিক আলোচনার প্রারম্ভ : আধুনিক দর্শন বিচারমূলক। এ জ্ঞানের সম্ভাবনাকে যাচাই না করে পরমসত্তার আলোচনায় নিয়োজিত হয় না। জীবনজগতের পরিদৃশ্যমান রূপ ও তাদের মূলীভূত সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে দর্শন এ সকল বিষয়ের জ্ঞানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করে। কাজেই একথা বলা যায় যে, জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার মাধ্যমেই দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটে, অন্তত আধুনিক দর্শনের আলোচনায় এ কথা তর্কাতীত।

জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান : এটি জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, যথার্থতা ও সীমা সম্পর্কে আলোচনা করে। জ্ঞান কি অভিজ্ঞতাজাত না বুদ্ধিজাত? প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ কি? জ্ঞানের মাধ্যমে কি পরমসত্তাকে জানা যায়? প্রকৃত জ্ঞান কি কি শর্তের ওপর নির্ভরশীল? মানুষ কি জগৎ, আত্মা ও খোদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে? কোন অবস্থায় জ্ঞান সত্য বলে বিবেচিত হয়, আর কোন অবস্থায়ইবা জ্ঞান মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়? জ্ঞানবিদ্যায় এই সমুদয় প্রশ্ন যথাযথভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। আধুনিক দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা এক উল্লেখযোগ্য আসনের অধিকারী। জ্ঞানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে না পারলে পরমতত্ত্বের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের অন্যতম প্রধান শাখা।

(খ) রূপবিজ্ঞান জীবনজগতের পরিদৃশ্যমান দিকের আলোচনা : দর্শন পরমসত্তার প্রেক্ষিতে জীবন ও জগতের সামগ্রিক রূপের ব্যাখ্যা প্রয়াস। আমরা সরাসরি পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করতে পারি না, অভিজ্ঞতায় পরিস্ফুট পরমতত্ত্বের রূপই আমাদের দর্শন পরিক্রমার পাথেয়। জীবন ও জগতের পরিদৃশ্যমান রূপ আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু। বিজ্ঞানের মতো দর্শনও অভিজ্ঞতানির্ভর। দর্শন জীবন ও জগতের পরিদৃশ্যমান রূপ সম্পর্কে আলোচনা করে। দর্শনের এই শাখা রূপবিজ্ঞান নামে চিহ্নিত। রূপবিজ্ঞান জড়বস্তু, প্রাণ ও মনের ব্যক্ত রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করে। জড়বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান– বিজ্ঞানের এই প্রধান শ্রেণীত্রয় রূপবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। বিজ্ঞানের এই শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে দর্শনেও তিন প্রশাখা নির্দেশিত হয়ে

---

[১] There is no province of numan experience, there is nothing in the whole realm of reality, which lies beyond the domain of Philosophy or to which Philosophical investigation does not extend. – Dr. Caird-Philosophy of Religion

থাকে। যেমন, জড়দর্শন, প্রাণদর্শন ও মনোদর্শন। দর্শনের এই শাখায় অর্থাৎ রূপবিজ্ঞানে এইসবের ব্যক্ত রূপের আলোচনা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দেশ ও কালের পটভূমিতে বস্তু, প্রাণ ও মনের ব্যাখ্যা রূপবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। রূপবিজ্ঞান একদিকে যেমন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমষ্টির বিচার, অন্যদিকে তেমনি এ অধিবিদ্যার সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট।

(গ) অধিবিদ্যা ও পরমসত্তার আলোচনা : এটা সুস্পষ্ট যে, জীবন ও জগতের পরিদৃশ্যমান রূপ পরমসত্তার সাথে নিবিড় যোগসূত্রে গ্রথিত। জড়বস্তুর স্বরূপ, প্রাণের স্বরূপ, জড়বস্তুর সাথে প্রাণের পার্থক্য, মনের স্বরূপ, প্রাণ ও মনের সম্বন্ধ ও পার্থক্য, জড়বস্তুর মূলীভূত উৎস হিসেবে পরমসত্তার অস্তিত্ব, পরমসত্তা বা খোদার স্বরূপ, খোদার সাথে জীবনজগতের সম্পর্ক নির্ধারণ প্রভৃতি সমস্যা অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অধিবিদ্যার আলোচনা ব্যতিরেকে দর্শন অন্তঃসারযুক্ত হতে পারে না। অধিবিদ্যা দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

অধিবিদ্যার বিভিন্ন উপশাখা : এই শাখার তিনটি উপশাখা বর্তমান, যেমন : ১. প্রকৃতি সম্পর্কীয় অধিবিদ্যা; ২. মন সম্পর্কীয় অধিবিদ্যা ও ৩. পরমসত্তা সম্পর্কীয় অধিবিদ্যা। প্রকৃতি সম্পর্কীয় অধিবিদ্যায় জড়, দেশকাল, কার্যকারণতত্ত্ব, দ্রব্য, জীবন, সৃষ্টি, ক্রমবিকাশ, যান্ত্রিকতা, উদ্দেশ্যমুখীনতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। মন সম্পর্কীয় অধিবিদ্যায় আত্মা বা মনের স্বরূপ, উদ্ভব ও পরিণতি এবং দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করা হয় ও তাদের সমাধান খুঁজে বের করা হয়। পরমসত্তা সম্পর্কীয় অধিবিদ্যায় পরমসত্তার স্বরূপ ও গুণাবলি, পরমসত্তার সাথে প্রকৃতি ও আত্মার সম্পর্ক পরমসত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করে। অধিকন্তু পরমসত্তা সম্পর্কীয় অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুত্ববাদ সম্পর্কেও দর্শনের এই শাখা বিশেষভাবে বিচার করে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দর্শন জীবনজগতের পরিদৃশ্যমান ও অতীন্দ্রিয় উভয় দিক সম্পর্কেই গভীরভাবে আলোচনা করে।

(ঘ) আদর্শবিদ্যা মূল্যবোধের আলোচনা : জীবনজগতের অবভাসিক, তত্ত্বগত দিক ও জ্ঞানবিষয়ক সমস্যার আলোচনা করে দর্শনের কাজ নিঃশেষ হয় না। জীবনজগতের বিভিন্ন ঘটনা মানুষের কাছে কি তাৎপর্য বা মূল্য বহন করে আনে দর্শন সে বিষয়ও আলোচনা করে। দর্শনের যে শাখা এই জাতীয় প্রশ্নের জবাব প্রদান করে তার নাম আদর্শবিদ্যা। কোনো বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আদর্শবিদ্যার কাজ নয়, কোনো বিষয়ের মূল্য নির্ধারণই আদর্শবিদ্যার লক্ষ্য। 'কাননে ফুল ফুটেছে'– এই বাক্যটি তথ্য নির্দেশক, কিন্তু 'ফুল কি সুন্দর!'–এই বাক্যটি মূল্যনির্ধারক। একটি বাক্যে বাস্তব ঘটনার বর্ণনা আছে, অন্যটিতে অবস্থার মূল্যায়ন। আদর্শবিদ্যা তথ্য নির্দেশ বাক্য (Judgment of fact) ও মূল্যনির্ধারক বাক্যের (Judgment of value) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে। মূল্যবোধের স্বরূপ কি? মূল্য কি বস্তুগত, না ব্যক্তিগত? মূল্যের কি কোনো তাৎপর্য আছে? সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শ কি আমাদের কল্পনাপ্রসূত, না এদের কোনো বাস্তব ভিত্তি বর্তমান? পরম আদর্শের যথার্থ স্বরূপ কি? খোদার সঙ্গে পরম আদর্শসমূহের সম্পর্ক কি? সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শ কি স্বতন্ত্র, না খোদাতে প্রমূর্ত? আদর্শবিদ্যা মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত এই ধরনের বহু সমস্যার ওপর আলোকপাত করে। আদর্শবিদ্যা মূল্যবিদ্যা বা মানবিদ্যা নামেও পরিচিত।

আদর্শবিদ্যার ভূমিকা : আদর্শবিদ্যা আধুনিক দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। দর্শনের এই শাখার মাধ্যমে আমরা বিশ্বপরিকল্পনায় আমাদের স্থান, কর্তব্য, লক্ষ্য ও সম্ভাবনার জ্ঞান লাভ করি। সৃষ্টি পরিকল্পনায় মানুষ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে, দর্শন তা দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে। এই আলোচনার পরে এ কথা দ্বিধাশূন্য চিত্তে বলা যায় যে, দর্শনের পরিসর সর্বত্রগামী ও সুবিশাল।

দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি

Different Methods of Discussion of Philosophy

বুদ্ধিনির্ভর ও বুদ্ধি বিযুক্ত পদ্ধতি : পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নই দর্শনের লক্ষ্য। কোনো বিষয়ে সুষ্ঠু আলোচনার জন্য যেমন পদ্ধতির অনুসরণ প্রয়োজন, যথার্থ দার্শনিক আলোচনার জন্যও তেমনি পদ্ধতির অনুসরণ অপরিহার্য। দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জীবনজগতের স্বরূপ আলোচনা ও মূল্য নিরূপণের জন্য বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন পদ্ধতির অবলম্বন করেছেন। দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি কোনটি সে সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে দার্শনিক আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা আবশ্যক। দর্শনের অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতিকে আমরা প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা– (ক) বুদ্ধিনির্ভর পদ্ধতি (Intellectual Method) এবং (খ) বুদ্ধিবিযুক্ত পদ্ধতি (Non-Intelletual Method)। এ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হলো :

(ক) বুদ্ধিনির্ভর পদ্ধতি (Intellectual Method) : এই শ্রেণীর পদ্ধতি অনুসারে দার্শনিক সমস্যার সমাধানার্থে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার প্রয়োগ অপরিহার্য। এই পদ্ধতিগুলি জীবনজগতের রহস্য অনুধাবনে সমর্থ বলে স্বীকার করা হয়। বুদ্ধিনির্ভর পদ্ধতিগুলি হলো : (১) নির্বিচারবাদ (Dogmatism), (২) সংশয়বাদ (Scepticism), (৩) বিচারবাদ (Criticism) ও (৪) দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Dialecticism or Dialectic method)।

১। নির্বিচারবাদ (Dogmatism)

নির্বিচারবাদের বৈশিষ্ট্য : নির্বিচারবাদ বুদ্ধিনির্ভর পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। কোনোরূপ সমালোচনা ছাড়া কোনো দার্শনিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে তাকে নির্বিচারবাদ বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে জ্ঞানবিদ্যার আবশ্যকতা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। তত্ত্বালোচনার পূর্বে জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, সীমা ও বৈধতা আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কথা নির্বিচারবাদী দার্শনিকরা আমল দেন না। তাঁরা পদ্ধতির কার্যকারিতা উপযোগিতা বিচার না করেই তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করেন। তাঁরা কতগুলি ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে ঐ ধারণাসমূহ থেকে সিদ্ধান্ত অনুমান করেন এবং সেই সিদ্ধান্তের সত্যতা পরীক্ষা করেন না। দর্শনের ইতিহাসে নির্বিচারবাদের দুটি রূপ পাওয়া যায়। যথা– বুদ্ধিবাদ (Rationalism) এবং অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)।

বুদ্ধিবাদ (Rationalism)

বুদ্ধিবাদ প্রজ্ঞা জ্ঞানের উৎস : বুদ্ধিবাদ অনুসারে, আমরা একমাত্র প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির সাহায্যে পরমসত্তাকে জানতে পারি। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিশ্চিত ও অভ্রান্ত জ্ঞান পাওয়া

যায় না। একমাত্র প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি থেকেই জ্ঞানের প্রজনন ঘটে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শনের প্রজ্ঞাকে ঐশী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সে যুগের দার্শনিকরা প্রায়শ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অবদান স্বীকার করতেন না, এমন কি কোনো কোনো দার্শনিক জ্ঞানের উৎপত্তির বেলায় অভিজ্ঞতার ভূমিকা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতেন। আধুনিককালের দর্শনেও দেকার্ত, স্পিনোজা, লিবনিজ, উলফ প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিক বুদ্ধির ক্ষমতায় অত্যধিক বিশ্বাসী ছিলেন। কান্ট এই দার্শনিকদের নির্বিচারবাদী দার্শনিক বলে অভিহিত করেছেন।

অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)

অভিজ্ঞতাবাদ : অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস । অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে, অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষণই জ্ঞানের আধার। জ্ঞানের পরিকল্পনায় প্রজ্ঞার কোনো অবদান নেই। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, মানুষের জন্মের সময় তার মন অলিখিত শ্লেটের মতো থাকে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন-শ্লেটে ছাপ পড়ে যায়। এই অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। সকল প্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতার সৃষ্টি। অভিজ্ঞতাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা জন লক। তিনি দেকার্টের সহজাত ধারণাকে উড়িয়ে দিয়ে অভিজ্ঞতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। লক কিংবা তাঁর অনুসারীরা অভিজ্ঞতাবাদের যথার্থ্য বিচার করেন নি। বিনা বিচারে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সম্ভাব্যতা ও প্রামাণ্যতা ধরে নিয়েছেন।

সমালোচনা

পদ্ধতির দুর্বলতা : দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি বিচার-বিযুক্ত হলে দর্শনের ইপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব। দর্শনের লক্ষ্য সত্যলাভ, একমাত্র বিচার বিবেচনার মাধ্যমেই সত্যে উপনীত হওয়া যায়, অন্য কোনো পথে নয়। নির্বিচারে কোনো ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করে তা থেকে সিদ্ধান্ত অনুমান করলে সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিবে। সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে নির্বিচারবাদের সাহায্যে জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

জ্ঞানের প্রতি গুরুত্বের অভাব : নির্বিচারবাদে জ্ঞানের সমস্যা যথাযথ গুরুত্ব লাভ করে নি। জ্ঞানের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির যুগ্ম অবদান রয়েছে। বস্তুর যেমন উপাদান ও আকার দুটি রূপ আছে, তেমনি জ্ঞানেরও দুটি দিক রয়েছে। অভিজ্ঞতা হলো জ্ঞানের উপাদান, বুদ্ধি হলো জ্ঞানের আকার; আর এই দুইয়ের সমন্বয়ই জ্ঞান। এই দুইয়ের একটি স্বীকার করলেও অন্যটিকে অস্বীকার করলে জ্ঞানের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

দর্শনে ব্যক্তিগত মতামত : পরিশেষে, দর্শনে ব্যক্তিগত মতামতের কোনো স্থান নেই। নিজ নিজ মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা দার্শনিকদের কাজ নয়, বরং প্রত্যেক মতবাদের পরীক্ষা করাই দার্শনিকদের জীবনের মহৎ লক্ষ্য। বিনা বিচারে কোনো মতবাদের সপক্ষে ওকালতি করা দার্শনিকদের কাজ নয়, বরং বিচারের সাহায্যে দার্শনিক মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই তাঁর কাজ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নির্বিচারবাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়।

২। সংশয়বাদ (Scepticism)

সংশয়বাদে যথার্থ জ্ঞানলাভ অসম্ভব : সংশয়বাদ নির্বিচারবাদের অনিবার্য পরিণতি।

বিভিন্ন নির্বিচারবাদী দার্শনিক বিভিন্ন মূলনীতিকে স্বীকার্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করায় বিভিন্ন মতবাদের কোনটি গ্রহণীয় এবং কোনটি গ্রহণীয় নয় তা স্থির করা অসম্ভব। ফলে পরস্পরবিরোধী মতবাদ অনিবার্যভাবে সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়। সংশয়বাদ অনুসারে, মানুষের পক্ষে যথার্থ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। সংশয় বা জ্ঞানের অনিশ্চয়তার স্বীকৃতি হলো সংশয়বাদের মর্মকথা। কেয়ার্ড বলেন, "নির্বিচারবাদের ব্যর্থতার প্রথম ফল হলো সংশয়বাদের জন্ম। বিরোধী মতবাদসমূহের বিরোধ হতাশার সৃষ্টি করে, এ এমন একটি বিশ্বাসও জন্মিয়ে দেয় যে, যা যত জোরের সাথে স্বীকার করা যায় তা তত জোরের সাথে অস্বীকারও করা যায়। এইরূপ সংশয়বাদ গভীর কিংবা অগভীর উভয় প্রকৃতিরই হতে পারে।"[১]

প্রাচীন ও আধুনিক সংশয়বাদ : দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা সংশয়বাদের দুটি রূপ দেখতে পাই– প্রাচীন সংশয়বাদ এবং আধুনিক সংশয়বাদ। সক্রেটিসের পূর্বে গ্রিস দেশে একদল পাণ্ডিত্যাভিমানী জ্ঞানী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা সোফিস্ট (Sophist) নামে পরিচিত। গর্জিয়াস, প্রোডিকাস, হিপিয়াস, প্রোটাগোরাস প্রভৃতি বিখ্যাত সোফিস্ট। পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করাই তাঁদের লক্ষ্য। সুবিখ্যাত সোফিস্ট প্রোটাগোরাস প্রাচীন সংশয়বাদের মূলমন্ত্র মাত্র একটি বাক্য প্রয়োগ করে প্রকাশ করেন।

প্রাচীন সংশয়বাদে সত্যের সার্বজনীনতা অস্বীকৃত : তাঁর মতে, 'ব্যক্তিমানুষই সবকিছুর পরিমাপক।'[৩] অর্থাৎ আমার কাছে যা সত্য, তা আমার কাছে সত্য, তোমার কাছে যা সত্য, তা তোমার কাছে সত্য; তার কাছে যা সত্য; তা তার কাছে সত্য। সত্য ব্যক্তিগত ব্যাপার। সত্যের কোনো সাধারণ মানদণ্ড নেই। মানবজীবনের নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের কোনো সার্বজনীন রূপ নেই।

দেকার্ত ও তার সংশয়বাদের বৈশিষ্ট্য : আধুনিককালে সংশয়বাদের একটি বিশেষ রূপ দেখতে পাই দেকার্তের দর্শনে। নিশ্চিত ভিত্তির ওপর দর্শনের সৌধ নির্মাণের জন্য দার্শনিক দেকার্ত সংশয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান, সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতির ধারণায় সংশয় প্রকাশ করেন। কিন্তু সংশয়ের শিখরে আরোহণ করে তিনি দেখলেন যে, সবকিছুকে সংশয় করলেও সংশয়কারী নিজেকে সংশয় করতে পারে না। "আমি চিন্তা করি, কাজেই আমি অস্তিত্বশীল।[৪] এইভাবে চিন্তার স্ব-প্রতীতির (self certitude) মধ্যেই তিনি জ্ঞানের নিশ্চিত ভিত্তি খুঁজে পেলেন, সংশয়ের তরণী বেয়ে সংশয়ের বৈতরণী পার হলেন। দেকার্ত আসলে সংশয়বাদী ছিলেন না, সংশয় তাঁর দর্শনের একটি পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

হিউম ও তার সংশয়বাদের বৈশিষ্ট্য : আধুনিক যুগের প্রখ্যাত সংশয়বাদী হলেন দার্শনিক হিউম। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লকের অভিজ্ঞতাবাদের পথ বেয়ে তিনি

---

[১] The first effect of the failure of Dogmatism is naturally the rise of Scepticism. The conflict of opposite dogmas produces a sense of hopelessness, and even, it may be, conviction that whatever can be asserted may be with equal reason be denied. Such exception may be of deeper or of shallower nature." – Caird, Critical Philosophy of Kant, P. 2

[৩] Man is the Measure of all things. – Protagorus.

[৪] Cogito ergo sum-I think, therefore, I exist– Descartes.

সংশয়বাদে উপনীত হলেন। তাঁর মতে, প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ই শুধু জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আমাদের জ্ঞান সংবেদনেই সীমিত। আমরা সংবেদনের বাইরে কোনো কোনো বস্তুতে পৌঁছতে পারি না। হিউম বলেন যে, অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানের একমাত্র পথ হয় তবে দ্রব্য, মন, খোদা প্রভৃতি ধারণার কোনো অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয়।" ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কেবল বস্তুর গুণের প্রত্যক্ষণ সম্ভব, জ্ঞানের অতিরিক্ত কোনো দ্রব্যত্বের জ্ঞান লাভ করা যায় না। মন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য— পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার বাইরে কোনো মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কাজেই হিউমের মতে "অভিজ্ঞতার বাইরে আমরা কিছুই জানতে পারি না। এটাই হিউমের সংশয়বাদ।"

সমালোচনা

Criticism

সংশয়বাদ নির্বিচারবাদের প্রকারভেদ : সংশয়বাদ ও নির্বিচারবাদের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। সংশয়বাদ এক ধরনের নির্বিচারবাদ। নির্বিচারবাদে যেমন বিনা বিচারে জ্ঞানের সম্ভাব্যতা স্বীকার করা হয়, সংশয়বাদেও তেমনি বিনা বিচারে জ্ঞানের অসম্ভাব্যতা স্বীকার করা হয়। সংশয়বাদের নঞর্থক চিন্তা মানব মনকে পরিতুষ্ট করতে পারে নি। কাজেই সংশোধক শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা চলে না।

সংশয়বাদ আত্মঘাতী : সংশয়বাদ নির্ভরযোগ্য দার্শনিক পদ্ধতি নয়। কারণ সংশয়বাদ স্ববিরোধী। সংশয়বাদের মূলকথা— জ্ঞান সম্ভব নয় এটাও এক প্রকার জ্ঞান। কাজেই সংশয়বাদ জ্ঞানের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করতে গিয়ে নিজের অলক্ষ্যে জ্ঞানের সম্ভাব্যতা স্বীকার করে থাকে। অধিকন্তু আমরা বস্তুর অবভাসিক দিক জানতে পারি, এর অধিক জানতে পারি না। এখানে একটি বিষয় পরিস্ফুট যে, আমরা বস্তুর আসল রূপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারি না এবং সে ক্ষেত্রে বস্তুর দুটি রূপের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা বিশদভাবে বুঝতে পারি। কাজেই সংশয়বাদ আত্মঘাতী।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিস্ফুট যে, সংশয়বাদ নির্বিচারবাদের জঞ্জাল অপসারিত করে দর্শনের জয়যাত্রার গতি অব্যাহত রাখে।

৩। বিচারবাদ (Criticism) : বিচারবাদ নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। নির্বিচারবাদ বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকে জ্ঞানের সম্ভাবনা স্বীকার করে জীবনজগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন সম্ভব বলে ঘোষণা করে। আর এই বিচারবিযুক্ত বিভিন্ন মতবাদের বিরোধের ফলে দেখা দেয় সংশয়বাদ। সংশয়বাদও এক ধরনের বিচারবিযুক্ত মতবাদ। এই মতবাদও জ্ঞানের সমন্বয় সাধনকারী সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনোরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। বিচার ছাড়াই জ্ঞানের সম্ভাব্যতা ঘোষণা করে। সুতরাং এই দুটি মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জ্ঞানের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি সাধারণ নীতি অপরিহার্য। বিচারবাদ এই সাধারণ নীতির স্বীকৃতি দেয়। নির্বিচারবাদ ও সংশয়বাদের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু গ্রহণ করে বিচারবাদ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং জ্ঞানসমস্যা আলোচনার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে।

কান্ট ও বিচারবাদ : জ্ঞানের উপাদান ও আকার : আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বিচারবাদের প্রবর্তক। দার্শনিক কান্টই সর্বপ্রথম জ্ঞানের সমস্যাকে গুরুত্ব দেন এবং এ সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করেন। তিনি জ্ঞানের

স্বরূপ, উৎপত্তি, সীমা ও বৈধতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নির্বিচারবাদের ও সংশয়বাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পান। তাঁর মতে যথার্থ জ্ঞান হলো বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপ। প্রত্যেক বস্তুর মতো জ্ঞানের দুটি দিক আছে– উপাদান ও আকার। অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ করে, আর বুদ্ধি জ্ঞানের আকার প্রদান করে; উপাদান ও আকার মিলিত হয়ে জ্ঞানের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগৎ : কান্টের পূর্বে জ্ঞানের সমস্যাকে কোনো দার্শনিকই এত গভীরভাবে আলোচনা করেন নি। প্রাক্-কান্টীয় দর্শন তাই বিচারবিযুক্ত। কান্টের পর থেকেই দর্শন বিচারমূলক দর্শনে পরিণতি লাভ করে; অবশ্য শিগগির তিনি দেখতে পেলেন যে, জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। ইন্দ্রিয়ানুভূতির আকার (Forms of intuition) ও বুদ্ধির মৌলিক ধারণা (Categories of understanding) পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য, অতীন্দ্রিয় জগৎ (Things-in-themselves) সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কান্টের দর্শন এইভাবে পরিদৃশ্যমান জগৎ (Phenomenal world) ও অতীন্দ্রিয় জগৎ– এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরিদৃশ্যমান জগৎ অতীন্দ্রিয় জগতের অবভাস (Appearance) মাত্র। কান্টীয় দর্শন অনুযায়ী আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের জ্ঞান লাভ করি। অতীন্দ্রিয় জগৎ আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

সমালোচনা

Criticism

দ্বৈতবাদ ও এই মতবাদের জটিলতা : কান্টের বিচারবাদ দর্শনের ইতিহাসে জ্ঞান সমস্যার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের বলিষ্ঠ প্রয়াস। তাঁর পূর্বে কোনো দার্শনিকই জ্ঞান সমস্যাকে তলিয়ে দেখেন নি। বিচারবাদ অন্যান্য মতবাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার কিন্তু কান্টের বিচারবাদ একটি বিশেষ ত্রুটির অধীন। তাঁর বিচারবাদ পরিণামে দ্বৈতবাদে (Dualism) পর্যবসিত হয়েছে। পরিদৃশ্যমান ও অতীন্দ্রিয়, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে জগৎ আমাদের কাছে অধিকতর জটিল চিত্র তুলে ধরেছে। তিনি শুধু পরিদৃশ্যমান জগতের জ্ঞানই নিশ্চিত করেছেন। তাঁর মতে, বুদ্ধি শুধু দৃশ্যমান জগৎকে জানতে পারে। কিন্তু দৃশ্যমান জগৎ কি করে সংবেদন উৎপন্ন করে, ভেবে পাওয়া যায় না। কান্টের দ্বৈতবাদ এক প্রকার সংশয়বাদে রূপ লাভ করে, তাঁর দর্শন তাই অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism) নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। কান্টের পরবর্তী দার্শনিক ফিকটে, শেলিং ও হেগেল কান্টের দ্বৈতবাদ অতিক্রম করেন। তাঁরা দৃশ্যমান ও অতীন্দ্রিয় জগতের পার্থক্য উঠিয়ে দিয়ে দুইয়ের মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক উদ্ঘাটিত করেন।

৪। **দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Dialectical Method or Dialecticism)** : ইংরেজি ডায়ালেকটিক (Dialectic) শব্দটি ডায়ালগ (Dialogue) শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সংলাপ বা দুই ব্যক্তির কথোপকথনকে ডায়ালগ বলে। ইংরেজি ডায়ালেকটিক মেথড বা ডায়ালেকটিসিজম বাংলায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি নামে অভিহিত। এই পদ্ধতির সাহায্যে কোনো মতবাদের অন্তর্নিহিত বিরোধ বা ভালো-মন্দ নির্ধারণ করা হয়। একই বিষয়ে দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের উপস্থাপন করে বিরোধের মাধ্যমে সত্য নির্ধারণ করাই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কাজ।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির দ্বিবিধ রূপ রয়েছে। যথা– (অ) নঞর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Negative Dialectic Method) এবং (আ) সদর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Positive Dialectic Method)।

(অ) নঞর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Negative Dialectic Method) : নঞর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা হয়। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস এই পদ্ধতির প্রবর্তক। তিনি কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিপক্ষের মতবাদের দ্বন্দ্ব বা বিরোধ প্রমাণ করে স্বীয় মতবাদের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতেন। সোফিস্টদের ব্যক্তিমানুষই সত্যের মাপকাঠি, এই মতবাদ খণ্ডন করে তিনি জ্ঞানের সার্বজনীনতা ও যথার্থ প্রমাণ করেন। এই পদ্ধতি সক্রেটিস পদ্ধতি নামেও পরিচিত। সক্রেটিস তাঁর প্রতিপক্ষকে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে আহ্বান করতেন, তারপর মতের অসঙ্গতি ও অন্তর্বিরোধ উদ্ঘাটন করে বিপরীত মতবাদ অর্থাৎ নিজের মতের প্রতিষ্ঠা করতেন। এই পদ্ধতি প্রতিপক্ষের মতো খণ্ডন করার পদ্ধতি হলেও এই পদ্ধতির একটি গঠনমূলক দিকও আছে– অন্যের মনের অসারতা প্রতিপাদনের মধ্য দিয়ে নিজের মতের প্রতিষ্ঠা। কাজেই এই পদ্ধতি একাধারে খণ্ডন ও প্রমাণের পদ্ধতি। আধুনিককালে জার্মান দার্শনিক কান্ট এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আত্মা, জগৎ ও খোদা প্রভৃতি ধারণার অন্তর্বিরোধ প্রদর্শন করেন।

(আ) সদর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Positive Dialectic Method) : জার্মান দার্শনিক হেগেল এই পদ্ধতির প্রবর্তক। সদর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি পরস্পরবিরোধী ধারণার সংশ্লেষণের মাধ্যমে জগৎসত্তা নিরূপণ করে। এটি নঞর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। নঞর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বিপক্ষের মতবাদ খণ্ডন করে স্বপক্ষীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে, আর সদর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি পরস্পরবিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জগৎসত্তার স্বরূপ নির্ধারণ করে। হেগেলের এই মতকে সদর্থক দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষক বা গঠনমূলক (Synthetic or Constructive) বলা হয়ে থাকে, কারণ এই পদ্ধতি বিরোধ সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ সমন্বয়ের (Highest synthesis) দিকে অগ্রসর হয়।

Thesis, Anti-thesis, Synthesis

হেগেল তাঁর Science of Logic গ্রন্থে সদর্থক দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের চিন্তা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই অগ্রসর হয়– মানুষ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চিন্তা করে। আমরা সদর্থক ধারণা (Thesis) থেকে নঞর্থক ধারণায় (Anti-Thesis) পৌঁছাই, পরে উভয়ের সমন্বয়ে উপনীত হই; পরম সমন্বয়ে (Absolute synthesis) উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সদর্থক ধারণা থেকে নঞর্থক ধারণার মাধ্যমে সমন্বয়ে গমনাগমন অব্যাহত থাকে। আমরা শুধু বিপরীত ধারণার সমন্বয়ের প্রেক্ষিতে কোনো ধারণার যথার্থ তাৎপর্য উদ্ঘাটন করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' কে 'ক' হিসেবে বুঝতে গেলে 'নয়-ক'র প্রেক্ষিতেই তা করতে হবে 'ক' যে 'নয়-ক' থেকে স্বতন্ত্র– এই পার্থক্য 'ক' ও 'নয়-ক'কে বুঝতে সাহায্য করে। এই 'ক' এবং 'নয়-ক' মিলিত এক উচ্চতর সমন্বয়ের নির্দেশ দেয়। ধরা যাক এটি 'খ'। পরে এই 'খ'কে সদর্থক ধারণা করতে 'নয়-খ' হলো নঞর্থক ধারণা– এই 'খ' এবং 'নয়-খ মিলে 'গ' এই উচ্চতর সমন্বয়ে পর্যবসিত হয়। এইভাবে সমন্বয় সাধন ক্রিয়া চলতে থাকে। একটি মূর্ত উদাহরণ নেওয়া যাক। 'জড়' এই ধারণাকে বুঝতে হলে এর বিপরীত

'অজড়'। এই ধারণার সাথে তুলনা করে বুঝতে হবে। 'জড়' ও 'অজড়'-এর মধ্যে চিরন্তন বিরোধ নেই– উভয়ই এক উচ্চতর ঐক্যের অন্তর্ভুক্ত। 'জড়' ও 'অজড়' উভয়ের সমন্বয় হলো 'দ্রব্য' ও এর বিপরীত ধারণা 'অ-দ্রব্য'– এই দুইয়ের সমন্বয় হলো 'সত্তা'। এইভাবে চলতে চলতে পরম সমন্বয়ের মধ্যে সকল বিরোধের অবসান ঘটে।

পদ্ধতির সামগ্রিকতা : এই পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে হেগেল বলেন যে, এ শুধু মানুষের চিন্তার পদ্ধতি নয়, এ সমগ্র জগতের ক্রমবিকাশের পদ্ধতি, দ্বান্দ্বিক বিবর্তন সমগ্র জগতের নীতি। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের ফল। এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমেই পরমসত্তা নিজেকে প্রকাশ ও উপলব্ধি করেন। পরমসত্তা নিজের মধ্যে নিহিত বিরোধ প্রকাশ করেন, সেই বিরোধগুলি উচ্চতর সমন্বয়ের মধ্যে একীভূত করেন এবং এই বিবর্তনের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করেন। মানবমনের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন পদ্ধতি এবং পরমসত্তার দ্বান্দ্বিক বিবর্তন পদ্ধতির মধ্যে মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং এই পদ্ধতির মাধ্যমে পরমসত্তার স্বরূপ জানতে পারা যায়।

সমালোচনা

Criticism

হেগেল তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে হেগেলীয় পদ্ধতির চেয়ে উচ্চতর কোনো পদ্ধতি নেই। দর্শন সমগ্রের ব্যাখ্যা; কাজেই ব্যাপকতর পদ্ধতি দর্শনে অধিক শ্রদ্ধেয়। যে পদ্ধতি বা যে মতবাদের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে যত অধিক বিষয় ব্যাখ্যা করা যায়, দর্শনের বিচারে সেই পদ্ধতি ততোধিক নির্ভরযোগ্য, সন্তোষজনক। হেগেলীয় পদ্ধতি সেই দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তবে তাঁর এই পদ্ধতি ঐক্যের বেদীমূলে বৈচিত্র্যকে কোরবানি দেয়।

(খ) বুদ্ধি বিযুক্ত পদ্ধতি (Non-Intellctual Method) বা স্বজ্ঞাবাদ : বুদ্ধিমূলক পদ্ধতি ছাড়াও অপর এক শ্রেণীর পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতির নাম স্বজ্ঞা। ভাববাদী দার্শনিকরা বুদ্ধিমূলক পদ্ধতিকে দর্শনের প্রকৃত পদ্ধতি বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, দর্শন হলো বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। কিন্তু স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিকরা মনে করেন যে, দর্শনের বুদ্ধিমূলক পদ্ধতিসমূহ বস্তুজগতের ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হলেও অতীন্দ্রিয় সত্তার স্বরূপ নিরূপণে এই শ্রেণীর পদ্ধতি মোটেই ফলদায়ক নয়। একমাত্র স্বজ্ঞাই পরমসত্তার জ্ঞান দিতে পারে– মরমিবাদী দার্শনিকরা এই মতের সমর্থক।

বার্গসঁ ও তার মতবাদ : আধুনিককালে ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁ স্বজ্ঞাবাদের সাহায্যে পরমসত্তাকে ব্যাখ্যা করা যায় বলে দাবি করেন। তাঁর মতে, বুদ্ধি জীবনজগতের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এলেও দর্শনের সমস্যা সমাধান, পরমসত্তার স্বরূপ নির্ধারণে কোনো কাজে আসে না। বুদ্ধি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র প্রভেদ অতিক্রম করতে পারে না। ফলে বুদ্ধিমূলক পদ্ধতি জীবন্ত ও চলমান পরমসত্তার খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ ছাড়া অখণ্ড রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাতে পারে না। তিনি পরমসত্তাকে প্রাণপ্রবাহ (Elan Vital) বলে মনে করেন। এই প্রাণপ্রবাহ নব নবসৃষ্টির পথে চলেছে বাধাবন্ধনহারা। এই চলমান প্রক্রিয়া প্রাণ প্রবাহ বা পরমসত্তাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে। ফলে বুদ্ধির মাধ্যমে পরমসত্তার যে চিত্র পাওয়া যায় তা পূর্ণাঙ্গ নয়। সতত সঞ্চারী প্রাণপ্রবাহ বা পরমসত্তাকে জানার একমাত্র পদ্ধতি স্বজ্ঞাবাদ। তাই স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিকরা পরমসত্তার অবগতির ক্ষেত্রে স্বজ্ঞাকে বুদ্ধির ওপর প্রাধান্য দেন।

বার্গসঁ স্বজ্ঞা বলতে এক ধরনের বুদ্ধিমূলক অনুভূতিকে (Intellectual Sympathy) বুঝিয়ে থাকেন। এটি বুদ্ধির চেয়েও উচ্চতর এক ধরনের শক্তি। এই শক্তির মাধ্যমে আমরা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়র সম্পর্ক অতিক্রম করে পরমসত্তা– প্রাণ প্রবাহের সাথে একাত্মবোধ করি এবং পরমসত্তাকে যথার্থ অনুভব করি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, স্বজ্ঞা এক প্রকার অনুভূতিমূলক শক্তি।

ইকবাল : প্রাচ্যের কবি ও দার্শনিক ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল প্রজ্ঞার প্রয়োজনীয়তার ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, স্বজ্ঞা পরমসত্তার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ; অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আমরা পরমসত্তা খোদার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারি। যেমন : প্রত্যক্ষণের সাহায্যে বস্তুর জ্ঞান লাভ করি। কাজেই "স্বজ্ঞা মানবীয় অভিজ্ঞতা বহির্ভূত কোনো পন্থা নয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতায় সমগ্রতা মুখ্য হয়ে থাকে অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন অংশ এক অখণ্ড ঐক্যে পরিণত হয়।"[১]

এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমার রচিত মুসলিম দর্শনের ভূমিকা'র 'আত্‌তাসাউফ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সমালোচনা

Criticism

স্বজ্ঞাবাদের সীমা : স্বজ্ঞাবাদকে দার্শনিক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার অসুবিধা আছে। স্বজ্ঞাবাদ অনুভূতিমূলক পদ্ধতি বলে এই পদ্ধতিলব্ধ ফল অন্যের কাছে পরিবেশন করা সম্ভব নয়। কিন্তু দার্শনিক জ্ঞান বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্লেষণযোগ্য সার্বজনীন। বিভিন্ন দিক দর্শন আলোচনা করে। চিন্তা ছাড়া অনুভূতি ও ইচ্ছাও দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এদিক দিয়ে বিচার করলে দর্শন চিন্তার বিভিন্ন দিকের মতো অনুভূতির বিভিন্ন দিকও আলোচনা করে। অল্প কথায় মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পার্থিব মানসিক বিষয়াবলির ন্যায় আধ্যাত্মিক বিষয়ও দর্শন আলোচনা করে থাকে। তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে দর্শন সর্বজনগ্রাহ্য ও যৌক্তিক। সুতরাং যেটাই দর্শনের আওতাভুক্ত হোক না কেন সে সকল বুদ্ধি ও যুক্তির পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত হওয়া চাই। স্বজ্ঞাবাদ এককভাবে তাই দর্শনের চাহিদা মিটাতে পারে না, আমাদেরকে বুদ্ধিমূলক পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। স্বজ্ঞাবাদীরা স্বজ্ঞাকে প্রাধান্য দিলেও বুদ্ধির প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁরা যুক্তিবলেই স্বজ্ঞার প্রাধান্য ও বুদ্ধির অক্ষমতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। সুতরাং স্বজ্ঞাবাদীরা নিজেদের অজ্ঞাতেই বুদ্ধির মাহাত্ম্য স্বীকার করে থাকেন।

দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি

True Method of Philosophy

দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি অভিজ্ঞতা ও অনুধ্যানভিত্তিক : উপরে দর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এই আলোচনা থেকে দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি কোনটি তারও আভাস দেওয়া হয়েছে। দর্শনের আলোচ্য বিষয় ও

---

[১] The mystic state brings us into contact with the total passage of Reality in which all the diverse stimuli merge into one another and form a single unanalysable unity in which ordinary distinction of subject and object does not exit. – Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 19

বৈশিষ্ট্যই এর যথার্থ পদ্ধতির নির্দেশক। দর্শন জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। জীবনজগতের পরিদৃশ্যমান দিকের আলোচনা থেকে দর্শনের যাত্রারম্ভ। এই পর্যায়ে দর্শন ও বিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে চলে, এখানে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতি (Empirical Method) দিয়েই দর্শনের কাজ চলে। কিন্তু দর্শন জীবনজগতের প্রাতিভাসিক দিকে সীমাবদ্ধ থাকে না। জীবন ও জগতের সামগ্রিক চিত্র গঠনের জন্য দর্শন জীবনজগতের পরিদৃশ্যমান দিকের অন্তরালে অবস্থিত পরমসত্তার আলোচনা করে। এই পর্যায়ে দর্শন শুধু অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে না, এখানে অনুধ্যান পদ্ধতির (Reflective method) সাহায্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। জীবনজগতের ব্যাখ্যা মূল্যায়নের জন্য সমগ্র অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা ও মূল্য নিরূপণের জন্য দর্শন মানবজাতির সর্ববিধ অভিজ্ঞতা– পার্থিব ও দৈহিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ বিজ্ঞানলব্ধ ফল ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা সৌন্দর্যানুভূতি, নৈর্ব্যক্তিক আদর্শসমূহের প্রতি আকুতি– সব বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ কষ্টিপাথরে যাচাই করে সব কিছুকে সমন্বিত করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে দর্শন পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরমসত্তা সম্পর্কে সুষ্ঠু ও যৌক্তিক ধারণা গঠন করে এবং বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠিত করে। কাজেই দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি অভিজ্ঞতা-অনুধ্যানভিত্তিক (Empirico-rational)।

দর্শন জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন

যুগে যুগে মানুষের জিজ্ঞাসু মন জীবন ও জগতের অপার রহস্যের আবরণ উন্মোচন করার প্রয়াস পেয়েছে, জীবন ও জগতের মূল উৎস পরমসত্তার সন্ধান করে ফিরেছে। অজানাকে জানার, না পাওয়াকে পাওয়ার এক দুর্নিবার স্পৃহা তার সমগ্র সত্তাকে চঞ্চল করে তুলছে। মাথার উপরে নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশ, জগৎবেষ্টিত অগাধ জলধি, অচল-অটল হিমাদ্রি, রহস্যঘেরা গভীর অরণ্যাদী, স্নিগ্ধ শ্যামল প্রান্তর, সীমাহীন ধূসর মরুভূমি, বিভিন্ন ঋতুতে পরিশোভিত প্রকৃতির অফুরন্ত বর্ণচ্ছটা, সমুদ্রগামী তটিনীর বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গ, মলয়শীতল দখিন হাওয়া তাকে বিমুগ্ধ করেছে, বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে জীবনের বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্য জীবনের অপরিসীম জটিল গ্রন্থি তার বিস্ময়াবিমুগ্ধ মনে কতগুলি গভীর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। এই জিজ্ঞাসা থেকে জন্ম লাভ করেছে মানুষের দর্শন। বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ জীবন ও জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করেই ক্ষান্ত হয় নি, তার জীবনে জীবন ও জগতের রহস্য যে গভীর তাৎপর্য বহন করে আনে তার আবিষ্কার করেছে। কাজেই দর্শন জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন।

দর্শনে জীবনের মূল্যায়ন : দর্শন শুধু জীবন ও জগতের ব্যাখ্যাই নয়, মূল্যায়নও বটে। যেদিন থেকে মানুষের জীবন সমস্যা দর্শনের আওতাভুক্ত হতে শুরু করেছে সেদিন থেকে মূল্যবোধের প্রশ্নটি, দর্শনের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে প্রাধান্য লাভ করেছে। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি– আশরাফুল মখলুকাত। এই বিশ্বপরিকল্পনায় মানুষের স্থান, কর্তব্য, লক্ষ্য ও সম্ভাবনা, বিশ্বস্রষ্টা ও জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রভৃতি মানবিক সমস্যা ফুটে উঠেছে। দর্শন মানবজীবনের পরম আদর্শ : সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রেক্ষিতে জীবনের সমস্যার মূল্য নির্ধারণ করে জীবনের গভীর তাৎপর্য ব্যক্ত করছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক

PHILOSOPHY AND ITS RELATION TO OTHER SUBJECTS

There is no province of human experience, there is nothing in the whole realm of reality which lies beyond the domain of philosophy or to which philosophical investigation does not extend. – **Caird**

- ❑ দর্শন ও কাণ্ডজ্ঞান
- ❑ দর্শন ও বিজ্ঞান
- ❑ দর্শন ও ধর্ম
- ❑ দর্শন ও কাব্য
- ❑ দর্শন ও জীবন
- ❑ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি
- ❑ দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা
- ❑ দর্শন ও অধিবিদ্যা
- ❑ দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা
- ❑ দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব
- ❑ দর্শন ও কলাশিল্প
- ❑ দর্শন পঠন-পাঠনের উপকারিতা

দর্শন ও কাণ্ডজ্ঞান

Philosophy and Common Sense

কাণ্ডজ্ঞানের স্বরূপ : কাণ্ডজ্ঞান বলতে সাধারণত বাস্তব বুদ্ধি বা স্বাভাবিক মানুষের সাধারণ বুদ্ধিকে বুঝিয়ে থাকে। এই বুদ্ধির বলেই সাধারণ লোক জীবনের সাধারণ প্রয়োজন মিটিয়ে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকে। লৌকিক জ্ঞান অর্থেও কাণ্ডজ্ঞান (Common sense) শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কানিংহাম এই শেষোক্ত অর্থেই কাণ্ডজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, যে মতবাদ-সমষ্টি কোনো মানবগোষ্ঠী বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করে তাকে কাণ্ডজ্ঞান বা লৌকিক জ্ঞান বলা হয়।[১]

কানিংহাম কাণ্ডজ্ঞান বা লৌকিক জ্ঞানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেছেন :

প্রথমত, ব্যক্তি ও ব্যক্তির পরিবেশ লৌকিক জ্ঞানের অন্তর্গত : কাণ্ডজ্ঞান বা লৌকিক জ্ঞান আমাদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে, ব্যক্তি ও ব্যক্তির পরিবেশ কাণ্ডজ্ঞানের প্রধান উপজীব্য বিষয়। কাণ্ডজ্ঞানের জরিপকালে আমরা দেখতে পাই যে, লৌকিক মনোবিজ্ঞান, লৌকিক

---

[১] Loosely described, common sense may be said to be the aggregate of views which by any group is commonly held without serious questioning–Problems of Philosophy,P- 6.

নীতিবিজ্ঞান, লৌকিক ধর্ম রয়েছে। সাধারণ লোক তার নিজের, নিজের প্রকৃতির এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করে। মানুষ বুদ্ধিগত বিবর্তনের যে স্তরেই অবস্থান করুক না কেন, তার আত্মচেতনা ও পরিবেশ চেতনা সম্পর্কে ধারণা থাকবেই থাকবে।

দ্বিতীয়ত, কাণ্ডজ্ঞান বা লৌকিক জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিগত উদ্যোগের সামগ্রিকতা : লৌকিক জ্ঞান বুদ্ধিগত বিবর্তনের কোনো একটি বিশেষ স্তরের উদ্যোগের ফলসমষ্টি। ব্যক্তির দিক থেকে এ ব্যক্তির বুদ্ধিগত অভিযানের পাথেয়। ব্যক্তি তার কালের ও সমাজের কাছে থেকে প্রাপ্ত লৌকিক জ্ঞানের পাথেয় নিয়ে তার বুদ্ধিগত যাত্রা আরম্ভ করে। যদি সে লৌকিক জ্ঞানের সীমানা অতিক্রম করে, তবে এখান থেকে শুরু হয় তার বুদ্ধিগত বিবর্তন। কাজেই বলা চলে, লৌকিক জ্ঞান আমাদের বৌদ্ধিক অভিযাত্রার প্রারম্ভ। লৌকিক জ্ঞানের বিশেষত্ব হলো এ বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়, এ কতগুলি মতবাদের সমষ্টি– ঘটনার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের জটিল মিশ্রণ।"[১]

তৃতীয়ত, লৌকিক জ্ঞান মানুষের কৃষ্টিগত চেতনার নির্দেশক : মানুষের কৃষ্টিগত চেতনার কোনো বিশেষ স্তরে পরিলক্ষিত মতবাদসমূহ তার পূর্ববর্তী স্তর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এইগুলি প্রধানত ভাষা ও প্রথার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। কোনো মানবগোষ্ঠীর রক্ষণশীল শক্তিসমূহের মাধ্যমেই এই লৌকিক জ্ঞানের উত্তরাধিকার এক যুগ থেকে অন্য যুগে সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চরণ বা সংক্রমণেরকালে মতবাদসমূহ ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। মধ্যযুগের লৌকিক জ্ঞান গ্রিকদের লৌকিক জ্ঞান থেকে অনেক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র, আবার আধুনিক যুগে লৌকিক জ্ঞান মধ্যযুগের লৌকিক জ্ঞান থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন কৃষ্টির প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, লৌকিক জ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের লৌকিক জ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যথেষ্ট বিসদৃশ মতবাদ দৃষ্ট হয়। এর মূল কারণ এই যে, কোনো বিশেষ মানবগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত লৌকিক মতবাদ অপর মানবগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত মৌলিক মতবাদের বিরোধী হলেও ঐগুলি লৌকিক জ্ঞান হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। লৌকিক জ্ঞানের এই পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ এই যে, লৌকিক জ্ঞানের নিশ্চিত ভিত্তি নেই। আর এই ভিত্তি নেই বলেই লৌকিক জ্ঞান এত বিরোধ কন্টকিত ও দোদুল্যমান।

দর্শন ও লৌকিক জ্ঞানের পার্থক্য : উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, কাণ্ডজ্ঞান বা লৌকিক জ্ঞান জীবনজগতের গভীর ভাবনা অনুধ্যানসঞ্জাত নয়। অপরপক্ষে, দর্শন জীবনজগৎ সম্পর্কীয় গভীর চিন্তাভাবনা ও অনুধ্যানের যৌক্তিক প্রকাশ। অন্য কথায়, দর্শন জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের প্রয়াস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, (১) লৌকিক জ্ঞান বা কাণ্ডজ্ঞান গভীর জীবন জিজ্ঞাসার ফল– লোকপরম্পরায় শ্রুত বা গৃহীত মতবাদসমূহ। এই মতবাদসমূহের পশ্চাতে বিচার-বিশ্লেষণ নেই, গভীর গবেষণা বা অনুসন্ধিৎসা নেই; আছে কোনো বিষয়ে অসংলগ্ন, অনেক সময় পরস্পরবিরোধী মতবাদের যেনতেন প্রকারের স্বীকৃতি। কিন্তু দর্শন জীবনজগতের বিভিন্ন সমস্যার প্রজ্ঞানিত জ্ঞান-বুদ্ধির 'ফিল্টারে' পরিশ্রুত জীবনজগৎ সম্পর্কিত সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। (২) লৌকিক জ্ঞান সাধারণ মানুষের কাজ চলা

---

[১] Cunningham, *Problems of Philosophy*, p. 8.

জ্ঞান, আর দর্শন হলো বুদ্ধির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সর্বোচ্চ জ্ঞান। লৌকিক জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বিচারে গৃহীত, সংরক্ষিত ও সঞ্চারিত, পক্ষান্তরে, দার্শনিক জ্ঞান নিরপেক্ষ নিরীক্ষণ ও যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। (৩) সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা লৌকিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য, পক্ষান্তরে দার্শনিক জ্ঞান উদার মতবাদের সমষ্টি– এই মতবাদসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ, সংশোধন ও বিবর্তনের অধীন। (৪) লৌকিক জ্ঞান মতবাদ হিসেবে পরিণত বা বিকাশপ্রাপ্ত নয় এবং এই কারণে লৌকিক জ্ঞানের প্রকাশ অসংযত ও অসলংগ্ন। পরিণতির অভাবেই লৌকিক মতবাদসমূহ অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। কিন্তু দর্শনের মতবাদসমূহ জীবনজগৎ সম্পর্কিত পরিণতি বা পরিপূর্ণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত জ্ঞান। কাজেই দার্শনিক জ্ঞান সংযত, সংলগ্ন যথার্থ ও সমন্বয়ধর্মী। বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়াসই হলো দর্শন। তাই দর্শনে মতবাদের ধারাবাহিক বিবর্তন লক্ষিত হয়। (৫) পরিশেষে বলা যায় যে, লৌকিক জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিগত অভিযানের প্রারম্ভ এবং দর্শন মানুষের বুদ্ধিগত অভিযানের সর্বোচ্চ স্তর। তাই দর্শন হলো লৌকিক জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক সাধনার ফল, ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার আলোকে জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যবোধের সর্বোচ্চ প্রকাশ।

দর্শন ও বিজ্ঞান
Philosophy and Science

বিজ্ঞানের সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থ : বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ বিশেষ জ্ঞান। বৈজ্ঞানিক লৌকিক জ্ঞানের মতো অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত ও অসংলগ্ন নয়। বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট, যথাযথ, সুশৃঙ্খল ও সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে। সংকীর্ণ অর্থে প্রকৃতির কোনো নির্দিষ্ট বিভাগ সম্পর্কীয় শৃঙ্খল, যথাযথ ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়। যেমন, পদার্থবিজ্ঞান আলোচনা করে পদার্থের স্বরূপ, নৈসর্গিক ঘটনাবলি; রসায়নশাস্ত্র আলোচনা করে উপাদানের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও রূপান্তর। আবার ব্যাপক অর্থে, যে কোনো যুক্তিযুক্ত সুশৃঙ্খল আলোচনাকে বিজ্ঞান বলা হয়।

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য : বিজ্ঞান বস্তু বা ঘটনার পরিদৃশ্যমান দিকের আলোচনা জীবনজগতের অবভাসিক বা পরিদৃশ্যমান (Phenomenal) দিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোনো বিষয় বিজ্ঞান আলোচনা করে না। বিজ্ঞান নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ ও আরোহণ (Observation, Experiment and Induction)– এই তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে তার বিষয়বস্তু আলোচনা করে থাকে। প্রত্যেকটি বিজ্ঞান তার বিভাগ সম্পর্কে কতিপয় সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করে আলোচ্য বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস পায়। বিজ্ঞানসমূহকে সাধারণত পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যাস করা যেতে পারে–

১। **জড়বিজ্ঞান (Material science) :** জড় বিজ্ঞান জড় সম্পর্কে আলোচনা করে। জড় বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। এরা হলো পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, জোতিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি।

২। **জীব বিজ্ঞান (Biological science) :** জীব বিজ্ঞান জীবন বা প্রাণের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে। প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৩। **মানসিক বিজ্ঞান (Mental science) :** মানসিক বিজ্ঞান মানসিক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৪। **সমাজবিজ্ঞান (Social science) :** সমাজবিজ্ঞান মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করে। সমাজবিদ্যা (Sociology) ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিজ্ঞান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৫। যন্ত্র বিজ্ঞান (Mechanical science) : যন্ত্র বিজ্ঞান যন্ত্রের উৎপাদন, নির্মাণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে। এরা হলো প্রকৌশলবিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা ইত্যাদি।

দর্শন ও বিজ্ঞানের অন্তরঙ্গতা : উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান জীবনজগতে পরিদৃশ্যমান দিকের সুসংহত ও সুশৃঙ্খল আলোচনা। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বের আলোচনা করে। দর্শন জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। কাজেই বিষয়বস্তু ও অনুসন্ধিৎসার দিক থেকে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে অন্তরঙ্গতা প্রচুর।

দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য : দর্শন ও বিজ্ঞান জীবন ও জগতের রহস্যের অবগুণ্ঠন ভেদ করে সত্যের সন্ধান দেয়, জীবন ও জগতের সমস্যাবলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়াস প্রায়। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই অভিজ্ঞতানির্ভর। জীবনের পথে যে সমুদয় ঘটনা মানুষের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে, তাদের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করে তাদের ব্যাখ্যা দান দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে কানিংহাম বলেন যে, লৌকিক জ্ঞান থেকে বিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞান থেকে দর্শনে উত্তরণকালে আমরা কোনো নতুন অজ্ঞাত অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করি না, বরং আমরা একই পরিবেশ সম্পর্কে অধিক থেকে অধিকতর সুষ্ঠু, সুস্পষ্ট ও ব্যাপক জ্ঞান লাভ করার জন্য সচেষ্ট হই। তবে মনে রাখার বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অনুসন্ধিৎসর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য একই হলেও বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার জগৎ অতিক্রম করে না, কিন্তু দর্শন জীবন ও জগতের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য অভিজ্ঞতার জগৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ পার হয়ে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ লাভ করে এবং যে পরম সত্য জীবন ও জগতের মূলে থেকে তাদেরকে চালিত করছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস পায়।

অনুসন্ধিৎসার প্রকৃতি ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় :

প্রথমত, বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ড, আর দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি অখণ্ড : বিজ্ঞান জীবন ও জগতের কোনো একটি নির্দিষ্ট দিক নির্বাচন করে শুধু তারই আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে, নিজ এলাকার বাইরে পদার্পণ করে না। বিজ্ঞানের নির্বাচনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তার আলোচ্য বিষয়কে সীমিত করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণিবিজ্ঞান প্রাণের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে, নির্বাচিত বিষয়ের বাইরে কোনো বিষয় (প্রয়োজন হলেও) আলোচনার প্রয়োজন বোধ করে না। পদার্থবিদ্যা জড়বস্তুর ধর্ম ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করে। এর নির্দিষ্ট জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস পায়। কোনো বিশেষ বিভাগে দর্শনের আলোচনা সীমিত থাকে না। জীবন ও জগতের সবকিছুই দর্শনের এখতিয়ারভুক্ত। ড. কেয়ার্ডের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "মানুষের অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই, সমগ্র বিশ্বসত্তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা দর্শনের এলাকা বহির্ভূত কিংবা যার দিকে দার্শনিক অনুসন্ধান কাজ প্রসারিত হয় না।" দর্শনের এই সার্বজনীন বিস্তৃতির মূলে রয়েছে দর্শনের অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয়ত, দর্শনের পরিসর বা ক্ষেত্র বিজ্ঞানের পরিসর বা ক্ষেত্র অপেক্ষা ব্যাপকতর : বিজ্ঞান জীবন ও জগতের প্রকাশ রূপ নিয়ে আলোচনা করে, পরিদৃশ্যমান জীবন ও জগতের মূলে কোনো পরমসত্তা আছে কি-না সে সম্পর্কে বিজ্ঞান মাথা ঘামায় না। কিন্তু দর্শন পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচরের মূলীভূত পরমসত্তার স্বরূপ অনুসন্ধান করে। জীবন ও

জগতের কারণ বা উৎস, এক মহাসত্যই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দৃশ্যমান জগৎ ও জীবন ছাড়াও এদের মূলীভূত মহাসত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন, এই মহাসত্যের সাথে জীবন ও জগতের সম্বন্ধ নিরূপণ দর্শনের কাজ। সুতরাং বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অপেক্ষা দর্শনের ক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞান নিজ সীমার বন্ধনে বাঁধা, দর্শন বন্ধন কেটে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করে : প্রত্যেক বিজ্ঞান কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও পূর্বানুমান নিয়ে অনুসন্ধান কাজে ব্যাপৃত হয়। প্রকৃতির নিমানুবর্তিতা, কার্যকারণতত্ত্ব, কার্যকারণের সমানুবর্তিতা ইত্যাদি মূলনীতি স্বীকার করে বিজ্ঞান নিরীক্ষণ পরীক্ষণের পথে অগ্রসর হয়। উদাহরণস্বরূপ, পদার্থবিজ্ঞান জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়, রসায়নশাস্ত্র উপাদানের অবস্থিতি মেনে থাকে, মনোবিজ্ঞান মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই স্বীকার্য বিষয় বাদ দিলে বিজ্ঞানের নিরীক্ষণ-পরীক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে, দর্শনের কোনো স্বীকার্য সত্য নেই, স্বতঃসিদ্ধ বা পূর্বানুমান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। দর্শন বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য বা দর্শন কোনো স্বতঃসিদ্ধের সমালোচনা দিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ ছাড়া, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মধ্যে যে যোগসূত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে, দর্শন উচ্চতর নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মধ্যে সংহতি স্থাপন করে। পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে, প্রত্যেক বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সন্ধানী তৎপরতা চালায় এবং নিজ গণ্ডীর বাইরে গমন করে না। কিন্তু বিশ্বজগৎ খণ্ড বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, জীবনও শতধা বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, জীবন ও জগৎ এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে পরিকল্পিত। দর্শন স্বতন্ত্রভাবে নিয়োজিত বিভিন্ন বিজ্ঞানের গবেষণা ও সাধনার মধ্যে মিলন ঘটিয়ে জীবনজগতের সার্বজনীন ঐক্যের ধারণা প্রদান করে।

চতুর্থত, বিজ্ঞান প্রধানত আরোহাত্মক, দর্শন প্রধানত অবরোহাত্মক : দর্শন ও বিজ্ঞানের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান জীবন ও জগতের কোনো নির্দিষ্ট বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করে, উক্ত বিভাগের নির্দিষ্ট ঘটনাসমূহের নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। বিজ্ঞানের পদ্ধতি অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Empirical) ও আরোহাত্মক (Inductive)। প্রত্যেক বিজ্ঞান তার নির্দিষ্ট আওতাভুক্ত ঘটনাসমূহ নিরীক্ষণ-পরীক্ষণ ও শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে সামান্য নিয়মে উপনীত হয়ে থাকে, সামান্যকরণ বা সামান্য নিয়মের প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক বিজ্ঞানের শেষ স্তর। কিন্তু দর্শন যে সামগ্রিক জ্ঞানের সন্ধান করে, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত সামান্য নিয়মের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। দর্শন অভিজ্ঞতা থেকে যাত্রা শুরু করলেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার যুক্ত অবদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। দর্শন প্রজ্ঞার সাহায্যে উচ্চ থেকে উচ্চতর, পরিশেষে উচ্চতর উচ্চতম নিয়ম আবিষ্কার করে। কাজেই দর্শন একাধারে অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও বুদ্ধিসম্মত। বিজ্ঞান প্রধানত আরোহাত্মক আর দর্শন অবরোহাত্মক।

পঞ্চমত, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অমূর্ত, দর্শনের সিদ্ধান্ত মূর্ত্য। দর্শন ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের প্রকৃতিও পৃথক। বিজ্ঞান জীবন ও জগতের মূলীভূত পরমসত্তা ব্যতিরেকেই জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা করে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার আবশ্যকতা স্বীকার করে না। ফলে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অমূর্ত হয়ে থাকে, অধিকন্তু পরিমাণগত সূত্রের (Quantitative formula) সাহায্যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হওয়ায় তা অধিকতর অমূর্ত (Abstract) হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, দর্শন জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির যথাযথ কার্যকারিতা স্বীকার করে

পরমসত্তার প্রেক্ষিতে জীবনজগতের ব্যাখ্যা করে। ফলে দর্শনের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে মূর্ত। বাস্তবিক জীবন ও জগৎকে পরমসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে অযথা ভেদরেখা টানা হয়।

দর্শন ও বিজ্ঞানের পারস্পরিক নির্ভরতা : দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এরা যে পরস্পর নির্ভরশীল একথা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন বিজ্ঞান কতগুলি স্বীকার্য সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পদার্থবিজ্ঞান জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে; প্রাণিবিজ্ঞান প্রাণের অস্তিত্ব মেনে থাকে; মনোবিজ্ঞান মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকে। প্রত্যেক বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুর সত্যতার সঙ্গে জ্ঞানের সম্ভাব্যতাও স্বীকার করে থাকে। কিন্তু দর্শন প্রত্যেক বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্যের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে, জ্ঞানের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। সুতরাং বিজ্ঞান দর্শনের ওপর নির্ভরশীল।

আবার দর্শনও বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। দর্শন জীবন ও জগতের পরিদৃশ্যমান রূপের সমালোচনার মাধ্যমে পরমসত্তার ধারণায় উপনীত হয়। এখানে দর্শন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহের সদ্ব্যবহার করে; বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তই দর্শনের উপাদান হিসেবে গৃহীত হয়। কাজেই দর্শনও বিজ্ঞানের কাছে ঋণী।

উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা পরস্পর নির্ভরশীল। দর্শন ও বিজ্ঞানের অন্তরঙ্গতা সম্পর্কে অধ্যাপক ওয়েবারের মতবাদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, "দর্শন ব্যতিরেকে বিজ্ঞানসমূহ ঐক্যবিহীন সমষ্টি মাত্র, আত্মাহীন দেহ; পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান ব্যতিরেকে দর্শনও দেহহীন আত্মা; নিছক কবিতা ও স্বপ্ন থেকে এর বিশেষ পার্থক্য নেই।"[1] বাস্তবিক দর্শন ও বিজ্ঞান একে-অপরের পরিপূরক।

দর্শন ও ধর্ম

Philosophy and Religion

ধর্মীয় চেতনার বৈশিষ্ট্য : বিশ্বস্রষ্টা খোদার চেতনাই ধর্মের ভিত্তি। জীবনজগতের যিনি উৎস, সমগ্র জীবের যিনি স্রষ্টা ও প্রতিপালক, বিশ্বের সকল বস্তু যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, এমন সার্বভৌম পরমসত্তাকে খোদা বলা হয় এবং তাঁর ওপর নির্ভরতাই ধর্মীয় চেতনার মূল কথা। বিশ্বাস বা ঈমান ধর্মের মূলমন্ত্র, ঈশক বা প্রেম এই বিশ্বাসকে বলীয়ান করে এবং মানুষকে খোদার সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রাণের মধ্যে যে এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, সৃষ্টি যে স্রষ্টার প্রেমে বাঁধা– দুইয়ের এই অন্তরঙ্গতা ধর্মের মর্মকথা।

স্রষ্টা সম্পর্ক চৈতন্যই ধর্ম : ধর্মের সার হলো এক পরম পুরুষ সম্পর্কে চেতনা, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, প্রতিপালক ও রক্ষক। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার চেতনাই ধর্মের প্রাণ, এই চেতনাবর্জিত, বিশুষ্ক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরম পুরুষ খোদার সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব নয়। কোরআনে উক্ত হয়েছে, "পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোর মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা নেই।" (লায়ছাল বেরাআন তোয়াল্লো উজুহাকুম কেবলাল মাশরেকে

---

[1] The science without Philosophy are aggregate without unity, a body without a soul, Philosohy without the science is a soul without a body, differing in nothing form poetry and its dream. – Prof. Weber

ওয়াল মাগরিবে)। বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চৈতন্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হওয়াই ধর্মের অন্তরের কথা। যার অন্তর ভক্তিরসে মজে না তার মধ্যে ধর্মীয় চেতনা নেই বললেই চলে। "নিশ্চয় আমার উপাসনা, আমার ত্যাগ, আমার জীবন ও মরণ সবই বিশ্বভুবনের প্রভু আল্লাহর জন্য" (ইন্না ছালাতি ওয়ানুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহেরাব্বিল আলামিন)। এই ধরনের পরিপূর্ণরূপে আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে প্রকৃত সখ্য স্থাপন করা সম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়াই ধর্মের লক্ষ্য। এটা ধর্মের ভিতরের দিক।

ধর্মের লক্ষ্য জীবনোৎকর্ষ : এতদ্ব্যতীত ধর্মের একটা তত্ত্বগত দিকও রয়েছে। তত্ত্বের দিক থেকে "ধর্ম হলো কতগুলি সার্বজনীন মতের সমষ্টি, যা নিষ্ঠার সাথে পালন করলে এবং যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করলে আমাদের চরিত্রের পরিবর্তন সাধন করতে পারে।"[১] "কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের লক্ষ্য আমাদের অন্তর্জীবন ও বহিঃজীবনের উৎকর্ষ সাধন। জীবনের মহান তাৎপর্যকে বাস্তবায়িত করে ধর্ম বিশ্বের সাথে, বিশ্বের স্রষ্টাকে মৈত্রীর বন্ধনে বেঁধে দেয়। সুতরাং, নিছক জ্ঞানার্জন নয়, উপলব্ধির মাধ্যমে বিশ্বের সাথে শান্তি সংস্থাপন ধর্মের বৈশিষ্ট্য। দার্শনিক ইকবাল বলেন, "ধর্ম বিভাগীয় ব্যাপার নয়, এ নিছক চিন্তন নয় কিংবা নিছক অনুভূতি নয়, কিংবা নিছক ক্রিয়াও নয়– এ মানুষের সামগ্রিক প্রকাশ।"[২] এই প্রসঙ্গে ধর্মীয় জীবনের তিনটি স্তর উল্লেখযোগ্য। যথা– বিশ্বাস, চিন্তা ও আবিষ্কার।"[৩] প্রথম স্তরে ধর্মীয় জীবন কতগুলি আদেশ-নিষেধের অনুশীলন–এই আদেশ জীবনের নিষেধসমূহের তাৎপর্য অনুসন্ধানের কোনো প্রয়াস নেই। এটি বিশ্বাসের স্তর। এর পরবর্তী স্তর হলো চিন্তন বা অনুধ্যানের স্তর। এই স্তরে বিশ্বাসের ভিত্তি অনুসন্ধান করা হয়। এখানে বিশ্বাসের উৎস ও যৌক্তিকতা বের করা হয়। শেষ স্তর পরমসত্তার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই স্তরে নিয়মের নিগড় থেকে ব্যক্তিসত্তা মুক্ত হয়ে আপনার চৈতন্যের গভীরে সার্বজনীন তত্ত্বের উৎস আবিষ্কার করে। সুতরাং ধর্ম জীবনজগতের তাৎপর্য আবিষ্কার করে এবং সৃষ্টি পরিকল্পনায় মানুষের যথাযথ স্থান নির্দেশ করে।

উভয়ের সাদৃশ্য : দর্শন জীবনজগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের প্রয়াস। সমস্যার দিক থেকে ধর্ম ও দর্শন উভয়ই সার্বজনীন জীবন-জিজ্ঞাসা সম্পর্কে আলোচনা করে। জীবনজগতের রহস্য উন্মোচন, জীবনজগতের স্বরূপ উদ্ঘাটন, বিশ্বপরিকল্পনায় মানুষের স্থান, কর্তব্য, দায়িত্ব ও গুরুত্ব ব্যাখ্যায় দর্শন ও ধর্ম উভয়ই সচেষ্ট। বিজ্ঞানের ন্যায় জীবনজগতের নিছক ব্যাখ্যা দর্শন ও ধর্মের উপজীব্য নয়। দর্শন ও ধর্ম উভয়ই জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নে নিয়োজিত। অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নে দর্শন ও ধর্ম মানুষকে সবর উপরে স্থান দিয়েছে। এ ছাড়া দর্শনে অনেকগুলি ধর্মীয় সমস্যা আলোচিত হয়ে থাকে। যথা–আত্মা, আত্মার অমরতা, সৃষ্টি, ইষ্ট, অনিষ্ট, খোদা ইত্যাদি।

---

[১] Religion is a system of general truths which have the effect of transforming character when they are sincerely held and vividly apprehended. –Prof. Whitehead

[২] Religion is not a departmental affair; it is neither mere thought, nor mere feeling, nor mere action; it is an expression of the whole man.
– The Reconstruction of Religous Thought in Islam p. 2

[৩] Ibid, P. 181

বিজ্ঞানের ন্যায় দর্শন ও ধর্মের পরিমাণগত পার্থক্য নিরূপণের দিকে প্রবণতা নেই। উভয়ই গুণগত পার্থক্যে বিশ্বাসী। পরিণতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দর্শন ও ধর্মকে বিশেষিত করে। উভয়ই মানবমনের গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

উভয়ের বৈসাদৃশ্য : দর্শন ও ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও অল্প নয়।

প্রথমত, ধর্ম অনুভূতিনির্ভর, দর্শন যুক্তিনির্ভর : "দর্শনের প্রকৃতি হলো স্বাধীন জিজ্ঞাসা। এ সকল প্রকার কর্তৃত্বকে সন্দেহ করে। এর কাজ হলো মানব-চিন্তার নির্বিচার অনুমানসমূহের গোপন উৎস অনুসন্ধান করা এবং এই সন্ধানী তৎপরতার পরিণামে এ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার পক্ষে পরম সত্যকে জানার অসম্ভাব্যতা বা অক্ষমতার অকপট স্বীকৃতিতে পর্যবসিত হয়। পক্ষান্তরে, বিশ্বাসই ধর্মের সারবস্তু; বিশ্বাস বিহঙ্গের মতো বুদ্ধি-অগ্রহ্য 'সীমাহীন পথ' দর্শন করে। এই বুদ্ধি ইসলামের একজন বিখ্যাত মরমি কবির ভাষায়, "শুধু মানবের জাগ্রত হৃদয়কে বিভ্রান্ত করে এবং হৃদয়ের মধ্যে নিহিত জীবনের অদৃশ্য সম্পদ হরণ করে।"[১] ধর্ম বিশ্বাস অনুভূতির তীব্রতায় মহিমান্বিত এবং দর্শন যুক্তির প্রাবল্যে আবেগবিহীন ও বিচারসম্মত।

দ্বিতীয়ত, দর্শনের লক্ষ্য সত্য, ধর্মের লক্ষ্য কল্যাণ : দর্শনের লক্ষ্য সত্যের অনুসন্ধান, ধর্মের লক্ষ্য কল্যাণ লাভ। দর্শন অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলির বিচার, বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন করে এবং জীবনজগতের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করে। দর্শন জীবন ও জগতের পরিদৃশ্যমান দিকের আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয় না, পরমসত্তার সাথে জীবন ও জগতের কি সম্পর্ক তাও নির্ধারণ করে। কাজেই পরমসত্তার আলোকে জীবনজগতের সমস্যাবলি সমাধানের মাধ্যমে সত্যলাভই দর্শনের লক্ষ্য। কিন্তু ধর্মের লক্ষ্য ঐতিহ্য ও পারলৌকিক কল্যাণ। সুতরাং জীবনজগতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিছক সত্য লাভ দর্শনের উদ্দেশ্য নয়, বরং পরমসত্তায় বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে জীবনজগতের তাৎপর্য নির্ণয় ও কল্যাণ লাভের পন্থা নির্দেশই ধর্মের লক্ষ্য। অন্যকথায়, একের লক্ষ্য সত্য, অন্যের লক্ষ্য কল্যাণ।

তৃতীয়ত, দর্শন যুক্তিবিদ, ধর্ম আবেগধর্মী : দর্শন ও ধর্মের পদ্ধতির মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান। দর্শন ধারণা ও বুদ্ধির আকারের সাহায্যে জীবন ও জগতের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করে। দর্শন মুখ্যত বুদ্ধিজাত যুক্তির কষ্টিপাথরে অভিজ্ঞতাকে বিচার করে; ভাবালুতা বা আকাশকুসুম কল্পনার স্থান দর্শনে নেই। দর্শন চিন্তামূলক ও যুক্তিসিদ্ধ। পক্ষান্তরে, ধর্ম হৃদয়ের অনুভূতি ও বিশ্বাসের মাধ্যমে পরম সত্যের পথে অগ্রসর হয় এবং পরমসত্তাকে উপলব্ধি করে। সুতরাং ধর্ম প্রধানত অনুভূতিমূলক। দর্শন বুদ্ধিজাত এবং ধর্ম অনুভূতিসঞ্জাত। দর্শন বুদ্ধির সাহায্যে সত্যে উপনীত হয়, আর ধর্ম স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে সত্য লাভ করে।

---

[১] The sprit of Philosophy is one of free inquiry. It suspects all authority. Its function is to trace the uncritical assumptions of human thought to their hiding places and in this pursuit it may finally end in denial or a frank admission of the incapacity of pure reason to reach the ulitimate reality. The essence of religion, on the other band, is faith; and faith, like the bird, sees its "trackless way" unatteneded by intellects which in the words of the great mystic poet of Islam only waylays the living heart of man and robs it of the invisible wealth of life that is withia. – Iqbal, The Reconstruction of Religious thought in Islam, p. 120.

চতুর্থত, জ্ঞান : দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান সুস্পষ্ট, যুক্তিসিদ্ধ ও সুসংহত কিন্তু ধর্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান অস্পষ্ট, আলঙ্কারিক ও অসংলগ্ন। দর্শন বুদ্ধিনির্ভর বলে দর্শনলব্ধ জ্ঞান সুস্পষ্ট, আর ধর্ম অনুভূতিনির্ভর বলে ধর্মলব্ধ জ্ঞান অস্পষ্ট। দর্শন ও ধর্মের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকলেও একে-অপরের পরিপূরক। দর্শন ও ধর্ম উভয়ই জীবনজগতের ব্যাখ্যা করে। বিশ্বপরিকল্পনায় মানুষের স্থান, কর্তব্য দায়িত্ব ও সম্ভাবনার ব্যাখ্যা করে। উভয়েরই উৎস এক। প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞা, দর্শন ও ধর্মের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ নেই। দর্শন বুদ্ধির সহায়তায় সে পরমসত্তার বিশ্লেষণ করে, ধর্ম স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে সেই সত্যকেই সংশ্লেষাত্মকভাবে উপলব্ধি করে। দর্শন ও ধর্ম একে-অপরের পরিপূরক। ধর্মের অনুভূতিসঞ্জাত জ্ঞান দর্শনের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ও যুক্তিসিদ্ধ হয়ে সর্বসাধারণের কাছে বোধগম্য হয়। আবার দার্শনিক সংশয় ও যুক্তিপ্রবণতা পরমসত্তার অস্তিত্বে সন্দিহান করে তুলতে পারে, ধর্ম সেখানে আমাদের বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দর্শনের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখে। সুতরাং দর্শন ও ধর্ম পরস্পর পরিপূরক।

দর্শন ও কাব্য

Philosophy and Poetry

কাব্য ছন্দযুক্ত সাহিত্যকর্ম : কাব্য একটি বিশেষ সাহিত্যকর্ম। যখন কোনো ভাব বা চিন্তা ছন্দবদ্ধ হয়ে কবির মনের মাধুরীর মাঝে আমাদের মনোভূমি স্পর্শ করে তখন তা কাব্যে উন্নীত হয়। কাব্য, ভাব ও অনুভূতির উন্নততর প্রকাশ, সুনির্বাচিত শব্দাবলির সুন্দরতম প্রকাশ ঘটে কাব্যে। শব্দের ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগই কাব্যকে অন্যান্য সাহিত্যকর্ম থেকে পৃথক করে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কাব্য, দর্শন ও ধর্ম জীবন ও জগতের সার্বজনীন জিজ্ঞাসার প্রকাশ। মহৎ কাব্যে, দর্শনে ও ধর্মে মানবমনের চিরন্তন আকুতির প্রতিফলন ঘটে। কাজেই বিষয়বস্তু পার্থক্য আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়গুলির মধ্যে ভেদরেখা অঙ্কন করা সম্ভব হয় না। জীবনজিজ্ঞাসার রূপায়ণ ও ঈপ্সিত ফল লাভই উপযুক্ত বিষয়সমূহের বিশিষ্টতা জ্ঞাপক।

দর্শনের পদ্ধতি বিচার, কাব্যের পদ্ধতি অনুভূতি : দর্শনের মতো কাব্যও জগতের রহস্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট। জীবনজগতের স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনা এবং পরমসত্তার সাথে জীবনজগতের সম্পর্ক দর্শন ও কাব্য উভয়েরই উপজীব্য বিষয়। কিন্তু এদের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। দর্শন যুক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে অগ্রসর হয়, কাব্য অনুভূতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। দর্শনের পদ্ধতি যুক্তি ও বিচার, আর কাব্যের পদ্ধতি অনুভূতি ও আবেগ। দর্শনের উৎস মস্তিষ্ক, আর কাব্যের উৎস হৃদয়। সুতরাং দার্শনিকের আবেদন মানুষের মস্তিষ্কের কাছে, আর কবির আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে। কবির অনুভূতির সার্থকতা ভাবের গভীরতায় নয়– প্রকাশভঙ্গির মাধুর্যে, আর দার্শনিকের ভাবের সার্থকতা ভাব প্রকাশে নয়– ভাবের মৌলিকতায়, যুক্তির বলিষ্ঠতায়।

কবির কল্পনায় নতুন রূপরসের জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কবির তুলিকা স্পর্শে এক অভাবনীয় জগৎ অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে আমাদের নয়ন সম্মুখে ভেসে ওঠে।

> "As imagination bodies forth.
> The poet's pen turns them to shape
> And gives to airy nothing
> A local habitation and a name."

কাব্যের ধর্ম : কবির লেখনীমুখে ধূলিবিমলিন ধরায় যে নতুন তাজমহল জেগে ওঠে, সৌন্দর্যের যে অমরাবতীর সৃষ্টি হয়, শেক্সপিয়রের অমর পঙক্তিগুলির মধ্যে সে সত্যই ধ্বনিত হয়েছে। কবি যা বলেন তদপেক্ষা অনেক বেশি ইঙ্গিত করেন। কাব্যে বক্তব্য অপেক্ষা ব্যঞ্জনাই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু দার্শনিক জীবনজগতের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তৎপর। তাই তাঁর বক্তব্য বাস্তবনির্ভর ও বুদ্ধিসম্মত; এখানে ব্যঞ্জনার কোনো স্থান নেই। বুদ্ধিসম্মত জগতই দার্শনিকের আলোচ্য জগৎ। কবি সুন্দরের খেয়ালী দুলাল; দার্শনিক সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের মধ্যে সঙ্গতি বিধায়ক।

দার্শনিক কবি এবং কবি দার্শনিক : পেরি (Perry) দার্শনিক কবি এবং কবি দার্শনিকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যাঁরা দার্শনিক কবি তাঁরা জীবনের বর্ণনা করেন. আর যাঁরা কবি দার্শনিক তাঁরা জীবনের ব্যাখ্যা করেন। ওমর খৈয়াম, জালাল উদ্দিন রুমি, দান্তে, গ্যেটে, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, ব্রাউনিং, ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কবি। এরা জীবনজগতের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট করেছেন। অপরপক্ষে প্লেটো ও হেগেল কবি দার্শনিক। এদের সৃষ্টি একাধারে দর্শন ও কাব্যের গন্ধে আমোদিত।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও প্রকাশভঙ্গি, পদ্ধতি ও সৃষ্টি হিসেবে দর্শন ও কাব্য স্বতন্ত্র।

দর্শন ও জীবন

Philosophy and Life

দর্শনের স্বরূপ ও গুরুত্ব : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দর্শন জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের প্রয়াস। বিশ্বজগতের রহস্য উদ্ঘাটন ও বিশ্ব পরিকল্পনায় মানুষের ভূমিকা, কর্তব্য ও লক্ষ্য নিরূপণের প্রচেষ্টা থেকে দর্শন উদ্ভূত হয়েছে। কাজেই দর্শন ও জীবনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পরই মানব শিশু নতুন পরিবেশের মধ্যে নিপতিত হয়, উষ্ণ মাতৃগর্ভ থেকে জগতের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুতে স্থান লাভ করে। জন্মের পর থেকেই মানবশিশু তার পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে, ধীরে ধীরে একটা সঙ্গতি বিধানে সমর্থ হয়। এই নেহায়েত বাঁচবার তাগিদের মধ্য দিয়েই মানুষের পথপরিক্রমা চলতে থাকে। শিশুর ক্ষুদ্র আবেষ্টনী তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত হতে থাকে এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের বৈচিত্র্য ও জীবনের জটিলতা মানুষের মনে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। ভাবালুতা কিংবা বিলাসিতা নয়, জীবনের প্রয়োজনে সংগ্রামমুখিতা ও অনুসন্ধিৎসাই মানুষকে নব নব চিন্তার পথে ঠেলে দেয়। জীবনসচেতন মানুষ তাই না ভেবে থাকতে পারে না। জীবনজগতের বৈচিত্র্য ও জটিলতা সম্পর্কে যে ব্যক্তি যত অধিক সচেতন, সে ব্যক্তি তত অধিক চিন্তাশীল। অবশ্য পিতামাতার অত্যধিক আদর-যত্নের ফলে যে সমস্ত নর-নারী গোল্লায় যায়, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে গাফেল থাকে, তাদের কথা একটু স্বতন্ত্র। প্রকৃতির অনাবিল আবেষ্টনীতে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা মানব তনয় জীবনজগৎ সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারে না। কারণ চিন্তাপ্রবণ মানুষ চিন্তা না করে থাকতে পারে না। মানুষ যে ধরনের জীবনযাপন করবে, তার দর্শনও তদ্রূপ হবে কিংবা মানুষের জীবনদর্শন তার কর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করবে। উভয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে চলবে। জীবন ও দর্শন তাই এক

অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তাই কানিংহাম বলেন, "জীবন ও তার প্রয়োজন থেকে সরাসরি দর্শনের উন্মেষ ঘটে। যদি কোনো ব্যক্তি আদৌ ভাবনা-চিন্তায় জীবনযাপন করে, তবে সে কিছুটা দার্শনিক।"

মানুষ ও পরিবেশ : মানুষ কোনো না কোনো পরিবেশে বাস করে। এই পরিবেশ একটি জটিল সংগঠন : প্রাকৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়াসমূহের সমন্বয়। পৃথিবীর যে স্থানে একটি মানুষের বাস, সেই স্থানের ভৌগোলিক পরিবেষ্টনী তার আহার্য, দেহ ও মানস গঠনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষের দৈহিক ও মানসিক গঠনের দিকে তাকালে মানবজীবনে প্রাকৃতিক প্রভাবের দিকটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও মানবজীবনে অপরিসীম। সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্মপ্রথা ইত্যাদি থেকে পৃথক করে মানুষকে ভাবা যায় না। মানুষ সমাজের সৃষ্টি; একথা বললেও বেশি বলা হবে না। সাধারণভাবে মানুষ সম্পর্কে একথা সম্পূর্ণ খাটে। এমন কি অসামান্য প্রতিভাধর নর-নারীও সামাজিক চিন্তাধারার সৃষ্টি-যুগ ও পরিবেশই তাদেরকে গড়ে তোলে, তবে পার্থক্য এই যে, তারা যুগ ও পরিবেশের সৃষ্টি হয়েও যুগ ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে, সাধারণ লোক তা পারে না।

দর্শনের অনিবার্যতা : সাধারণ ও অসাধারণ লোকের মধ্যে এই পার্থক্য স্বীকার করে নিলেও একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের পরিবেশ এমনি যে, দর্শনের জন্ম অবশ্যম্ভাবী এবং হয়েছেও তাই। ড. স্টিফেন সত্যই বলেছেন যে, "দর্শন থাকবে কিংবা থাকবে না, সে প্রশ্ন নয়, আসল কথা হলো ভালো এবং মন্দ দর্শনের মধ্যে একটি নির্বাচন করা। প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের একটা না একটা দর্শন থাকবেই।"

বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষ : যে বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে মহাজীবনের দ্বারপ্রান্তে এনে এক বিশাল বিচিত্র জীবনের অনুভূতি প্রদান করে, বাস্তব জীবন বাস্তব জীবনকে বাস্তবাতীত জীবনে উন্নীত করে, সেই বিশিষ্ট চিন্তাশক্তিই মানুষকে নিরন্তর নব নবসৃষ্টির পথে চঞ্চল ও অস্থির করে তোলে। ব্রাউনিং সত্যই বলেছেন–

প্রগতি মানবের বিশিষ্ট লক্ষণ
পশু ও খোদার নেই কোনো অগ্রগতি,
–খোদা পরিপূর্ণ, পশু প্রগতির অযোগ্য
মানুষ সীমিত শক্তির অধিকারী
কিন্তু আশা তার সীমাহীন।[১]

বুদ্ধিবৃত্তি গতিবেগ ও প্রেরণা : কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বুদ্ধিবৃত্তি অজানাকে জানার জন্য, অচেনাকে চেনার জন্য মানুষের মধ্যে এক অফুরন্ত কৌতূহল সৃষ্টি করে। মানুষ এগিয়ে চলে জীবনের পথে, জীবনের নিরাপত্তা ও উৎকর্ষ বিধানে। জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার শক্তি অর্জনের পরেই মানুষ তার সুকুমার বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে অগ্রসর হয়। এই মন ও মানব সভ্যতার প্রবণতা– শক্তি ও সুন্দরের সাধনা। মানবজীবন

---

[১] Progress– Man's distinctive mark alone.
Neither god's nor beasts; God is, they are;
Man partly is, but mainly hopes to be. – Browing

নিরন্তর প্রবহমান, সেই জীবনের প্রতিলিপি দর্শনও এগিয়ে চলেছে। দর্শনের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, সামগ্রিক জীবনের সত্যরূপ সকলকালে সকল মানুষের মধ্যে একইভাবে রক্ষিত হয় নি। যে প্রয়োজনের তাগিদ থেকে দর্শনের জন্ম হয়েছে, কালক্রমে সমাজ জীবনের চাপে পড়ে দর্শনের গতি পরিবর্তিত হয়েছে– প্রয়োজন থেকে অপ্রয়োজনের দিকে, চিরন্তন থেকে সাময়িকের দিকে। জীবনের অভিজ্ঞতাসুলভ ও বাস্তবধর্মী প্রেরণাই এই পরিবর্তনের মূল কারণ। জীবাত্মার অমরতা এবং অনুরূপ বহু সমস্যা এক সময়ে দার্শনিকদের মনোযোগ ধারণ করেছিল তা জড়বাদ ও বস্তুবাদ ও বস্তুবাদের প্রভাবে লাভ-লোকসানের বিবেচনায় পর্যবসিত হয়েছে, ফলে সার্থক দর্শন অন্তরালবর্তী হয়েছে। কিন্তু নৈরাশ্যের কিছুই নেই। মানুষ যখনই নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করবে, তখন সে জীবনের জাঁকজমক পরিবর্তন করে জীবনের গভীরে প্রবেশ করবে, তখন লাভ-লোকসানের দর্শন চিরন্তন সত্যের কাছে নতিস্বীকার করবে।

মানুষের রুহানি তেজ : জীবনের আধ্যাত্মিক স্বরূপ ও ঐশী প্রেরণা সাময়িক চাঞ্চল্য ও জড়বাদী জৌলুসের প্রভাবে আড়ষ্ট হলেও জীবনের মৌল প্রেরণা অমৃতের সন্তান কোনোদিনই ভুলবে না, রুহানি তেজ চিরকাল তার পথে বাধা অপসারণ করে আঁধার পথে আলো দেখাবে।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞাকি দৃষ্টিভঙ্গি

Philosophical and Scientific Attitude

দর্শন ও বিজ্ঞান মানবমনের আলোক পিপাসা থেকে উৎপন্ন : মানবমনে অজানাকে জানার অনন্ত স্পৃহা। বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ তার পরিবেশ সম্পর্কে না ভেবে থাকতে পারে না। ভৌগোলিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা, সামাজিক পরিবেশের জটিলতা ও শতধা প্রবাহিত স্রোতধারা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। পরিবেশ সম্পর্কে তার চৈতন্য যতই তীব্র হতে থাকে, আপাত সরল পরিবেশ ও পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ও রহস্যের কুয়াসা জাল বিস্তার করে থাকে। জ্ঞানান্বেষীর সামনে অস্পষ্টতার আবরণ যতই গাঢ় হতে থাকে, জুলমতের পর্দা ছিন্ন করে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হওয়ার স্পৃহাও তার মধ্যে ততই দুর্বার হয়ে ওঠে। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোকের পথে উত্তরণের স্পৃহা মানুষের সকল সৃষ্টির প্রেরণা ও উন্মাদনা, আর এই স্পৃহা থেকে উৎসারিত হয় দর্শন ও বিজ্ঞান। সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞান মূলত মানুষের আলোক-পিয়াসী ও বিচারপ্রবণ মনোভঙ্গি থেকে উৎসারিত।

দর্শন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য : দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই সুনির্দিষ্ট, সুশৃঙ্খল ও সুসংহত জ্ঞানের অনুসন্ধান করে থাকে। কিন্তু দর্শন শুধু সুসংহত জ্ঞান নিয়েই তৃপ্ত নয়, এর লক্ষ্য সামগ্রিক জ্ঞান। বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান পেলেও তৃপ্ত হয়; দর্শন অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান করে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ড, দর্শনের দৃষ্টিবঙ্গী অখণ্ড : পরিদৃশ্যমান জগতের ব্যাখ্যা, ঘটনাবলির শ্রেণীকরণ ও বর্ণনা করতে পারলেই বিজ্ঞান তুষ্ট; কিন্তু দর্শন এ সকলের মূলীভূত পরম কারণ আবিষ্কারে নিবেদিত। ব্রড বলেন, "বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে তার সাথে মানবজাতির ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞতার সিদ্ধান্তসমূহ যুক্ত করে সমগ্রের ওপর পরিপূর্ণভাবে বিবেচনা করাই দর্শনের লক্ষ্য। আশা এই যে, এইভাবে

আমরা বিশ্বজগতের প্রকৃতি এবং বিশ্ব পরিকল্পনায় আমাদের স্থান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে কতগুলি সার্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।"[১] দর্শনের এই লক্ষ্য থেকে দর্শনের অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট। দর্শন জীবনজগতের সামগ্রিক জ্ঞান লাভের জন্য বিশ্বচরাচরে সর্বত্র গমন করে, কোনো বিশেষ স্থানে এর সন্ধানী তৎপরতা কেন্দ্রীভূত করে না। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান জীবনজগতের পরিদৃশ্যমান অংশে এর অনুসন্ধিৎসা কেন্দ্রীভূত করে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণে মশগুল। প্রত্যেক বিজ্ঞান স্বীয় আলোচ্য বিষয়ের বাইরে কিছুই আলোচনা করে না। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, প্রাণিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর দিকে খেয়াল করলে এ কথার সত্যতা পরিস্ফুট হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ড, আর দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি অখণ্ড।

বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও একে-অপরের পরিপূরক। বর্তমান যুগে আমাদের জ্ঞানের পরিধি এত অধিক বিস্তৃত হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র বিশ্বজগৎ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। জ্ঞানের পরিধির এই ব্যাপক বিস্তৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব করে তুলছে। বিজ্ঞান বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে জীবনজগৎকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় বিভক্ত করে বিভিন্ন বিভাগে অনুসন্ধানরত রয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণ : কোনো বিজ্ঞানের পক্ষে নিজ এলাকার বাইরে গিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ যাচাই করা কিংবা তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নয়। দর্শনই বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে অপরিহার্য দ্বৈত ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিশ্বজগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ অবগতির জন্য বিজ্ঞানের খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ড্রেক সত্যিই বলেছেন, "দর্শন জ্ঞানের একত্রীকরণ ও বিজ্ঞানসমূহের সমন্বয় সাধন।"[২]

দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা

Philosophy and Epistemology

জ্ঞানবিদ্যার স্বরূপ : জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, সীমা ও যথার্থ সম্পর্কে আলোচনা করে। জ্ঞানের স্বরূপ কি? পরমসত্তার জ্ঞান কি সম্ভব? জ্ঞান কীভাবে জন্মে? জ্ঞানের শর্ত কি কি? জ্ঞানের সীমা কতদূর? জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞান সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে সচেষ্ট হয়। কাজেই জ্ঞানবিদ্যা হলো জ্ঞানের সমালোচনা।

জ্ঞানবিদ্যার অপরিহার্যতা : দর্শন জীবন ও জগতের বিভিন্ন বস্তুর ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। দর্শন পরমসত্তার আলোকে জীবন ও জগতের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনাবলির সম্পর্ক নিরূপণ করে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় ধারণাসমূহের ব্যাখ্যা করে এবং তাদের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। কিন্তু বিজ্ঞানের স্বরূপ সম্ভাবনা ও বৈধতা সম্পর্কে নিশ্চিত

---

[১] The object of Philosophy is to take over the results of the various science, to add to them the religious and ethical hope is that, by this means, we may be able to reach some general conclusions as to the nature of the universe and as to our position and prospects in it. – C. D. Brod : *Scientific Thought* p. 20.

[২] Philosophy is the intergration of knowledge, the synthesis of the sciences. Druant Drake, Invitation to Philosophy. P. X.'

হতে না পারলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কীয় ধারণাসমূহ কত দূর যুক্তিসিদ্ধ সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা দর্শন আলোচনার প্রারম্ভিক স্তর।

বিভিন্ন যুগের জ্ঞানবিদ্যা : আধুনিক দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার অপরিহার্যতা স্বীকৃত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শনে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা তেমন অনুভূত হয় নি। পূর্ববর্তী যুগে দার্শনিকরা মোটামুটিভাবে জ্ঞানের সম্ভাব্যতা স্বীকার করেই জীবনজগতের সমস্যাসমূহের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নে অগ্রসর হয়েছেন। জ্ঞানের সমস্যা তাঁদের তেমন বিচলিত করতে পারে নি। গ্রিক দর্শনের সোফিস্টদের মধ্যে প্রোটাগোরাস (Protagoras) ও গর্জিয়াস (Gorgias) জ্ঞানের সমস্যাকে সর্বপ্রথম মানুষের সামনে উপস্থাপিত করেন। সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে প্রভূত আলোচনা করেছেন। আধুনিককালে দেকার্ত, লক, বার্কলি, হিউম, মিল, স্পিনোজা, লিবনিজ প্রমুখ দার্শনিক অজ্ঞিতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছেন। লক, হিউম ও মিল অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থক এবং অন্যরা বুদ্ধিবাদী। কান্ট ও ফিকট জ্ঞানবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই যুগের দার্শনিকরা জ্ঞানের আলোচনার পরই জীবন ও জগতের সমস্যাবলির আলোচনায় ব্যাপৃত হন।

একে-অন্যের পরিপূরক : দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা একে-অপরের পরিপূরক। জ্ঞানবিদ্যা ছাড়া দর্শন চলতে পারে না, আবার দর্শন ছাড়াও জ্ঞানবিদ্যা চলতে পারে না। দর্শনের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ হতে হলে একে যেমন জ্ঞানবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়, জ্ঞানবিদ্যাকেও সার্থক ও সারবান হতে হলে তেমনি দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

দর্শন ও অধিবিদ্যা

Philosophy and Ontology or Metaphysics.

অধিবিদ্যা দর্শনের প্রধানতম শাখা

বিশ্বজগৎ, জীবন ও খোদার স্বরূপ নির্ধারণ অধিবিদ্যার কায। অধিবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বা পরাবিজ্ঞান বলা যেতে পারে। ইংরেজি 'মেটাফিজিকস' ও 'অনটোলোজি' শব্দদ্বয় অর্থের দিক দিয়ে বাংলায় উপযুক্ত তিনটি শব্দেই ভাষান্তরিত হতে পারে।

অধিবিদ্যা পরমসত্তা সম্পর্কীয় আলোচনা : রূপবিজ্ঞান জীবন ও জগতের পরিদৃশ্যমান দিক নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু জীবন ও জগতের অন্তরালে কোনো পরমসত্তা ক্রিয়াশীল কি-না সে সম্পর্কে নিরুত্তর। প্রত্যেক বস্তুর দুটি রূপ রয়েছে : একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ এবং অপরটি অভ্যন্তরীণ রূপ বা অতীন্দ্রিয় সত্তা। বস্তুর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যেমন : বস্তুর দ্রব্যত্বের ধারণা। যদি আমরা বস্তুর দ্রব্যত্ব স্বীকার না করি তবে বস্তুর গুণাবলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। দ্রব্য ছাড়া গুণ কাকে আশ্রয় করে বাঁচবে? তেমনিভাবে আমাদের সতত পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের অন্তরালে স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে ইচ্ছা, অনুভূতি ও চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ ছাড়া দেশ, কাল, কার্যকারণ সম্পর্ক, জড়, প্রাণ, মন, খোদা প্রভৃতির স্বরূপ নির্ধারণ করাও দর্শনের কাজ। এই জগৎ কি আকস্মিকভাবে সৃষ্ট হয়েছে, না বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে? জগৎ কি উদ্দেশ্যমূলক, না যান্ত্রিক? জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে, না তাঁর ইচ্ছা জাগতিক

নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? জড়, প্রাণ, চৈত্যেন্যর মূল কি একই সত্তা, না ভিন্ন ভিন্ন সত্তা? খোদার স্বরূপ কি? তিনি কি জগতের সাথে সম্পর্কিত, না জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন? তার অস্তিত্ব আছে কি? তিনি কি প্রত্যক্ষের বিষয়? প্রত্যক্ষের বিষয় না হলে তাঁর অস্তিত্ববোধের উপায় কি– অধিবিদ্যাকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়। দর্শনের প্রধানতম শাখা অধিবিদ্যার আলোচনা ব্যতিরেকে দর্শন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

দর্শন ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক একমত নন :

প্লেটোর মতে, দর্শন ও অধিবিদ্যা অভিন্ন। প্লেটো পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, পরিদৃশ্যমান জগৎ অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতিচ্ছবি। স্যামুয়েল আলেকজান্ডারও দর্শন ও অধিবিদ্যাকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু প্লেটোর মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, অতীন্দ্রিয় জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতিরিক্ত সত্তা হলে তা আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব। প্রত্যক্ষবাদীরা (Positivists) যার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না তা অস্বীকার করেন। তাঁরা অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এই মতবাদও অযৌক্তিক। কেননা আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার সব সত্য নয়, আর যা প্রত্যক্ষের বাইরে তার যে অসত্য এমন ধারণা করার যুক্তি নেই। মনকে দেখা না গেলেও মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত প্রকাশ ও বস্তুর স্বরূপ ভিন্ন।

অজ্ঞেয়তাবাদীদের মত : অজ্ঞেয়তাবাদীদের (Agnositics) মতে, অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু তা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। তাঁরা এই মত পোষণ করেন যে, বস্তু আমাদের কাছে যেভাবে প্রতিজ্ঞাত হয় আমরা তাকে সেভাবেই জানতে পারি। এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অতীন্দ্রিয় সত্তা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত না হয় তবে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা চলে না। অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব আছে, এই বাক্যটি প্রমাণ করে যে, তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় হতে পারে না। অতীন্দ্রিয় সত্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্য দিয়ে যতটুকু প্রকাশ পায় তা অগ্রাহ্য করা চলে না।

পার্থক্য ও সাদৃশ্য : অধিবিদ্যার পরিসর দর্শনের পরিসর অপেক্ষা সংকীর্ণ। দর্শন জীবনজগতের দৃশ্যমান ও অব্যক্ত উভয় দিকে আলোচনা করে, আর অধিবিদ্যা শুধু জীবনজগতের অব্যক্ত দিকের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকে। দর্শন অধিবিদ্যা ছাড়াও জ্ঞানবিদ্যা, রূপবিজ্ঞান ও আদর্শবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করে, কাজেই দর্শন ও অধিবিদ্যা এতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, জীবনজগতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদের পৃথক করার কথা চিন্তাই করা যায় না।

দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা

Philosophy and logic

যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের পারস্পরিক নির্ভরতা : যুক্তিবিদ্যা নির্ভুল চিন্তার নিয়মাবলি সম্পর্কে আলোচনা করে। কি কি নিয়ম পালন করলে চিন্তার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি পরিহার করে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় যুক্তিবিদ্যা সে সম্পর্কে নির্দেশ দান করে। যুক্তিবিদ্যা একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। এ সত্যের আদর্শ সম্মুখে রেখে নির্ভুল চিন্তনের নিয়মাবলি প্রণয়ন করে, কোনো বিশেষ যুক্তি বা চিন্তার ক্ষেত্রে সেই নিয়মসমূহ প্রতিফলিত হচ্ছে কি-না তা পরীক্ষা করে থাকে। অপর পক্ষে, দর্শন জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। জীবনজগতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় দিকের সম্পর্ক নিরূপণের মাধ্যমে

দর্শন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান দান করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, **দর্শনলব্ধ** জ্ঞানের যথার্থ্য যুক্তিবিদ্যাকে দার্শনিক জ্ঞানের ভিত্তি বলা চলে।

উভয়ের আলোচ্য বিষয়ের পার্থক্য : যুক্তিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যুক্তিবিদ্যার লক্ষ্য হলো যুক্তি বা চিন্তনের ক্ষেত্রে যথার্থ্যতা লাভ করা। যুক্তিবিদ্যা একটি মানসিক বিজ্ঞান হলেও তা মনোবিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র। মনোবিজ্ঞান চিন্তার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করে। মনের স্বরূপ কিংবা চিন্তার প্রকৃতি আলোচনা করা যুক্তিবিদ্যার কাজ নয়। যুক্তির যথার্থ প্রতিপাদন করাই যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়। অপরপক্ষে, দর্শন মুখ্যত তত্ত্বমূলক আলোচনা। জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যাই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। দর্শনে মানবজীবনের আদর্শ সম্পর্কে আলোচিত হলেও তার উদ্দেশ্য হলো জীবন ও জগতের সামগ্রিক জ্ঞানদান। কাজেই দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা দুটি স্বতন্ত্র ধরনের আলোচনা।

পরিধি : পরিসরের দিক দিয়েও দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। দর্শনের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক, কিন্তু যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ, দর্শনের পরিসর সর্বব্যাপী– জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের প্রয়াস। পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্যা যুক্তিবিন্যাসের যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করে।

দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব

Philosophy and Theology

ধর্মতত্ত্ব প্রাকৃতিক বুদ্ধিসম্মত : খোদা সম্পর্কীয় আলোচনার নাম ধর্মতত্ত্ব। ধর্মতত্ত্ব দর্শনের একটি প্রধান শাখা। এটি খোদার স্বরূপ ও অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে এবং জগৎ ও মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতি নিরূপণ করে। দর্শনের শাখা হিসেবে পরিগণিত ধর্মতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বা বুদ্ধিসম্মত ধর্মতত্ত্ব বলা হয়। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব এই কারণে যে, আত্মার স্বরূপ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব চরাচরের গঠনকৌশল পর্যালোচনা করে খোদার অস্তিত্বের ধারণায় উপনীত হয়। একে বুদ্ধিসম্মত ধর্মতত্ত্ব বলবার কারণ এই যে, বিশ্বাস নয়, বিচারের মাধ্যমেই প্রজ্ঞার বলেই এটি খোদার অস্তিত্বের ধারণা প্রদান করে।

প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্ব : ধর্মতত্ত্ব প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম বা প্রত্যাদশ প্রেরিত পুরুষের মাধ্যমে প্রচারিত খোদার বাণী। প্রত্যাদেশের অর্থ হলো মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করা। ইসলাম ধর্ম, ক্রিশ্চান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি। প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্বে আমরা খোদার বর্ণনার মাধ্যমেই তাঁর স্বরূপ, তাঁর সঙ্গে মানুষের ও জগতের সম্বন্ধ সম্পর্কে জানতে পারি। বুদ্ধিসম্মত ধর্মতত্ত্বে মানুষের আত্মার স্বরূপ এবং বাহ্য জগতের প্রকৃতির প্রেক্ষিতে খোদার স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই বুদ্ধিসম্মত ধর্মতত্ত্বের সাথে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্বের কোনো সাদৃশ্য নেই, তথাপি বুদ্ধিসম্মত ধর্মতত্ত্ব প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করে। প্রত্যাদিষ্ট ধর্মসমূহের বিভিন্ন মতবাদের বিচার-বিশ্লেষণ করে তাদের দার্শনিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তি নিরূপণ করা বুদ্ধিসম্মত ধর্মতত্ত্বের কার্য। এইভাবে বুদ্ধিসম্মত ধর্মতত্ত্ব ধর্মসমূহের সারাংশ গ্রহণ করে থাকে। বুদ্ধিসম্মত ধর্মতত্ত্বকে (Theology) সর্বোচ্চ শাখা বলা চলে।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ধর্মতত্ত্ব দর্শনের একটি শাখা, এর আলোচ্য বিষয় খোদাতত্ত্ব। কাজেই ধর্মতত্ত্বের পরিসর দর্শনের পরিসরের তুলনায় সংকীর্ণতর।

দর্শন ও কলাশিল্প
Philosophy and Art

কলাশিল্পের বৈশিষ্ট্য : শিল্প-নির্মিতিতে একটা নতুন কিছুর সৃষ্টি আছে। কাব্য, সঙ্গীত, নাটক, স্থাপত্য, ভাস্কর্য– সকল শিল্পের মধ্যে নতুন সৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। শিল্পী এমন কিছু সৃষ্টি করেন যার অবিকল ছবি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। শাহজাহানের অমর কীর্তি তাজমহল, রাফেলের মাতৃমূর্তি প্রভৃতি প্রকৃতির কোনো নকল নয়। সঙ্গীত পশুপক্ষী ও মানুষের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ নয়। তেমনি কবির কবিতাও প্রকৃতির নকল নয়, কবি মনের রঙে রঞ্জিত প্রকৃতির এক রমণীয় মূর্তি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কলাশিল্প মানবমনের চিরন্তন সৌন্দর্য পিয়াসার মনোরম শরীরী প্রকাশ। এখানে মানুষের সংগ্রামী সত্তার পরিবর্তে ধেয়ানী সত্তার শৈল্পিক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, পরিবর্তনশীল সত্তা চিরন্তনত্ব লাভ করে।

দর্শন ও কলাশিল্পের সাদৃশ্য : দর্শন জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে মানুষ সার্বজনীন জিজ্ঞাসা দ্বারা তাড়িত হয়েছে এবং যুগচেতনা অনুযায়ী জীবনজগতের একটা ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এই ব্যাখ্যা মনুষ্যজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ধিত, পরিস্ফুট ও জটিলতর হয়েছে। প্রত্যেক যুগসঞ্চিত জ্ঞান পরবর্তী যুগে জ্ঞানের নতুন দিগন্তে মিলিত হয়েছে। তাই দর্শন ও কলাশিল্পের মধ্যে আছে নবসৃষ্টির উল্লাস– বৃহত্তর মহত্তর ও নতুনতর নির্মিত। দর্শন ও কলাশিল্পের মধ্যে এখানেই সাদৃশ্য।

দর্শন ও কলাশিল্পের মধ্যে সার্বজনীন জীবনজিজ্ঞাসার প্রতিফলন ঘটে। দর্শন জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন, শৈল্পিক সৃষ্টি ও ব্যক্তির মাধ্যমে সার্বজনীনের আনন্দানুভূতি। কাজেই দর্শন কলাশিল্পের মধ্যে রয়েছে সার্বজনীনের অনুকরণ।

উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য : দর্শন কলাশিল্পের মধ্যে সাদৃশ্যের ন্যায় পার্থক্যও বর্তমান। শিল্পের পথ অনুভূতির, দর্শনের পথ বুদ্ধির। শিল্পী কল্পনাকে আশ্রয় করে সুন্দরের অমরাপুরী সৃষ্টি করেন, বাস্তবকে কেন্দ্র করে বাস্তবাতীত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন। কিন্তু দর্শনে কল্পনার স্থান নেই। দর্শনের ভিত্তি বাস্তব জগৎ– সত্যের অটল বুনিয়াদের ওপর দর্শনের নির্মাণ।

দর্শন পঠন-পাঠনের উপকারিতা
Utility of the Study of Philosophy

দর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ : সত্যের অনুসন্ধান দর্শনের লক্ষ্য হলেও দর্শন সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয় নি। দর্শন পঠন-পাঠনের আবশ্যকতা সম্পর্কে বিষয়ী, বস্তুতান্ত্রিক সাধারণ লোকের মধ্যে বিরূপ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সকল লোকের মতে, দর্শনের পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ অসার। দর্শন সহজ জিনিসকে জটিল করে তোলে। দর্শনের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান আপত্তি হলো : (ক) দর্শন সনাতন ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানে; (খ) বৈজ্ঞানিক সত্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট; (গ) পরমসত্তার জ্ঞান অসম্ভব; (ঘ) দার্শনিকরা জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার সর্বজনগৃহীত কোনো জবাব দিতে পারে নি; (ঙ) দর্শন অর্থহীন মানসিক অনুশীলন ও সাড়ম্বর ধ্বনিসমৃদ্ধ শব্দের গোলক ধাঁধা। এ মানুষের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে। (চ) দর্শন যে ধারণা ও আদর্শ শিক্ষা দেয় তা অবাস্তব এবং জীবন বিবর্জিত।

ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে দর্শনের অপরিহার্যতা : উপরে উল্লিখিত দর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তি ও ধারণা দর্শনের স্বরূপ ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। দর্শন জীবনজগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। সমস্যা জর্জরিত, সংঘাতময় ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে মানুষ আজ দিশেহারা। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা ছাড়াও বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত মানবজাতিকে কম বিভ্রান্ত করে নি। মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শের মূলেও আজ কুঠারাঘাত এসেছে। আজকের বিভিন্নমুখী সংঘাতময় দুনিয়ায় মানুষকে মানুষের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, ধ্বংসমুখী দানবীয় শক্তির কবল থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করতে হলে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের বিশেষ প্রয়োজন। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনবোধই কেবল সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা প্রদান করতে পারে। কাজেই এক সুষ্ঠু বলিষ্ঠ দর্শনই আজকের সমস্যা জর্জরিত, আদর্শ বিঘ্নিত মানুষের জীবনের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক জীবনবোধ ফিরিয়ে এনে অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

দর্শন জীবনজগতের সমস্যাজাত : দর্শন জীবনও জগতের সমস্যা থেকে উদ্ভূত। জীবন ও জগতের বিভিন্নমুখী সমস্যার ওপর আলোকপাত করে বলে দর্শন মানবজীবনের দিশারী। মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা। জীবনের অগ্রাভিযানের পথে যে সকল সমস্যা মানুষকে সতত বিব্রত করছে, মানুষ সে সকল সমস্যা সম্পর্কে না ভেবে স্থির থাকতে পারে না। চিন্তা করা মানুষের স্বভাব। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার সমাধান করতে গিয়ে মানুষ তার জ্ঞান জীবনজগতের কোনো একটি বিশেষ বিভাগে সীমায়িত করতে পারে না, জীবনজগতের বিভিন্ন বিভাগীয় জ্ঞানের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পায়। এই সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টাকে বলা হয় দর্শন। কাজেই দর্শন অকাজের কাজ নয় এবং দর্শনের পঠন-পাঠনও নিরর্থক মানসিক অনুশীলন নয়।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দর্শনের প্রভাব : মানব-জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দর্শনের প্রভাব সুবিদিত। সাহিত্য, শিল্পকলা, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দর্শনের অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পাক-ভারতের প্রখ্যাত কবি ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলির বিশ্বজোড়া প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে তাদের বলিষ্ঠ জীবনদর্শন। শেক্সপীয়ার, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিট্স, ব্রাউনিং, টেনিসন প্রমুখ ইংরেজ কবির জগৎ-জোড় খ্যাতির মূলেও রয়েছে তাঁদের অনাবিল সৃষ্টির মূলীভূত দার্শনিক মতবাদ। অর্থাৎ জীবনজগৎ সম্পর্কীয় স্বচ্ছ ধারণা। জগতের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিবর্তনে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনেও দার্শনিকদের ভূমিকা নেহায়েত কম নয়। এ প্রসঙ্গে জন লক, ভল্টেয়ার, রুশো, মিল, স্পেন্সার, কার্ল মার্কস, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীর নাম করা যায়। আধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোনো জাতির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সে জাতির জাতীয় দর্শন ক্রিয়াশীল। বাঙালিদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সংগ্রাম ও সাধনার মধ্যেও তাদের জাতীয় দর্শনের প্রতিফলন সুপরিস্ফুট।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় স্তম্ভিত জড়বাদীরা দর্শনের পঠন-পাঠনের মধ্যে কোনো উপযোগিতা দেখতে পান না। তাঁরা যান্ত্রিক জীবনের প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েসের স্ফূর্তিতে মুহ্যমান। জীবনের দৈহিক আরাম-আয়েস ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে দর্শন আলোচনার ব্যর্থতা তাঁদের মনে দর্শন সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তাঁরা ভুলে যান

যে, মানুষ একতাল মাংসপিণ্ড নয়, মানুষ ইতর প্রাণি থেকে পৃথক। জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বাইরেও যে অপ্রয়োজনের আনন্দ তাকে নব নব মণ্ডল আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে, এক অজানা পরমসত্তার সন্ধানে তাকে ব্যাপৃত রাখে। মানুষ যতই প্রবৃত্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রজ্ঞার আনন্দে উদ্ভাসিত হতে থাকে, সে ততই জীবনের উন্নত সোপানে আরোহণ করতে থাকে। দর্শন মানুষকে নীচতর পঙ্ক থেকে আনন্দের উন্নত লোকে সমুন্নত করে। কাজেই দর্শন মানুষকে লক্ষপতি না করলেও তাকে অনাবিল আনন্দের অধিকারী করে।

দর্শন বাস্তববাদীদের ধারণা প্রদান করে : মানুষ কেবল বাস্তবকে নিয়ে বাঁচতে পারে না। মানুষের দৈহিক গঠন একটা বিশেষ পরিমাপের দ্বারা সীমিত, কিন্তু তার মনে অনন্ত আকিঞ্চন তার উদরপূর্তির জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি আবশ্যক তার হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা নিবারণের জন্য। সাময়িক প্রয়োজন মানুষকে দীর্ঘকাল বেঁধে রাখতে পারে না, সংকীর্ণ হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা তাকে চঞ্চল করে তোলে, তার মনে অনন্তের প্রতি, অনির্বচনীয়ের প্রতি এক দুর্নিবার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ তাকে বাস্তব জীবনের রূঢ় নির্মমতার মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত করে তোলে। ধূলি-বিমলিন ধরণীর আঙ্গিনা থেকে দূরে-বহুদূরে এক অমরাপুরীর সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান মানুষকে এই নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের পরশ দিতে পারে না। বিজ্ঞান মানুষকে বাঁচবার অনেক রসদ যুগিয়েছে, কিন্তু তার মনের খোরাক যোগাতে পারে না।

> "The desire of the moth for the star
> And the night for the morrow.
> A devotion to something a far
> From the sphere of our sorrow."

যে আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা মানুষকে প্রয়োজনে বাইরে এনে অনন্তলোকের সঙ্গে, অনির্বচনীয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, দর্শনই তার সন্ধান দিতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দর্শন প্রয়োজনের মধ্যে অপ্রয়োজনের, বাস্তবের মধ্যে বাস্তববাদীদের ধারণা প্রদান করে মানুষের জীবনের গৌরব বাড়িয়ে দেয়, মানুষকে অসীমলোকে উন্নীত করে। কেউ কেউ দর্শনের বিরাট পরিধি ও সিদ্ধান্তের বৈচিত্র্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ করে দার্শনিক সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা ও নির্ভরতা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

জীবনের জটিলতা দর্শনকে সমৃদ্ধ করে : তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সমস্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে মানুষকে পূর্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা করতে হচ্ছে। এ ছাড়া জীবনের নতুন সমস্যার আলোকে লব্ধ সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে; কিন্তু এই বিরোধ জ্ঞানের পক্ষে বিভ্রান্তিকর নয়, বরং এ নতুন চিন্তার, নতুন গবেষণার, নতুন রহস্যের এলাকা আবিষ্কারের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। কাজেই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আধুনিককালে দর্শনের ব্যাপক প্রসার মানবজ্ঞানের এক অপরিসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

দর্শনের প্রত্যক্ষ কল্যাণ : এতদ্ব্যতীত, দর্শনের পঠন-পাঠনের একটা প্রত্যক্ষ কল্যাণ রয়েছে। দর্শনের আলোচনা দর্শনসেবীর মনের যে উত্তুঙ্গ বিকাশ সাধন করে, চিন্তায় যে শৃঙ্খলা আনয়ন করে, অন্যত্র তার সাক্ষাৎ মেলে না। দর্শনের পঠন-পাঠন আমাদের বুদ্ধিকে মার্জিত, শাণিত ও প্রখর করে তোলে। দর্শন চর্চার ফলে মানুষ পরিণত মন, নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়। দর্শনের অনুশীলনলব্ধ এই গুণাবলি মানবজীবনের মহামূল্যবান সম্পদ।[৪]

---

[৪] H. M. Bhattachary – *Principles of Philosophy*, p-14.

চতুর্থ অধ্যায়
জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ
THEORIES OF THE ORIGIN OF KNOWLEDGE

"Percepts and concepts constitute the elements of all our knowledge"-**Kant**

- ❑ ভূমিকা
- ❑ জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ
- ❑ প্রাধিকারবাদ
- ❑ বুদ্ধিবাদ
- ❑ অভিজ্ঞতাবাদ ও জন লক
- ❑ বিচারবাদ
- ❑ স্বজ্ঞাবাদ
- ❑ বিবর্তনমূলক অভিজ্ঞতাবাদ

ভূমিকা
Introduction

দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানুষের পরিবেশকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে জিজ্ঞাসার জন্ম হয়, প্রশ্ন ওঠে আসে। গ্রিক দার্শনিক থেলিসের মনে প্রশ্ন জেগেছিল : জগৎ কোথা থেকে এল? জগতের মূলে কি আছে? তিনি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন পানির মধ্যে। অর্থাৎ জগতের আদিকারণ পানি। কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন আর্দ্রতা সমুদয় জীবন্ত বস্তু ও জীবের মধ্যে বিদ্যমান। ঐশীগ্রন্থ কোরআনে আমরা দেখি আল্লাহ সমুদয় জীবন্ত জিনিসকে পানি দিয়ে তৈরি করেছেন। অতঃপর গ্রিক দর্শনের পরিক্রমায় বায়ু, মৃত্তিকা, অগ্নি প্রভৃতি জগতের উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে সত্তা ও অ-সত্তার প্রশ্ন এসেছে। জগৎ গঠনকারী নউস বা মনের কথা এসেছে, পরমাণু ও গতির কথা এসেছে। সোফিস্ট কিংবা সক্রেটিসের পূর্বে জ্ঞান সম্পর্কীয় কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় নি। সক্রেটিসের আগে কেউ এই সম্পর্কীয় প্রশ্ন তোলেন নি। তিনি ধারণার মাধ্যমে জ্ঞান হয় বলে উক্তি করেছেন। এখানে আংশিকভাবে হলেও জ্ঞান সম্বন্ধে সামান্য ধারণা এসেছে। পরবর্তী দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মধ্যে এই প্রশ্নের অবতারণা হলেও অধিবিদ্যক প্রশ্নের চাপে জ্ঞান তাত্ত্বিক প্রশ্ন উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। মধ্যযুগের খ্রিস্টান দর্শনে ঐশীবাণীর যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হয়েছে। স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞানের প্রশ্ন আলোচিত হয় নি। যা হয়েছে তা সামান্যই। জ্ঞানের প্রশ্নটি স্পষ্টতর হয়েছে আধুনিক দর্শনের জনক দেকার্ত থেকে।

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসের শুরুতেই জ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হতে থাকে। জ্ঞান কি? জ্ঞানের উৎস কি? জ্ঞান কত দূর সম্ভব?– এই সব প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে, বিভিন্ন দার্শনিক জ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জ্ঞান কি অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপ কি– এসব প্রশ্ন ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকে। জ্ঞান মনের ধারণা,

সেই ধারণার সঙ্গে বস্তুর সঙ্গতি এবং তাতে বিশ্বাস। এ বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকলেও এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা প্রাধান্য রয়েছে। অতঃপর প্রশ্ন ওঠে : জ্ঞান কীভাবে আসে? এ বিষয়ে প্রথম ও প্রাধান্য পায় ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বিষয়, মানুষের রয়েছে পাঁচটি ইন্দ্রিয় : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক– এসব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ বাহ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। কোনো ইন্দ্রিয়ের অভাব ঘটলে কিংবা কোনো ইন্দ্রিয় বিকল/অকার্যকর হলে সেই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। এই জ্ঞান যেসব সময়ে সঠিক জ্ঞান দিয়ে থাকে, তা নাও হতে পারে। দূরে একটি জিনিসকে ছোট দেখায়, কাছ থেকে দেখলে বড় মনে হয়। জড় অবস্থায় কোনো জিনিসকে ঠাণ্ডা মনে হয়, আবার ঠাণ্ডা জিনিস স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা মনে হয়। এ ক্ষেত্রে এমন একটি মাপকাঠি চাই, যা সঠিক জ্ঞান দিতে পারে। এ জ্ঞান হলো বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এটি জ্ঞানের উচ্চতর নীতি। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি ছাড়া কোনো বিশেষ মুহূর্তে কোনো বিশেষ বস্তু সম্পর্কে নতুন জ্ঞান পাওয়া যায়। এই জ্ঞান হলো স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান। এ ছাড়া জ্ঞান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রস্তাব ও বিরোধ এবং প্রস্তাব ও বিরোধের সমন্বয়ের মাধ্যমেই জ্ঞান পাওয়া যায়। ধারাবাহিক চিন্তাশৃঙ্খলে– এ হলো থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিসের মাধ্যমে জ্ঞান। এ জ্ঞান সমন্বয়ধর্মী জ্ঞান। দার্শনিক হেগেল সদর্থক সমন্বয় এবং সক্রেটিস ও কান্ট নঞর্থক সমন্বয়ের কথা বলেছেন। আদালতে আইনজীবীরা নঞর্থক দ্বান্দ্বিকতা এবং হেগেল সদর্থক দ্বান্দ্বিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণ হয়ে থাকে, আবার বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানেরও তদ্রূপ হয়ে থাকে। আজ জ্ঞানবিদ্যা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দৃপ্তদম্ভে এগিয়ে চলেছে। এমন কি জ্ঞানবিদ্যা আজ ভাষাদর্শন নামে অন্যান্য শাখা পল্লবিত করে তুলছে। ভাষা চিন্তা বা অভিজ্ঞতার বাহন, কাজেই আজ জ্ঞানবিদ্যা ভাষার শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কাজ করছে। ভাষাদর্শন আজ দর্শনের একটি শক্তিশালী শাখায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই ক্রমবিকাশ জ্ঞানবিদ্যার গবেষণার পথ ধরেই হচ্ছে। দর্শন আজ অস্তিত্বের কত না দিকে সম্প্রসারিত হয়ে মানুষকে বিহ্বল করে তুলছে। এ দিকটি দর্শনের জ্ঞানবিদ্যা শাখারই অভাবিত পরিণতি।

জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ

Defferent Theories as to the Origin of Knowledge

জ্ঞানবিদ্যার একটি প্রধান প্রশ্ন হলো জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় সমস্যা। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জ্ঞানের উৎপত্তি কীভাবে ঘটে, সে সম্পর্কে দার্শনিকরা একমত নন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। এই মতবাদগুলির মধ্যে বুদ্ধিবাদ (Rationalism), অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism), বিচারবাদ (Criticism), বিবর্তনমূলক অভিজ্ঞতাবাদ (Evolutional Empiricism) ও স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধিবাদ অনুসারে বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞান লাভের উৎস। দেকার্ত, উলফ, লিবনিজ প্রমুখ দার্শনিক প্রসিদ্ধ বুদ্ধিবাদী চিন্তাবিদ। অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। লক, হিউম, মিল প্রমুখ দার্শনিক অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তাবিদ। বিবর্তনমূলক অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই ছিল জ্ঞানের উৎস। কিন্তু বংশপরম্পরায় ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান অন্তর ধারণা রূপে পরবর্তী বংশগতিতে সংক্রমিত হয়।

অর্থাৎ এক সময়ে যা ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা, আজ তাই সহজাত ধারণা। এই মতের সমর্থক দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার। বিচারবাদ অনুসারে, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়ই জ্ঞানের উৎস। অভিজ্ঞতা প্রদান করে জ্ঞানের উপাদান, বুদ্ধি প্রদান করে জ্ঞানের আকার; দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে জ্ঞানের সৌধ। ইমানুয়েল কান্ট বিচারবাদের প্রবর্তক। স্বজ্ঞাবাদের মতে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা স্বজ্ঞা হলো জ্ঞানের উৎস। পাশ্চাত্য দর্শনে দার্শনিক বার্গসঁ একজন প্রখ্যাত স্বজ্ঞাবাদী।

প্রাধিকারবাদ

Authoritarianism

জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলির সমাধানকল্পে বিভিন্ন দার্শনিক দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। তার মধ্যে একটি প্রধান মতবাদ হলো প্রাধিকারবাদ।

প্রাধিকার বা অথরিটিকে সাধারণ্যে জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে মনে করা হলেও দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে দর্শনে প্রাধিকারের যৌক্তিকতা থাকার কথা নয়। কারণ দর্শন স্বাধীন চিন্তা। কোনো ব্যক্তি বিশেষের, গোষ্ঠী বিশেষের চাপের মুখে দর্শন কিছুই গ্রহণ করে না। যুক্তির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, বাস্তবতার আলোকে যাচাই করে দর্শন অগ্রসর হয়। দর্শনের মতে বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা সত্য লাভ করার দুটি নিশ্চিত পথ। যে বিষয় বা বা বস্তু বা ঘটনা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এমন কিছু করা অন্ধ কুসংস্কার। আর যেখানে বাস্তবকে জানা যায় না সেখানে সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে বের করা দর্শনের কাজ। এখানে যৌক্তিক হাতিয়ার আমাদের সহায়ক। সুতরাং বাস্তবতা ও যৌক্তিকতার্যুক্তিনির্ভরতা দর্শনের সহায়ক।

এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে অথরিটি বা প্রাধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে অগ্রসর হওয়াই দর্শনের কাজ। মিয়া ভাই যা, আমিও তা– এ ধরনের বিনয় দর্শনে আছে বলে আমার জানা নেই। বড় বড় শ্রদ্ধেয় দার্শনিকদের বক্তব্য ও যুক্তি তাদের উত্তরসূরিরা বেমালুম ছেঁটে কেটে সংস্কার করে নতুন দর্শন খাড়া করেছেন, দর্শনের ইতিহাস ঘাঁটলে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা না হলে দর্শনে এত অধিক মতবাদ এবং একই মতবাদের মধ্যে খুটিনাটি পার্থক্য নজরে আসত না। তবে সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে জ্ঞান নিরূপণ করার জন্য প্রাধিকার/অথরিটি স্বীকার করা হয়ে থাকে। সাধারণ লোকে কাজ করার একটি পথ অন্ততপক্ষে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। সে কারণে পূর্বসূরিদের/অভিজ্ঞ লোকদের কর্মপন্থা অনুসরণ করলে কাজ করা সহজ হয়ে থাকে। অফিস-আদালতে কাজের সুবিধার জন্যই দরখাস্ত/আবেদন পত্রের নমুনা ছাপানো হয়। এতে কাজের সুবিধা হয়। কিন্তু দর্শন বিষয়টি এমন নয়, প্রতিটি পদক্ষেপে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাধিকার/অথরিটি মানার কোনো তাৎপর্য থাকে না। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রত্যেক আলোচনার একটি প্রারম্ভিক বিন্দু আছে, প্রত্যেক চিন্তাকারী কোনো একটি জায়গা থেকে বা কোনো কিছু স্বীকার করে নিয়ে তার আলোচনা শুরু করেন। কোনো বিজ্ঞান বা কোনো শাস্ত্রের প্রারম্ভ আছে, আলোচনার দৃষ্টিকোণ আছে, এটা জ্ঞানালোচনার জন্য অপরিহার্য; তবে এটা প্রাধিকার নয়। নতুন কিছু বলার অধিকার অর্জন করা কিন্তু সহজ নয়। এ জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মনন শক্তি। দর্শনকে তাই বলা যায় মুক্ত চিন্তার প্লাটফর্ম। মুক্ত চিন্তার

সঙ্গে প্রাধিকার বা অথরিটি কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ বা অসঙ্গতিপূর্ণ, একটু গভীরভাবে ভাবলেই তা অনুধাবন করা যায়। বাঁধা-ধরা চিন্তার সঙ্গে অবাধ চিন্তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে : মুক্তচিন্তা বলে কিছু আছে কি? একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায় যে মুক্ত চিন্তা কোথায়? কোনো ব্যক্তি/চিন্তাকারী কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য, কোনো না কোনো ধর্মের লোক, কোনো না কোনো গোষ্ঠীর সদস্য, কোনো না কোনো যুগের লোক, এ-সব অর্থাৎ পরিবার, ধর্ম, গোষ্ঠী ও যুগের ধারণা তার মনে ছায়াপাত করা সম্ভব। এসব সংগঠনের প্রভাব এড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করা কি সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে, না সম্ভব নয়। আবার একথাও সত্য যে, পরিবারের ধর্মের, গোষ্ঠীর ও যুগের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে জীবনের পরিস্থিতির পরিবর্তন, জীবনের চাহিদার পরিবর্তন। জীবন ও জগতের নিয়ত পরিবর্তন এবং সমাজের ওপর তার প্রভাব, এই সব পরিবর্তনের কারণ।

প্রাধিকারের বা অথরিটি শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাতে সামাজিক পরিবর্তন বা চিন্তার পরিবর্তনের ব্যাপারটি কোনোরূপ পোষকতা করে বলে মনে হয় না। সুতরাং দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রাধিকারবাদ মানানসই নয়।

প্রাধিকারের পদ্ধতিসমূহ

প্রাধিকারের যথার্থতা নিরূপণের জন্য কতগুলি পদ্ধতি বা মানদণ্ড রয়েছে। যথা :

ক. যদি কোনো একটি বিষয় বা কোনো মতামতকে অধিকাংশ মানুষ সত্য বলে গ্রহণ করেন, তাহলে সে বিষয় বা মত সত্য। অর্থাৎ সর্বসম্মতি বা বিরোধহীন ঐকমত্য প্রকৃত জ্ঞানের বিশ্বাসজনক উপায়। নৈতিক মান এবং পূর্বসংস্কার এ মতবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

খ. দীর্ঘদিন ধরে কোনো মত চালু হয়ে এলে সেই মতকে সত্য বলে ধরে নেয়া হয়। ফলে তা জ্ঞানের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ, কালিক দীর্ঘতা জ্ঞানের যথার্থতা যাচাইয়ের নির্ভরযোগ্য উপায়।

গ. খ্যাতিমান, অভিজ্ঞ, সম্মানিত ব্যক্তি যদি কোনো মতামত ব্যক্ত করে থাকেন তবে তার মতামত সত্য বলে গৃহীত হয়। যা তাঁদের পূর্ব ক্রিয়া-কলাপের সাধন থেকে অর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং জ্ঞান বিচারের এই মানদণ্ড হচ্ছে প্রাধিকারীর সম্মান, খ্যাতি এবং মর্যাদা।

এ পদ্ধতিতে ব্যক্তি সত্য ও মিথ্যা নির্ধারণে, তথা যথার্থ জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধানে তার নিজস্ব স্বাধীন প্রচেষ্টা পরিহার করে এবং গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানিক বা কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্য ও নির্দেশনা। সেই প্রতিষ্ঠানকেই মনে করা হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বলে।

সমালোচনা

Criticism

যদিও কিছু আপেক্ষিক গুণাবলি যা অস্বীকার করা চলে না। তবু সন্তোষজনক বলা চলে না কোনোক্রমেই।

১. প্রাধিকারবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে যুক্তিহীন। অধিকাংশ লোক কোনো মতকে স্বীকার করলেই তাকে সত্য বলে ধরে নেয়া যুক্তিসম্মত নয়।

২. কোনো কিছুকে যুক্তিসম্মত উপায়ে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা না করে কেবল বিশেষজ্ঞ কিংবা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দোহাই দিয়ে গ্রহণ বা বর্জন করা যৌক্তিক নয়।

৩. মানুষের চিন্তার ইতিহাস নিয়ত পরিবর্তনশীল। তার সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে তার সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-আচরণ-প্রথা ইত্যাদি। কিন্তু প্রাধিকার তা স্বীকার করে না।

৪. জ্ঞানের বাহন হিসেবে প্রাধিকারবাদ দুর্বল। কারণ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের বিধান– যা ভিন্নতর এমন কি পরস্পরবিরোধী। এমতাবস্থায় প্রাধিকার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সুতরাং প্রাধিকারবাদকে জ্ঞানের যথার্থ উৎস সম্পর্কীয় মতবাদ না বলে, বরং বিশ্বাসনির্ভর মতবাদ বলাই শ্রেয়। কারণ বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে জটিলতা ও সংকট নিরসনে প্রাধিকারবাদ সত্যিকার অর্থে অচল।

বুদ্ধিবাদ

Rationalism

বুদ্ধিবাদের মূলনীতি হলো বুদ্ধিই জ্ঞানের উৎস। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান সামান্য ও নিশ্চিত নয়। অনেক সময় ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আমাদেরকে প্রবঞ্চিত করে। কাজেই সামান্য, নিশ্চয়াত্মক ও বিশুদ্ধ জ্ঞান একমাত্র বুদ্ধির মাধ্যমেই পাওয়া যায়। দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদ বিভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ড. পলসন (Dr. Paulsen) তত্ত্ববিষয়ক (Metaphysical), গাণিতিক (Mathematical) এবং আকারগত (Formalistic)– এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধিবাদের উল্লেখ করেছেন। প্লেটো ও হেগেল তত্ত্ববিষয়ক বুদ্ধিবাদের সমর্থক। দেকার্ত, লিবনিজ, স্পিনোজা ও উলফ গাণিতিক বুদ্ধিবাদের সমর্থক এবং কান্ট আকারগত বুদ্ধিবাদের সমর্থক।

সক্রেটিস, প্লেটো ও হেগেল : প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস ও প্লেটোর কণ্ঠে বুদ্ধিবাদের বাণী প্রথম ধ্বনিত হয়। এই দুই ভাববাদী দার্শনিকই সর্বপ্রথম বুদ্ধিবাদের মূলনীতি ঘোষণা করেন। তাঁদের মতে, আত্মা বুদ্ধির মাধ্যমে সামান্য ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে। প্লেটোর মতে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগৎ প্রকৃত নয়, ধারণার জগৎই (The world of ideas) প্রকৃত জগৎ। ধারণার জগৎই আত্মার প্রকৃত অধিষ্ঠান। বিচার-বুদ্ধি আত্মার প্রকৃত স্বভাব। কাজেই বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমেই প্রকৃত জ্ঞান– শাশ্বত, সনাতন, নিশ্চিত সামান্য জ্ঞান লাভ করা যায়। হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি চিন্তা ও সত্তাকে অভেদাত্মক বলে মনে করে; কাজেই প্লেটোর বুদ্ধিবাদ থেকে হেগেলের বুদ্ধিবাদ খুঁটিনাটি ব্যাপারে পৃথক হলেও একে তত্ত্ববিষয়ক বুদ্ধিবাদ বলা চলে। অবশ্য একথা সত্য যে, হেগেলীয় বুদ্ধিবাদ প্লেটোর বুদ্ধিবাদ অপেক্ষা গভীরতর। হেগেলের মতে, এ জগৎ মিথ্যা নয়; জগৎ পরম ধীশক্তির প্রকাশ।

দেকার্ট আধুনিক দর্শনের জনক : আধুনিক প্রতীচ্য দর্শনে দেকার্ত, স্পিনোজা, লিবনিজ ও উলফ প্রখ্যাত বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হিসেবে নন্দিত। দেকার্তকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক (Father of modern Western Philosophy) বলা হয়ে থাকে। এই সকল দার্শনিক প্রজ্ঞানিত জ্ঞানের নিশ্চয়তা ও যথার্থতা সম্পর্কে একমত। তাঁরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, অনিশ্চয়তা ও ভ্রান্তি সম্পর্কে নিশ্চিত। দেকার্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বিশ্লেষণ করে দেখতে পান যে, এই জ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয়, এ অনেক সময় আমাদেরকে প্রতারিত করে।

ধারণার শ্রেণীবিন্যাস : তিনি মানবমনের ধারণাসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা,- আগন্তুক ধারণা (Adventitious ideas), কৃত্রিম ধারণা (Fictitious ideas) ও সহজাত ধারণা (Innate ideas)। আগন্তুক ধারণা বাহির থেকে আমাদের মনে আসে, বিভিন্ন ধারণাকে সংশ্লিষ্ট করে মনে কৃত্রিম ধারণা গঠন করে। এই দুই শ্রেণীর ধারণাই অস্পষ্ট। কিন্তু সহজাত ধারণা সুস্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ; এই দুই শ্রেণীর ধারণাসমূহ মানুষের জন্মের সময় খোদা মানুষের মনে প্রোথিত করেন। এইগুলি মনের মৌলিক ধারণা। এইগুলি হলো অসীমতা, নিত্যতা পরমসত্তা কার্যকারণতত্ত্ব, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা, অভেদ নিয়ম, বিরোধ নিয়ম। এই সহজাত ধারণাসমূহ থেকে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান অনুমিত হয়। যেমন- জ্যামিতিতে সংজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধ থেকে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়।

স্পিনোজার মত : স্পিনোজা দেকার্টের মতো সহজাত ধারণায় বিশ্বাসী। তিনি দর্শনকে অবরোধমূলক অনুমান বলে মনে করেন। তাঁর মতে, নিছক প্রত্যক্ষের মাধ্যমে যে ধারণা পাওয়া যায় তা অস্পষ্ট ও অপূর্ণ; এই ধারণার সাহায্যে পরমসত্তাকে জানা যায় না। বুদ্ধি বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান দান করে।

লিবনিজ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অবদান স্বীকার করেন : দেকার্ত ও স্পিনোজা সহজাত ধারণায় বিশ্বাসী, কিন্তু জার্মান দার্শনিক লিবনিজের মতে, মানুষের মনে কোনো সহজাত ধারণা নেই, তবে মানুষের মনে কতগুলি প্রবণতা আছে, এইগুলিকে সুপ্ত ধারণা বলা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে এসে এই প্রবণতাসমূহ ধারণায় পর্যবসিত হয়। মন চিহ্নবিহীন সাদা কাগজ নয় বরং মন হলো চিন্তার সীমাহীন সম্ভাবনার প্রবণতা ও স্বভাব। তাঁর মতে বস্তু সম্পর্কীয় সত্য অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়। আর নিশ্চিত, সামান্য সত্য পাওয়া যায় বুদ্ধি থেকে। কাজেই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা, এই দ্বিবিধ উপায়েই সত্য পাওয়া যায়। তবে বিশুদ্ধ জ্ঞান বুদ্ধি থেকে পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয় থেকে বিশুদ্ধ জ্ঞান পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

উলফ চরম বুদ্ধিবাদী : দার্শনিক উলফ কতিপয় মৌলিক সহজাত ধারণা থেকে জগৎ, আত্মা ও খোদা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অনুমান করেন। উলফের মতবাদ চরম বুদ্ধিবাদী বলে পরিবিদিত। সক্রেটিস ও প্লেটো থেকে উলফ পর্যন্ত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা বুদ্ধিকে জ্ঞানের উৎস ও বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের মতে, জ্ঞান অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং বিশ্লেষণাত্মক। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই।

কান্টের মতে, জ্ঞান অভিজ্ঞতাপূর্ব ও অভিজ্ঞতালব্ধ : আধুনিক দর্শনে ইমানুয়েল কান্টই এই ধারার বুদ্ধিবাদের প্রথম ও বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। তিনিই সর্বপ্রথম জ্ঞানের সমস্যাকে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন, জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, সীমা ও বৈধতা সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়ই জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমানভাবে অপরিহার্য। জ্ঞান একাধারে অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং অভিজ্ঞতালব্ধ (priori and posteriori)। অভিজ্ঞতা জ্ঞানের উপাদান এবং বুদ্ধি জ্ঞানের আকার। অভিজ্ঞতা বুদ্ধির দ্বারা বিখ্যাত হলে তা জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। জ্ঞানের ব্যাখ্যায় কান্ট যে যুগান্তর আনয়ন করেছেন তা থেকে বুদ্ধিবাদের এক বলিষ্ঠতর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

কান্টের বুদ্ধিবাদের আকার ও উপাদানের ঐক্যবিধান : কান্টের বুদ্ধিবাদে (বিচারবাদ, Criticism) জ্ঞানের আকার ও উপাদান দুই স্বতন্ত্র উৎস থেকে উৎপন্ন, কাজেই তারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত। এখানে হেগেল এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন,

মনের আকার কীভাবে স্বতন্ত্র উৎস থেকে আগত সংবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? কান্ট বুদ্ধির আকার ও সংবেদনের মধ্যে কোনো সঙ্গতি বিধানে সমর্থন হন নি। দার্শনিক হেগেল বুদ্ধির আকার ও অভিজ্ঞতার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। তাঁর মতে, বিশ্বজগৎ পরম ধীশক্তির প্রকাশ– জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ। মানুষের বুদ্ধির আকার ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ উভয়ই একই পরম ধীশক্তি বা পরমাত্মারই প্রকাশ। কাজেই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল রয়েছে, উভয়ই একই উৎস থেকে উদ্ভূত। বুদ্ধির আকার শুধু আত্মগত নয়, বিষয়গত এবং অভিজ্ঞতাও শুধু বিষয়গত নয়, আত্মগতও।

সমালোচনা

Criticism

কান্টের মতবাদের উৎকর্ষ : দেকার্ত, স্পিনোজা, লিবনিজ, উলফ প্রমুখ দার্শনিকের বুদ্ধিবাদ সহজাত ধারণাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। লক ও অন্য অভিজ্ঞতাবাদীরা এই মতবাদের সমালোচনা করেছেন। লক বলেন যে, অভিজ্ঞতা ছাড়া কোনো ধারণা মনে জন্মাতে পারে না। সহজাত ধারণার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। লকের মতের সাথে একমত না হতে পারলেও একথা বলা যায় যে, অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে মনের বিভিন্ন প্রবণতা ও স্বভাব বিকাশ লাভ করতে পারে না, মন সুসংহত চিন্তার অধিকারী হতে পারে না।

কান্টের মতবাদের অপরিহার্য পরিণতি দ্বৈতবাদ : তিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান সমস্যার সার্থক আলোচনা করেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়েরই যুগ্ম অবদান স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিবাদে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়েই পরস্পর স্বতন্ত্র থেকে যায়– হেগেল উভয়ের মধ্যে সঙ্গতি বিধান করেন এবং তিনি বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উৎস হিসেবে পরম ধীশক্তি উল্লেখ করেন, ফলে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ হয়– উভয়ই পরমসত্তার মধ্যে যথাযোগ্য আসন লাভ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কান্ট-পরবর্তী বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় সাধন করে জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক সমস্যার সন্তোষজনক সুরাহা করে।

অভিজ্ঞতাবাদ ও জন লক

Empiricism and Jon Locke

দেকার্টের সহজাত ধারণাবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদের উদ্ভব ঘটে। সহজাত ধারণাবাদ (Theory of Innate ideas) অনুসারে মানুষের মনে কতগুলি মৌলিক ও সামান্য ধারণা নিহিত থাকে, এই ধারণাসমূহ থেকে প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। স্রষ্টা জন্মের সময় মানুষের মনে এই সকল ধারণা রোপণ করে থাকেন, জ্ঞান এসকল ধারণারই পরিস্ফুটিত রূপ। ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক দেকার্টের সহজাত ধারণাবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও অভিজ্ঞতাবাদ প্রচার করেন। সুতরাং লকের কাজ হলো দ্বিবিধ : প্রথম, দেকার্টের সহজাত ধারণাবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করা। দ্বিতীয়, অভিজ্ঞতাবাদের স্বরূপ বর্ণনা করা।

তিনি সহজাত ধারণাবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি উত্থাপন করেন :

১। **সার্বজনীনতার অভাব** : কোনো সহজাত ধারণা যদি মানুষের মনে থাকে তবে সে ধারণা সকলের মনেই সমানভাবে থাকবে। কিন্তু শিশু, নির্বোধ, অশিক্ষিত, অসভ্য প্রভৃতি লোকদের মধ্যে এই জাতীয় ধারণার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। সকল মানুষ

খোদা, কার্যকারণতত্ত্ব, নিত্যতা, অসীমতা, নৈতিক নিয়ম প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, এই জাতীয় ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই।

২। **অভিন্নতার অভাব** : যদি মানুষের কোনো সহজাত ধারণা থাকে, তবে তা সার্বজনস্বীকৃত হবে কিন্তু খোদা নৈতিক নিয়ম, অসীমতা, নিত্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্নকালে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধারণা লক্ষিত হয়। সহজাত ধারণা থাকলে সকল যুগের, সকল দেশের, সকল মানুষের মধ্যেই একই ধারণা একইরূপ হবে। এই অনৈক্য সহজাত ধারণার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে।

৩। **ধারণার সাধারণ উপস্থিতি সহজাত তত্ত্ব প্রমাণ করে না** : যদি প্রত্যেক মানুষের মনে একটি সাধারণ ধারণার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তবে তাকে সহজাত বলবার কোনো হেতু নেই। প্রত্যেক মানুষের আগুন সম্পর্কে ধারণা আছে। এই ধারণা অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত। সুতরাং কোনো ধারণা সকল মানুষের মনে উপস্থিত থাকলেই তাকে সহজাত ধারণা বলে গ্রহণ করার কোনো শক্তিশালী যুক্তি নেই। এই যুক্তিগুলির মাধ্যমে লক প্রতিপন্ন করতে চান যে, সহজাত ধারণা আরোহাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত।

অভিজ্ঞতার পথ সংবেদন ও অন্তর্দর্শন : এ হলো লকীয় মতবাদের নেতিবাচক দিক, এই পর্যায়ে তিনি দেকার্টের মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিজস্ব মতবাদের বর্ণনা করেন। লকের মতে, জন্মের সময় মানুষের মন সাদা অলিখিত কাগজের (Tabula rasa) মতো থাকে, অভিজ্ঞতার ফলেই মনে বাইরের বস্তুর ছাপ পড়ে। মনে কোনোরূপ সহজাত ধারণা থাকে না, মনের সকল ধারণাই অভিজ্ঞতা থেকে আসে। অভিজ্ঞতা লাভ করার দুটি উপায় আছে– সংবেদন (Sensation) এবং অন্তর্দর্শন (Reflection)। সংবেদনের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি, আর অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হই। কাজেই সংবেদন ও অন্তর্দর্শন ছাড়া মনে কোনো ধারণা জন্মাতে পারে না। জন্মের পর মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সংবেদনকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করে। পরে বিভিন্ন ধারণা মনকে সক্রিয় করে তোলে। বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে তুলনা করেও সেইগুলিকে সংযুক্ত করে মন জটিল ধারণা গঠন করে এবং সামান্যীকরণের মাধ্যমে বিশেষ ধারণা থেকে সামান্য ধারণা গঠন করে। লকীয় দর্শনে ধারণার সাহায্যেই আমরা বস্তু সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজের মানসিক অবস্থা এবং ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর গুণসমূহ প্রত্যক্ষ করাকে ধারণা বলা হয়। বস্তু ও ধারণার সঙ্গতি ধারণার সত্যতা প্রমাণ করে আর উভয়ের মধ্যে সঙ্গতির অভাবই ধারণার অসত্যতা ঘোষণা করে। তাঁর মতে, ধারণার মাধ্যমেই বস্তুর জ্ঞান হয়ে থাকে। সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতা থেকে জাত অভিজ্ঞতাপূর্ব কোনো উপাদান জ্ঞানের মধ্যে নেই। তিনি বলেন, "বুদ্ধিতে এমন কিছু নেই যা পূর্বে কোনো ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে ছিল না।"[৫]

লকের মতবাদের মধ্যে ব্যতিক্রম : দ্রব্য, আত্মা ও খোদা : যদিও লক একজন অভিজ্ঞতাবাদী তথাপি তিনি দ্রব্য, আত্মা ও খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমরা শুধু বস্তুর গুণ সম্পর্কে জানতে পারি, কিন্তু বস্তুর

---

[৫] There is nothing in the intellect which was not previously in the senses. – Locke

গুণসমূহ কোনো আশ্রয় ছাড়া টিকতে পারে না অর্থাৎ দ্রব্য ছাড়া বস্তু টিকতে পারে না। গুণাবলির আধার হিসেবে দ্রব্যের স্বরূপ জানতে পারা না গেলেও দ্রব্যের অভিজ্ঞতা স্বীকার না করলে গুণের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। তাই তিনি দ্রব্যকে (Substances/Substratum) অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলে ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে তিনি ইচ্ছা, অনুভূতি ও চিন্তার আধার হিসেবে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

বার্কলি : বার্কলিও একজন অভিজ্ঞতাবাদী। তিনি লকের পন্থা অকুসরণ করে বস্তুর মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। প্রত্যক্ষণই যদি জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় হয়, তবে সংবেদন ও ধারণাই জ্ঞানের একমাত্র বস্তু। কাজেই সংবেদন ও ধারণার সমষ্টি বস্তু, এদের অতিরিক্ত কিছু তিনি স্বীকার করতে নারাজ। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বার্কলি দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।

হিউম : চরম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম, লক ও বার্কলির মতবাদের অনিবার্য পরিণতি দান করেন। তিনি অভিজ্ঞতাবাদের অনিবার্য পরিণতির আলোকে দ্রব্য, আত্মা ও খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। হিউম ও তাঁর অনুসারীদের মতে, অভিজ্ঞতাবাদ অনিবার্যভাবে ও যুক্তিসঙ্গতভাবে সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়। হিউম তাঁর সংশয়বাদের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন।

সংবেদন একমাত্র সম্বল : **প্রথমত,** জ্ঞান যদি শুধু সংবেদনের দ্বারা গঠিত হয় এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি অন্য কোনো উপাদান বর্তমান না থাকে, তবে সংবেদনের বাইরে কিছু জানার উপায় নেই। এমতাবস্থায় শুধু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতায় উপনীত হওয়া যায়, এর বাইরে যাওয়া চলে না।

সংবেদন অনুষঙ্গ সূত্রে গ্রথিত : **দ্বিতীয়ত,** সংবেদনসমূহ যদিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র, তথাপি সেগুলি অনুষঙ্গের নিয়মাবলির দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত হয়। অনুষঙ্গের তিনটি নিয়ম আছে। যথা– সান্নিধ্য নিয়ম (Law of Contiguity), সাদৃশ্য নিয়ম (Law of Similarity) এবং পারম্পর্য নিয়ম (Law of Succession)। এই ব্যক্তিনিরপেক্ষ নিয়মগুলি সংবেদনসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বিধান করে। এ ব্যাপারে সহজাত ধারণা বা বুদ্ধির আকারের প্রয়োজন হয় না।

কারণ কার্যের অগ্রগামী ঘটনা : **তৃতীয়ত,** সংবেদন যদি বাহ্য বস্তুসমূহের প্রভাবজাত মানসিক ফল বলে বিবেচিত হয়, তবে কারণ বলতে কোনো শক্তি বুঝায় না। হিউম কারণের লৌকিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ কারণ কার্য উৎপাদনের শক্তি– এই মতবাদ অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। অভিজ্ঞতায় আমরা কারণকে কার্যের অপরিবর্তনীয় অগ্রগামী ঘটনা হিসেবে পাই।

সম্ভাব্যতা জ্ঞানের নিয়ামক : **চতুর্থত,** অভিজ্ঞতা যদি জ্ঞানের একমাত্র উৎস হয় তবে আমাদের পক্ষে সামান্য ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভের কোনো আশা নেই। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতাই জ্ঞানের একমাত্র নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। হিউমের মতে, দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব নেই, কেননা সংবেদনের বাইরে কোনো দ্রব্য আমরা প্রত্যক্ষ করি না। বস্তু বাস্ত ব ও সম্ভাব্য সংবেদনের সমষ্টি। অতিন্দ্রীয় আত্মা বা মনের কোনো অস্তিত্ব নেই, কেননা চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার সমষ্টি হলো মন– প্রত্যক্ষণে এ সকলের অতিরিক্ত কোনো মনের সন্ধান মেলে না। খোদার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের এলাকা বহির্ভূত, কাজেই কল্পনার বিষয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হিউম সংবেদনের বাইরে কোনো কিছুই মানতে রাজি নন। যার সংবেদন পাওয়া যায় না তার জ্ঞান সম্ভব নয়। কাজেই হিউমের দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদ অনিবার্যভাবে সংবেদনবাদ ও সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়।

সমালোচনা

Criticism

জ্ঞানের ব্যাখ্যায় মন সক্রিয় : অভিজ্ঞতাবাদ ও সংশয়বাদ নিম্নলিখিত কারণে অসঙ্গতিপূর্ণ ও সমর্থনের অযোগ্য। লকের মতে, ধারণা গ্রহণ করার সময় আমাদের মন নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ধারণাসমূহ যুক্ত করে জটিল ধারণা গঠনের সময় সক্রিয় হয়ে হয়ে ওঠে। এই ধারণা অমনোবৈজ্ঞানিক। মনোবিজ্ঞানের মতে, মন সব সময়ই সক্রিয়; আর এই সক্রিয়তাই সংবেদন থেকে জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য দায়ী। লক ধারণা ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে মনে করেন। তাঁর কাছে ধারণার মধ্যে মিল বা অমিল প্রত্যক্ষ করাই জ্ঞান।

বস্তুর ধারণাই জ্ঞান : কিন্তু আসলে বস্তুর ধারণাই বস্তুর জ্ঞান অর্থাৎ কোনো বস্তুর ধারণাই সেই বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। জ্ঞান ও ধারণার মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই।

লক ধারণা ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, সাক্ষাৎভাবে ধারণাকে জানা যায়, আর ধারণার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বস্তুকে জানা যায়। এতে প্রশ্ন ওঠে, বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে জানা না গেলে বস্তুর অস্তিত্ব কীভাবে জানা যায়? এ ছাড়া মনের ধারণা যে বস্তুর অনুরূপ তাইবা জানা যায় কীভাবে?

জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও মনের যুক্ত অবদান : মন জন্মের সময়ে অলিখিত সাদা কাগজের মতো, লকের এই ধারণাও ঠিক নয়। মানব-শিশুর মধ্যে কোনো সহজাত প্রবণতা না থাকলে একই পরিবেশের মধ্যে দুটি শিশু দুইভাবে গড়ে উঠতে পারত না। এ ছাড়া, জ্ঞানের যথার্থ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে সংবেদন পাওয়া যায় তাই ব্যাখ্যাত হয়ে জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে সংবেদন পাওয়া যায়, মন তার আকার ও মৌলিক ধারণার (From of intuition and categories of understnding) সাহায্যে এই সংবেদনকে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করে। সুতরাং জ্ঞান অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং অভিজ্ঞতালব্ধ উভয় প্রকার উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। জ্ঞানের পরিকল্পনায় অভিজ্ঞতা ও মন উভয়েরই যুগ্ম অবদান রয়েছে।

অধিকন্তু, অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস মনে করলে সামান্য ও অনিবার্য (General and necessary) জ্ঞান অসম্ভব হয়ে পড়ে। জগৎ সম্পর্কীয় ধারণা কতিপয় সামান্য ও অনিবার্য ধারণার অন্তর্গত। স্থান, দ্রব্য, কার্যকারণতত্ত্ব ইত্যাদি অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, এই সমস্ত ধারণা বুদ্ধিজাত। কাজেই বুদ্ধিই জ্ঞানের সার্বিকতা ও অনিবার্যতা প্রতিপন্ন করে।

মন সংবেদনের ঐক্যবিধায়ক ও সংশ্লেষণী শক্তি : হিউম লকের অভিজ্ঞতাবাদ অনুসরণ করে সংশয়বাদে উপনীত হন। তিনি পরিষ্কারভাবে দেখান যে, অভিজ্ঞতাবাদ অবশ্যম্ভাবীরূপে সংশয়বাদে পর্যবসিত হয়। হিউম মনের কোনো স্থায়ী সত্তা স্বীকার করেন না। তিনি বিচ্ছিন্ন সংবেদন ও ধারণাকেই জ্ঞানের উপকরণ বলে মনে করেন। কিন্তু বিচ্ছিন্ন সংবেদন ও ধারণার মধ্যে কোনো অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র না থাকলে জ্ঞানের

সংহতি ও ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করা যায় না। মন সংবেদনের ব্যাখ্যা প্রদান করে, বিভিন্ন সংবেদনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্দেশ করে, অতীত ও ভবিষ্যতের সংবেদনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। মনের এই ঐক্য ও সংশ্লেষণী শক্তি ছাড়া অনুষঙ্গের নিয়মের কোনো অর্থ হয় না, মন ছাড়া একটি সংবেদন অপর একটি সংবেদনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে না। মনই সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের সাহায্যে অভিজ্ঞতার মূর্ত চিত্র গড়তে পারে।

এটি অমনোবৈজ্ঞানিক। লক ও হিউম উভয়েই জ্ঞানের পরিকল্পনায় বুদ্ধির অবদান অস্বীকার করেছেন। বুদ্ধিজাত ধারণা ছাড়া নিছক অভিজ্ঞতা জ্ঞানে রূপান্তরিত হতে পারে না। কাজেই তাঁদের জ্ঞানের বিশ্লেষণ অমনোবৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক।

সিদ্ধান্ত : হিউমের মতে, বস্তুর প্রকাশ্য রূপকেই জানা যায়, বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানা যায় না। বস্তুর গুণকে জানা যায়, বস্তুকে জানা যায় না; ধারণা, ইচ্ছা, অনুভূতিকে জানা যায়, মনকে জানা যায় না; জগৎকে জানা যায়, জগতের কর্তাকে জানা যয় না। কিন্তু প্রকাশের মাধ্যমেই সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়; গুণের মাধ্যমে বস্তু, মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মা, সংবেদনের মাধ্যমে জগৎ এবং বিশ্বভুবনের মাধ্যমে খোদার উপলব্ধি ঘটে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অভিজ্ঞতাবাদী সন্তোষজনক মতবাদ নয়। জ্ঞানের বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতাবাদ একদেশদর্শী, অসঙ্গতিপূর্ণ মতবাদ।

বিচারবাদ

Criticism on Critical Theory

অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদে বিরোধ : জ্ঞানের উৎপত্তিকে কেন্দ্র করে অভিজ্ঞতাবাদী ও যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মতবিরোধ দীর্ঘদিনের। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই মতবাদ প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস ও প্রোটাগোরাস থেকে শুরু করে বেকন, লক, হিউম, কোঁতে, জেমস, জে. এস. মিল, বেন ও স্পেন্সার প্রমুখ দার্শনিকের চিন্তার মধ্যে প্রবাহিত। অপরপক্ষে, বুদ্ধিবাদীদের মতে, বুদ্ধি প্রকৃত জ্ঞানের উৎস। মনের সহজাত ধারণা থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সক্রেটিসের চিন্তায় এই মতবাদ প্রবাহিত। এই দুটি মতবাদ চরম মতবাদ। বুদ্ধিবাদ বুদ্ধিকে জ্ঞানের একমাত্র উৎস ও বিষয়বস্তু বলে মনে করে, আর অভিজ্ঞতাবাদ সংবেদন ও অনুভূতিকে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করে। কান্টের আবির্ভাবের পূর্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মতবিরোধ চলতে থাকে।

জ্ঞান প্রত্যক্ষগত অবধারণ : এই দুটি বিরোধী দল একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট। এই একদেশদর্শিতার প্রভাব থেকে মুক্ত করে জ্ঞানকে এক বলিষ্ঠ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য। জ্ঞানের যথার্থ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জ্ঞান প্রত্যক্ষগত অবধারণ (Perceptual judgment) একাধারে প্রত্যক্ষ ও ধারণার সমন্বিত রূপ, সংবেদন ও বুদ্ধি উভয়ের সমন্বয় ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব নয়। কান্টই সর্বপ্রথম জ্ঞানের সমস্যাটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন। তাই দর্শনের ইতিহাসে কান্ট বিচারবাদের প্রবর্তক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

জ্ঞানের দুটি দিক : উপাদান ও আকার : কান্ট তাঁর বিচারবাদের সহায়তায় অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেন যে,

প্রত্যেক বস্তুর মতো জ্ঞানেরও দুটি দিক আছে– উপাদান ও আকার। অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের উপাদান পাওয়া যায়, বুদ্ধি এই উপাদানের সাহায্যে জ্ঞানসৌধ গড়ে তোলে। অভিজ্ঞতা কেবল জ্ঞানের উপাদান সরবরাহ করে, আকার প্রদান করতে পারে না; আর বুদ্ধি কেবল জ্ঞানের আকার দিতে পারে, কিন্তু উপাদান সরবরাহ করতে পারে না। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংবেদনজাত বস্তুর যেমন প্রয়োজন, বুদ্ধিজাত ধারণারও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। কান্ট এমনিভাবে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদে অন্তর্নিহিত সত্য গ্রহণ করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। এই দুই মতবাদের সমন্বিত রূপই কান্টের বিচারবাদ নামে পরিচিত।

বস্তুর প্রকাশ ও অতীন্দ্রিয় রূপের পার্থক্য : কান্ট বস্তুর দুটি দিক নির্দেশ করেছেন– একটি বস্তুর প্রকাশ্য দিক (Phenomenal aspect), আর একটি হলো বস্তুর অতীন্দ্রিয় দিক (Noumenal aspect)। বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তাই সংবেদন (Manifolds of intuition) উৎপন্ন করে। এই সংবেদন বিশৃঙ্খল ও তাৎপর্যবিহীন। মনের সংশ্লেষণী শক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত হলেই সংবেদন জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়। মন এই সংবেদনকে দৈশিক ও কালিক পারম্পর্যে স্থাপন করে এবং দ্রব্য কার্যকারণতত্ত্ব প্রভৃতি বোধির আকার (Categories of understanding) প্রদান করে জগৎ, আত্মা ও খোদা– বুদ্ধির এই তিনটি নিয়ামক ধারণার প্রেক্ষিতে সংবেদন বা অভিজ্ঞতাকে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত করে। অর্থাৎ বহির্জগৎ থেকে প্রাপ্ত সংবেদন যখন দৈশিক ও কালিক (Spatial and temporal) আকার নিয়ে মনের দুয়ারে উপস্থিত হয় তখন মন তার ওপর বোধজাত কতগুলি আকার– দ্রব্য, কার্যকারণতত্ত্ব, একত্ব, বহুত্ব, সমগ্র ইত্যাদি আরোপ করে এবং তাদের সাহায্যে সংবেদন সুসংহত করে। ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বোধ ছাড়া মনের অন্য একটি বৃত্তি কান্ট স্বীকার করেছেন– বুদ্ধি। বুদ্ধি শুধু জগৎ, আত্মা, খোদার ধারণার দ্বারা জ্ঞানকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।

কান্টের মতে, অনুভূতির আকার, বোধের আকার ও বুদ্ধির ধারণা শুধু বস্তুর প্রকাশ্য দিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কাজেই বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা জ্ঞেয় এবং অতীন্দ্রিয় সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

সমালোচনা
Criticism

উৎকর্ষ : জ্ঞানের যথার্থ বিশ্লেষণ : কান্টের বিচারবাদের উৎকর্ষ এই যে, এ বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের অবসান ঘটিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার যুক্ত অবদানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেছে। একদিকে তিনি জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও সীমা নির্দেশ করেছেন, অন্যদিকে তিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা ও সার্বিকতা প্রতিপন্ন করেছেন।

কান্টের বিচারবাদের নিম্নলিখিত ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে :

দুই জগতের ব্যবধান কৃত্রিম : প্রথমত বিচারবাদ পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে তা কৃত্রিম। পরিদৃশ্যমান জগৎ অতীন্দ্রিয় জগতের বাহ্য প্রকাশ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশের মাধ্যমেই যে অতীন্দ্রিয় সত্তা নিজেকে ব্যক্ত করে দার্শনিক কান্ট তা উপলব্ধি করতে পারেন নি।

সংবেদন উৎপাদক অতীন্দ্রিয় সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় : দ্বিতীয়তকান্ট জগতের মূলে

অবস্থিত এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, অথচ তিনি বলেছেন যে, এই সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই অতীন্দ্রিয় সত্তা জানতে না পারলে তত্ত্বালোচনাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কান্ট বলেন যে, এই অতীন্দ্রিয় সত্তাই সংবেদন উৎপন্ন করে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্তা যদি না জানা যায় (যেমন কান্ট বলেছেন), তবে অতীন্দ্রিয় সত্তা যে সংবেদন উৎপন্ন করে তা কীভাবে জানা যায়?

কান্টের মত স্ববিরোধী : তৃতীয়ত কান্টের মতে, জ্ঞানের আকারসমূহ অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, আবার তিনি বলেন যে, অতীন্দ্রিয় সত্তাই সংবেদনের উৎস। অতীন্দ্রিয় সত্তাই হলো কারণ, সংবেদন হলো কার্য। এই কার্যকারণ সম্পর্কে জ্ঞানের একটি আকার। কান্ট নিজেরমতেব বিরুদ্ধে নিজের অলক্ষ্যে অতীন্দ্রিয় সত্তার ক্ষেত্রেই কার্যকারণতত্ত্ব আরোপ করেছেন। এক্ষেত্রে কান্টের মত স্ববিরোধী।

দ্বৈতবাদ : চতুর্থত কান্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় সত্তার মধ্যে এক দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞেয় এবং অতীন্দ্রিয় সত্তা অজ্ঞেয়। কিন্তু প্রকাশ্য সত্তার মধ্য দিয়ে যে অতীন্দ্রিয় সত্তা (পরমসত্তা) প্রকাশমান, দার্শনিক কান্ট সে কথা উপলব্ধি করেন না বা করার চেষ্টা করেন নি। এর ফলে কান্টের মতবাদ অজ্ঞেয়তাবাদে পরিণত হয়েছে– একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিশ্চিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তাত্ত্বিক আলোচনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হেগেলের সমন্বয় : কিন্তু হেগেল তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরমসত্তাকে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা বলে মনে করেন, যে সত্তা মনোজগৎ ও জড়জগতের মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করছে ও নিজেকে উপলব্ধি করছে। সুতরাং বস্তু ও মন, প্রকাশ্য অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই– উভয়ই পরম ধীশক্তির প্রকাশ।

স্বজ্ঞাবাদ

Intuitionism

স্বজ্ঞাবাদ পরমসত্তার অবগতির ক্ষেত্রে বুদ্ধির ব্যর্থতা ঘোষণা করে : স্বজ্ঞাবাদ অনুসারে জীবন্ত ও গতিময় পরমসত্তাকে জানার পক্ষে বুদ্ধি উপযুক্ত নয়। বুদ্ধি মনের আকার ও মৌলিক ধারণার সাহায্যে অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎকে অনুভব করে। বুদ্ধির আলোকে পরমসত্তার যে ধারণা লাভ করা যায় তাতে পরমসত্তা নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়। স্বজ্ঞাবাদীদের মতে, পরমসত্তা হলো গতিময় ও পরিবর্তনশীল, চিরন্তন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সত্তা অগ্রসর হচ্ছে, গতিময়তা ও পরিবর্তনশীলতা পরমসত্তার বৈশিষ্ট্য। বার্গসঁ পরমসত্তাকে প্রাণপ্রবাহ (Elan Vita) বলে অবিহিত করেছেন। ব্রাডলির কাছে পরমসত্তা হলো পরম অভিজ্ঞতা (Absolute experience)। তাঁর মতে, বুদ্ধির দ্বারা পরম অভিজ্ঞতাকে জানা যায় না, বুদ্ধির চেয়ে উচ্চতর শক্তি স্বজ্ঞাই পরমসত্তার জ্ঞান দিতে পারে। স্বজ্ঞা হলো বিচার-বুদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে সাক্ষাৎভাবে কোনো সত্তা উপলব্ধির উপায়।

বার্গসঁর মতে স্বজ্ঞা বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি : দার্শনিক বার্গসঁর মতে, বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। বুদ্ধি সত্তার জ্ঞান দিতে গিয়ে সত্তার বিকৃত রূপই ফুটিয়ে তোলে। কারণ বুদ্ধি তার সুনির্দিষ্ট আকার ও ধারণা ব্যতিরেকে কোনো সত্তাই জানতে পারে না। বুদ্ধির ফ্রেমের ভিতর পতিত হয়ে চলমান, গতিময় সত্তা অসাড়, স্থবির সত্তায় পর্যবসিত হয়। কাজেই বার্গসঁর মতে, পরম তত্ত্ব (যা তাঁর মতে প্রাণপ্রবাহ) অনন্ত গতিময় শক্তি

একমাত্র স্বজ্ঞার মাধ্যমেই আমরা এই পরম তত্ত্ব, প্রাণপ্রবাহের সাথে একাত্ম হতে পারি। স্বজ্ঞার স্বরূপ সম্পর্কে বার্গসঁ বলেন, "স্বজ্ঞা হলো সেই বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতি, যার সাহায্যে কেউ কোনো বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করে এই উদ্দেশ্যে যে, বস্তুর মধ্যে যা কিছু অসাধারণ ও অনির্বচনীয় তার সাথে একাত্মতা লাভ করবে।"[৩] সুতরাং তিনি স্বজ্ঞাকে অনেকটা অনুভূতির পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। অনুভূতির মাধ্যমে আমরা যেমন অন্যের অন্তরে প্রবেশ করি বুদ্ধিসঞ্জাত সহানুভূতির মাধ্যমে আমরা তেমনি বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করতে পারি।

তার মতে বুদ্ধি বিশ্লেষণধর্মী । বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বস্তুকে জানতে গেলে বস্তুটির প্রকাশ্য রূপটিকে অবলোকন করা যায়। বুদ্ধি বিশ্লেষণধর্মী; বুদ্ধি কোনো বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে তাকে বোঝার চেষ্টা করে। বুদ্ধির এই বৈশিষ্ট্যই পরমসত্তার অখণ্ড রূপের মধ্যে প্রবেশের অন্তরায়। পরম তত্ত্ব এক অখণ্ড প্রবাহ, কাজেই বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি তাকে উপলব্ধি করতে পারে না।

বুদ্ধিসঞ্জাত জ্ঞান সম্পর্কসাপেক্ষ : বুদ্ধি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় সে জ্ঞান বিভিন্ন সম্বন্ধের ভিত্তিতে পাওয়া যায়। একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য একটি বস্তুর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমেই বুদ্ধিসঞ্জাত জ্ঞান লাভ করা যায়। বুদ্ধিসঞ্জাত জ্ঞান সম্পর্কসাপেক্ষ। এই ধরনের জ্ঞান বস্তুর একটি দিক নির্বাচন করে সেই দিক থেকে বস্তুটিতে প্রত্যক্ষ করে। কাজেই বস্তুর সমগ্র চেহারা বুদ্ধির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

বুদ্ধি বস্তুর পূর্ণাঙ্গ ও চলমান রূপ প্রকাশে অসমর্থ : এটি ছাড়া, বুদ্ধি সাধারণ ধারণার সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু সাধারণ ধারণা বস্তুর সাধারণ ও অনিবার্য গুণের সমষ্টি, কাজেই অমূর্ত ও আংশিক। বস্তুর পূর্ণাঙ্গ রূপটি বুদ্ধির ক্যামেরায় ধরা পড়ে না; সাধারণ ধারণা বস্তুর সাধারণ রূপটি উদ্ঘাটিত করতে পারে, পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। অধিকন্তু সাধারণ ধারণার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু জগৎ ও জীবন চলমান, চিরচঞ্চল। সুতরাং বুদ্ধির নিশ্চল আকার ও ধারণার সাহায্যে নিরন্তন পরিবর্তনশীল পরমসত্তাকে জানা যায় না।

স্বজ্ঞা বস্তুর অন্তর-সত্তার পরিচয় দেয় : স্বজ্ঞাবাদীদের মতে, স্বজ্ঞা বুদ্ধির ত্রুটির অধীন নয়। বিচার-বিশ্লেষণের পথ পরিত্যাগ করে স্বজ্ঞা সরাসরি সত্তার অন্তরে প্রবেশ লাভ করে এবং সত্তার সাথে একাত্মতা অনুভব করে। স্বজ্ঞা সত্তা বা বস্তুর বাহ্য রূপের পরিচয় না দিয়ে তার অন্তরস্বরূপের পরিচয় প্রদান করে।

সমালোচনা
Criticism

স্বজ্ঞার বিরুদ্ধে সাধারণত নিম্নলিখিত আপত্তিসমূহ উত্থাপিত হয়ে থাকে।

প্রথমত, স্বজ্ঞা ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার। এ সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না। দর্শনে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির কোনো ব্যাপার নেই। দার্শনিক সত্য সার্বজনীন স্বীকৃতির স্পর্ধা রাখে।

দ্বিতীয়ত, স্বজ্ঞাবাদ স্বীকার করলে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিরোধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের পদ্ধতি বিচার-বিশ্লেষণের, স্বজ্ঞাবাদ বিচার-বিশ্লেষণকে মোটেই আমল দেয় না। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই, একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল।

---

[৩] By Intuition is meant the king of intellectual sympathy by which one places oneself within an object in order to coincide with what is unique in it and cosequently inexperssible. – Bergson

তৃতীয়ত, জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে বাদ দেওয়া চলে না, বুদ্ধি যে স্বজ্ঞার তুলনায় শ্রেষ্ঠ তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় এই কারণে যে, স্বজ্ঞাবাদী বার্গসঁ নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

স্বজ্ঞার ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ : স্বজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি থাকলেও দর্শনে স্বজ্ঞার গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। কেননা জীবনজগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যায় স্বজ্ঞারও একটি স্থান রয়েছে। বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার সম্বন্ধ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কোনো কোনো দার্শনিক স্বজ্ঞাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে, স্বজ্ঞা সত্যকে প্রকাশ না করে সত্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু আধুনিককালের কতিপয় দার্শনিক স্বীকার করেন যে, বুদ্ধিস্তরের ঊর্ধ্বে এক প্রকার উচ্চতর চেতনা আছে, এই চেতনা পরমসত্তাকে অতীন্দ্রিয় সত্যকে উপলব্ধি করে। এই উচ্চতর চেতনাকে তাঁরা স্বজ্ঞা বলেছেন। তাঁদের মতে, বুদ্ধি পরমসত্তার যে বিশ্লেষণ করে তা মূল্যবান। বুদ্ধির কাজ পরমসত্তার বিশ্লেষণ, স্বজ্ঞার কাজ পরমসত্তার উপলব্ধি।

"আমরা যদি এই অবস্থা স্বীকার করি তবে দর্শন মরমিবাদে পর্যবসিত হয়, সে কারণে কোনো দিক দিয়েই হীন হয় না। আমরা যদি দর্শনের এই সর্বোচ্চ অগ্রগতিকে উপলব্ধি করতে পারি, তবে দর্শন ও মরমিবাদের কোনো বিরোধই থাকে না। সুতরাং দার্শনিক চেতনা, যা পরমসত্তার উপলব্ধিতে পর্যবসিত হয় তা চিরন্তনের বুদ্ধিগত পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করে না বরং বুদ্ধির পরিপূর্ণতার সীমা অতিক্রম করে।"[১] ড. ম্যাকট্যাগার্ট যথার্থই বলেছেন, "যে মরমিবাদ বোধের দাবিকে অস্বীকার করে সে মরমিবাদ নিঃসন্দেহে নির্মূল হবে। কেউ এ পর্যন্ত যুক্তিবিদ্যাকে নস্যাৎ করতে অগ্রসর হয় নি, কেননা সেক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যাই তাকে নস্যাৎ করত। এক ধরনের মরমিবাদ আছে যা বোধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরম্ভ হয় এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি ততটুকুই পরিত্যাগ করে যতটুকু এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরম ও চরম নয় এবং তখন নিজের বাইরে কিছু স্বীকার করে। নিম্নস্তর অতিক্রম করার অর্থ তাকে উপেক্ষা করা নয়।"[২]

বিবর্তনমূলক অভিজ্ঞতাবাদ

Evolutional Empiricism

বিবর্তনমূলক অভিজ্ঞতাবাদে অভিজ্ঞতাপূর্ব একদা ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ : কান্ট বুদ্ধিজাত আকার ও অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান– জ্ঞানের এই দুই উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছিলেন, আকারগত বুদ্ধিবাদের মধ্যে উভয়ের বিরোধ মিটিয়ে জ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। বিবর্তনবাদী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার অন্য পন্থায় উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি কান্টের পথ পরিত্যাগ করে বিবর্তনের সাহায্যে অভিজ্ঞতাবাদের রূপান্তর সাধন করেছিলেন। তাঁর মতে, আকার ও উপাদান উভয়ই মূলত অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জ্ঞানের অপরিহার্য আকার আমাদের মধ্যে

---

[১] H. M. Bhattacharya, *Principles of Philosophy*. P-48

[২] A Mysticism which ignored the claims of the understanding would no doubt be doomed. None ever went to break logic, but in the end logic broke him. But there is a Mysticism which starts from the standpoint of the understanding and only departs from it is so far as that standpoint shows itsef not to be ultimate, but to postulate something beyond itself. To transcend the lower is not to ignore it. – Mac Taggrt

সহজাত ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। জ্ঞানের আকার বা বুদ্ধিজাত ধারণা বলে আমরা যা ধরে নিয়েছি সেগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার জারক রসে পরিশ্রুত হতে হতে বংশানুক্রমিক সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, আমরা সেগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি। অর্থাৎ জ্ঞানের যে আকারগুলি আজ আমাদের কাছে অভিজ্ঞতাপূর্ব, একদিন তা ছিল অভিজ্ঞতানির্ভর।

হার্বার্ট স্পেন্সার : অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয় : হার্বার্ট স্পেন্সার কান্টের সাথে একমত যে, জ্ঞানের পরিকল্পনায় কতগুলি সার্বিক ও অনিবার্য ধারণা রয়েছে; এগুলি আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই নি, পেয়েছি বুদ্ধিজাত ধারণা হিসেবে। তিনি লক ও হিউমের সঙ্গেও একমত যে, বিশেষ ঘটনাবলির সামন্যীকরণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা থেকে মূলত এই ধারণাগুলি আগত। এই ধারণাসমূহ আমাদের পূর্বপুরুষরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করেছেন। আমরা এগুলি সহজাত ধারণা হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি। এইভাবে হার্বার্ট স্পেন্সার অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রয়াস পেয়েছেন।

স্পেন্সারের মতে জ্ঞান পরিবেশের সাথে সমন্বয়ের উপায় : স্পেন্সার জ্ঞানকে জীবনের বিবর্তন বলে মনে করেন। তাঁর মতে, জ্ঞান জীবকে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে সাহায্য করে, জ্ঞানের জটিল রূপ জীবনের জটিল অবস্থার সাথে সাফল্যজনকভাবে মোকাবেলায় সাহায্য করে। জ্ঞান জীবনের অধীন, জীবন জড় ও গতি থেকে উদ্ভূত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, হার্বার্ট জড়বাদের সমর্থক।

সমালোচনা

Criticism

অভিজ্ঞতাবাদের ত্রুটিসমূহ : স্পেন্সারের বিবর্তনমূলক অভিজ্ঞতাবাদ আসলে অভিজ্ঞতাবাদের একটি বিশেষ রূপ। এই মতবাদ জ্ঞানের বিবর্তনের এক ধরনের ব্যাখ্যা। এটি জ্ঞানের সমস্যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না। এই মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদের ত্রুটিসমূহের অধীন।

জ্ঞানের অভিজ্ঞতাপূর্ব উপকরণের অভাব : অভিজ্ঞতা আমাদের জ্ঞানের সার্বিক ও অনিবার্য শর্ত মিটাতে অসমর্থ। অভিজ্ঞতা আমাদের সামান্য ও অনিবার্য জ্ঞান দিতে পারে না। জ্ঞানের এই দুটি বৈশিষ্ট্য আসে বুদ্ধি থেকে। অভিজ্ঞতা প্রদান করে জ্ঞানের উপাদান, বুদ্ধি দেয় জ্ঞানের আকারে। এই দুটি মিলে গড়ে ওঠে জ্ঞানের সৌধ। আমাদের অভিজ্ঞতার মতো আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতাও জ্ঞানের অভিজ্ঞতাপূর্ব ভিত্তি খুঁজেছিল।

বংশগতির সংক্রমণ সম্পর্কে মতদ্বৈধতা : বিবর্তনমূলক অভিজ্ঞতাবাদ বংশগতির মাধ্যমে অর্জিত গুণের যে সংক্রমণের কথা বলেছে তা সকল বিবর্তনবাদী মানেন নি। এই মতের সমর্থকরা বলেন যে, অর্জিত গুণাবলি যদি বংশ পরম্পরায় কিংবা পিতা থেকে পুত্রে সঞ্চারিত হতো তবে পণ্ডিতের সন্তান বিনা প্রচেষ্টায় পণ্ডিত বনে যেত, সেজন্য পুত্রকে কোনো প্রচেষ্টার কারণ হতে হতো না।

নিম্নতর নীতি থেকে উচ্চতর নীতির জন্ম হয় না । এটি ছাড়া, একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয় যে, জীবন থেকে জীবনের উন্নততর নীতিচৈতন্যের উদ্ভব ঘটেছে। জ্ঞানজীবনের নীতিচৈতন্যের উদ্ভব ঘটেছে। জ্ঞান জীবনের অধীন নয়, জীবন থেকে উদ্ভূত। জীবন জড় ও গতি থেকে উদ্ভূত বলে স্বীকার করা চলে না, কেননা জীবন জড় থেকে উন্নততর নীতি। সুতরাং হার্বার্ট স্পেন্সারের বিবর্তনমূলক অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞানোৎপত্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয়।

পঞ্চম অধ্যায়
জ্ঞানের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু
NATURE AND OBJECT OF KNOWLEDGE

"Whatever is real is rational and whatever is rational is real" – **Hegel**

- ❑ আভাস
- ❑ বস্তুবাদের স্বরূপ
- ❑ ভাববাদের স্বরূপ
- ❑ বস্তুবাদ ও ভাববাদের সম্পর্ক
- ❑ বস্তুবাদের প্রকারভেদ
- ❑ ভাববাদের প্রকারভেদ
- ❑ কতিপয় সমসাময়িক মতবাদ

আভাস
Introduction

বস্তুবাদ ও ভাববাদ : জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কের আলোচনাই জ্ঞান। জ্ঞানের পরিকল্পনায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু উভয়ই যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যিনি জানেন তাকে বলা হয় জ্ঞাতা, আর যা জানা হয় তাকে বলে জ্ঞেয় বস্তু। এই দুইয়ের একটির অভাব ঘটলে জ্ঞান হতে পারে না। জ্ঞাতা ছাড়া যেমন জ্ঞানের অস্তিত্ব নেই তেমনি জ্ঞেয় বস্তু ছাড়াও জ্ঞান হতে পারে না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র স্বরূপ এবং সম্পর্ক আনতে না পারলে জ্ঞানের স্বরূপ জানা যায় না। সুতরাং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র স্বরূপ এবং জ্ঞেয়র সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক নিরূপণ জ্ঞানবিদ্যার অন্যতম প্রধান কাজ। জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। যথা– বস্তুবাদ (Realism) এবং ভাববাদ (Idealism)। বস্তুবাদ মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে, অপরপক্ষে ভাববাদ মনসাপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করে।

মানুষের চিন্তার ইতিহাস ভাববাদ ও বস্তুবাদের বিরোধের ইতিহাস : মানুষের চিন্তার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে বস্তুবাদ মানুষের আদিম ও স্বাভাবিক প্রবণতা। বস্তুবাদ ভাববাদের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছে। মননিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই মানুষের চিন্তার যাত্রা আরম্ভ হয়। প্রাচীন গ্রিক দর্শনের প্রাথমিক পর্যায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এই সত্যই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। চিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তরে উন্নীত হতে থাকে, ধীরে ধীরে জীব-জগতের গভীর প্রশ্নাবলি মানুষের মনে উদিত হয়। চিন্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখতে পায় যে, জ্ঞানের ওপর জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল। দর্শনের ইতিহাস প্রধানত বস্তুবাদ ও ভাববাদের বিরোধের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এবার আমরা বস্তুবাদ ও ভাববাদের প্রকৃতি, সম্বন্ধ ও তাদের শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

বস্তুবাদের স্বরূপ

Nature of Reaslism

বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুর মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। বস্তু জ্ঞাতার ওপর নির্ভরশীল নয়। বস্তুর একটা স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। আমরা যখন কোনো বস্তুকে জানি তখন তা আমাদের জ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, জানার মাধ্যমে আমরা কোনো বস্তু সৃষ্টি করি না। বস্তু আমাদের অবগতির পূর্বেও অস্তিত্বশীল। মানুষের পদচারণার পূর্বেও চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ নভোচারীরা যেভাবে দেখেছিলেন সেভাবেই ছিল। কলম্বাসর আবিষ্কারের পূর্বেও আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের পূর্বেও পরমাণুর অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। বস্তুর মননিরপেক্ষ সত্তা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয় এতই দৃঢ় যে, মনের বাইরে বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি না। সকল বস্তুবাদী এ বিষয়ে একমত যে, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর, মেঘ, তারকা জড়পদার্থ, বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ, বস্তুর বিভিন্ন গুণাবলি মননিরপেক্ষ– এদের অস্তিত্ব জ্ঞাতার ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ বস্তুসত্তা জ্ঞানরিপেক্ষ। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমেই বস্তুর স্বরূপ ও গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। বস্তুর গুণাবলির অবগতি সম্পর্কে সকল বস্তুবাদী একমত না হলেও বস্তুসত্তার মননিরপেক্ষতা সম্পর্কে বস্তুবাদীরা একমত। দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজান্ডার বলেন, "আমার অভিজ্ঞতা ঘোষণা করে যে জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব এমন যে, তা জ্ঞানরিপেক্ষ না হয়ে পারে না।"[১]

বস্তুবাদ প্রধানত দুটি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞেয় বস্তুর মননিরপেক্ষতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। **প্রথমত**, জ্ঞানের অস্তিত্ব জ্ঞাতার সাথে বস্তুর সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই দুই স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই জ্ঞানের কাজ। বস্তু ছাড়া জ্ঞান সম্ভব নয়, সুতরাং জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব বর্তমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বস্তু জ্ঞানের সৃষ্টি নয়, জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা।

দ্বিতীয়ত, বস্তুর সাথে জ্ঞানের যে সম্পর্ক তা বাহ্য– আন্তরিক নয়। জ্ঞান ও বস্তু অস্তিত্বের জন্য একে-অপরের ওপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই তাদের সম্পর্ক বাহ্য। জ্ঞানের সাথে জ্ঞেয় বস্তুর বাহ্য সম্পর্ক নির্দেশ করে সে জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা আছে।

ভাববাদের স্বরূপ

Nature of Idealism

ভাববাদ অনুসারে জ্ঞানাতিরিক্ত কোনো বস্তুর সত্তা নেই। জ্ঞেয় বস্তু মনের ওপর নির্ভরশীল। মন বা চৈতন্য জগতের মূল উৎস, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর মূলনীতি। এই চৈতন্যই জগতের সকল বস্তু, জীব ও মনকে নিয়ন্ত্রিত করছে, নবতর বিকাশের পথে টানছে। ভাববাদীর মতে, বাহ্য বস্তুর মননিরপেক্ষ কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। কোনো বস্তুকে জানার পরই আমরা সেই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করি। ইংরেজ কবি গ্রের অতল সিন্ধুতলে লুক্কায়িত অগণিত মণি-মাণিক্য ও গহন বিজন বনে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির কোনো মূল্য নেই ভাববাদী দার্শনিকদের কাছে, কেননা সে সর্বজ্ঞানবহির্ভূত

---

[১] My experience declares the existence of the object as something non-mental– Samuel Alexander

বিষয়সমূহ আমার কাছে অস্তিত্বহীন। সুতরাং জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাননির্ভর মনসাপেক্ষ। দার্শনিক বার্কলি সত্যই বলেন যে বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। (Esse est percipii)

ভাববাদী দার্শনিকরা বস্তুর জ্ঞাননির্ভরতা বা মনসাপেক্ষতার সপক্ষে কতগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেন :

প্রথমত, ভাববাদ অনুসারে একমাত্র জ্ঞানের মাধ্যমেই বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ বা খণ্ডন করা যায়। জ্ঞাননিরপেক্ষ কিংবা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বস্তুর অধিবাস কল্পনায় পাওয়া গেলেও বাস্তবে পাওয়া যায় না। সুতরাং জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু প্রমাণাতীত।

দ্বিতীয়ত, বস্তুর অধ্যাস (Illusion) প্রমাণ করে যে, বস্তু জ্ঞাননির্ভর সত্তা, জ্ঞাননিরপেক্ষ নয়। অধ্যাস হলো ভুল প্রত্যক্ষণ– এক ব্যক্তির স্থানে অন্য এক ব্যক্তিকে দেখা কিংবা একটি বস্তুর স্থানে অন্য একটি বস্তুকে দেখার নাম অধ্যাস। বন্ধুর চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত ব্যক্তিকে বন্ধু বলে ভুল করা বৃক্ষের অবনমিত শাখাকে ভূত মনে করা অধ্যাসের উদাহরণ। এ ছাড়া অমূল প্রত্যক্ষণের (Hallucination) ক্ষেত্রে ধারণা প্রমূর্ত হয়ে ব্যক্তির রূপ পরিগ্রহ করে প্রত্যক্ষণ সংঘটিত হয়। অমূল প্রত্যক্ষণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার না হলেও মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধারণার যে বিস্ময়কর শক্তি আছে অমূল প্রত্যক্ষণ তাই প্রমাণ করে। ভাববাদী দার্শনিকদের মতে, অধ্যাস ও অমূল প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে দৃষ্ট বস্তু ও স্বাভাবিক অবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং ধারণার ওপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল, এহেন অবস্থায় মননিরপেক্ষ– জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব ভ্রমপ্রসূত।

তৃতীয়ত, মন যে অর্থে সত্তা সে অর্থে সত্তা নয়। দেকার্ত বলেন যে বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা গেলেও মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। (Cogito ergo sum) আমি চিন্তা করি, কাজেই আমি অস্তিত্বশীল। মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয় বলে মনকে চরম সত্তা বলা যায়। সুতরাং জ্ঞেয় বস্তু যে জ্ঞাননির্ভর মনসাপেক্ষ বস্তু এ কথা বলাই বাহুল্য।

বস্তুবাদ ও ভাববাদের সম্পর্ক

Relation between Realism and Idealism

বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুর মননিরপেক্ষ সত্তা আছে : বস্তুবাদ ও ভাববাদ দর্শনের মতোই পুরাতন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই দুটি মতবাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। বস্তুবাদের বক্তব্য এই যে, বস্তুর একটা মননিরপেক্ষ জ্ঞানাতিরিক্ত অস্তিত্ব আছে। গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি অস্তিত্ব মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। মনের বাইরেই এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান অর্থাৎ জগতের বস্তুসমূহের অস্তিত্ব মন বা চৈতন্যনির্ভর নয়; জ্ঞান বহির্জগতের বস্তুর বা বস্তুসমূহের গুণের অবিকল প্রতিলিপি। বস্তুবাদীরা বলেন যে, আমরা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করি বলেই বাহ্য জগতের জ্ঞান পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। সুতরাং জগতের বস্তুগত ধারণা মননিরপেক্ষ জগতের ওপর নির্ভরশীল।

ভাববাদ অনুসারে বস্তুর মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই, পক্ষান্তরে ভাববাদ মননিরপেক্ষ কোনো বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ভাববাদীদের মতে, জ্ঞাতা ছাড়া জ্ঞেয় বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই। বস্তু মনের ওপর নির্ভর করে কাজেই মনের বাইরে কোনো বস্তুর

অস্তিত্ব নেই। জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, জ্ঞাতা বাহ্য বস্তুর প্রতিলিপি নয়। বাহ্য জগতের অস্তিত্ব আ-,দের চেতনার ওপর নির্ভরশীল।

বস্তুবাদ ও ভাববাদের দ্বন্দ্ব : জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি কি-না এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্য দীর্ঘকালের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। বস্তুবাদী দার্শনিকদের প্রধান কাজ মননিরপেক্ষ জগতের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করা, আর ভাববাদী দার্শনিকদের উদ্দেশ্য মননিরপেক্ষ জগতের স্বতন্ত্র অস্বীকার করা। এ প্রসঙ্গে হকিং বলেন যে, "প্রত্যেক বস্তুর পরিপূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য বস্তুবাদীরা জগতের ব্যক্তিনিরপেক্ষ অথবা মন বিবর্জিতকরণের জন্য আগ্রহশীল যাতে এ ভাববাদ অপেক্ষা অধিকতর বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক হয়।"[১] অর্থাৎ জগতের স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠিত করাই বস্তুবাদের মূল উদ্দেশ্য।

বস্তুবাদ ও ভাববাদ পরস্পর যুক্ত : আবার ভাববাদীরা প্রচার করেন যে, জগতের প্রত্যক্ষ মননিরপেক্ষ সত্তা অলীক; কেননা জগৎ মনের ওপর নির্ভরশীল। বস্তুবাদের ব্যাখ্যা সাধারণ লোকের কাছে বোধগম্য। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে জগৎ যেভাবে প্রতিভাত হয় বস্তুবাদ সেই মতেরই প্রবক্তা।

বস্তুগত ভাববাদ বস্তুবাদ ও ভাববাদের আপাত বিরোধের সমন্বয় সাধন করে, তবে বস্তুবাদ ও ভাববাদকে পরস্পরবিরোধী মতবাদ বলা যায় না। কেননা বস্তুবাদ ভাববাদের দিকে প্রবাহিত লৌকিক/সরল বস্তুবাদ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে, আর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ পর্যবসিত হয় ভাববাদে। লৌকিক/সরল বস্তুবাদের মতে, জগতের প্রত্যেকটি বস্তু মননিরপেক্ষ সত্তা। জ্ঞান বস্তুর প্রতিলিপি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মতে, বস্তু সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। বস্তুকে সরাসরি জানা যায় না। আমরা বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণের (Primary and Secondary qualities) সাহায্যে বস্তুর সাথে পরিচিত হই। আয়তন, আকৃতি, সংখ্যা ও ঘনত্ব বস্তুর মুখ্য গুণ। বস্তু থেকে এই গুণগুলিকে পৃথক করা যায় না। চতুষ্কোণী আয়তক্ষেত্রকে আমরা ত্রিভুজ বলে মনে করি না। কিন্তু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, উষ্ণ, শীতল প্রভৃতি গুণ ব্যক্তির মনের ওপর নির্ভরশীল। ভাববাদ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ও প্রতীকবাদের (Representative Realism) মতবাদ খণ্ডন করে এক নতুন মতবাদ প্রচার করে। এই মতবাদ অনুসারে, গৌণ গুণের মতো মুখ্য গুণও প্রত্যক্ষকারীর মনের ওপর নির্ভরশীল। চৈতন্য বা মন থেকে পৃথক করে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। হেগেলের পূর্ববর্তী দার্শনিকরা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মাধ্যমে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সুসঙ্গত সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন যে, পরমসত্তা এক পরম ধীশক্তি, যিনি আপনাকে প্রকৃতি ও মনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন। আত্মসচেতন ও মূর্তশক্তি হিসেবে সসীম বস্তু ও মনের সমগ্র জগৎ উদ্ভাবন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং সব কিছুর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছেন। পরমসত্তার আত্মবিকাশ ও আত্মসচেতনতার জন্য বস্তু ও মনের উদ্ভব। কাজেই বস্তুজগৎ জড়াত্মক নয়, মনের বিপরীত নয়, বরং পরম মানবসত্তারই এক বিশেষ মূর্ত প্রকাশ। একই শক্তি জড়, জীব ও চৈতন্যের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

---

[১] In the interest of allowing every object to full distinctive flavour realism is inclined into personalise of dementalise the world, to see thing starkly and factually in a spirit which it conceives to be at once objective and more scientific than of Idealism. -- Hocking

যে পরমসত্তা সমগ্র জগতের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছেন, সেই শক্তি মানসিক বস্তু ও মনের মধ্য দিয়ে সেই শক্তি বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করছেন। কাজেই বস্তু ও মন পরস্পরবিরোধী নয়– একই পরমসত্তার দ্বিবিধ অভিব্যক্তি; বস্তুজগৎ ও মানবজগতের মধ্য দিয়ে পরমসত্তা ক্রমশ ব্যাপক অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বস্তুজগতে পরমসত্তার প্রকাশ আংশিক, জীবজগতে এই শক্তির প্রকাশ ব্যাপক মানস জগতে এর প্রকাশ সর্বাধিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বস্তুগত ভাববাদ একাধারে বস্তুজগতের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, অন্যদিকে জগতের সব কিছুই যে এক পরম মানস সত্তা থেকে উদ্ভূত তাও প্রতিপন্ন করে। জগতের সব কিছু এক উৎস থেকে উদ্ভূত। বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে যে বহু যুগসঞ্চিত বিরোধ চলে আসছিল বস্তুগত ভাববাদ তার অবসান ঘটিয়ে দর্শনের ইতিহাসে এক নবদিগন্তের সূচনা করে।

বস্তুবাদের প্রকারভেদ

Different kinds of Realism

বস্তুবাদের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বস্তুবাদ প্রধানত চার প্রকার। যথা– ক. লৌকিক বা সরল বস্তুবাদ (Native or Popular Realism), খ. বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (Scientific Realism), গ. নব্যবস্তুবাদ (Neo-Realism) ও ঘ. বিচারমূলক বস্তুবাদ (Critical realism)। এবার এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

ক. লৌকিক বা সরল বস্তুবাদ (Native or Popular Realism) : লৌকিক বস্তুবাদ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে । লৌকিক বস্তুবাদ প্রাচীনতম মতবাদ। সরল, সহজ, সাধারণ মানুষের মতের সঙ্গে মিল থাকায় এ শ্রেণীর বস্তুবাদকে লৌকিক বস্তুবাদ বলা হয়ে থাকে। এই মতবাদ অনুসারে মনের বাইরে বাহ্য জগতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগৎ যেভাবে প্রতিভাত হয় জগৎ ঠিক তাই। জগতে নিরন্তর যে পরিবর্তন চলছে সে পরিবর্তনও সত্য। আমাদের মনের ধারণা বাহ্য জগতের অবিকল প্রতিলিপি। কাজেই প্রত্যক্ষণের সময় আমরা বস্তু ও বস্তুর গুণ উভয়ই জেনে থাকি। কারণ বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বের মতোই বস্তুর গুণাবলিও অস্তিত্বশীল। সুতরাং লৌকিক বস্তুবাদ অনুসারে প্রত্যক্ষণের সময় আমরা বস্তুর যথার্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হই।

লৌকিক বস্তুবাদ সরল : উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, লৌকিক বস্তুবাদ জ্ঞানের সমস্যাকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করে। এই মতবাদের সমর্থনকারীরা (ও সাধারণ লোক) দার্শনিকদের জ্ঞানালোচনাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে করে। লৌকিক মতবাদ অত্যন্ত সরল মতবাদ। সাধারণ্যে নিন্দিত এই মতবাদ গ্রহণ করতে পারলে জীবনজগতের কোনো ভাবনাই আমাদের ভাবতে হতো না।

সমালোচনা

Criticism

লৌকিক বস্তুবাদ বিচারের ধোপে টেকে না।

প্রথমত, এই মতবাদ জ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যদি আমরা এই মতবাদ গ্রহণ করি তবে অধ্যাস, আমূল প্রত্যক্ষণ ও স্বপ্নের মধ্যে দৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আমরা জানি অধ্যাসের ক্ষেত্রে বস্তুর বিকৃত রূপ আমাদের

চোখে পড়ে, রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়; আমূল প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তু ছাড়াই প্রত্যক্ষণ হয়- ধারণা উপযুক্ত পরিবেশে কায়া ধারণ করে; স্বপ্নের মধ্যে অভিজ্ঞতা, চিন্তা, অনুভূতির প্রভৃতির জটিল সংমিশ্রিত রূপের অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে ধারণাকে বাহ্য বস্তুর প্রতিলিপি বলা চলে না। আসল ব্যাপার হলো অধ্যাস, আমূল প্রত্যক্ষণ এবং স্বপ্নের ক্ষেত্রে ধারণাই প্রত্যক্ষীভূত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, লৌকিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা অবৈজ্ঞানিক : লৌকিক বস্তুবাদ বস্তুর সমস্ত গুণকেই বস্তুগত বলে মনে করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দেখা যায় যে, বস্তুর সমুদয় গুণ বস্তুতে নয়। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণ ব্যক্তির মনের ওপর নির্ভরশীল। একই বস্তু কোনো ব্যক্তির কাছে সুন্দর আবার কোনো ব্যক্তির কাছে অসুন্দর। অধিকন্তু একটি বস্তু একটি ব্যক্তির কাছে কোনো সময়ে সুন্দর, কোনো সময়ে অসুন্দর মনে হতে পারে। কাজেই কোনো বস্তুর সৌন্দর্য বা রূপ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

খ. বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (Scientific Realism) : বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণ : বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ লৌকিক বস্তুবাদের ত্রুটি নির্দেশ করে। লৌকিক বস্তুবাদের ত্রুটি নিরসনের জন্য জন লক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রবর্তন করেন। তিনি বস্তুর গুণাবলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন- **মুখ্য গুণ** (Primary qualities) এবং **গৌণ গুণ** (Secondary qualites)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বস্তুর এমন শক্তি আছে যা আমাদের মনে ধারণা উৎপন্ন করতে পারে। বস্তুর এই শক্তিকে তিনি গুণাবলি (qualities) বলে অভিহিত করেন। যে সমস্ত গুণ জড়বস্তুকে জড়বস্তু হিসেবে প্রতিভাত করে, অন্যান্য বস্তু থেকে জড়বস্তুকে পৃথক করে, এই সকল গুণকে বলা হয় মুখ্য গুণ। বস্তুর আয়তন, আকৃতি, সংখ্যা, ঘনত্ব, গতি প্রভৃতি বিভিন্ন লোকের কাছে একইভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। এই বস্তুগত গুণের নাম মুখ্য গুণ। ব্যক্তিভেদে এই গুণগুলির পরিবর্তনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

গৌণ গুণ ব্যক্তির অনুভূতিনির্ভর, পক্ষান্তরে, রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, উষ্ণ, শীতল প্রভৃতি গুণ ব্যক্তিগত। এই গুণগুলিকে গৌণগুণ বলা হয়। এইগুলি ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে- অনাবশ্যিক (Not essential) ও পরিবর্তনশীল। এই গৌণ গুণসমূহ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয় কিংবা একই গুণ বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যা একজনের কাছে সুন্দর তা হয়তো অন্যের কাছে অসুন্দর। যার চক্ষু নেই তার বর্ণ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়, আবার যার কর্ণ নেই তার পক্ষে ধ্বনি জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কাজেই গৌণ গুণগুলি ব্যক্তির অনুভূতিনির্ভর, বিষয়গত নয়। লকের মতে, মুখ্য গুণগুলি বস্তুর মধ্যে যেভাবে থাকে আমরা সেইগুলিকে সেভাবেই প্রত্যক্ষ করে থাকি, আর গৌণ গুণগুলিকে আমরা যেভাবে জানি সেইভাবে বস্তুতে অবস্থান করে। এ সম্পর্কে মুখ্য ও গৌণ গুণের প্রভেদ সম্পর্কীয় লকের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, "আমাদের মনের বাইরে বহির্জগৎ আলোকিত বা অন্ধকারময়, নিস্তব্ধ বা শব্দায়মান, উষ্ণ বা শীতল নয় বরং বিস্তৃত ও দুর্ভেদ্য।"[৭]

---

[৭] The external world outside of our minds is neither light non dark, neither silent nor resonant, neither hot nor cold, but extended and impenetrable– Locke.

লকের মতে, কোনো বস্তুকে আমরা সরাসরি জানতে পারি না। ইন্দ্রিয় পথে বস্তুর যে প্রতিকৃতি মনের ওপর প্রতিফলিত হয় তাই আমরা জানি, তাকেই আমরা বস্তুর প্রতীক বলে মনে করি। কাজেই বাহ্য বস্তু সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা বস্তুর প্রতীকের মাধ্যমে। কোনো বস্তুকে সরাসরি জানা যায় না। এই মতবাদ অনুসারে বস্তুর প্রতীককে আমরা সরাসরি জানতে পারি বা জেনে থাকি। এই মতবাদের আর এক নাম প্রতীকবাদ (Representationism)। যখন প্রতীকের সঙ্গে বস্তুর সামঞ্জস্য হয় তখন সত্য জ্ঞান পাওয়া যায়, আর যখন প্রতীকের সঙ্গে বস্তুর কোনো মিল থাকে না তখন সেই জ্ঞান হয় মিথ্যা।

সমালোচনা
Criticism

প্রথমত, বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণ উভয়ই ব্যক্তিনির্ভর : লকের মতে, মুখ্যগুণগুলি বস্তুগত কিন্তু গৌণ গুণগুলি ব্যক্তিগত– এই মতের বিরুদ্ধে ভাববাদী বার্কলি বলেন যে, যদি গৌণ গুণগুলিকেও ব্যক্তিগত বলে গ্রহণ করা হয়, তবে মুখ্য গুণগুলিকেও ব্যক্তিগত বলে গ্রহণ করতে হবে। কেননা ইন্দ্রিয়ের ওপর বাহ্য বস্তুর ক্রিয়ার ফলে মুখ্য ও গৌণ গুণসমূহের ধারণা মনে উৎপন্ন হয়। শ্রবণ ছাড়া যেমন শব্দের কোনো ধারণা জন্মে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বস্তুর মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত, লকের সূত্র বার্কলির ভাববাদে পর্যবসিত : লকের মতে, বস্তু সরাসরি জানা যায় না; আমরা বস্তুকে জানি বস্তুর প্রতীকের মাধ্যমে– ধারণা হলো বস্তুর প্রতীক। এই সূত্র ধরে বার্কলি প্রমাণ করেন যে, যা আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারি তা হলো আমাদের মনের ধারণা– বস্তু নয়। কাজেই মননিরপেক্ষ বস্তু নেই, একমাত্র ধারণাই সত্য।

তৃতীয়ত, জ্ঞানের যথার্থ প্রমাণ করা যায় না : ধারণার সঙ্গে বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই জ্ঞান সত্য হয়, আর এর বিপরীত হলে জ্ঞান মিথ্যা হয় বলে লক যে মতবাদ প্রচার করেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে, বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয়– বস্তুকে জানা যায় বস্তুর গুণাবলির মাধ্যমে। এইরূপ অবস্থায় মনের ধারণার সঙ্গে বস্তুর সঙ্গতির ব্যাপার প্রমাণের অযোগ্য।

গ. নব্যবস্তুবাদ (Neo Realism) : আত্মগত ও বস্তুগত ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উদ্ভূত হয় নব্যবস্তুবাদ। এই মতবাদ মনকে মূল সত্তা বলে স্বীকার করে না– বস্তুর মননিরপেক্ষ সত্তার সপক্ষে ওকালতি করে।

মন সরাসরি বাহ্যবস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে : নব্যবস্তুবাদ অনুসারে, মন সরাসরি বাহ্যবস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, কোনো ধারণার সাহায্য আবশ্যক হয় না। ধারণা বস্তুর অবিকল প্রতিলিপি নয়। মনের বাইরে অবস্থিত স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বস্তু সরাসরি জ্ঞাত হওয়া যায়। নব্যবস্তুবাদকে প্রত্যক্ষ বস্তুবাদও (Direct Realism) বলা চলে। আমেরিকান দার্শনিক হল্ট, মারভিন, মন্টেগু, পেরি, পিটকিন ও স্পল্ডিং এই মতবাদের ভাষ্যকার। এই মতবাদ মূলত লৌকিক বস্তুবাদের পুনাবর্তন, লৌকিক বস্তুবাদের আধুনিক ব্যাখ্যা। নব্যবস্তুবাদে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

প্রথমত, মন অন্যান্য বস্তুর মত স্বতন্ত্র সত্তা : নব্যবস্তুবাদ জ্ঞাননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করে, জ্ঞানের পরিকল্পনায় বস্তুর মন নির্ভরতার ব্যাপার স্বীকার করে না।

বিশ্বজগতে অন্যান্য বস্তুর মতো মনও একটি স্বতন্ত্র সত্তা। নব্যবস্তুবাদীদের মতে, জানা বা না জানার ব্যাপারটি বস্তুর সত্তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বস্তুকে জানি– সৃষ্টি করি না।

দ্বিতীয়ত, বস্তুর মতো গুণসমূহ বস্তুগত : নব্যবস্তুবাদ অনুসারে মন প্রতীকের সাহায্য ছাড়াই বাহ্য বস্তুকে সরাসরি জেনে থাকে। এই মতের অনুসারীরা দেকার্ত ও লকের প্রতীকবাদ পরিবর্জন করে সরল বস্তুবাদই সমর্থন করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে, মুখ্য, গৌণ ও তৃতীয় শ্রেণীর গুণাবলি (Primary, Secondary and Tertiary qualities) বস্তুরও বস্তুনিষ্ঠ, কোনো গুণই মনের ব্যক্তিগত ধারণা নয়। কাজেই লৌকিক বস্তুবাদের মতো নব্যবস্তুবাদও আয়তন, ঘনত্ব, গতি, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, উষ্ণতা শৈত্য, সুন্দর কুৎসিত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর গুণাবলিকেই বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ বলে মনে করে।

তৃতীয়ত, জ্ঞান ও বস্তুর সম্পর্ক বাহ্য : বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। মনের প্রত্যক্ষণের ওপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না, বস্তুসমূহ সসীম ও অসীম সকল মনের উর্ধ্বে অবস্থিত। নব্যবস্তুবাদ ভাবগত ও আত্মগত ভাববাদ পরিবর্জন করে– এই মতবাদ অনুযায়ী জ্ঞান বস্তুর অস্তিত্বকে প্রভাবিত করতে পারে না। বস্তু ও জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক বাহ্য।

চতুর্থত, বস্তু ও মননিরপেক্ষ সত্তা : নব্যবস্তুবাদ বস্তু ও মনের দ্বৈতবাদ অস্বীকার করে। এই মতবাদ অনুসারে বস্তু ও মন উভয়ই নিরপেক্ষ সত্তা (neutral entities) যা অন্যান্য বস্তুর তুলনায় পার্থিব সত্তা (Physical entities) এবং স্নায়ুতন্ত্রের তুলনায় ধারণা। এই মতবাদকে নিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদও (Natural Monism) বলা হয়ে থাকে।

পঞ্চমত, অবাস্তব বস্তু : নব্যবস্তুবাদীদের মতে, অধ্যাস আমূল প্রত্যক্ষণ স্বপ্ন ইত্যাদি মননিরপেক্ষ 'অবাস্তব বস্তু' (Unreal objects) এইগুলি অসত্য হলেও তাদের বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

ষষ্ঠত, জগৎ বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ে গঠিত : নব্যবস্তুবাদীদের মতে, এই জগৎ বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ে গঠিত এক সুসংহত ঐক্য নয়, জগতের বিভিন্ন বস্তু সত্য। জগতের বিভিন্ন বস্তু বহুত্বের পরিপোষক, ঐক্যের নয়। জগতের বিভিন্ন বস্তু পরমসত্তার বিকাশ নয়। জগতের বিভিন্ন বস্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বস্তুসমূহ বাহ্য, তাদের সম্পর্কও বিষয়নিষ্ঠ ও বাস্তব। বস্তুর সম্পর্ক ভাবগত নয়, দেশ, কাল, কার্যকারণতত্ত্ব প্রভৃতি বাস্তব।

সপ্তমত, সার্বিক নিয়ম ও আদর্শসমূহ বস্তুগত : গাণিতিক সম্পর্ক, যুক্তির নিয়মাবলি, নৈতিক আদর্শসমূহ এবং সৌন্দর্যবিষয়ক নীতিসমূহ বাস্তব ও বস্তুগত। এ সবের অস্তিত্ব দৈশিক ও কালিক (Spatio-temporal) নয়।

অষ্টমত, বস্তুবাদ বিশ্লেষণধর্মী : নব্যবস্তুবাদ বুদ্ধিবিষয়ক ও বিশ্লেষণধর্মী (Intellectual and analytical)। নব্যবস্তুবাদীদের মতে, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে জগতের সব কিছুই জানা যায়। বুদ্ধির সাহায্যে বিচার ও বিশ্লেষণ, বিজ্ঞান দর্শন উভয়েরই উপযোগী পদ্ধতি। এই মতের অনুসারী দার্শনিকরা দর্শনের অঙ্গনে স্বজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। বুদ্ধি দর্শনের একমাত্র পদ্ধতি বলে তাঁরা মনে করেন।

সমালোচনা
Criticism

প্রথমত, নিরপেক্ষ পদার্থের ধারণা অস্পষ্ট : নব্যবস্তুবাদের 'নিরপেক্ষ পদার্থের' স্বরূপ বোধগম্য নয়। নব্যবস্তুবাদীদের বাচনভঙ্গি থেকে মনে হয় জড় মনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত

করতে না পেরে তাঁরা নিরপেক্ষ পদার্থের অবতারণা করেছেন। এই 'নিরপেক্ষ পদার্থ' একবার পার্থিব আবার মানসিক কি করে হতে পারে বুঝে ওঠা মুশকিল।

দ্বিতীয়ত, নব্যবস্তুবাদ জ্ঞানের ব্যাখ্যা অপারগ : নব্যবস্তুবাদীদের প্রত্যক্ষণ মতবাদ জ্ঞান সমস্যাকে অত্যন্ত সহজ ও সরল করে। বস্তুর চেতনা মাত্রাকে প্রত্যক্ষণ বলা যায় না বস্তুর চেতনা বা সংবেদনের ব্যাখ্যাই হলো প্রত্যক্ষণ। শুধু সংবেদনকে জ্ঞান বলা যায় না, সংবেদন যখন মনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় তখনই তা জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়। বস্তুবাদীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের এই অবদানের বিষয় উপেক্ষা করে থাকেন।

তৃতীয়ত, নব্যবস্তুবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না : নব্যবস্তুবাদীরা ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। স্বপ্ন, অধ্যাস ও আমূল প্রত্যক্ষণের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। এসব মানসিক ও ব্যক্তিগত। কারণ এসব ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

চতুর্থত, মনের ওপর সার্বিক নিয়ম নির্ভরশীল : সার্বিক নিয়ম বস্তুজগতের নিয়মাবলির মধ্যে প্রমূর্ত হতে পারে না কিংবা চিন্তাশীল মনের বাইরে শাশ্বত জগতেরও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে না। মনই শুধু সার্বিক নিয়মের বিষয় চিন্তা করতে পারে। অনন্ত জগতে সার্বিক নিয়মের অধিবাস কথাটি প্লেটোর ধারণার জগতের মতোই কাল্পনিক।

পঞ্চমত, সার্বিক নিয়ম, পরমমূল্য প্রভৃতি মনের সক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত। সক্রিয় মন ছাড়া এইগুলির কোনো মূল্য থাকতে পারে না।

ষষ্ঠত, সম্পর্ক দ্বিবিধ বাহ্য ও আন্তর : সমুদয় সম্পর্ক বাহ্য হতে পারে না। কতিপয় সম্পর্ক আন্তর (Internal) জড়, দেশ, কাল এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। এরা এক সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত এবং জড়জগতের ধারণার উৎস। আন্তর সম্পর্কের মধ্যে আবার বাহ্য সম্পর্ক বর্তমান। জড়, সকল জড়বস্তুর সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ ঐক্য, তেমনি জড়বস্তুর মধ্যে একটা বাহ্য সম্পর্কও রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমার কলম ও হাতের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হলো বাহ্য।

সপ্তমত, সম্পর্ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অস্তিত্ব প্রমাণ করে : সম্পর্ক বুদ্ধিদীপ্ত। আমরা জগৎকে বুঝতে পারি এই বোধ প্রমাণ করে যে, আমাদের বুদ্ধি পরম বুদ্ধির প্রকাশ। জগৎ ও জগতের বিভিন্ন রূপ সম্পর্ক অনুধাবনের ব্যাপার জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধির অবদান স্বীকার করে নেয়।

ঘ. বিচারমূলক বস্তুবাদ (Critical Realism) : বস্তুকে ধারণার মাধ্যমে জানা যায় : নব্যবস্তুবাদের অসুবিধাসমূহ দূরীকরণার্থে সান্তায়ানা (Santayana), স্ট্রং রোজার্স লভজয়, সেলার্স, প্রাট, ড্রেক প্রমুখ দার্শনিক বিচারমূলক বস্তুবাদের প্রবর্তক। প্যাট্রিক এই মতবাদকে নব্যবিচারমূলক বস্তুবাদ বলে অভিহিত করেন। এই মতবাদ অনুসারে জগৎ বস্তু ধারণার সমবায়ে গঠিত। আমরা ধারণাকেই সরাসরি জানতে পারি, বস্তুকে ধারণার মাধ্যমে পরিজ্ঞাত হই। বস্তুর জ্ঞান ধারণা থেকে অনুমিত হয়। বস্তু থেকে ধারণা আংশিকভাবে স্বতন্ত্র।

বিচারমূলক বস্তুবাদের মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ :

বিচারমূলক বস্তুবাদের বক্তব্য : "(১) জগৎ জড়বস্তু ও মানসিক অবস্থাসমূহের বা ধারণার সমবায়ে গঠিত। (২) একমাত্র ধারণাকেই সাক্ষাৎভাবে জানা যায়। আর

জড়বস্তুকে পরোক্ষভাবে জানা যায় ধারণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হিসেবে। (৩) অনুমিত জড়বস্তু সব সময়ে সংখ্যা ও অস্তিত্বের দিক দি.য়ে প্রত্যক্ষীভূত বস্তু বা ধারণা থেকে শ্রেণীগত বা প্রকৃতিগতভাবে অন্ততপক্ষে আংশিক পৃথক।"[১]

প্রথমত, বিচারমূলক বস্তুবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয়োপাত্তের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জড়বস্তুকে জানা যায়। জড়বস্তু থেকে যে সংবেদন বা উপাত্ত আসে তাই হলো আমাদের বস্তুজ্ঞানের ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, বিচারমূলক বস্তুবাদীদের মতে, নব্যবস্তুবাদীরা অধ্যাস, আমূল, প্রত্যক্ষণ ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন না।

তৃতীয়ত, বৈশিষ্ট্য : বিচারমূলক বস্তুবাদীরা মন থেকে স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, কিন্তু জ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করতে পারেন না। পক্ষান্তরে নব্যবস্তুবাদীরা জ্ঞানের সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে। তাঁদের মতে, মন সোজাসুজি বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়।

চতুর্থত, বিচারমূলক বস্তুবাদীদের মতে, বস্তুর গুণাবলি আংশিকভাবে বস্তুগত ও আংশিকভাবে ব্যক্তিগত।

পঞ্চমত, জ্ঞানের অঙ্গ ও বিচারমূলক বস্তুবাদ : মনের উপস্থাপিত ইন্দ্রিয়োপাত্তকে (Sense-data/Sensa) বলা হয় স্বভাব মিশ্র। স্বভাব মিশ্র বস্তুর স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে। এ প্রত্যক্ষকারী মন ও জড়বস্তুর মধ্যস্থতাকারী ইন্দ্রিয়োপাত্ত থেকে স্বতন্ত্র। বাহ্য বস্তু অভিজ্ঞতার মধ্যে উপস্থিত থাকে না, থাকে ইন্দ্রিয়োপাত্ত। মানুষের জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ : (১) প্রত্যক্ষকারী মন, (২) বহির্জগতের বস্তু এবং (৩) 'ইন্দ্রিয়োপাত্ত', স্বভাব মিশ্র বা আন্তর সত্তা (Sense data, character complexes of essences)। এইগুলি স্বভাব মিশ্র বা আন্তর সত্তা জড় কিংবা চেতন নয়– এইগুলি যৌক্তিক (Logical entities) মন সরাসরি স্বভাব মিশ্র বা আন্তর সত্তাকে জেনে থাকে এবং এ থেকে বস্তুর কল্পনা করে। এই মতানুসারে বস্তু ও জ্ঞাতা পৃথক।

সমালোচনা
Criticism

প্রথমত, বিচারমূলক বস্তুবাদীরা জ্ঞান সমস্যার জটিলতা স্বীকার করেন, নব্যবস্তুবাদীদের মতো জ্ঞানের সমস্যাকে সহজ বা সরল মনে করেন না। দেকার্ত ও লকের প্রত্যক্ষ সম্পর্কীয় মতবাদের সঙ্গে এই মতবাদের সাদৃশ্য আছে।

দ্বিতীয়ত, বিচারমূলক বস্তুবাদের ত্রুটিসমূহ : বস্তু ও প্রত্যক্ষকারী মনের মধ্যে দোদুল্যমান ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বভাব মিশ্র আন্তর সত্তা রহস্যাবৃত্ত। বিচারমূলক বস্তুবাদীদের আন্তর সত্তা বা যৌক্তিক সত্তা নব্যবস্তুবাদীদের নিরপেক্ষ সত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন বিচারমূলক বস্তুবাদী ইন্দ্রিয়োপাত্ত আন্তর সত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করে থাকেন।

---

[১] (1) The world is composed of material things and mental states or ideas. (2) The ideas alone are immediately known, while the material things are only known being infereed as the direct or indirect causes of the ideas. (3) The infereed material objects are always numerically or existentially nonidentical with the immediately presented object of ideas from which they are infereed and they are atleast partially different in Kind or nature from the latter. – *Twentieth Century Philosophy p. 441-42*

চতুর্থত, আন্তর সত্তা ও সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয় নি। এই আন্তর সত্তা কান্টের অতীন্দ্রিয় সত্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই মতের অনুসারী বস্তুবাদীদের মতে বস্তুকে সরাসরি জানা যায় না, আন্তর সত্তা বা ইন্দ্রিয়োপাত্তের মাধ্যমে জানা যায়।

পঞ্চমত, বিচারমূলক বস্তুবাদীরা নিজেদের অলক্ষ্যে ভাববাদীদের মত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকারী মনের ভূমিকা স্বীকার করে থাকেন।

ভাববাদের প্রকারভেদ

Different Types of Idealism

ভাববাদের শ্রেণীবিন্যাস : পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, ভাববাদীদের মতে বস্তুজগতের অস্তিত্ব মননির্ভর। বস্তুজগৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত থেকে গেলে কোনো না কোনো মনের অন্তর্ভুক্ত হবে– মনের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া জ্ঞান সম্ভব নয়। ভাববাদের মূল সুর ঠিক থাকলেও সক্রেটিস-প্লেটো থেকে আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্যন্ত ভাববাদের বিভিন্ন রূপের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। ভাববাদের প্রধান রূপগুলি এই : (ক) প্লেটোর ভাববাদ (Platonic Idealism), (খ) বার্কলির আত্মগত ভাববাদ (Subjective Idealism of Barkeuy), (গ) লিবনিজের ভাববাদ (Idealism of Liebnitz), (ঘ) কান্টের অবভাসিক ভাববাদ (Phenomenalistic Idealism of Kant), (ঙ) ফিকটের পরব্রহ্মবাদ (Absolute Idealism of Fichte), (চ) শেলিং-এর অতিবর্তী ভাববাদ (Transcendental Idealism of Schelling), (ছ) হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ (Objective Idealism of Hegel), (জ) পুরুষবাদ (Personalism), (ঝ) সোপেন হাওয়ারের ঐচ্ছিক ভাববাদ (Voluntaristic Idealism of Schopenhaur)। নিম্নে মতবাদসমূহের বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হলো।

(ক) প্লেটোর ভাববাদ (Platonic Idealism)

বিশেষ ক্ষণস্থায়ী সামান্য চিরন্তন : প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্লেটো ভাববাদের আদি প্রবর্তক। তাঁর মতে, বিশেষ বস্তু ও বিশেষ ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল। এই জগতের সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই সব চিরন্তন ও শাশ্বত নয়। কিন্তু ভাবজগৎ (The world of ideas) চিরন্তন, এই জগৎ ভাবজগতেরই প্রতিবিম্ব। ব্যক্তি ও বস্তু বিশেষের পরিবর্তন হলেও সামান্য ধারণার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। রাম, রহিম, পল প্রভৃতি ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলেও মনুষ্য জাতি অবিনশ্বর। পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম ইতিহাসকার ফ্রাঙ্ক থিলি, প্লেটোর ধারণাবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য কনে, যে বিশেষ বস্তু আমরা দর্শন করি তা চিরন্তন নমুনার অপূর্ণ প্রতিলিপি বা প্রতিফলন, বিশেষ পরিবর্তনের অধীন, কিন্তু ধারণা বা আকার অপরিবর্তনীয়। ব্যক্তি মানুষ গতায়াতের অধীন, কিন্তু মনুষ্য জাতি চিরন্তন।'[১] এই জাতি বা সামান্যই একমাত্র চিরন্তন সত্য। এই সামান্যকে প্লেটো ধারণা (Idea) বা আকার (form) বলে অভিহিত করেছেন। সামান্য বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত ধারণা, আর ব্যক্তি বা বস্তু হলো বিশেষ। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বিশেষকে জানি, আর বুদ্ধির মাধ্যমে জানি জাতি বা শ্রেণীকে। ব্যক্তি পরিবর্তনের অধীন, জাতি পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে। কাজেই জাতি বা সামান্য ধারণাই একমাত্র সত্য।

---

[১] The particular objects which we perceive are imperfect copies or reflections of the eternal patterns. Particulars may come and go, but the idea or form goes on for ever. Men may come and men may go, but the man type is eternal. – Fank Thilly, *A History of Philosophy*, P. 80

বিশেষকে নিয়ে যেমন ইন্দ্রিয়ের জগৎ, সামান্যকে নিয়ে তেমনি ভাবের জগৎ। প্লেটো ভাবের জগৎকে চিরন্তন বলেছেন। এই জগৎ পরিবর্তনহীন, অবিনশ্বর। ইন্দ্রিয়ের জগৎ মিথ্যা, কারণ পরিবর্তনশীল। এই জগৎ ভাব-জগতের প্রতিবিম্ব-ছায়া। শ্রেণী ছায়া, ব্যক্তি কায়া। এই প্রসঙ্গে প্যাট্রিকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য : ইন্দ্রিয়ের জগতের বড় জোর গৌণ অস্তিত্ব আছে যতটুকু এই জগৎ শাশ্বত ভাবজগতের অস্পষ্ট ছায়া। ধারণার জগৎ জ্ঞানলব্ধ, ইন্দ্রিয়ের জগৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞাত। ধারণার জগৎ নিরন্তর পরিবর্তনের অধীন এবং কোনো সময়েই অস্তিত্বশীল নয়।"[২]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তে প্লেটোর ভাববাদ : প্যাট্রিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বিজ্ঞানের একটি সরল দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্লেটোর ভাববাদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী মহামতি নিউটন একটি আপেল ফলকে গাছ থেকে পড়তে দেখলেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের (চক্ষুর) দ্বারা আপেল পতন দর্শন করলেন, কিন্তু তিনি প্রজ্ঞার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। এই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব যন্ত্রবিদ্যার বিপরীত বর্গতত্ত্ব (The law of inverse square) নামে পরিবিদিত। এই বিপরীত বর্গতত্ত্ব মনের বোধগম্য, অপরিবর্তিত ও চিরন্তন তত্ত্বরূপে গাণিতিক 'আকারে' যে প্রকাশ করা যায় তা এইরূপ ২+২=৪। পতনশীল আপেল ফল যেমন চিরন্তন ও শাশ্বত বোধগম্য তত্ত্বের বিষয় অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, সেইরূপ সমগ্র বিশ্ব শাশ্বত ও চিরন্তন ভাবের জগতের অনুলিপি বিশেষ। এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে, চিরন্তন ও শাশ্বত ঘটনা দেশ ও কালের কুক্ষিগত নয়। কারণ দেশ ও কালের ঘটনাগুলি অবিরাম আবির্ভূত হয়, পরে অতীতের স্মৃতির মধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হয়। ভাবের জগৎ পরিবর্তনশীল জগতের চিরন্তন, অপরিবর্তিত ও শাশ্বত আকার (forms) বিশেষ।

সমালোচনা
Criticism

প্লেটোর ভাববাদ আমাদের মনে এক রোমাঞ্চকর ভাব জাগিয়ে তোলে। ইন্দ্রিয়ের জগৎ ও ভাবজগতের মধ্যে প্লেটো যে ব্যবধান রচনা করেছেন তা আমাদেরকে ভাবজগতের অভাবনীয় দৃশ্যাবলির কল্পনায় মোহাবিষ্ট করে। ভাবজগতের অনুভূতি আমাদের মনে পুলক শিহরণ জাগায়, এক অনির্বচনীয় আনন্দরসে আমাদের হৃদয় ভরে যায়। কিন্তু যুক্তির বিচারে প্লেটোর ভাববাদ ত্রুটিপূর্ণ।

প্রথমত, ব্যক্তি ও জাতির সম্পর্ক অস্পষ্ট : প্লেটোর ভাববাদে ব্যক্তি ও জাতির সম্পর্ক যথাযথ ব্যাখ্যায়িত হয় নি। সেখানে ব্যক্তি ধূলিবিমলিন মাটির মানুষ, জাতি সনাতন ভাবজগতের অধিবাসী, যেন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে কোনো আন্তর সম্পর্ক নেই। কিন্তু ব্যক্তি ও জাতির নিবিড় সম্পর্ক ব্যতিরেকে যে দুইয়ের কোনোটাই বোধগম্য নয়, এটাই প্লেটো বুঝতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত, এ জগত ও ভাবজগতের সম্পর্ক অস্পষ্ট : প্লেটোর মতে, ইন্দ্রিয় জগত ভাবজগতের ছায়া মাত্র। কিন্তু ছায়ার সাথে বস্তুর সম্পর্ক কি তা বুঝে উঠা কষ্টকর।

---

[২] The world of sense has only a derivative being at best in so far as it adumbrates the real world of ideas. The Ideas are known by reason or intelligence of man, whereas the world of matter appears to man through his senses. The Ideas are unchanging, they always are, whereas the world of sense is in a constant flux and never in fact is. -- Patric : *Introduction to Philosophy,* P. 231.

তিনি ভাবের জগৎকে এতদূরে সরিয়ে নিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়ের জগতে ভাবের জগতে কোনো ছায়াই পড়তে পারে না।

তৃতীয়ত, প্লেটোর ভাববাদে ঐক্যের অভাব : প্লেটোর ভাববাদে পরমসত্তার কোনো উল্লেখ নেই। বস্তুর মধ্যে ঐক্যবিধানের জন্য বস্তুগত ও ভাবজগতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য পরমসত্তার অস্তিত্ব কল্পনা অপরিহার্য। প্লেটোর পরম মঙ্গল ধারণা (The idea of good) সব কিছুর উর্ধ্বে সমাসীন রয়েছে, সবকিছুর মধ্যে অন্তর্লীন হতে পারে নি।

(খ) বার্কলির আত্মগত ভাববাদ (Subjective Idealism of Barkele)

মন ছাড়া বস্তুর অস্তিত্ব বোধগম্য নয় : বিশপ বার্কলি তাঁর যুগের অভিজ্ঞতাবাদ ও জড়বাদের প্রচারে মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি অভিজ্ঞতাবাদের অসঙ্গতি ও জড়বাদের ত্রুটি প্রদর্শনের জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি দেখালেন যে, জ্ঞাতা মন ছাড়া নিষ্ক্রিয় দ্রব্য হিসেবে জড়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। লকের অভিজ্ঞতাবাদের অসঙ্গতির সমালোচনা করে তিনি ভাববাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। লকের মতে, কোনো বস্তুকে আমরা সরাসরি জানতে পারি না, বস্তুর গুণাবলির মাধ্যমেই আমরা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিহিত হই।

বস্তুর দ্বিবিধ গুণ রয়েছে : মুখ্য ও গৌণ গুণ। মুখ্য গুণ বস্তুনির্ভর আর গৌণ গুণ ব্যক্তিনির্ভর। মুখ্য গুণ হলো আয়তন, আকৃতি, সংখ্যা, ঘনত্ব ইত্যাদি, আর গৌণ গুণ হলো রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি। মুখ্য গুণ বস্তুগত, আর গৌণ গুণ আত্মগত। বার্কলির আত্মগত ভাববাদের মূল কথা হলো জড়বস্তুর গুণাবলির সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নয়; মুখ্য ও গৌণ, জড়বস্তুর সকল গুণই মনের ধারণা। কাজেই বস্তু প্রত্যক্ষণনির্ভর (Esse est percipii – existence is perception)। লকের চিন্তার সূত্র ধরে বার্কলি দেখালেন যে, যদি অভিজ্ঞতার পথ ধরে সব জ্ঞান আসে তবে মনের ধারণা ছাড়া অন্য কিছুই জানা যায় না, কারণ যা প্রত্যক্ষীভূত হয় তা মনের ধারণা মাত্র। কাজেই মননিরপেক্ষ জড়বস্তুর ধারণা নির্বিচারবাদী ও অতিরঞ্জিত প্রকল্প। বহির্জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই, কাজেই জগতের মুখ্য ও গৌণ গুণাবলি মনের আত্মগত ধারণা মাত্র। আমাদের মনের বাইরে অবস্থিত জগৎ উষ্ণ কিংবা শীতল, উজ্জ্বল কিংবা অস্পষ্ট, সুস্বাদু কিংবা তিক্ত, সুগন্ধ কিংবা দুর্গন্ধযুক্ত নয়; এবং বিস্তৃত কিংবা দুর্ভেদ্য; গতিশীল কিংবা নিশ্চলও নয়। সুতরাং জগৎ ও জগতের মুখ্য ও গৌণ গুণাবলি আমাদের মনের ধারণা মাত্র। মনের ধারণা খোদা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেন। খোদা সুনির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সসীম মনের ধারণা করে থাকেন। বার্কলি সসীম মন, অসীম মন এবং মনের ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি জড়জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।"[১] এই কারণে বার্কলির ভাববাদ আত্মগত ভাববাদ (Subjective Ideaslism) নামে পরিচিত।

বার্কলির নিম্নলিখিত যুক্তির সাহায্যে গৌণ গুণগুলির মতো মুখ্য গুণগুলিও আত্মগত :

প্রথমত, মুখ্য গুণ ও মনের ধারণা : আয়তন, আকৃতি, সংখ্যা, ঘনত্ব ইত্যাদি মুখ্য গুণগুলির প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই এই গুণসমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক এই ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্য ছাড়া এই গুণসমূহ আমাদের

---

[১] Dr. J. N. Sinha : *Introduction to Philosophy*, P. 43

গোচরীভূত হতে পারে না। যা প্রত্যক্ষীভূত হয় তা আমাদের মনের ধারণা। কাজেই মুখ্য গুণগুলি আমাদের মনের ধারণা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, মুখ্য ও গৌণ গুণ অবিচ্ছেদ্য : মুখ্য ও গৌণ গুণসমূহ পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। আয়তন বা বিস্তৃতি ছাড়া বর্ণ, শব্দ, স্বাদ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা যায় না। আবার শৈত্য, উষ্ণতা, বর্ণ ইত্যাদি গৌণ গুণের সাহায্য ব্যতিরেকে বিস্তৃতি প্রত্যক্ষীভূত হতে পারে না।

তৃতীয়ত, মুখ্য গুণ অবস্থাভেদে ভিন্ন মনে হয় : গৌণ গুণসমূহের মতো মুখ্য গুণসমূহও ব্যক্তিভেদে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে কাছ থেকে দেখলে দীর্ঘ এবং দূর থেকে দেখলে খর্বকায় মনে হয়। কাজেই গৌণ গুণ যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়, মুখ্য গুণও তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। মুখ্য ও গৌণ সব গুণই ব্যক্তিনির্ভর। সুতরাং উভয় শ্রেণীর গুণই মনের ধারণা মাত্র।

অতঃপর বার্কলি জড়ের অস্তিত্ব খণ্ডন করেন। তিনি জড়ের অস্তিত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত যুক্তির অবতারণা করেন :

প্রথমত, জড় প্রত্যক্ষীভূত নয় : লক জড় বলতে বোঝেন মুখ্য গুণসমূহের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় আধার, মুখ্যগুণগুলি বাস্তব জড় গুণরাজির আধার। বার্কলি বলেন, অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর, প্রত্যক্ষীভূত হওয়া এবং অস্তিত্বসম্পন হওয়া একই কথা। লক বলেন যে, জড় প্রত্যক্ষীভূত হতে পারে না, এ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এ থেকে বার্কলি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যেহেতু জড় প্রত্যক্ষীভূত হতে পারে না, কাজেই জড়ের অস্তিত্ব নেই।

দ্বিতীয়ত, জড় ইন্দ্রিয় বা মন কোনো কিছুরই অন্তর্ভুক্ত নয় : জড় অস্তিত্বসম্পন্ন হলে তা হয় ইন্দ্রিয়সমূহ না হয় চিন্তার দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হবে। যদি তা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হয় তবে তা মনের ধারণা বৈ অন্য কিছু নয়, কেননা কেবল মনের ধারণাই প্রত্যক্ষণের আওতাভুক্ত। জড়কে মনের সাহায্যেও জ্ঞাত হওয়া যায় না, কেননা আমাদের সংবেদনের উৎস হিসেবে জড়ের অনুমান অপরিহার্য নয়, বরং বার্কলির মতে, খোদা বা অসীম মনই কতিপয় নির্ধারিত নিয়মে মানুষের মনে সংবেদন উৎপন্ন করেন। কাজেই জড়ের কোনো অস্তিত্ব নেই।

তৃতীয়ত, বস্তু ও বস্তুর সংবেদন অভিন্ন : সংবেদন থেকে পৃথকভাবে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হতে পারে না। বার্কলি বলেন, যে কোনো বস্তুর বাস্তব সংবেদন ছাড়া সেই বস্তুর দর্শন বা অনুভব অসম্ভব নয়, কাজেই চিন্তার মধ্যেও কোনো বস্তুর সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ ছাড়া তার বোধ জন্মাতে পারে না। মূলত বস্তুর সংবেদন অভিন্ন, একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা চলে না। সংবেদনের বাইরে কোনো বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হতে পারে না। কাজেই মনের বাইরে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব অনুভবযোগ্য নয়।

চতুর্থত, বস্তু ও বস্তুর ধারণা অভিন্ন : লকের মতে, ধারণা বস্তুর প্রতিলিপি। লককে অনুসরণ করে বার্কলি বলেন যে, যদি ধারণা বস্তুর অনুরূপ হয়, তবে বস্তুও অবশ্য ধারণা হবে। ধারণা, ধারণা বৈ অন্য কিছু নয়, বর্ণও বর্ণ বৈ অন্য কিছু নয়। যদি ধারণা ও বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকে, তবে তারা প্রকৃতিগতভাবে অভিন্ন বস্তু ধারণা ছাড়া অন্যকিছু নয়।

জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই : এইভাবে বার্কলি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তুর (Extramental matter) অস্তিত্ব বিচারবিযুক্তি ও অতিরঞ্জিত। বহির্জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই, জগতের সমস্ত মুখ্য ও গৌণ গুণসমূহ মনের ব্যক্তিগত অবস্থামাত্র। বার্কলির ভাববাদ তাই আত্মগত ভাববাদ নামে পরিবিদিত। জগতের সমুদয় বস্তু ও মন ব্যক্তির চেতনার ওপর নির্ভরশীল। এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তি নিজের মন ছাড়া অন্যান্য মন ও বিশ্বমনের কোনো ধারণা দিতে পারে না, প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুসত্তা লোপ পায়। ফলে জাগতিক ঐক্য ও যোগসূত্র বিনষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তিমনই তার জ্ঞেয় বস্তু নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণে অনেকে বলেন যে,"বার্কলির ভাববাদ আত্মকেন্দ্রিকতাবাদে (Solipsism) পর্যবসিত।"[১] (আমি এবং আমার ধারণারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, এই হলো আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ)।

পরবর্তী সংস্করণ বস্তুর সার্বিক মনের ধারণা : পরবর্তীকালে বার্কলি বিরুদ্ধ পক্ষের কতিপয় প্রশ্নের সম্মুখীন হন। বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর হলে অপ্রত্যক্ষীভূত বস্তুর অস্তিত্ব কীভাবে স্বীকার করা যায়? আর আমি যখন কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ করছি না তখন সেই বস্তুর অস্তিত্ব কীভাবে স্বীকার করা যায় সেখানে আমার প্রত্যক্ষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হচ্ছে? কেননা অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর (Esse est percipii)। বার্কলি তাঁর ভাববাদকে আত্মকেন্দ্রিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য ঘোষণা করলেন যে, অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর হলেও বস্তুর স্থায়িত্ব ও ঐক্যের নিশ্চয়তা দানের জন্য এবং জ্ঞান যাতে অন্য ব্যক্তিও পায় সেই জন্য প্রত্যক্ষণকে অবশ্যই সার্বিক মনের প্রত্যক্ষণ হতে হবে। কাজেই বস্তু হলো সার্বিক মনের ধারণা– প্রত্যক্ষণ হলো সার্বিক মনের বিষয়বস্তু অবলোকন করা (A looking into the contents of the divine mind)। এইভাবে বার্কলি খোদা বা সার্বিক মনের বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও জ্ঞানের নিশ্চয়তা দান করেন।

সমালোচনা
Criticism

বার্কলি আত্মগত ভাববাদ বস্তুবাদী ও ভাববাদী উভয় শ্রেণীর দার্শনিকদের আক্রমণের বিষয়বস্তুতে পর্যবসিত হয়েছে। জি. ই. ম্যুর বলেন, যে কোনো বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার জন্য অস্তিত্বসম্পন হয় না, বরং বস্তু অস্তিত্বসম্পন্ন বলে তার প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয়। অর্থাৎ বস্তু আছে বলেই তার প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয়। বস্তুর জ্ঞান বস্তুর অস্তিত্বকে প্রভাবিত করতে পারে না। বার্কলি জ্ঞান সমস্যাকে অত্যন্ত সরলভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। জনসন বার্কলির মতবাদকে অমনোবৈজ্ঞানিক বলেছেন। এই মতবাদের মধ্যে জ্ঞানের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নেই। তিনি বস্তু ও সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন না– উভয়কে অভিন্ন মনে করেছেন। সংবেদনকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করা না গেলেও উভয়কে অভিন্ন মনে করার পশ্চাতে কোনো যুক্তি নেই।

বস্তু ও বস্তুর জ্ঞানকে এক করে দেখা চলে না। জ্ঞানের বিভিন্নতা বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর অবস্থিতি আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বিভিন্নতা উৎপাদন করে। বিভিন্ন বর্ণ আছে বলেই আমাদের বিভিন্ন বর্ণের জ্ঞান হয়।

---

[১] My world of ideas constitutes the only reality; beyond that there is nothing. – Paulsen.

ধারণাই প্রত্যক্ষের বিষয় প্রমাণসাপেক্ষ : বার্কলির মতে, ধারণাই একমাত্র প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু তিনি এ স্বীকার করেছেন মাত্র, প্রমাণ করেন নি। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হলো সেই বস্তু যা আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যক্তি মনের ধারণা। কারণ ধারণাই একমাত্র প্রত্যক্ষের বিষয়।

বস্তুই ধারণা এ মত ভ্রান্ত : দার্শনিক আলেকজান্ডারের মতে কোনো কিছুকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হওয়ার জন্য মনের ওপর নির্ভর করতে হয় সত্য, কিন্তু তার অস্তিত্বের জন্য কারও ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। লকের আলোচনার সূত্র ধরে বার্কলি বলেন যে, বস্তুর ধারণা বস্তুর অনুরূপ, সেহেতু উভয়ই অভিন্ন। বস্তুই ধারণা কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত কেননা সাদৃশ্য অভিন্নতা প্রমাণ করতে পারে না। বার্কলির সমালোচনা করে ড. জনসন বলেন যে, বার্কলি প্রত্যক্ষণের যে বিশ্লেষণ করেছেন তা অস্পষ্ট। তিনি প্রত্যক্ষণের মানসিক রূপ ব্যক্তির মানসিক অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে সমর্থন হন নি।

আত্মগত ভাববাদ আত্মকেন্দ্রিকতাবাদে পর্যবসিত : বার্কলির আত্মগত ভাববাদ আত্মকেন্দ্রিকতাবাদে পর্যবসিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর তিনি সার্বিক মন বা খোদার ধারণার সাহায্যে তাঁর মতবাদকে অনেকটা দোষমুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর ভাববাদের বড় ত্রুটি এই যে, তিনি বিশেষের মাধ্যমে সার্বিকে উপনীত হওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ ও সার্বিকের মধ্যে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন নি। পরবর্তী মহামতি হেগেলই এই দুইয়ের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

(গ) লিবনিজের ভাববাদ (Idealism of Liebnitz)

লিবনিজের ভাববাদ চিৎপরানুবাদ (Monadism) নামেও পরিচিত। এই মতবাদ অনুসারে চিৎপরমাণু (Monad) থেকে বিশ্বজগৎ উদ্ভূত হয়েছে। এই পরমাণু চেতন ও ভাবাত্মক। জড় বিস্তৃতিসম্পন্ন। পরমাণু অপার্থিব আধ্যাত্মিক দ্রব্য। চেতন পরমাণু স্বভাবতই গতিশীল, কিন্তু চেতন পরমাণু সমানভাবে গতিশীল নয়। যে চেতন পরমাণুগুলির গতিশীলতা সর্বাপেক্ষা অল্প সেগুলিকে জড় বলে অভিহিত করা হয়। জড় চৈতন্যের এক রূপ বিশেষ। তবে এখানে চৈতন্য অত্যন্ত অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন পরমাণু সংখ্যায় অগণিত বলে জগতের মধ্যে নিরন্তন পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এই মতবাদ বহুত্ববাদী ভাববাদ (Pluralistic Idealism) নামে পরিচিত হয়ে থাকে। লিবনিজের মতে, প্রত্যেক চিৎপরমাণু গবাক্ষশূন্য (Windowless) স্বনির্ভর, আত্মকেন্দ্রিক ও সক্রিয়। কোনো পরমাণু অন্য পরমাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই স্বনির্ভর আত্মকেন্দ্রিক চিৎপরমাণুর মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু খোদা এই শৃঙ্খলা বিধান করেছেন।

সমালোচনা

Criticism

এই মতবাদের মধ্যে মারাত্মক অসঙ্গতি রয়েছে। খোদা নিজে চিৎপরমাণু হয়ে কীভাবে অন্যান্য চিৎপরমাণুর মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য; এই মতবাদ বহুত্ববাদের ত্রুটিগুলিরও অধীন।

(ঘ) কান্টের অবভাসিক ভাববাদ (Phenomenalistic Idealism of Kant)

জার্মান দার্শনিক কান্ট জ্ঞান সমস্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে দর্শনের ইতিহাসে বিপ্লব আনয়ন করেন। তিনি লকের নিষ্ক্রিয় মনের ধারণাকে খণ্ডন করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের সক্রিয় ভূমিকার কথা ঘোষণা করেন। সংবেদন ও বুদ্ধির সমন্বিত রূপকে জ্ঞান বলা হয়। কেবল সংবেদন জ্ঞান পদবাচ্য হতে পারে না, সংবেদন মনের দ্বারা ব্যাখ্যাত হলেই জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়ে থাকে। অতীন্দ্রিয় সত্তা আমাদের মনে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র সংবেদন উৎপন্ন করে, বুদ্ধি তার আকার ও মৌলিক নিয়মের প্রয়োগ করে এই বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র সংবেদনকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করে জ্ঞানে রূপায়িত করে।

কান্টের মতে, বুদ্ধির আকার ও মৌলিক নিয়মাবলি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অতীন্দ্রিয় সত্তার ক্ষেত্রে জ্ঞানের মৌলিক নিয়মসমূহ প্রযোজ্য নয়। কাজেই বিশ্বের উৎপত্তি, মানবাত্মা ও খোদার স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের কোনো জ্ঞান হতে পারে না, কেননা এইসব ক্ষেত্রে জ্ঞানের আকার ও নিয়মাবলি প্রযোজ্য নয়। এইগুলি ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত। জগতের পরিদৃশ্যমান দিক সম্পর্কেই আমরা জানতে পারি, এর মূলীভূত, অতীন্দ্রিয় সত্তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কান্টের জগৎ মন গঠিত অবভাসিক জগৎ। প্যাট্রিক বলেন, "জগতের উদ্ভব, আত্মা খোদা ও অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বগত জ্ঞান হতে পারে না, কেননা এইগুলি মানুষের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত। এই জগৎ পরিদৃশ্যমান, অবভাসিক জগৎ; এই জগৎ মনের আকার ও নিয়মাবলির মাধ্যমে দৃষ্ট– এক বিশেষ অর্থে মনগঠিত জগৎ।"[১] অবশ্য কান্ট স্বীকার করেছেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে একটা বিষয়গত সত্তা (Objective Reality) আছে এবং এই সত্তাই হলো সংবেদনের কারণ। এই হলো কান্টের অতীন্দ্রিয় সত্তা (Thing in it self/Din an Sich)। এই কারণে কান্ট বলেন যে, বোধ প্রকৃতিকে গঠন করে (Understanding maketh nature)। তিনি জ্ঞানের দ্বিবিধ উপকরণের নির্দেশ করেন, উপাদান এবং আকার (Matter and form) জ্ঞানের উপাদান আসে অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে, যে জগৎ আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই জগৎ আমাদের মননিরপেক্ষ; কিন্তু এ বিষয়গতভাবে সত্য। এই জগৎ আসলে কি তা জানতে না পারলেও আমরা এই পর্যন্ত জানি যে, অতীন্দ্রিয় জগৎ বর্তমান–অবভাসিক জগতের অন্তরালে পরমসত্তা বর্তমান, কিন্তু এই পরমসত্তার স্বরূপ জানতে পারি না, কেননা আমাদের জ্ঞানের আকার ও মৌলিক নিয়মাবলি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দেশ, কাল, দ্রব্য, কার্যকারণ ইত্যাদি মনের আকারের সাহায্যে মানুষের মন পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এইগুলি অতীন্দ্রিয় জগৎ বা পরম তত্ত্বের বেলায় কার্যকরী হয় না; অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাখ্যায় এই সব জ্ঞানের আকার ও নিয়মাবলি অক্ষম। এইগুলি পরমতত্ত্বের রহস্যভেদ করে তার স্বরূপ জানতে পারে না। কাজেই মন যে জগৎকে জানিয়ে থাকে সে জগৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদান ও বোধের আকারে সমন্বিত রূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে যেভাবে জেনে থাকে সেইরূপ। সুতরাং কান্টের ভাববাদেও এক নাম অবভাসিক ভাববাদ (Phenomenalistic Idealism/Phenomena/ism)। কান্টের এই মতবাদে দ্বৈতবাদ পরিস্ফুট।

---

[১] Thus we can have no theoretical knowledge concerning the origins of the world, of the soul, of God and the like, because these transcend all possible human experience. This world is but a world of appearance, a phenomenal world, a world seen through these forms and categories of mind, a mind made world in a sense.Patric : *Introduction to Philosophy* p. 320

সমালোচনা
Criticism

প্রথমত, জগতের প্রকাশমান দিক পরম তত্ত্বেরই দিক : আমাদের জ্ঞান শুধু অবভাসের মধ্যে সীমিত নয়, এ চরম তত্ত্বকে বা পরমসত্তাকেও নিজ সীমার অন্তর্ভুক্ত করে। পরিদৃশ্যমান জগতকে জানা যেমন মানুষের কাজ, এর অন্তরালবর্তী পরমসত্তাকে জানার আকিঞ্চনও তেমনি মানুষের কাজ। মানুষের মনে পরম সত্যকে জানার অদম্য স্পৃহা বর্তমান। দৃশ্যমান জগতের রহস্যাবরণ ভেদ করে মানুষ পরম সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করতে চায়। আর পরম সত্য এই অবভাসিক জগৎ থেকে পৃথক কোনো সত্তা নয়– জগতের প্রকাশমান দিক বাস্তব তত্ত্বেরই একটি দিক।

দ্বিতীয়ত, অবভাসের মধ্যে বাস্তব তত্ত্ব আভাসিত : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় অবভাসিক ও অপ্রকাশ্য জগতের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগৎ একই বাস্তব তত্ত্বের দুটি দিক। কাজেই বাস্তব তত্ত্বের অবভাস বাস্তবতত্ত্ব থেকে পৃথক নয়, অবভাসের মাধ্যমেই বাস্তব তত্ত্ব আভাসিত। প্রিংগল প্রেটিসন বলেন, "অতীন্দ্রিয় সত্তা যেটুকু নিজেকে প্রকাশ করে তাই হলো অবভাস।"[১]

তৃতীয়ত, কান্টের দ্বৈতবাদ সমর্থনযোগ্য নয় : কান্ট অবভাস এবং চরম তত্ত্বের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, অতীন্দ্রিয় জগৎ এবং অবভাসিক জগতের মধ্যে বিরোধের প্রাচীর তুলে দিয়েছেন– দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে, আমরা শুধু অবভাসিক জগৎকেই জানতে পারি, অতীন্দ্রিয় জগৎকে জানতে পারি না। কান্টের এই দ্বৈতবাদ গ্রহণীয় নয়, কেননা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

চতুর্থত, কান্টের অবভাসিক ভাববাদ অজ্ঞেয়তাবাদে পর্যবসিত হয়। আমরা যদি একমাত্র আমাদের মনগড়া জগতকে জানতে পারি তবে তার বাইরে আমরা কিছুই জানতে পারি না। এই অবস্থায় অতীন্দ্রিয় জগতের ধারণা পুণ্যগর্ভ ধারণা মাত্র। এই মতবাদ স্বীকার করলে অধিবিদ্যা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পঞ্চমত, হেগেলের মত : কান্টের পরবর্তী দার্শনিক হেগেল কানশি দৈতবাদকে অতিক্রম করেন, সসীম ও অসীম জড় মনের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এক পরম ধীশক্তি থেকে জড়, জীব, মন সবকিছুই উদ্ভূত হয়েছে।

(ঙ) ফিকটের পরব্রহ্মবাদ (Absolute Idealism of Fichte)

কান্টের অবভাসিক ভাববাদে অবভাস এবং চরম তত্ত্বের মধ্যে যে প্রভেদ প্রদর্শিত হয়েছে তা গ্রহণীয় নয়। কার্যকারণ তত্ত্ব আমাদের বোধে একটি আকার– এ পরিদৃশ্যমান জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু কান্ট একে অতীন্দ্রিয় জগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তিনি অতীন্দ্রিয় জগৎকে সংবেদনের উৎস হিসেবে মনে করেন। কান্টের মতো ফিকটেও ইচ্ছার প্রাধান্য স্বীকার করেছেন। ফিকটের মতে, বাস্তব হলো পরম কল্যাণ (Good) সক্রিয় প্রজ্ঞা (Active reason), বিশুদ্ধ ইচ্ছা (Pure will), নৈতিক অহং (Moral Ego)। বিশ্বজগৎ বিশুদ্ধ ইচ্ছার প্রধান আর এই বিশুদ্ধ ইচ্ছাই হলো পরব্রহ্ম বা পরমসত্তা জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে সংবেদনের সৃষ্টি নয়,

---

[১] The Phenomenon is the noumenon so far it has manifested itself. – Pringle Pettrison.

জ্ঞান অহং-এর সৃষ্টি। প্রত্যেক বৌদ্ধিক ক্রিয়ার তিনটি রূপ রয়েছে। অহং-এর স্বীকৃতি (Thesis) না অহং-এর অস্বীকৃতি (Antithesis) এবং অহং এবং না-অহং এর সমন্বয়। স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অহং নিজেকে স্বীকার করে, অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে অহং-এর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অহং এবং না-অহং পরস্পরকে সীমিত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অহং এবং না-অহং-এর স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি সমন্বয় একটি মাত্র ক্রিয়া। যখন অহং নিজেকে স্বীকার করে তখন সে নিজেকে বস্তু থেকে পৃথক করে (বস্তু অহং থেকে স্বতন্ত্র)। যখন অহং নিজেকে উৎপন্ন করে তখন নিজের বিপরীত বস্তুজগৎকে উৎপন্ন করে। অহং নিজেই নিজের বাধা (Limitation) সৃষ্টি করে। অহং-এর বাধাস্বরূপ বস্তুজগৎ অস্তিত্বশীল, কিন্তু এর অসিবৃতত্ব অহং-এর সক্রিয়তার ওপর নির্ভরশীল। অহং-কে বাদ দিলে বস্তুজগৎ বাদ পড়ে যায়। ফিকটে কান্টের অতীন্দ্রিয় সত্তাকে পরব্রহ্মে রূপান্তরিত করেছেন। খোদা নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক নিয়ম ইচ্ছার স্বাধীনতা যা দৈশিক ও কালিক জগতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে প্রমূর্ত হচ্ছে।

পরব্রহ্ম বা পরম অহং নিজেই নিজের অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেন। এই স্বীকৃতির সময়ে তিনি না-অহং সৃষ্টির মাধ্যমে অস্বীকৃতি বা বিরোধ সৃষ্টি করেন। অহং এবং না-অহং পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করে। পরম অহং অহং এবং না-অহং (Ego and non Ego) উভয়ই সৃষ্টি করেন। অহং-কে না-অহং-এর বিরোধ অতিক্রম করতে হয়। জগৎ সসীম অহং-এর সৃষ্টি নয়; পরম অহংই জগতের কারণ পরম অহং বিশুদ্ধ ইচ্ছা। এ বস্তুজগতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নৈতিক স্বাতন্ত্র্য ইচ্ছার স্বাধীনতা উপলব্ধি করছে। ফিকটের ভাববাদ তাই পরব্রহ্মবাদ। এর প্রকৃতি নৈতিক।

ড. পলসনের মতে, ফিকটের ভাববাদ আত্মকেন্দ্রিকতাবাদে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদ ভ্রমাত্মক। কেননা তিনি মনে করেন যে, জ্ঞানের আকার ও উপাদান উভয়ই সসীম অহং-এর সৃষ্টি। কিন্তু এই ধারণা ফিকটের পরব্রহ্মবাদের মূল সুরের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

সমালোচনা
Criticism

প্রথমত, ফিকটের ভাববাদকে আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ বলে মনে করা যায় না। কেননা আত্মকেন্দ্রিকতাবাদে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব অন্যান্য অসীম মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু আমাদের জীবন সমাজের অন্যান্য মানুষের অস্তিত্বও মনের সাথে যুক্ত। ফিকটের দর্শনে অহং এবং না-অহং (Ego and non Ego) উভয়ই পরম অহং-এর সৃষ্টি এবং পরম অহং-এর মধ্যে সব বিরোধের সমন্বয়– কাজেই সসীম অহং এবং না-অহং-এর অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নি। ফিকটের ভাববাদ আত্মকেন্দ্রিকতাবাদে পর্যবসিত হয় নি। বরং ফিকটের ভাববাদ যথার্থভাবে পরব্রহ্মবাদ বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

দ্বিতীয়ত, ফিকটে তাঁর ভাববাদে প্রকৃতিকে যে স্থান দিয়েছেন তা অত্যন্ত গৌণ হয়ে পড়েছে। এই বাস্তব জগতের গৌণ স্থান নির্দেশিত হওয়ার জন্য ফিকটের দর্শনে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে।

(চ) শেলিং-এর অতিবর্তী ভাববাদ (Transcendental Idealism of Schelling) :

ফিকটে মতে, না-অহং বা জগৎ অহং-এর সৃষ্টি। কিন্তু শেলিং এতে আপত্তি করেন। তাঁর মতে, না-অহং সত্যিকার অহং পদবাচ্য নয়। না-অহং ছাড়া অহং টিকতে

পারে না। অহং না-অহং সৃষ্টি করতে পারে না। যদি অহং না-অহং সৃষ্টি করতে পারে, তবে না-অহংও না-অহং সৃষ্টি করতে পারে না। বার্কলি যথার্থই মন্তব্য করেন যে, জ্ঞাতা ছাড়া জ্ঞেয় থাকতে পারে না। এই অর্থে ধরলে বলতে হয় যে, ফিকটের কথা সত্য, অর্থাৎ জ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তু সৃষ্টি করে। কাজেই না-অহং বা বস্তুজগৎ যে অহং-এর অস্তিত্বের অন্যতম পূর্বশর্ত, ফিকটে এবং বার্কলি এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। যদি না-অহং পরব্রহ্ম বা পরম অহং না হয়, তবে অহংও পরম অহং নয়। কাজেই পরমসত্তাকে পরম অহং বা পরব্রহ্ম বলা ঠিক নয়; কারণ পরমসত্তা অহং এবং না-অহং এর উর্ধ্বে। আমরা বলতে পারি না যে, অহং না-অহং সৃষ্টি করে কিংবা না-অহং অহং সৃষ্টি করে, অহং এবং না-অহং, ভাবনা এবং বস্তু একটি উচ্চতর নীতি থেকে উৎসারিত। এই নীতি নিরপেক্ষ। শেলিং পরমসত্তাকে অতিবর্তী নীতি হিসেবে মনে করেন যে, নীতি অহং এবং না-অহং এর উর্ধ্বে।

প্রকৃতি অহং এর সৃষ্টি নয়। প্রকৃতি অস্তিত্বশীল প্রজ্ঞা এবং মন চিন্তাশীল প্রজ্ঞা। পরমসত্তা বাস্তব জগৎ এবং চিন্তাজগৎ, উভয় জগতেরই উৎস। শেলিং-এর মতে, পরমসত্তা ইচ্ছা। প্রকৃতি বিপরীতের সমন্বয়-সম্ভাবনার বাস্তবায়ন। বৌদ্ধিক অনুভূতির মাধ্যমে আমরা পরমসত্তাকে জানতে পারি।

সমালোচনা

শেলিং যথার্থই বলেছেন যে, অহং এবং না-অহং, জ্ঞাত ও জ্ঞেয় একে-অপরের পরিপূরক-অহং ছাড়া না-অহং টিকতে পারে না, না-অহং ছাড়াও অহং টিকতে পারে না, কিন্তু পরমসত্তা শুধু অতিবর্তী নয়, অন্তর্লীনও বটে। শেলিং-এর পরমসত্তা সব কিছুকেই গ্রাস করে। তবে প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর মতবাদ আংশিকভাবে সত্য। শেলিং-এর মতবাদ হেগেলের বস্তুগত ভাববাদের পূর্বাভাস।

(ছ) হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ (Objective Idealim)

জর্জ বিশপ বার্কলি প্রবর্তিত ভাববাদ কান্টের হাতে জ্ঞানমূলক ভাববাদে পরিণতি লাভ করলেও এই মতবাদে বিশ্বজগতের ঐক্যসূত্রের অভাব ঘটেছে। ফলে এ দার্শনিক মনের অভাব মিটাতে সমর্থ হয় নি। হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ এই শূন্যতা ভরে দিয়েছে ও তত্ত্বের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপন করেছে। দার্শনিক কান্ট দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেন, তাঁর পরবর্তী দার্শনিক ফিকটে, শেলিং ও হেগেল তার পরিসমাপ্তির একটা বলিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ফিকটে ও শেলিং-এর দর্শন সম্ভব না হলেও হেগেলের দর্শনে কান্টের দ্বৈতবাদের অবসান ঘটেছে।

হেগেলের মতে, পরমসত্তা সব কিছুর উৎস : কান্টের মতে পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগৎ পরস্পর পৃথক। আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের জ্ঞান পাই অতীন্দ্রিয় জগতের জ্ঞান পাই না; কেননা অতীন্দ্রিয় জগতের ক্ষেত্রে জ্ঞানের আকার প্রযোজ্য নয়। অতীন্দ্রিয় জগৎ পরিদৃশ্যমান জগতের উৎস কান্ট একথা বললেও তিনি এ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। হেগেল এই দুই জগতের জ্ঞান ও স্বজ্ঞান ব্যবধান ঘুচিয়ে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। তাঁর মতে পরমাত্মাই হলো পরমসত্তা; জীবাত্মা পরমাত্মার খণ্ড প্রকাশ। পরমাত্মা থেকে উৎসারিত জীবাত্মার মধ্য দিয়েই পরমাত্মার প্রকাশ। জীবাত্মা ও জড়বস্তু উভয়ই পরমাত্মা থেকে উৎসারিত। কাজেই জীবাত্মা জড়বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে পারে।

পরম ধীশক্তি আধ্যাত্মিক : দার্শনিক হেগেলের মতে, পরমসত্তা হলো পরম ধীশক্তি (Absolute Reason)– এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি। পরম ধীশক্তি হলো এমন এক চৈতন্য শক্তি যা একাধারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। এই জীবজগৎ পরম ধীশক্তির মূর্ত প্রকাশ। পরম ধীশক্তি সক্রিয় ও গতিশীল। নিজেকে প্রকাশের মাধ্যমে অবহিত হওয়াই বৈশিষ্ট্য। পরমসত্তা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন– প্রতিষ্ঠা, বিরোধ ও সমন্বয় (Thesis, Antithesis and Synthesis) পরমসত্তার প্রকাশ পদ্ধতি।

প্রতিষ্ঠা, বিরোধ ও সমন্বয় পরম ধীশক্তির প্রকাশ পদ্ধতি : পরম ধীশক্তিপূর্ণ– তিনি একাধারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। বিশ্বজগৎ পরম ধীশক্তির জ্ঞানের বিষয়বস্তু– জীব ও জড়বস্তু নিয়েই বিশ্বজগৎ গঠিত। জীবাত্মা ও জাগতিক বস্তুসমূহ পরম ধীশক্তির প্রকাশ, কাজেই উভয়ই মূলত এক। সেই কারণে হেগেল বলেছেন যে, যা বৌদ্ধিক তাই বাস্তব, যা বাস্তব তাই বৌদ্ধিক। তাঁর মতে, তা বুদ্ধির নিয়ম যা জগতেরও নিয়ম। এই কারণে ব্যক্তির কাছে এই জগৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য। প্রকৃতি নিয়মের অধীন। প্রকৃতির একরূপতা, শৃঙ্খলা, সূক্ষ্ম কলাকৌশল, নিয়মানুবর্তিতা, সংহতি সবই বুদ্ধির অস্তিত্ব ঘোষণা করে। জগতের মধ্যে যে শৃঙ্খলা, ঐক্য, সামঞ্জস্য ও নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে তা নির্দেশ দেয় যে, এই জগৎ বুদ্ধিরই প্রকাশ– এই জগৎ কোনো চৈতন্যের বাহ্য প্রকাশ। এই জগৎ আকস্মিক, এ যুক্তিসঙ্গত নয়। কান্ট জ্ঞানের পক্ষে অবশ্যস্বীকার্য মৌলিক বিষয়গুলিকে আত্মগত বলে স্থির করেছিলেন, কিন্তু হেগেলের মতে এইগুলি আত্মগত ও বিষয়গত উভয়ই। কার্যকারণ সম্পর্ক যেমন মনে আছে তেমনি জগতেও আছে। কাজেই বুদ্ধি ও বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু উভয়ই এক পরম ধীশক্তির প্রকাশ।

বস্তুগত ভাববাদ বস্তুবাদ এবং ভাববাদের সমন্বয় : হেগেলের ভাববাদ বস্তুগত ভাববাদ নামে পরিবিদিত। কারণ এই মতবাদের মধ্যে বস্তুবাদ ও ভাববাদ এই দুই মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। পরমসত্তার প্রকাশ রূপেই হেগেল জগতের বাস্তব সত্তা স্বীকার করেছেন। হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ জীবনজগতের ব্যাখ্যায় একটি সন্তোষজনক মতবাদ, কেননা এই মতবাদ জীবনজগতের মূলীভূত পরমসত্তাকে আধ্যাত্মিক বলে স্বীকার করে। বস্তুজগৎ চৈতন্য জগৎ এই পরমসত্তার বহিঃপ্রকাশ। জীবনজগতের সবকিছুই আবার স্বীয় অস্তিত্বে বিদ্যমান, সব কিছুরই মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। পরমসত্তাকে হেগেল পরম ধীশক্তি বা পরম প্রজ্ঞা (Absolute idea/Absolute Thought) বলেছেন। তাঁর মতে, পরমসত্তা এবং বস্তুজগৎ ও চৈতন্য জগতের মধ্যে কোনো দ্বৈতবাদ নেই–বস্তুগৎ ও চৈতন্যজগৎ উভয়ই পরমসত্তার প্রকাশ। কাজেই সসীম মনের পক্ষে বস্তুজগত ও পরমসত্তাকে জানার পক্ষে কোনো অন্তরায় নেই।

বস্তুগত ভাববাদে ইচ্ছার স্বাধীনতা : হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ মানবাত্মাকে পরম ধীশক্তির খণ্ড প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। ফলে মানুষের নৈতিক, ধর্মীয় ও সৌন্দর্যবিষয়ক জীবনের মূল্যবোধের ব্যাখ্যা এই মতবাদে পাওয়া যায়। মানুষ সসীম হলেও অসীমের হৃদয়বীণার সুর তার বাণীতে ঝংকৃত হয়ে থাকে, সত্যসুন্দর কল্যাণের আদর্শ তাঁর জীবনকে অনুপ্রাণিত করে।

হেগেলীয় ভাববাদের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ : দার্শনিক মতবাদ হিসেবে বস্তুগত ভাববাদ দর্শনের সর্বপ্লাবী মতবাদ। এতে জীবনজগতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রয়াস রয়েছে। দর্শনের সন্তোষজনক মতবাদ হওয়া সত্ত্বেও হেগেলের পরবর্তী অনেক দার্শনিকই এই

মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থাপিত করেছেন। হেগেলের মতবাদের সমালোচকগণ বলেন যে হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ বুদ্ধিসর্বস্ব। তিনি বুদ্ধি প্রজ্ঞার ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। আমাদের জীবনে অনুভূত ও ইচ্ছার যে একটা ভূমিকা রয়েছে, হেগেলীয় দর্শনে তা যথাযোগ্য স্থান লাভ করে নি। হেগেলীয় ভাববাদে মানবাত্মার সৃজন ক্ষমতা বিলীন হয়েছে, পরম ধীশক্তির সর্বব্যাপী মহিমা মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে গ্রাস করে ফেলেছে। হেগেলীয় ভাববাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বজ্ঞাবাদ, নব্য অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে।

(ঝ) পুরুষবাদ (Personalism) :

এই মতবাদে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকৃতি : বস্তুগত ভাববাদ পরম ধীশক্তির ওপর এত অধিক গুরুত্বারোপ করেছে যার ফলে মানুষের স্বাধীনতা খর্বীকৃত হয়েছে। পুরুষবাদ হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে জেহাদস্বরূপ; ব্যক্তিত্বের অলঙ্ঘ্য তথ্যের ওপর এই মতবাদের ভিত্তি স্থাপিত। আমি যে একজন ব্যক্তি ও সমাজের একজন সদস্য তা আমি কোনোরূপেই অস্বীকার করতে পারি না। এই মতবাদ মানুষের ব্যক্তিগত, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নৈতিক দায়িত্ব ও নব নব মূল্যবোধের ওপর গুরুত্বারোপ করে। এই মতবাদ খোদার স্বাধীনতা খর্ব করে মানুষের স্বাধীনতা অটুট রাখে, খোদাকে মানুষের মতো সসীম বলে মনে করে। এই মতবাদ অনুসারে খোদা সসীম শক্তি, মানুষের মতো তিনিও কল্যাণকে জয় করার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছেন। এ নীতিশাস্ত্রকে অধিবিদ্যার ভিত্তি বলে মনে করে।

রাশডাল : রাশডালের মতে, পরমসত্তা বলতে বুঝায় খোদা ও সসীম আত্মাসমূহের সমষ্টি। পরমসত্তা আত্মসচেতন শক্তি নয়। খোদা জগতের মধ্য দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করছেন এবং মানুষের কাছে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছেন। মানুষ স্বাধীনভাবে স্রষ্টার উদ্দেশ্য অনুধাবন করছে। পরমসত্তা, খোদা, সসীম আত্মা ও জগতের অচেতন ঐক্য। এ ব্যক্তিগত নয়। অনিষ্ট বাস্তব ঘটনা। আমরা অনিষ্টকে জয় করার জন্য সংগ্রাম করছি।

ওয়ার্ড : ওয়ার্ডের মতে, জগৎ সসীম সক্রিয় চিৎপরমাণুর দ্বারা সংগঠিত সসীম, আত্মা স্বাধীন। খোদা সসীম সমানের মধ্যে সার্বভৌম। তিনি সসীম আত্মা দ্বারা সীমিত। লিবনিজের শ্রেষ্ঠ মোনাডের মতো খোদা সার্বভৌম আত্মা।

বাউনি ও হাইসন : বাউনি ও হাউইসন (Bonwne and Howison)-এর মতে, খোদা সসীম সত্তা। তিনি সসীম আত্মাসমূহের প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। তিনি আত্মাসমূহের স্রষ্টা নন, তিনি তাদের আদর্শ বা লক্ষ্য, মানবাত্মা তাঁর দিকেই এগিয়ে চলেছে। এই মতবাদ মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও নব মূল্যবোধ সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে এক যুগান্তর আনয়ন করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষবাদ মানুষের ব্যক্তিত্বের পথ বেয়ে অগ্রসর হয়। এই মতবাদ অদ্বৈত পরম তত্ত্বের বিরোধী বহুবাদকে সমর্থন করে। মানুষের স্বাধীনতা দায়িত্ব, সংগ্রাম, সাধনা এই মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সমালোচনা

Critcism

অসীম ও সসীম ইচ্ছার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই : প্রথমত, সত্তার ধারণা মানুষের নৈতিক চেতনার ওপর নির্ভরশীল। কাজেই একে অবশ্যই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। ঐশী ইচ্ছা মানুষের ইচ্ছাকে গ্রাস করবে না, সত্তার পরাবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় মানুষের স্বাধীনতা, শক্তি ও ইচ্ছার পরিপূর্ণ ভূমিকা থাকা চাই। খোদার সার্বভৌম ইচ্ছার সাথে মানুষের সীমিত ইচ্ছার সামঞ্জস্য থাকা চাই। কিন্তু অসীম ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সসীম ইচ্ছাশক্তির এই সামঞ্জস্য বিধান খুবই কঠিন। এতে মানুষের স্বাধীনতা খোদার ইচ্ছার দ্বারা সীমিত হয়ে থাকে।

অচেতন পরমসত্তা স্ববিরোধী : দ্বিতীয়ত, পরমস্বত্তা অচেতন ঐক্য হতে পারে না। অচেতন পরমসত্তা স্ববিরোধী। পরমসত্তা আত্মসচেতন ঐক্য– সসীম সত্তা ও জগতের ঐক্য। খোদা সসীম হতে পারে না। সসীম খোদা অপূর্ণ খোদা। এহেন খোদা মানবাত্মার আকিঞ্চন পূর্ণ করতে অসমর্থ, আমাদের উপাস্য হওয়ার অযোগ্য। পুরুষবাদের খোদা গণতান্ত্রিক, যুক্তি ও তত্ত্বের বিচারে এহেন খোদা মানুষের মনের ক্ষুধা মিটাতে পারে না।

(ঝ) সোপেনহাওয়ারের ঐচ্ছিক ভাববাদ (Voluntaristic Idealism of Sohopenhaur) :

ধীশক্তি ইচ্ছাশক্তির অধীন : সোপেনহাওয়ার ভাববাদের একজন প্রবক্তা। তাঁর ভাববাদ ঐচ্ছিক ভাববাদ নামে বিদিত। কান্টের অতীন্দ্রিয় সত্তা (Things in themselves) ফিকটের হাতে পরম অহং (Absolute Ego), শেলিং-এর কাছে নিরপেক্ষ সত্তা এবং হেগেলের কাছে পরম ধীশক্তিতে (Absolute Idea or thought) পরিণত হয়। ফিকটে, শেলিং ও হেগেল দার্শনিকত্রয় নিরপেক্ষ ভাববাদের প্রবক্তা। সোপেনহাওয়ার কান্টের ইচ্ছার সার্বভৌমত্ব অনুসরণ করে হেগেলের পরম ধীশক্তিকে পরম ইচ্ছাশক্তিতে রূপান্তরিত করেন। তাঁর মতে, ধীশক্তি ইচ্ছাশক্তির অধীন। ইচ্ছা আমাদের আত্মার প্রকৃতিগত গুণ। আত্মা নিরন্তর সংগ্রাম সাধনার পথে অগ্রসরমান। আমাদের দেহ ইচ্ছাশক্তিরই বাহ্য প্রকাশ। দেহ যেমন আমাদের ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ, এই জগতও তেমনি পরম ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশ।

ইচ্ছা মৌলশক্তি : সোপেনহাওয়ার বলেন যে, চেতনা আমাদের মনের উপরিভাগ মাত্র। চেতনাবুদ্ধির তলে চেতন বা অচেতন ইচ্ছার অধিবাস। কোনো কোনো সময় মনে হয় ধীশক্তি ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করে, কিন্তু আসলে ইচ্ছা নিজের দ্বারা নিজেই পরিচালিত হয়ে থাকে। ধীশক্তি ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর মতে, ইচ্ছাশক্তি মনের স্থায়ী উপাদান, ইচ্ছাই চেতনার বস্তুসমূহের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে; ধারণা ও চিন্তাকে একত্র করে রাখে। ইচ্ছাশক্তি মানুষের মৌলশক্তি। সোপেনহাওয়ার ইচ্ছার প্রেক্ষিতেই বিশ্বজগতের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ইচ্ছাই শক্তি; ইচ্ছাই কারণ। ইচ্ছা যেমন আমাদের মধ্যে সার্বজনীন কারণ এ তেমনিভাবে বিশ্বের সকল বস্তুরই কারণ। অচেতনতা চৈতন্যের স্বাভাবিক ও মৌলিক শর্ত। অচেতন সার্বজনীন ইচ্ছাই বিশ্বজগতের মূল। এই ইচ্ছা অন্ধ, অচেতন ও অবোধ। পুনরুৎপাদন প্রত্যেক জীবের পরম লক্ষ, এবং এই প্রবৃত্তি তাকে মৃত্যুকে জয় করতে সাহায্য করে। ব্যষ্টি সমষ্টির অধীন, কেননা সমষ্টির অধীনতার মাধ্যমেই ব্যক্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

সমালোচনা

Criticism

অন্ধ অচেতন ইচ্ছা স্ববিরোধী : সোপেনহাওয়ার নিরপেক্ষ ইচ্ছার ওপর গুরুত্বারোপ করে ভুল করে নি। কিন্তু একথা ঠিক যে, অন্ধ, অবোধ ইচ্ছাশক্তি নিসর্গবাদের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। ইচ্ছা আত্মসচেতন শক্তিসম্পন্ন হওয়া চাই। কারণ একমাত্র আত্মসচেতন ইচ্ছাই আপনার লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হয়ে সফলকাম হতে পারে। অন্ধ অচেতন ইচ্ছা স্ববিরোধী। নিরপেক্ষ ইচ্ছাশক্তিকে অন্ধ বলে মেনে নিলে তাকে নিরপেক্ষ বলা চলে না। আর এমন শক্তি পরমসত্তা বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যও নয়। নিরপেক্ষ সত্তা বা আত্মসচেতন শক্তি বিশ্বজগতের মধ্য দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছে।

এটি ছাড়া, সোপেনহাওয়ার ইচ্ছাকে জ্ঞানমূলক বৃত্তির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, চিন্তা ইচ্ছার একটি অবান্তর গুণ। কিন্তু আমার আত্মসচেতনতার বলে জানতে পারি যে, মন নিজেকে জেনে থাকে। কাজেই সোপেনহাওয়ারের মতবাদ অমনোবৈজ্ঞানিক।

কতিপয় সমসাময়িক মতবাদ

Some Contemporary Theories

আমরা এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি সমসাময়িক মতবাদের আলোচনা করব। এইগুলি হলো : ক. নব্য-ভাববাদ (Neo-Idealism), খ. প্রয়োগবাদ (Pragmatism), গ. বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism), ঘ. অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism) এবং ঙ. অস্তিত্ববাদ (Existentialism)।

ক. নব্য-ভাববাদ (Neo-Idealism) : নব্য-ভাববাদ ও নব্য হেগেলীয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য : নব্য-ভাববাদ দর্শনের একটি সাম্প্রতিক মতবাদ। ইতালির দার্শনিক বেনেদেতো ক্রোচে (Benedetto Croce) ও গোভানি জেনটিলে (Giovanni Gentile) এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। হেগেল ও তাঁর অনুসারীদের ভাববাদ থেকে পৃথক বলে নতুন ভাববাদ নব্য-ভাববাদ (Neo-Idealism) নামে অভিহিত। হেগেলের অনুসারীবৃন্দ তাঁর দর্শনে নির্দেশিত গূঢ় বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই সমস্ত দার্শনিক নব্য হেগেলীয় নামে খ্যাত এবং তাঁদের দর্শন নব্য হেগেলীয় মতবাদ (Neo-Hegelianism) হিসেবে চিহ্নিত। এই নতুন মতবাদ হেগেলের মতবাদের ব্যাখ্যা কিংবা ভাবার্থ উদ্ধার। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নব্য-ভাববাদ নব্য-হেগেলীয় মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র। নব্য-হেগেলীয় মতবাদ অনুসারে, পরম ধীশক্তি হলো পরমসত্তা। সসীম মন এই পরম ধীশক্তির খণ্ড বিকাশ, পরমসত্তার মধ্যেই সসীম মন বা ধীশক্তির অস্তিত্ব, তাৎপর্য নির্ভরশীল। কিন্তু নব্য-ভাববাদ সসীম মনকে স্বাধীন শক্তি হিসেবে গণ্য করে, সক্রিয়, সৃজনশীল জ্ঞাতা হিসেবে বিবেচনা করে।

নব্য-ভাববাদে মন স্বাধীন শক্তি : নব্য হেগেলীয়দের মতো নব্য ভাববাদীরা মনকে পরম ধীশক্তির কেবল বাহ্য প্রকাশ হিসেবে মনে করে না। এই মতবাদের প্রখ্যাত প্রবক্তা ক্রোচে ও জেনটিলের মতে, হেগেল ও তাঁর অনুসারীদের বিশেষভাবে ব্রাডলি ও বোসানকে মত গ্রহণ করলে পরমসত্তাকে অপরিবর্তনীয় ও নিশ্চল বলে গ্রহণ করতে হয়, ফলে বিশ্বপরিকল্পনায় পরিবর্তনের কোনো অবকাশ থাকে না। এই মতবাদ

পরিবর্তন ও ইতিহাসের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করতে পারে না। জেমসের ভাষায় এই মতবাদ-নিঃসৃত জগৎ 'আবদ্ধ বিশ্ব (block universe) এবং সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনীয়। সি. ই. এম. জোয়াদ বলেন, "এই মতবাদ আমাদের সসীম অভিজ্ঞতার পশ্চাতে ও বাইরে পরমসত্তার স্থান নির্দেশ করে পরমসত্তাকে মানুষের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিষয়ে পরিণত করে ও পরমসত্তার জ্ঞানের সম্ভাব্যতা উপেক্ষা করে; আবার এই মতবাদ পরমসত্তাকে সমস্ত চিন্তার উৎস ও সমস্ত চিন্তার মিলন সমুদ্র, অভিজ্ঞতার সার্বজনীন পূর্বানুমান এবং পরম সমন্বয়ের অন্তর্বর্তী মৌল উৎস হিসেবে নির্দেশ করে অগ্রগতিকে অবাস্তব ও পরিবর্তনকে অলীক বিষয়ে পর্যবসিত করে। এই কারণেই পরমসত্তা নিষ্ক্রিয় চিন্তার মূর্ত প্রকাশ হিসেবে পরিগণিত হয়, সক্রিয় চিন্তার অভিব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে না।"[১]

দুটি মতবাদের পার্থক্য : নব্য-ভাববাদীদের মতে, সসীম মন সৃজনশীল– এটি নিষ্ক্রিয় পরম ধীশক্তির কেবল বহিঃপ্রকাশ নয়, বিশ্বজগতের বিভিন্ন উপাদানের অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ অপরিবর্তনীয় সত্তার নিছক বাহ্য প্রকাশ নয়। হেগেলীয়দের মত গ্রহণ করলে 'দর্শন হলো ইতিহাস' (Philosophy is History), এই স্বতঃসিদ্ধটি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। এই কারণে নব্যভাববাদীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে হেগেলীয় স্বতঃসিদ্ধটির নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাঁর সক্রিয় পরমসত্তা ও তার সাথে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সম্পর্কের আলোকে হেগেলের 'দর্শন হলো ইতিহাস' এই বাণীটির নতুন তাৎপর্য প্রদর্শন করে। এইখানেই হেগেলীয় ও নব্য-ভাববাদী দার্শনিকদের পার্থক্য।

নব্য-ভাববাদীদের মত : নব্য ভাববাদীদের মতে, পরমসত্তা গতিশীল, বর্ধিষ্ণু ও প্রগতিশীল এবং গতিশীল সত্তার আলোচনা হিসেবে দর্শনের অধ্যয়ন সৃষ্টিশীল। নব্যভাববাদীদের কাছে মন 'সক্রিয়', মনের সক্রিয়তা পরমসত্তার ব্যাখ্যায় প্রকাশ পায়। পরমসত্তার ব্যাখ্যায় মন সৃজন করে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, মন পরমসত্তাকে সৃষ্টি করে এবং মনই ইতিহাস সৃষ্টি করে, অথবা মনই ইতিহাস। যেহেতু মনের সৃষ্টি হলো পরমসত্তার ব্যাখ্যা বা দর্শন, কাজেই মন হলো দর্শন। একটু বাড়িয়ে বললে বলতে হয় যে, ইতিহাস হলো দর্শন, দর্শন হলো ইতিহাস। নব্য-ভাববাদীরা বলেন যে, হেগেলীয় স্বতঃসিদ্ধ 'দর্শন হলো ইতিহাস', এ কথার সত্যতা নির্ভর করে পরমসত্তার গতিশীলতা এবং মানবমনের সক্রিয়তা মতবাদ গ্রহণের ওপর। পরমসত্তা নিরন্তর গতিশীল এবং এর ক্ষেত্রে শেষ সমন্বয় বলে কিছুই নেই। পরমসত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে ক্রোচে ও জেনটিলে এক মত, তবে কতিপয় গৌণ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

---

[১] By locating the Absolute with which the reality is identified behind and beyond our finite experience, it makes reality transcend our experience and so precludes, the possibility of knowledge of reality, by making the Absolute the immanent spring from which all thought rises, as well as the all embracing sea into which all thought merges, the universal presupposition of experience as well as the final synthesis of experience, it renders progress non-exisent and change unreal and for this very reason Reality becomes embodiment of thought as a passive structure and not an evpression of thinking as an active principle. – C. E. M. Joad : *Inrtoduction to Modern Philosophy*

সমালোচনা

Criticism

ত্রুটি : প্রথমত, নব্য ভাববাদীদের মতবাদের মধ্যে হেগেলীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তির সন্তোষজনক সমাধানের প্রয়াস রয়েছে। নব্যভাববাদীরা মনকেই সক্রিয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মনকেই একমাত্র সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁরা পরমসত্তাকে গতিশীল বর্ধিষ্ণু ও পরিবর্তনশীল বলে মনে করেন। ফলে পরমসত্তার প্রকৃতি উপেক্ষিত হয়। পরমসত্তা পরিবর্তনের অধীন হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ক্রোচের 'দর্শন হলো ইতিহাস' যে যুক্তির ওপর নির্ভরশীল তা সন্তোষজনক নয়, কেননা দর্শন পরমসত্তার সামগ্রিক ব্যাখ্যার দর্শন, ইতিহাস পরমসত্তার এক দিকের প্রকাশ। কাজেই দর্শন ও ইতিহাস অভেদাত্মক হতে পারে না।

খ. প্রয়োগবাদ (Pragmatism) : কার্যকারিতা সত্য সত্যের মাপকাঠি : বিংশ শতাব্দীর দর্শন বিভীষিকা প্রয়োগবাদ একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদকে পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক মতবাদ না বলে দর্শন বিচারের একটি অভিনব পদ্ধতি বলা চলে। এই মতবাদ অনুসারে কোন মতবাদ বা কোন ধারণার কার্যকারিতা বিচার্য তার ফলের প্রেক্ষিতে। যদি কোনো বিষয় বাস্তব জীবনে ফলপ্রসূ হয় তবে সেই বিষয় সন্তোষজনক। কোনো মতবাদ বা ধারণা ভালো যদি সে মতবাদ বা ধারণার দ্বারা আমাদের কাজ চলে। কার্যকারিতার মাধ্যমেই কোনো বিষয়ের ভালো বা মন্দ নির্ভরশীল।

প্রয়োগবাদ মানববাদী : প্রয়োগবাদ একটি বিশেষ জীবনদর্শন। জীবন বাস্তব, বাস্তবই জীবন। এই দর্শন নিশ্চিতভাবে এক ধরনের মানবতাবাদ (Humanism)। প্রয়োগবাদের সামনে রয়েছে একটা নতুন দৃষ্টিকোণ। প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিকরা সৌন্দর্যধ্যান, গাণিতিক ও ভূগোল বিষয়ক কৌতূহল, এক পরিপূর্ণ জগৎকে জানার স্পৃহা নিয়ে মশগুল ছিলেন। তাঁরা প্রয়োগবাদকে আমল দেন নি। প্রয়োগবাদ কার্যকারিতার দর্শন, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দর্শন, অজয়কে জয় করার দর্শন। প্যাট্রিক বলেন, "প্রয়োগবাদীরা জগতকে পূর্ণাঙ্গ, সুন্দর, উপভোগ্য, অনুধ্যেয় ও আরাধ্য বলে মনে করেন না; তাঁরা মনে করেন যে, জগৎকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে, এর নব রূপায়ণের পথের বাধা অতিক্রম করতে হবে, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে একে গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং প্রয়োগবাদীরা জ্যোতির্বিদ্যার সৌরলোক বা বিজ্ঞানসমূহের জিজ্ঞাসিত বিশ্বজগতের প্রতি আকৃষ্ট নন; তাঁদের জগৎ হলো মানবিক জগৎ, সামাজিক জগৎ, শিল্পের জগৎ, মানবীয় ক্রিয়াবলির জগৎ।"[১]

পার্স ও জেমস : পার্স (Perce) এই মতবাদের উদগাতা হলেও এই মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন আমেরিকার প্রখ্যাত দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস। জেমস এই মতবাদকে দর্শনের পর্যায়ে উন্নীত করেন। তাঁর মতে, সত্যের মানদণ্ড

---

[১] The pragmatist does not think of the world as ready made perfect, beautiful, something to be enjoyed, contemplated or worshiped; he thinks of it as a world to be made or made over remodelled to his desires and wishes Consequently, it is not the astronomical unverse, the cosmos, the world which the physical Sciences try to penetrate, that the Pragmatist is interested in it is the human world, the social world, the industrial world, the attention world of human affairs, which holds his attention. Patric : *Introduction to General Philosophy.*

উপযোগিতা। যদি কোনো বিষয় উপযোগী বা ফলপ্রসূ হয় তবে তা সত্য। তিনি বলেন যে, কোনো মতবাদ, ধারণা ও প্রকল্প তখনই সত্য বলে বিবেচিত হবে যখন সেই মতবাদ থেকে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে। কাজেই সন্তোষজনক কার্যকারিতা, কার্যসাধন ও সার্থক নির্দেশনাই সত্যের মাপকাঠি। সত্য ধারণা বা বিষয়সমূহ প্রমাণযোগ্য এবং মিথ্যা ধারণা প্রমাণের অযোগ্য।

প্রয়োগবাদ বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ : প্রয়োগবাদ বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ বিশেষ। এই মতবাদ দর্শনশাস্ত্র ও তার ধারণা এবং মতবাদসমূহকে বুদ্ধি ও যুক্তির একঘেয়েমি থেকে রক্ষা করেছে, বাস্তবধর্মী দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে কার্যকারিতার প্রেক্ষিতে সব কিছুকে যাচাই করতে অগ্রসর হয়েছে। পুরনো দর্শনে খোদা, জড়, প্রজ্ঞা, পরমসত্তা, আত্মা প্রভৃতির ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে। এই সমস্ত ধারণার ওপর নির্ভর করি বলেই আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে। এসব বিষয় কিন্তু প্রয়োগবাদীদের ধারণা স্বতন্ত্র। প্রয়োগবাদীরা থামতে রাজি নন। তাঁরা সকল মতবাদের উপযোগিতা বা নগদ মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা সকল মতবাদের উপযোগিতা যাচাই করেন; উপযোগিতার ধোপে টেকে কি-না। তাঁদের মতে, আমরা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, এই পরিবর্তনের পথে পুরনো স্বতঃসিদ্ধ মূল্যবোধ আমাদেরকে যথার্থভাবে মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না।

বাস্তব জগৎ সত্য : পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, সামনে কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান নেই, পথের বাধা ঠেলে সে শুধু সামনের দিকে চলেছে, আর চলেছে। এই নিরন্তন চলার পথে নব নব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। এইসব সমস্যা সমাধানের জন্যই চিন্তার প্রয়োজন। পরমসত্তা অপরিবর্তনীয় বস্তাবাঁধাই সত্যের সমষ্টি নয়। বাস্তব জগৎই সত্য জগৎ, আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎই আসল জগৎ। এ সম্পর্কে জেমস একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। "একটি লোক তার পত্নী ও ছয়জন সন্তানের সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। লোকটি বেকার হয়ে কর্মের সন্ধান করে ব্যর্থকাম হন এবং বাড়িতে ফিরে অভুক্ত সন্তান ও স্ত্রীর করুণ ও নৈরাশ্যজনক চেহারা দেখতে পান। তিনি মনের দুঃখে কার্বলিক এসিড পান করে আত্মহত্যা করেন"– এই ঘটনাটি বাস্তব। এটি আমাদের অভিজ্ঞতার একটি করুণ চিত্র, এ থেকে একথা বলা যায় না যে, সত্যের এই অংশটুকু মন্দ।

জেমসের মতে, অভিজ্ঞতাই সত্য : তাই জেমসের মতে, অভিজ্ঞতাই সত্য (Reality is experience)। বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় প্রয়োগবাদীদের নেই। প্রয়োগবাদী দার্শনিক আশাবাদী– এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন প্রয়োগবাদীদের দর্শনের প্রেরণা।

সমালোচনা
Criticism

প্রথমত, মতবাদটি মানবিক । প্রয়োগবাদ জীবনের বাস্তব দিকের প্রতি সমধিক গুরুত্বারোপ করে। কাজেই এই মতবাদ মানবিক। এই মতবাদ জগৎকে প্রগতিশীল বলে মনে কনে। এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছোঁয়াচ মানবজীবনের সামনে তুলে ধরে। এক নতুন সমাজ, এক নতুন জগৎ, এক বাস্তবধর্মী সভ্যতার স্বপ্ন প্রয়োগবাদের শিখায়। কিন্তু জ্ঞানবিদ্যার আলোকে বিচার করলে এই মতবাদের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এই জগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য প্রয়োগবাদ সে সত্যই অনুধাবন করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ পূর্ণ সত্যের সাথে পরিচয় ঘটাতে পারে না, আংশিক সত্যের চিত্র তুলে ধরে।

তৃতীয়ত, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও পরাবৈজ্ঞানিক ত্রুটি : এই মতবাদ জীবনজগতের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোনো কিছু বলে না, বরং এই মতবাদ চরম সত্য, পরম তত্ত্বকে উপেক্ষা করে। এই মতবাদ জীবনজগতের রহস্য উদ্ঘাটন করে জীবনজগতের সামগ্রিক চিত্র আমাদের সামনে ধরতে পারে না।

চতুর্থত, এই মতবাদ সত্যকে ব্যক্তিগত ও সাপেক্ষ ব্যাপারে পরিণত করে। কিন্তু ব্যক্তিগত বা আত্মগত মতবাদ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়, কাজেই তা সত্য বলে ধরা যায় না। সত্য সার্বজনীন হওয়া চাই।

গ. বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদ (Logical Positivism) : পরমসত্তা বা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কীয় যুক্তি বাক্য– হয় পুনরুক্তি দুষ্ট নতুবা অবান্তর : প্রত্যক্ষবাদ দর্শনে একটি সাম্প্রতিক দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদের অনুসারীরা অধিবিদ্যার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, অধিবিদ্যা আমাদের অভিজ্ঞতা বহির্ভূত পরমসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত সত্তা স্বরূপত বুদ্ধির অতীত ও অপ্রকাশিতব্য। কোনো বোধগম্য যুক্তিবাক্যকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা যায়, বিভিন্ন অংশ অভিজ্ঞতার কোনো না কোনো দিক ব্যক্ত করে। পরমসত্তা বা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্পর্কীয় কোনো যুক্তিবাক্য অংশে বিভক্ত হতে পারে না, এ হয় পুনরুক্তি দুষ্ট নতুবা অবান্তর। এই ধরনের আংশিক যুক্তিবাক্য অর্থহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'আমি চিন্তা করি– কাজেই আমি অস্তিত্বশীল' (Cogito Ergo sum – I think, therefore, I exist)। আমি চিন্তা করি এই বাক্যাংশ একটি অভিজ্ঞতার টুকরা-ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতার অংশ; আবার আমি অস্তিত্বশীল– এই বাক্যাশ আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে অবস্থিত স্থায়ী 'অহং' কে বুঝায়। এ যেহেতু অভিজ্ঞতার আওতাবহির্ভূত, কাজেই অর্থহীন। যদি এই শেষোক্ত বাক্যাংশ প্রথম বাক্যাংশেরই সমর্থক হয়, তবে এ পুনরুক্তি দুষ্ট। আর একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক 'জগৎ ফল' কাজেই খোদা জগতের কারণ (The world is the effect, Therefore God is the cause of the world.) বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদের অনুসারীদের মতে, এই যুক্তিবাক্য দুটি অর্থহীন, কারণ এদের অংশে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। সমগ্র জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতার আওতাভুক্ত নয় কিংবা জগতকে আমরা কোনো কারণে ফল হিসেবেও অনুভব করি না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা খোদাকে জানতে পারি না, কিংবা তাঁকে জগতের কারণ হিসেবেও জানতে পারি না। যেহেতু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই যুক্তিবাক্য দুটির বিষয়বস্তুকে জানা যায় না, কাজেই যুক্তিবাক্য দুটি অবাস্তব অর্থহীন। এইভাবে এই মতবাদের অনুসারীরা অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত যুক্তিবাক্যসমূহের অভিজ্ঞতাবিযুক্তির কারণ দর্শিয়ে তাদের অসম্ভাব্যতা করেন।

যুক্তি বাক্যের বিশ্লেষণ : সুতরাং বুদ্ধিগ্রাহ্য সমর্থকবাদীরা অধিবিদ্যার প্রতিপন্ন অসম্ভাব্যতা প্রদর্শন করেন এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাক্যসমূহের বিশ্লেষণের কায়দা দর্শন। এই সমস্ত দার্শনিকের মতে, দর্শনের প্রধান কাজ হলো যুক্তি বাক্যের বিশ্লেষণ। দর্শন আসলে যুক্তিবিদ্যার বিজ্ঞান (Science of Logic)।

সমালোচনা

Criticism

বুদ্ধির ভূমিকা অবহেলিত : বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষবাদ অভিজ্ঞতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতা আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপাদান নয়, বুদ্ধিও আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জ্ঞানের অনিবার্যতা ও সামান্যতা এই দুটি লক্ষণ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার দান, এখানে অভিজ্ঞতার কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেই। আর সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাক্যও বিশ্লেষণের আওতাভুক্ত নয়। সুতরাং বলা যায় যে, যুক্তিগ্রাহ্য বা নৈয়ায়িক সমর্থকবাদ একদেশদর্শী, অবৈজ্ঞানিক ও খামখেয়ালী মতবাদ।

ঘ. অজ্ঞেয়তাবাদ (Agnosticism) : অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান লাভ অসম্ভব : অজ্ঞেয়তাবাদ অনুসারে পরমসত্তার জ্ঞান সম্ভব নয়। আমরা জড়, গতি, চেতনার বাইরে কোনো দ্রব্যের বিষয় জানতে পারি না। দৃশ্যমান জগতের অতীত কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান লাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা শুধু বস্তুর অবভাসিক দিক সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারি, কিন্তু বস্তুর আসল রূপ আমাদের বোধের অতীতই থেকে যায়। হার্বার্ট স্পেন্সার বিশ্বাস করতেন যে, পরম তত্ত্বের জ্ঞান অসম্ভব। আধুনিক যুগে অজ্ঞেতাবাদের সঙ্গে হাক্সলির নাম জড়িত। হাক্সলি অজ্ঞেয়তাবাদ ধর্মের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, যদিও আমরা খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান নই, তবুও তাঁর স্বরূপ আমরা জানতে পারি না।

সমালোচনা

Criticism

এই মতবাদ নৈরাশ্যব্যঞ্জক : নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদের মতো অজ্ঞেয়তাবাদ নৈরাশ্যব্যঞ্জক। কিন্তু এই ধরনের মতবাদ দর্শনের ইতিহাসে তেমন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। কেননা মানুষের অশান্ত আত্মার চিরন্তন আকুতি তাকে অজানাকে জানার পথে চিরচঞ্চল করে রেখেছে। মানুষের অন্তহীন অভিযান ছুটে চলে লোকে লোকে নূতনের সন্ধানে। বিংশ শতাব্দীর শতধাদীর্ণ মানুষের মধ্যে যা কিছুর অভাব থাকুক, অপ্রমেয় অভিযানস্পৃহার কোনো কমতি নেই; আর এই হার-না-মানা জীবন দর্শন তাকে সকল নৈরাশ্য ও হতাশা জয় করতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন মত ও পথের গোলকধাঁধার মধ্যে আমাদের জন্য এ বড় আশার কথা।

ঙ. অস্তিত্ববাদ (Existentialism) : অস্তিত্ববাদ ও নিসর্গবাদ ভাববাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ : অস্তিত্ববাদ দর্শনের ইতিহাসে একটি অতি সাম্প্রতিক মতবাদ। এই মতবাদ মানুষের বক্তব্য ও স্বাধীনতার ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে। নিসর্গবাদ ও ভাববাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অস্তিত্ববাদের উদ্ভব ঘটে। নিসর্গবাদ অনুসারে পার্থিব ঘটনাবলি যান্ত্রিক নিয়মাবলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; জড় জীবন ও মন পরস্পর বিভিন্ন হলেও এইসব পার্থিব ঘটনার প্রকারভেদ। মানুষের ক্রিয়াবলি তার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং শেষ পর্যন্ত এইসব জড়েরই ক্রিয়া। সুতরাং মানুষের স্বাধীনতার ধারণা অলীক। আবার ভাববাদের সিদ্ধান্তও নিসর্গবাদের মতো। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার বিরোধী। ভাববাদ অনুসারে পরম ধীশক্তি বিশ্বজগতের মূল শক্তি। জড়, জীবন, চৈতন্য, সবকিছুর উৎস পরম ধীশক্তি। পরম ধীশক্তির মধ্যেই মানুষের ইচ্ছা

অন্তর্লীন রয়েছে। কাজেই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা অলীক। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নিসর্গবাদ ও ভাববাদ উভয় মতবাদই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে। অস্তিত্ববাদ মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাবিরোধী নিসর্গবাদ ও ভাববাদের প্রতিক্রিয়ার পরিণতি।

অস্তিত্ববাদের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন :

প্রথমত, অস্তিত্ববাদীরা কোনো পূর্ণাঙ্গ মতবাদ গঠনের পক্ষপাতী নন। মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের জীবন অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে এই মতবাদ অগ্রসর হয়, কিন্তু এ বিশ্লেষণের কোনো বিশদ পন্থা নির্দেশ করে না। এই মতবাদ ভীতি, দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য, বিশ্বাস, আশা, প্রেম প্রভৃতি মানবমনের অবস্থার বিশ্লেষণে তৎপর, এই সবের তাৎপর্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট।

দ্বিতীয়ত, এই অস্তিত্ববাদ মানবকেন্দ্রিক : অস্তিত্ববাদ মানুষের অস্তিত্ব, তার ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্যের ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে। অস্তিত্ববাদ মানবকেন্দ্রিক মতবাদ। মানুষই এই মতবাদের সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য' একথা প্রতিপন্ন হয়েছে। মানুষের সাথে সম্পর্কে বিবর্জিত হয়ে কোনো বস্তুই এই মতবাদের বিবেচ্য নয়। এই মতবাদ অনুযায়ী পরমসত্তা কিংবা জগৎ অথবা জগতের কোনো বস্তুর ব্যাখ্যা মানুষের প্রসঙ্গ ছাড়া সম্ভব নয়। এই মতবাদের নিছক সমাজ-সংস্কারক স্পৃহা বড় হয়ে উঠতে পারে নি, যাঁরা মানুষের প্রেক্ষিতে সবকিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী।

তৃতীয়ত, অস্তিত্ববাদীরা উপাদান ও অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন : ভাববাদীরা বস্তুর উপাদানকে বস্তুর অস্তিত্বের পূর্বগামী বলে মনে করেন। কিন্তু অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা অস্তিত্বকে উপাদানের পূর্বগামী বলে মনে করেন। মানুষ আছে, মানুষের এই মৌল অভিজ্ঞতাই মানুষের অস্তিত্বের নির্দেশক।

এই মতবাদের অনুসারী দার্শনিকদের বক্তব্য এই যে, মানুষকে আদর্শীকৃত না করে বরং তার বাস্তব জীবনকেই বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। মানুষের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন দর্শনের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

চতুর্থত, অস্তিত্ববাদ মানুষের অভিজ্ঞতার আত্মগত দিকের ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে। নিসর্গবাদী ও জড়বাদীরা মানুষকে জড়, গতি প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেন। সাম্প্রতিক জড়াত্মক মতবাদসমূহ মনকে বস্তুতে পরিণত করে। ফলে মনের আত্মগত, অন্তর্মুখী স্বভাব, মনের বিশেষত্ব উপেক্ষিত হয়। মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদও মানুষকে জড়, গতি ও সমাজের সৃষ্টি বলে মনে করে। কিন্তু অস্তিত্ববাদ এইসব মতবাদের সমালোচনা করে, মানুষের অভিজ্ঞতার অন্তর্মুখী দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করে। এই মতবাদ ভাববাদ ও জড়বাদ, উভয় মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভূত হয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের অভিজ্ঞতা চিন্তা কিংবা জড় দ্বারা ব্যাখ্যা হতে পারে না।

পঞ্চমত, অস্তিত্ববাদীরা মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর গুরুত্বারোপ করে। এই মতবাদ নৈতিকতার ওপর নির্ভরশীল। অস্তিত্ববাদ বিশ্বপরিকল্পনায় মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বারোপ করে। অস্তিত্ববাদীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির যুগ

এসেছে, সমষ্টির বেদীমূলে ব্যক্তির আত্মবলিদানের যুগ ফুরিয়েছে। কবি নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতাটির নিম্নলিখিত দুটি পঙতিতে অস্তিত্ববাদের মূল সুর ধরা পড়েছে :

> 'বেদনার যুগ মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ, আজি
> কেউ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি।'

ষষ্ঠত, অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যক্তিগত ব্যাখ্যায় রঞ্জিত। কাজেই এই দর্শনে লেখকের ব্যক্তিগত দুর্বলতা পরিস্ফুট। লেখকের অভিজ্ঞতা উচ্চস্তরের না হলে তাঁর লেখায় আটপৌরে ভাব প্রকাশ পাবে। লেখকের মধ্যে যে ত্রুটি থাকবে, তাঁর লেখায় তা পরিলক্ষিত হবে। কিরকেগার্ড (Kierkegard) ও নিটশে (Nietzsche) ছিলেন স্নায়বিক, তাঁদের লেখার মধ্যে তাই অংশ বিশেষ অত্যন্ত সরস হয়েছে, আবার অংশবিশেষ নীরস হয়েছে, জেসপার (Jasper) আবার অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সপ্তমত, অস্তিত্ববাদীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ব্যক্তি সমাজ-সভ্যতা, ভৌগোলিক ও দৈহিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হলেও নিজের লক্ষ্য নির্বাচন করে সেই মোতাবেক কাজ করার ক্ষমতা আছে। মানুষ কতগুলি অবস্থার অধীন হলেও তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে সে এগিয়ে যায়, যেতে পারে, যাওয়ার শক্তি তার আছে। অস্তিত্ববাদীরা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিরোধী পরিবেশকে মানবতাবিরোধী বলে মনে করেন।

অষ্টমত, অস্তিত্ববাদীরা শূন্যতা বা নৈরাশ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত। অস্তিত্ববাদ মানবজীবনের বাস্তব দিক নিয়ে আলোচনা করে। মানুষের জীবনের আত্মগত চিত্র, একাকিত্ব, নৈরাশ্য ও বিভীষিকা অস্তিত্ববাদীদের নৈরাশ্যবাদের দিকে আকর্ষণ করে। নিটশে ও সাঁত্রে শেষ পর্যন্ত নেতিবাদ বা শূন্যতাবাদে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে অস্তিত্ববাদীদের বাস্তব জীবনজাত নৈরাশ্যবাদ নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়। অস্তিত্ববাদীরা জীবনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে থাকেন। জীবনকে উন্নততর ও মহত্তর করার আদর্শ ও প্রতিজ্ঞা তাঁদের মনে।

বিভিন্ন অস্তিত্ববাদী : কিরকেগার্ড (Kierkegard), জেসপার (Jasper), হাইডেগার (Heidegger), মার্সেল (Mercel), নিটশে (Nietzsche) ও সাঁত্রে (Satre) অস্তিত্ববাদী হিসেবে পরিবিদিত। নিটশে মূলত অস্তিত্ববাদী নন, তবে তাঁর দর্শনে অস্তিত্ববাদীদের আভাস পরিব্যক্ত হয়েছে। কিরকেগার্ড অস্তিত্ববাদের জনক, হেগেলীয় ভাববাদের বিশুদ্ধ চিন্তার বিরুদ্ধে তিনি চিন্তার বাস্তব রূপ প্রদর্শনের প্রয়াস পান। জেসপার সত্তার রহস্যভেদ করেন; হাইডেগার অস্তিত্বের অপূর্ণতার উপর আলোকপাত করেন, মার্সেলের দর্শন দৈহিক অবতারত্বের নির্দেশ দেয় এবং সাঁত্রে শূন্যতায় পাড়ি জমান।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সত্যতা সম্পর্কীয় পরীক্ষা
EXAMINATION OF THE THEORY OF TRUTH

Truth is immorital; error is mortal. – **Mark Baker Eddy**

- ❑ সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা
- ❑ স্বতঃপ্রতীতিবাদ
- ❑ অনুরূপতাবাদ
- ❑ সঙ্গতিবাদ
- ❑ প্রয়োগবাদ

সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা
Nature and Test of truth

অবধারণের মাধ্যমেই চিন্তার অভিব্যক্তি : দর্শন জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। জীবন ও জগতের জ্ঞান দর্শনের লক্ষ্য, অবধারণের মাধ্যমে তা ব্যক্ত হয়ে থাকে। অবধারণ চিন্তার সরলতম সত্যতার দাবি করে, কিন্তু সকল অবধারণ সত্য নাও হতে পারে। যেমন– 'সকল মানুষ মরণশীল,' 'জল বায়বীয়', এখানে প্রথম অবধারণটি সত্য কিন্তু দ্বিতীয় অবধারণটি মিথ্যা। এখন কথা হলো এই যে, সত্য অবধারণের মাধ্যমে সঙ্গতভাবে যুক্তি বিন্যাস করলে আমরা সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতে পারি। কিন্তু সত্য অবধারণকে কেন্দ্র করে যুক্তি গড়ে উঠলে তার সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য। অবধারণের সত্যতার ওপর আমাদের চিন্তার বুনিয়াদ নির্ভর করে। কেননা অবধারণের মাধ্যমেই জটিল যুক্তি শৃঙ্খল গড়ে ওঠে, অবধারণ থেকেই আমাদের চিন্তার যাত্রারম্ভ হয়। কাজেই অবধারণের সত্যতা নিরূপণের মাধ্যমেই আমরা সত্যের স্বরূপ জানতে পারি। অবধারণ ভাষায় ব্যক্ত হলে তাকে যুক্তিবাক্য বলা হয়।

অবধারণের সত্যতা নিরূপণের পদ্ধতি সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। এই সম্পর্কে চারটি মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা :

(ক) স্বতঃপ্রতীতিবাদ (The Self-evidence Theory)
(খ) অনুরূপতাবাদ (The Correspondence Theory)
(গ) সঙ্গতিবাদ (The Pragmatic Theory)
(ঘ) প্রয়োগবাদ (The Pragmatic Theory)

(ক) স্বতঃপ্রতীতিবাদ (The Self-evidence Theory) : স্বতঃপ্রতীতিবাদ অনুসারে সংশয়াতীত অবধারণ সত্য : এই মতবাদ অনুসারে অবধারণের সত্যতা স্বতঃপ্রতীতি হয়। যে সমস্ত অবধারণ সংশয়াতীত সেই অবধারণসমূহ সত্য। অবধারণ সত্য কিংবা মিথ্যা উভয়ই হতে পারে। সত্য ও অসত্যের মাপকাঠিতে অবধারণ সন্দেহাতীত অথবা সংশয়যুক্ত হতে পারে। সন্দেহাতীত অবধারণের সত্যতা

স্বতঃপ্রতীতি। যেমন : ২+২=৪; ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ ইত্যাদি। এই ধরনের অবধারণ থেকে যে সকল অবধারণ বা যুক্তিবাক্য পাওয়া যায় সেগুলি সন্দেহাতীত হতে পারে।

দেকার্তের মতে, স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা : বিখ্যাত দার্শনিক দেকার্তে এই মতের প্রবর্তক। তাঁর মতে, স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতাই সত্যতার মানদণ্ড। যে অবধারণ বা যুক্তিবাক্য স্পষ্ট ও পরিস্ফুট তা সত্য হতে বাধ্য। দেকার্তে বলেন যে, সবকিছুকে সন্দেহ করা যায় কিন্তু সংশয়কারী আত্মাকে সন্দেহ করা যায় না। আত্মজ্ঞানের সত্যতা স্বতঃপ্রতীত। আত্মজ্ঞান থেকে নিশ্চিতরূপে খোদা সম্পর্কিত জ্ঞান ও খোদা সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে বিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞান আসে। কাজেই অবধারণ বা যুক্তিবাক্যের সত্যাসত্য অবধারণ বা যুক্তিবাক্যের ওপর নির্ভরশীল। স্পিনোজাও এই মতের সমর্থক।

সমালোচনা
Criticism

স্বতঃপ্রতীতিবাদ নিম্নলিখিত কারণে সন্তোষজনক নয়।

প্রথমত, স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা নিশ্চিত মাপকাঠি নয় : স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা অবধারণ বা যুক্তিবাক্যের সত্যতা নিরূপণের একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা একটি অবধারণ বা যুক্তিবাক্য একজনের কাছে স্পষ্ট ও পরিস্ফুট এবং অপর জনের কাছে অস্পষ্ট অপরিস্ফুট মনে হতে পারে এবং হয়েও থাকে। সে ক্ষেত্রে স্পষ্টতা ও পরিস্ফুটতা সত্যতা নিরূপণের মাপকাঠি হতে পারে না। 'সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে' 'পৃথিবী স্থির' ইত্যাদি অবধারণ বা যুক্তিবাক্য মানুষ একদিন সংশয়াতীতরূপে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আজ এই অবধারণ বা যুক্তিবাক্যে সত্যতা কেউই স্বীকার করে না।

দ্বিতীয়ত, স্বতঃপ্রতীতিবাদ ব্যক্তিগত ব্যাপার : স্বতঃপ্রতীতি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেই এ অবধারণ বা যুক্তির সত্যাসত্য পরিমাপের মানদণ্ড হতে পারে না। যুক্তির এই মতের সমর্থকদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে, তাঁরা যুক্তিবাক্যের নিশ্চয়তা সম্পর্কে একমত হতে পারেন নি। দেকার্তের মতে, আত্মজ্ঞান সম্পর্কীয় অবধারণ সর্বাপেক্ষা সংশয়াতীত, কিন্তু স্পিনোজা বলেন যে, খোদা সম্পর্কীয় অবধারণই সর্বাপেক্ষা সংশয়াতীত, একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, অবধারণ সত্য বা অসত্য, সংশয়াতীত বা সংশয়পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু অবধারণ বা যুক্তিবাক্যের সত্যতা স্বতঃপ্রতীতির আওতাভুক্ত নয়।

(খ) অনুরূপতাবাদ (The Correspondence Theory) : অনুরূপতাবাদ অনুসারে ধারণা ও বস্তুর সামঞ্জস্য নির্দেশক অবধারণ সত্য : এই মতবাদ অনুসারে, অবধারণের সত্যতা নির্ভর করে ধারণা ও বস্তুর সামঞ্জস্যের ওপর। যখন ধারণা বস্তুর অনুরূপ হবে তখন অবধারণ সত্য হবে, আর যখন ধারণা বস্তুর অনুরূপ হবে না তখন অবধারণ অসত্য হবে। যেমন : 'কুইনাইন তিক্ত'– এই অবধারণটি সত্য। কেননা এ বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার 'দুগ্ধ নীল'-এই অবধারণটি অসত্য, কারণ বাস্তব জগতে নীল দুগ্ধের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই মতবাদটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কেননা এ সত্যাসত্যের লৌকিক মতবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বস্তুবাদী চিন্তাবিদরা অনুরূপতাবাদের সমর্থক। তাঁরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যেমন- লৌকিক বস্তুবাদ, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, নবব্স্তুবাদ ও বিচারমূলক বস্তুবাদ। বিভিন্ন বস্তুবাদী সম্প্রদায় 'অনরূপতা' কথাটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।

লৌকিক বস্তুবাদ : অনুরূপতা সম্পর্কে লৌকিক বস্তুবাদ : এই গোষ্ঠীর দার্শনিকদের মতে, আমরা বস্তুকে সরাসরি জানতে পারি। কাজেই 'অনুরূপতা'র অর্থ হলো সরাসরি জ্ঞাত বস্তুর সাথে অবধারণের মিল। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান বাস্তব অবস্থার অনুরূপ হলে তা সত্য হবে, আর তা বাস্তব জগতের অনুরূপ না হলে মিথ্যা হবে। এই মতবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না বলে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীরা 'অনুরূপতা' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করেন না।

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ : অনুরূপতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ : বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বা প্রতীকবাদ অনুসারে আমরা বস্তুকে সরাসরি জানতে পারি না, বস্তুর ধারণা বা প্রতীকের মাধ্যমেই বস্তুকে জানি। এই মতবাদ অনুযায়ী বস্তু নয়, বস্তুর ধারণা বা প্রতীকই জ্ঞানের বিষয়বস্তু। কাজেই এই অনুসারে 'অনুরূপতা'র অর্থ হলো প্রতীক বা ধারণার সাথে প্রতীকলব্ধ বস্তুর সামঞ্জস্য। এই মতবাদ গ্রহণীয় নয়, কেননা বস্তুর সাথে ধারণার সাদৃশ্য খুঁজে বের করা সুকঠিন।

নব্যবস্তুবাদ : অনুরূপতা সম্পর্কে নব্যবস্তুবাদ : নব্যবস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এক ও অভিন্ন। এই মতবাদ অনুযায়ী 'অনুরূপতা' হলো জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের অভিন্নতা বা একাত্মতা; এই মতবাদ গ্রহণ করলে 'কাক কালো'-এই অবধারণের কাকের জ্ঞান কালোর জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিচারমূলক বস্তুবাদ : অনুরূপতা সম্পর্কে বিচারমূলক বস্তুবাদ : বিচারমূলক বস্তুবাদ অনুসারে আমরা কোনো বস্তুকে সরাসরি জানতে পারি না, বস্তুর 'স্বভাবমিশ্র' বা 'আন্তরসত্তা'কেই জেনে থাকি। এই মতবাদ অনুযায়ী অনুরূপতা হলো বস্তুর ধারণা এবং স্বভাবমিশ্র বা আন্তরসত্তার সাহায্যে জানা বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

সমালোচনা

Criticism

প্রথমত, অনুরূপতা বস্তুবাদী মতবাদ, কাজেই বস্তুবাদের ত্রুটি এই মতবাদে পরিলক্ষিত হয়। বস্তুবাদীরা বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন না, বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকেন। বস্তুবাদী চিন্তাবিদরা বস্তুর অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ করতে পারেন না, তেমনি বস্তুর ধারণা ও বস্তুর অনুরূপতাও প্রমাণ করতে পারেন না। বস্তুবাদের মতো অনুরূপতাবাদও প্রমাণের অযোগ্য। কাজেই এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, অনুরূপতা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ পরস্পরবিরোধী। কাজেই এই মতবাদের সাহায্যে অবধারণের সত্যতা প্রমাণ করা যায় না।

(গ) সঙ্গতিবাদ (The Pragmatic Theory) : সঙ্গতিবাদ অনুসারে সঙ্গতিপূর্ণ অবধারণই সত্য : আধুনিক দর্শনে সঙ্গতিবাদ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। হেগেল, ব্রাডলি, বোসানকো প্রমুখ দার্শনিক এই মতবাদের সমর্থক। এই সব দার্শনিকের মতে,

কোনো অবধারণই স্বতন্ত্রবাদের সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। কোনো অবধারণ যখন অন্যান্য অবধারণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় কেবল তখনই সেই অবধারণকে সত্য বলা চলে। কোনো বিশেষ অবধারণ যখন অন্যান্য অবধারণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সসংবদ্ধমণ্ডলী গড়ে তোলে তখন সেই অবধারণটি সত্য হয়ে থাকে। সংবদ্ধমণ্ডলী গঠন করতে না পরিলে কোনো অবধারণই সত্য হতে পারে না। 'আম মিষ্টি'–এই অবধারণ স্বতন্ত্রভাবে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না, কেবল অন্যান্য অবধারণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সংবদ্ধমণ্ডলী সৃষ্টি করলেই তা সত্য হতে পারে।

অবধারণের মণ্ডলী গঠনের ওপর তার সত্যতার তারতম্য নির্ভর করে : বিভিন্ন অবধারণের স্বরূপ বিচার করলে দেখা যায় যে, সব অবধারণ সমানভাবে সত্য নয়। সংবদ্ধমণ্ডলী রচনার ক্ষমতার উপরই অবধারণের সত্যতা নির্ভর করে। যে অবধারণের মণ্ডলী যত অধিক প্রসারিত হয় সেই অবধারণ ততোধিক সত্য। অনুরূপভাবে অবধারণের মণ্ডলীর পরিধি যত অল্প সেই অবধারণের সত্যতা সেই পরিমাণে কম। কাজেই সকল অবধারণের সত্যতা একরূপ নয়, সুসংবদ্ধমণ্ডলী প্রসারিত হতে হতে চরম সীমায় পৌঁছলে পরম সত্য লাভ করা যায়। এই অবস্থায় পরম অভিজ্ঞতা লাভ হবার কথা, কিন্তু মানুষের পক্ষে পরম অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা মানুষ সসীম, তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষের দিক থেকে বিচার করলে কোনো অবধারণই চরম সত্য কিংবা চরম মিথ্যা হতে পারে না। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ পরিণামগত, প্রকাশগত নয়। মিথ্যা আংশিকভাবে সত্য। অবধারণ মণ্ডলীর সঙ্গে কোনো অবধারণ সঙ্গতিপূর্ণ না হলে তাকে অসত্য অবধারণ বলা যায়। এ আপেক্ষিক ব্যাপার। পরম অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে মিথ্যা বলে কিছু নেই। মানুষের বুদ্ধি সসীম বলে তার পক্ষে পরম সত্য লাভ করা সম্ভব নয়। সে কারণে মানুষকে খণ্ড জ্ঞান নিয়ে তৃপ্ত থাকতে হয়।

সমালোচনা
Criticism

প্রথমত, বাস্তব দৃষ্টিকোণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ : হেগেল ও তাঁর অনুসারীদের মতে, কোনো অবধারণই স্বতন্ত্রভাবে সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে না। বস্তুবাদীরা এই মতবাদের সমালোচনা করে বলেন যে, কীভাবে একই অবধারণ আংশিকভাবে সত্য কিংবা আংশিকভাবে মিথ্যা তা বুঝে উঠা দুরূহ। কারণ বাস্তব জীবনে আমরা সত্য ও মিথ্যাকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে করি– সত্যকে মিথ্যার বিপরীত বলে গ্রহণ করি। বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ২+২=৪ (দুই+দুই=চার)। এই অবধারণ আংশিকভাবে সত্য ও আংশিকভাবে মিথ্যা হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ধারণা ও বস্তুর সম্পর্ক বিবর্জিত : সঙ্গতি বলতে বস্তুর ধারণার সাদৃশ্য বুঝায়। বস্তুবাদীরা বলেন যে, অবধারণের সত্যতা পরীক্ষা করতে হলে ধারণার বিষয়বস্তুকে বাদ দিলে চলবে না।

মতবাদের উৎকর্ষ : পরিশেষে বলতে হয় যে, লৌকিক বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় এই মতবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। তথাপি সত্যের পরীক্ষায় 'এই মতবাদই চরম মতবাদগুলিকে অস্বীকার করে। জীবনজগৎ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা গঠনে বিভিন্ন অবধারণের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বের করা বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই সঙ্গতিবাদই সুসংবদ্ধমণ্ডলীর সহায়তায় অবধারণের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারে।

(ঘ) প্রয়োগবাদ (The Pragmatic Theory) : কার্যকারিতা বা সাফল্য সত্যের মাপকাঠি : উইলিয়াম জেমস, সিলার, জন ডিউই প্রমুখ দার্শনিক এই মতবাদের প্রবর্তক। তাঁদের মতে, কার্যকারিতা বা সাফল্যই সত্য নিরূপণের মাপকাঠি। কোনো অবধারণ, কোনো যুক্তি, কোনো মতবাদ, কোনো ধারণা সত্য কি মিথ্যা তা নির্ভর করে তার কার্যকারিতা বা প্রয়োজন চরিতার্থতায়।

জেমস : উইলিয়াম জেমসের মতে, ধারণার কোনো স্বতঃপ্রামাণ্য গুণ নেই। সত্যতা ধারণার এক আগন্তুক গুণ বিশেষ। যখন কোনো ধারণা জীবনের কাজে আসে, জীবনের প্রয়োজন সাধনে সহায়ক হয়, তখন সেই ধারণাটি সত্য বলে বিবেচিত হয়। কোনো ব্যক্তির কাজে একটি ধারণা তখন সত্য হয় যখন ধারণাটি তার কাছে ফলপ্রসূ হয়। জেমস বলন, "সত্য ধারণা হলো এমন ধারণা যা আমরা গ্রহণ করতে পারি, পরীক্ষা করতে পারি, নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারি, প্রমাণ করতে পারি। মিথ্যা ধারণাসমূহ এই সকল শর্তের অধীন নয়।"[১]

জন ডিউই : জন ডিউইর মতে, সত্যতা স্বতঃপ্রতীতির বিষয় নয়, এ সুপরিচালিত অনুসন্ধানের ফল; কোনো কোনো অবধারণ সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হলে সে বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করি, সন্দেহ দূর হলে অবধারণটিকে সত্য বলে গ্রহণ করি। কাজেই পরীক্ষার ফলাফলের উপর অবধারণের সত্যতা নির্ভরশীল।

সিলার : সিলার সত্যতার স্বতঃপ্রতীতি অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা অবধারণের সত্যতার মাপকাঠি। কোনো ভবিষ্যদ্বাণী যখন বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন সেই অবধারণ সত্য হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের মতে, অবধারণের ব্যবহারিক কার্যকারিতা বা সাফল্য তার সত্যতার নির্দেশক।

সমালোচনা
Criticism

এই মতবাদে আদর্শের স্থান নেই। প্রয়োগবাদ আত্মগত ও ব্যক্তিগত প্রবণতার ওপর নির্ভরশীল। এই মতবাদে কোনো সাধারণ, সামান্য নীতিও সত্য, ন্যায় ও সৌন্দর্য কোনো আদর্শের স্থান নেই। কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে যা সত্য, সুন্দর বা কল্যাণকর অপর কোনো ব্যক্তির কাছে তা তেমন নাও হতে পারে।

অবধারণের কার্যকারিতা সত্যের পরিমাপক নয়। অবধারণের কার্যকারিতা বা সাফল্য তার সত্যতার নির্দেশক বলে প্রয়োগবাদীরা যে মতবাদ প্রচার করেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, কোনো কোনো ভ্রান্ত অবধারণও বাস্তব জীবনে সাফল্যের সূচনা করতে পারে। অপরপক্ষে, সত্য অবধারণও অনেক সময় কোনো প্রয়োজনে নাও আসতে পারে। কাজেই বাস্তব জীবনের প্রয়োজন চরিতার্থতার আলোকে অবধারণের সত্যতা সব সময় পরীক্ষা করা চলে না।

---

[১] True ideas are those that we can assimilate, validate, corroborate and verify. False ideas are those that we cannot. – William James

উইনডেলব্যাণ্ডের সমালোচনা : এই মতবাদে কোনো উচ্চ আদর্শর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। প্রয়োগবাদের সম্মুখে কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য নেই। দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তকার উইনডেলব্যান্ড বলেন যে, "প্রয়োগবাদে পথের ও লক্ষ্যের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ চিন্তার ওপর ইচ্ছার বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে।"[১]

নতুন মতবাদ : প্রয়োগবাদ সার্থক দার্শনিক মতবাদ না হলেও এ দর্শনের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে অবলোকন করার সুযোগ দিয়েছে। দর্শনের ইতিহাসে প্রয়োগবাদ এক ধরনের গণতান্ত্রিক মতবাদ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মহৎ আদর্শ-সত্য সুন্দর কল্যাণের নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ যুগ যুগ ধরে মানবজাতিকে মহমানবতার মহাসম্মিলনের দিকে আকর্ষণ করছে। মানব সভ্যতা যত মত ও পথের দ্বারা দীর্ণ হোক না কেন চিরন্তনের আহ্বান সে কোনো দিনই উপেক্ষা করতে পারবে না। চিরন্তনের আদর্শ চিরদিনই মানুষকে সামনের দিকে টানবে।

---

১ It represents a victory of notion of individualism which, in the decay of our intellectual culture, would realease the elementary force of the will and let it pour itself over the realm of pure thought. It calls into question one of the greatest achievements of civilisation, the purity or will to truth. — Windelband

সপ্তম অধ্যায়
সৃষ্টি ও বিবর্তনবাদ
CREATION AND THEORY OF EVOLUTION

Changing order, orderly change, and this is everywhere in nature organic and inorganic in individual and in social life– for this vast conception, now everywhere diffusing, often expressed, rarely as yet applied, we need some general term– and this Evolution. - J. A. Thomson and P. Geddes

- ❑ বিবর্তনবাদ কাকে বলে
- ❑ বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য
- ❑ সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদের মধ্যে পার্থক্য
- ❑ বিবর্তনবাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ
- ❑ বিবর্তনবাদের প্রকারভেদ
- ❑ যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ
- ❑ পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ
- ❑ সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ
- ❑ উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ।

বিবর্তনবাদ কাকে বলে

What is Evolution

আমাদের ও আমাদের পরিবেশের বড় কথা হলো পরিবর্তন। জগতের যে দিকেই অবলোকন করি সে দিকেই পরিবর্তন আমাদের নজরে পড়ে। পরিবর্তন একটি সর্বপ্লাবী ঘটনা। কালই পরিবর্তনের ধারণা প্রদান করে। সবকিছুই কালের কবলে নিপতিত হচ্ছে, কালের সর্বগ্রাসী প্রবাহ থেকে কোনো কিছুরই পরিত্রাণ নেই। কিছুই স্থির নয়, সবকিছুই পরিবর্তনের পথে নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে। গ্রিক দার্শনিক হিরাক্লাইটাস এই পরিবর্তনকেই বিশ্বজগতের মূল সত্য বলে মনে করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "প্রত্যেক বস্তুই প্রবাহিত হয়ে চলছে।"[১] কিন্তু এই পরিবর্তন বিশৃঙ্খলাপূর্ণ নয়। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দিয়ে এই পরিবর্তন চলে আসছে। এই শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবর্তনই আমাদেরকে বিবর্তনবাদের ধারণা গঠনে সহায়তা করে।

---

* Everything flows– Heracleitus.

বিবর্তন বলতে ক্রমবিকাশ বুঝায়। ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অব্যক্ত অস্ফুট শক্তির ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হওয়ার নাম বিবর্তন। জীবন ও জগতের নিয়ত পরিবর্তনশীলতাই আমাদেরকে বিবর্তনের ধারণায় উপনীত হতে সহায়তা করে। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, পথ-প্রান্তর, গ্রহ-উপগ্রহ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বদা পরিবর্তন চলছে। মানুষের জগতেও পরিবর্তনের শেষ নেই। রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিন্তাকল্পনা, সাহিত্য-দর্শন, শিল্পকলা, রাজনীতি সমাজনীতি মানবজীবনের সকল স্তরেই পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে। কাজেই বিবর্তনবাদ বলতে বিশ্বজগতে ক্রমবিকাশকে বুঝিয়ে থাকে। উদ্ভিদজগৎ, জীবজগৎ, সৌরজগৎ সম্পর্কে বিবর্তন শব্দটি প্রযুক্ত হলে সর্বজনীন ক্রমবিকাশের ধারায় ঐ বিশেষ খাতে ক্রমবিকাশকেই বুঝিয়ে থাকে। বিবর্তন শব্দটি ব্যাপক ব্যঞ্জনাময়। এ বিশ্বজগতের সর্বমুখী ক্রমপরিবর্তনকেই বুঝিয়ে থাকে। বিবর্তনবাদ জীবনজগতের চলমান দিকের ভাষ্য।

বিবর্তনবাদ অনুসারে জগতের যাবতীয় বস্তু সহজ ও সরল অবস্থা থেকে ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান জটিল অবস্থায় উপনীত হয়েছে। জগতের কোনো বস্তু একদিনে সৃষ্ট হয় নি, প্রত্যেক বস্তুই ধীর ও ক্রমিক পরিবর্তনের ফল। আজ আমরা জগতের যে রূপ দেখতে পাচ্ছি তা দীর্ঘকালের সুশৃঙ্খল পরিবর্তনের ফল। বিবর্তনবাদ জীবন ও জগতের পরিবর্তনশীল অবস্থায় পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত। বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে হার্বার্ট স্পেন্সার সত্যই বলেছেন যে, বিবর্তন প্রক্রিয়া সব সময়েই সহজ-জটিল অবস্থায়, সদৃশ ও সমসাত্ত্বিক অবস্থা থেকে অসদৃশ্য ও বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায় অনির্দিষ্ট ও অসংবদ্ধ অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ অবস্থায় চালিত হয়।"[১]

বিবর্তনের মতো বিপ্লবও পরিবর্তন আনয়ন করে, একটা পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু বিপ্লবের পরিবর্তন ও বিবর্তনের পরিবর্তন, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিপ্লবের মধ্যে আছে আকস্মিকতা, আর বিবর্তনের মধ্যে আছে ধারাবাহিকতা। বিপ্লবের ফলে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জীবনে আসে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, কিন্তু বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা ধারাবাহিক। তাই বিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া আর বিপ্লব একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বিবর্তন প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক, আর বিপ্লব অপ্রাকৃতিক–বিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের হাত নেই, বিপ্লব মানুষের সৃষ্টি। বিবর্তন সর্বব্যাপী, বিপ্লব প্রধানত সামাজিক রাষ্ট্রীয়।

বিবর্তন উদ্দেশ্যমুখি, অন্ধ নয়। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীরা বিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনো সচেতন উদ্দেশ্যের নির্দেশ না করলেও বিবর্তন যে ঐক্যবিধান, পৃথকীকরণ ও নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারা জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব কল্পনা করে বিবর্তন পদ্ধতিকে অন্ধ ও লক্ষ্যহীন করে তুলেছেন। উদ্দেশ্যবিহীন বিবর্তন যে অচিন্তনীয়, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীরা তা ভাবতে পারেন নি। ভাববাদী দার্শনিকরা বিবর্তনের যে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হচ্ছে তা সঙ্গতভাবেই পেশ করেছেন।

---

[১] The process of evolution is always from a simple to a more complex form, an undifferentiated and homegeneous to a differentiated and heterogenous state, from an indefinite and incoherent to a difinite and coherent condition.– Herbert Spencer.

বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Evolution

বিবর্তনবাদ অনুসারে এই জগৎ একদিনে সৃষ্টি হয় নি। ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, "বিবর্তন প্রক্রিয়া সব সময়ই সহজ থেকে জটিল অবস্থায়, সদৃশ ও সমসাত্ত্বিক অবস্থা থেকে অসদৃশ ও বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায়, অনির্দিষ্ট ও অসংবদ্ধ অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ অবস্থায় চালিত হয়।" অর্থাৎ বিবর্তনের মধ্যে পরিবর্তন আছে। বিবর্তন লক্ষ্যাভিসারী। সে পরিবর্তন একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে। এই পরিবর্তন শৃঙ্খলাপূর্ণ।

বিবর্তন প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্য** আছে। যথা– (১) ঐক্যবিধান (Concentration), (২) পৃথকীকরণ (Differentiation) ও (৩) নিয়মানুগত্য বা নিয়ন্ত্রণ (Determination)।

১. ঐক্যবিধান : বিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় আদিম উপাদানসমূহ বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। বিবর্তন প্রক্রিয়ার জন্যই বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত আদিম উপাদানসমূহ একত্রে সমবেত হয়ে সংহতি রচনা করে। জগতের উপাদান অগ্নিময় গ্যাসীয় পদার্থরূপে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৌরজগতের সৃষ্টি করল। জৈবিক বিবর্তনও অনুরূপভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

২. পৃথকীকরণ : পৃথকীকরণ বিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্য একটি পথ। বিবর্তনের সরলতম অবস্থায় ঐক্যবিধান প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। কিন্তু ঐক্যবিধানের পরবর্তী স্তরে আসে পৃথকীকরণ। এই পৃথকীকরণ ঐক্যবদ্ধ অবস্থার মধ্যেই ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আদিম জীবকোষ কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুসমূহের ঐক্যবদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। এই জীবকোষ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরও বিভক্ত হয়ে জীবকোষ বিভক্ত করে দেয়, আর বিভক্ত জীবকোষগুলি আরও বিভক্ত হয়ে জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন করে। সৌরজগতের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে বিক্ষিপ্ত অগ্নিময় গ্যাসীয় পদার্থ ঐক্যবদ্ধ হয়, পরে এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থা থেকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে উদ্ভূত হয় সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ অর্থাৎ সমগ্র সৌর পরিবার।

৩. নিয়মানুগত্য বা নিয়ন্ত্রণ : ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ আসে নিয়মানুগত্য। বিবর্তন প্রক্রিয়া শুধু ঐক্যবদ্ধ অবস্থার পৃথকীকরণ নয়, বিবর্তন প্রক্রিয়ার নিয়মের অধীনে বিবর্তন সব সময়ই একটা নিয়ম মেনে চলে, এতে প্রত্যেক পূর্ববর্তী স্তর পরবর্তী স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণ বিবর্তনের মর্মকথা। বিবর্তন সর্বদা লক্ষ্যাভিসারী। বিবর্তন সব সময়ই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায়, অনির্দিষ্ট অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট অবস্থায়, সরল থেকে জটিল অবস্থায় ক্রম পরিণতি বুঝায়।

কংগারের মতবাদ : কংগার (Conger) বিবর্তনের চারটি **বৈশিষ্ট্য** উল্লেখ করেছেন। যথা– (১) কালিক পরিবর্তন (Change in time), (২) ক্রমিক শৃঙ্খলা (Serial order), (৩) অন্তর্নিহিত কারণ (Inherent causes) ও (৪) সৃজনমূলক সমন্বয় (Creative synthesis)।

১. কালিক পরিবর্তন : কোনো বস্তুর পরিবর্তন বলতে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বস্তুটির পরিণতি প্রাপ্ত হওয়া বুঝায়। কাজেই বিবর্তন সময়সাপেক্ষ, বিবর্তন কালেই ঘটে থাকে।

২. ক্রমিক শৃঙ্খলা : বিবর্তন বিশৃঙ্খল পরিবর্তন নয়, এই পরিবর্তন সর্বদা শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে ঘটে থাকে। প্রত্যেক পরবর্তী পরিবর্তন পূর্ববর্তী অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৩. অন্তর্নিহিত কারণ : বিবর্তনের মধ্যেই বিবর্তনের কারণ রয়েছে। বিবর্তন কারণবিহীন নয়।

৪. সৃজনমূলক সমন্বয় : বিবর্তনে পুরাতনের এমন পরিবর্তন ঘটে যাতে আমরা নূতনের আবির্ভাব দেখতে পাই। এ হলো সৃজনমূলক সমন্বয়।

সৃষ্টিবাদ

Theory of Creation

বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রধানত দুটি মতবাদ স্বীকৃত হয়ে থাকে। যথা– বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিবাদ। বিবর্তনবাদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে বিজ্ঞান সমর্থিত বিবর্তনবাদ ও ধর্ম সমর্থিত সৃষ্টিবাদ পরস্পরবিরোধী মতবাদ। কিন্তু এই মতবাদ যে সমর্থনযোগ্য নয় তা বুঝা যাবে।

সৃষ্টিবাদ অনুসারে স্রষ্টা এক বিশেষ সময়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন বস্তু ও নানা জাতীয় জীবসহ এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যেভাবে জগৎ সৃষ্টি করেছেন জগৎও ঠিক সেইভাবেই চলছে। গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, জল-স্থল, জীবজন্তু প্রভৃতি যেভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আজও তারা প্রায় সেভাবেই চলেছে, তাদের আকার ও গঠনের তেমন তারতম্য ঘটে নি।

সৃষ্টিবাদের দুটি রূপ কল্পনা করা হয়। যথা– (ক) নিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদ (Theory of Absolute Creation) ও (খ) সাপেক্ষ সৃষ্টিবাদ (Theory of Conditional Creation)।

(ক) নিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদ : এই মতবাদ অনুসারে খোদা নিছক শূন্যতা থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। এমন এক সময় ছিল যখন একমাত্র সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী খোদা ছিলেন; জগতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তিনি পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা; তাঁর কোনো অভাব ছিল না। তিনি এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করার মানস করলেন। এই জগৎ সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে বেগ পেতে হলো না, তিনি শুধু বললেন, 'হও' এবং জগৎ সৃষ্টি হলো। "কুন ফাইয়া কুন"– "Be and There was the world" এই মতবাদ অনুসারে খোদার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ মূর্ত হয়ে উঠল। বর্তমানে জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি জগৎও সেভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। জগৎ কোনোরূপ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয় নি। অর্থাৎ আদিম নমুনা অনুসারে চলে আসছে।

(খ) সাপেক্ষ সৃষ্টিবাদ : এই মত অনুসারে খোদা নিছক শূন্যতা থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করেন নি। খোদা জড় থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও জড় পদার্থ ছিল, তবে তা বিক্ষিপ্ত, অসংস্কৃত ও রূপহীন অবস্থায় ছিল। স্রষ্টা এই বিক্ষিপ্ত উপাদানকে নির্দিষ্ট আকার প্রদান করলেন এবং সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করলেন। তিনি এই জগতের নির্মাতা।

সৃষ্টিবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্ট হয়। যথা :

প্রথমত, জগৎ এক বিশেষ মুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছে। খোদা এই জগৎ ছাড়াই নিত্যকাল থেকে বিরাজমান ছিলেন। এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি জগৎ সৃষ্টি করার মানস করলেন।

দ্বিতীয়ত, খোদা শূন্যতা থেকে বা জড় পদার্থের সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

তৃতীয়ত, জগৎ সৃষ্টির পর তিনি কতগুলি নিয়মের মাধ্যমে, জগৎকে নিয়ন্ত্রিত থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। খোদা প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, নিয়মের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে তিনি হস্তক্ষেপ করেন।

চতুর্থত, খোদার সঙ্গে জগতের সম্পর্ক বাহ্য, আন্তর নয়। কেননা তিনি জগতের মধ্যে বাস করেন না, জগতের বাইরে অবস্থান করেন।

সমালোচনা

Criticism

সাধারণত সৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত আপত্তিসমূহ উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যথা :

প্রথমত, খোদা পরম পুরুষ, তিনি জগৎ ছাড়াই ছিলেন। জগত সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন তাঁর ছিল না, তবে কেন তিনি জগৎ সৃষ্টি করলেন?

এই অভিযোগ অত্যন্ত জোরদার বলে মনে হয় না, কেননা স্রষ্টার বা পরমসত্তার আত্মপ্রকাশের এ ধারণা অবাঞ্ছিত বা অকাম্য বলে প্রতিপন্ন করা যায় না। সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশের ইচ্ছাই মূল প্রেরণা।

দ্বিতীয়ত, শূন্যতা অথবা জড় পদার্থ থেকে স্রষ্টা জগত সৃষ্টি করেছেন– এটি মতবাদ ও বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিছক শূন্যতা থেকে জগত সৃষ্টি হলে জগৎও শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। কারণ শূন্যতা থেকে কেবল শূন্যতাই উদ্ভূত হতে পারে। এ অবস্থায় জগৎ অস্তিত্বহীন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সৃষ্টি কার্যকারণের পরিণতি। আবার জড় থেকে তিনি জগত সৃষ্টি করেছেন, একথা স্বীকার করলে জড়ের অস্তিত্ব স্রষ্টাকে সীমিত করে। কাজেই পূর্বস্থিত জড়ের অস্তিত্ব চিন্তার দিক দিয়ে দ্বৈতসত্তার সৃষ্টি করে।

এখানে আপত্তি যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, এ পর্যন্ত সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা যতগুলি মতবাদ পেয়েছি তন্মধ্যে একটি মতবাদ যে জড় থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে সে জড় নিষ্ক্রিয় জড় হোক কিংবা পারমাণবিক শক্তি হোক। আর একটি মতবাদ হলো পরমসত্তার চিন্তা থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, স্রষ্টা নিজেকে উপলব্ধি করতে গিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ জগৎ পরমসত্তার আত্মচৈতন্যের ফল। অপর একটি মতবাদ হলো পরমসত্তার ইচ্ছা থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন, এই ইচ্ছা থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টিক্রিয়ায় শুধু খোদার নির্দেশের প্রয়োজন হয়েছে।[১] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে জড় কিংবা চিন্তা ইচ্ছা থেকে জগৎ সংসার সৃষ্ট। আর সৃষ্টির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে একটি উদ্দেশ্যমুখীনতা কাজ করছে। জড় শক্তি আপনা-আপনি সৃষ্টি বৈচিত্র্য বা কৌশল জন্ম দিচ্ছে, একথা প্রতিপন্ন করা যায় না বরং চৈতন্যময় সত্তাই চিন্তা বা ইচ্ছার সাহায্যে এই জগৎকে উদ্দেশ্যমুখী সৃষ্টি হিসেবে প্রকাশ করতে পারেন। সৃষ্টিবাদের মধ্যে স্রষ্টার ধারণা সেই উদ্দেশ্যেরই নির্দেশক।

তৃতীয়ত, সৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধে বলা হয়ে থাকে যে খোদা কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে

---

[১] তুলনীয় "কুন ফাইয়া কুন" – আল কোরআন

জগৎ সৃষ্টি করলেন, কেন পূর্বে বা পরে সৃষ্টি করলেন না– সৃষ্টিবাদীরা এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। তবে এখানে বলা যায় যে, সৃষ্টি বলতে আমরা যদি কোনো ক্রিয়াকে বুঝাই তবে সে ক্রিয়া একটা বিশেষ মুহূর্তে আরম্ভ হয়েই যুক্তিযুক্ত, কালিক প্রেক্ষিত ছাড়া সৃষ্টি ক্রিয়া চিন্তা করা যায় না। কাজেই সৃষ্টিবাদের বিরুদ্ধ এই আপত্তিটি খুব জোরল বলে মনে হয় না।

চতুর্থত, সৃষ্টিবাদের বক্তব্য অনুযায়ী সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক বাহ্য, আন্তর নয়। এই অবস্থা গ্রহণীয় নয়। সৃষ্টি যেমন স্রষ্টা থেকে উৎসারিত তেমনি স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে নিঃশেষিত হন। স্রষ্টা একই সঙ্গে অতিবর্তী ও অন্তর্লীন (Transcendent and immanent)। একদিক দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে অনুসৃত হয়ে আছেন (কেননা স্রষ্টার শক্তি সৃষ্টিতে মূর্ত হয়েছে); অন্য দিক দিয়ে স্রষ্টা সৃষ্টি মধ্যেই সীমিত নন, স্রষ্টা সৃষ্টিকে অতিক্রম করে আছেন। কোরআনে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে বিবর্তনের উদ্দেশ্যমুখীনতা, সৃষ্টির মূলে স্রষ্টার আত্মচৈতন্য, আত্মোপলব্ধি, আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা প্রকটিত হয়েছে।[১] কাজেই কোরআনের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান।

পঞ্চমত, সৃষ্টিবাদের গতানুগতিক ধারণায় আমরা দেখতে পাই যে সৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে স্রষ্টা সক্রিয়ভাবে তা নিরসন করেন। অর্থাৎ স্রষ্টার হস্তক্ষেপের ফলেই বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়। মানুষের জ্ঞানের বর্তমান স্তরে নিয়ম সৃষ্টিতে স্রষ্টার হস্তক্ষেপ স্রষ্টার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক, বরং সৃষ্টিতে নিয়ম ও নিয়মের ব্যতিক্রমই (যা অন্য দিক দিয়ে নিয়ম) সৃষ্টির স্থিতি বিবর্তন ও ধ্বংস ব্যাখ্যা করতে পারে। সৃষ্টিতে একদিকে যেমন নব নবসৃষ্টি আভাসিত হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টির পাশাপাশি ধ্বংসেরও আভাস ফুটে উঠেছে। কাজেই স্রষ্টার পক্ষে প্রত্যেক ব্যাপার মানুষের মতো হস্তক্ষেপের প্রয়োজন করে না। আর খোদার পূর্বজ্ঞান (Fore-Knowledge) তাঁর হস্তক্ষেপের কোনো অবকাশ দেয় না। কেননা খোদার জ্ঞান এক অন্তহীন বর্তমান, তার কাছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কোনো প্রভেদ নেই।[২]

৩। (ক) সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদের মধ্যে পার্থক্য

সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে বলে মনে হয়। বিবর্তন হলো ক্রমবিকাশ। একটি বিশেষ অবস্থা থেকে ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব ঘটে, এটাই হলো বিবর্তনবাদের কথা। বিবর্তনের ফলে জড়, প্রাণ ও মনের অভিব্যক্তি ঘটে। এখানে বস্তুর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে বিরামহীন ঐক্য থাকে। অপরপক্ষে সৃষ্টিবাদের মতে, সৃষ্টিতে খোদার স্বরূপ ব্যক্ত হয়। কিন্তু এখানে সৃষ্টির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকে না।

সৃষ্টিবাদ অনুসারে জগৎ সৃষ্টি একটি বিশেষ মুহূর্তিক ব্যাপার, কিন্তু বিবর্তনবাদ

---

১ (রববানা মা খালাকতা হাজা বা তলা (সুরা ৩ - আ ঃ ১৯১ (হে আমাদের প্রভু, তুমি কিছুই অযথা সৃষ্টি করনি।)) বিস্তারিত আলোচনার জন্য মদীয় 'মুসলিম দর্শনের ভূমিকার' পঞ্চম অধ্যায় দেখুন।

২ ইন্না কুল্লা খালাকনাহু বেকদর (৫৪-৫৯)– নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বিষয় তার পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।

জগৎ সৃষ্টিকে একটি ক্রমপরিণতির ব্যাপার বলে মনে করেন। ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের সৃষ্টিবাদ ও বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ অধিকতর সমর্থন লাভ করেছে। সৃষ্টিবাদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু বিবর্তনবাদে বিবর্তন প্রক্রিয়া (Evolutionary process) ও বিবর্তনের ফল এই দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণীত হয় নি। এখানে এই দুটিকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। বিবর্তনবাদের কোনো শ্রেণীতে বিশেষ করে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকৃতির কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, বিবর্তনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় কোনো নিয়ামক শক্তির ধারণা স্বীকৃত না হলেও অন্যান্য প্রকারের বিবর্তনবাদে একটা নিয়ামক শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জটিল থেকে জটিলতর অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে। বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে নব নবসৃষ্টি উন্মেষ সাধিত হচ্ছে তার মূলে এক মহাসত্য কাজ করছে। এ স্বীকার না করলে বিবর্তনবাদের কোনো তাৎপর্যই থাকে না। এই দিক দিয়ে সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান। সৃষ্টি ও বিবর্তন উভয়ের মূলে এক মহাসত্য ক্রিয়াশীল। কোনো উচ্চতর প্রেরণা ছাড়া সৃষ্টি, পরিবর্তন, বিবর্তন প্রভৃতি ধারণার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ জড়ের মাধ্যমে জগতের যাবতীয় জিনিসের ব্যাখ্যা দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্বকে সহজবোধ্য করলেও দর্শনের ইতিহাসে এই মতবাদ অবিমিশ্র সমর্থন লাভ করতে পারে নি, বরং এই মতবাদ কঠোর সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিবর্তন বলতে উদ্দেশ্যমুখীনতা বুঝায়, আর কোনো বুদ্ধিমূলক পরিকল্পনা ছাড়া এই উদ্দেশ্যমুখীনতার কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা চলে না। কাজেই বিবর্তনবাদ পরমসত্তার ধারণা ছাড়া যথাযথভাবে ব্যাখ্যা হতে পারে না। এখানে সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সৃষ্টিবাদ প্রাকৃতিক সৃষ্টিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও জগৎ ও জীবনের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য নেই, একথা বলে না। বরং স্রষ্টার অসীম শক্তি এই জগদ্বিধানকে বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিমুহূর্তে নব নবভাবে সমৃদ্ধ করছে। এই দিক দিয়ে বিবর্তনের সুরের সাথে সৃষ্টিবাদের মূলগত সঙ্গতির অভাব নেই। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে কিংবা বাইর থেকে দেখলে এই দুটি মতবাদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা নগণ্য।

৪। বিবর্তনবাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ

Scientific Evidences of Evolution

বিবর্তনবাদের সপক্ষে নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের তরফ থেকে বিবর্তনের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ এসেছে।

প্রথমত, জ্যোতির্বিদ্যার মতে, আমাদের এই জগৎ একদিনে সৃষ্ট হয় নি, বহু শতাব্দীব্যাপী বিবর্তনের ফলে জগৎ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বর্তমানে সৌরজগৎ বলতে আমরা যা বুঝি তা একদিন তরল অগ্নিকুণ্ড ছিল।

দীর্ঘকাল ধরে এই অগ্নিময় পদার্থ ঠাণ্ডা হতে হতে গ্রহজগৎ সৃষ্ট হলো, গ্রহজগৎ আরও শীতল হলে উপগ্রহের সৃষ্টি হলো। ক্রমশ পৃথিবীর বুকে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টি হলো– বহু পরে পৃথিবীতে প্রাণির আবির্ভাব ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, ভূবিদ্যার মতে, পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশে মাটির বিভিন্ন স্তর পাওয়া যায়। এই স্তরগুলি একদিনে সৃষ্ট হয় নি, এইগুলি বহুদিনব্যাপী পরিবর্তনের ফল। এই স্তরসমূহ এক সময় তরল পদার্থ ছিল, ধীরে ধীরে কঠিন অবস্থাপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। মাটির বিভিন্ন স্তর পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, মাটির মধ্যম স্তরে জৈবশিলা (Fossils) দেখতে পাওয়া যায় এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু ছিল, সেগুলি এখন পৃথিবীর বুকে নেই, সেসব জীবজন্তু পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মাটির বিভিন্ন স্তর প্রমাণ করে যে পৃথিবী বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থার উপনীত হয়েছে।

তৃতীয়ত, জীববিজ্ঞান অনুসারে, জেলির মতো এক ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন প্রাণিই এই পৃথিবীর আদিমতম জীব। এই ধরনের জীব থেকে ক্রমবিকাশের ফলে মাছ ও জলজ উদ্ভিদের জন্ম হয়েছে। মাছের ক্রমপরিবর্তনের ফলে জলচর প্রাণি, উভচর প্রাণি, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণি, বানর জাতীয় জীব, বানর-মানুষ ও সর্বশেষে মানুষ উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ এক জাতীয় প্রাণি কালক্রমে অন্য জাতিতে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থত, সমাজ বিজ্ঞানও ঘোষণা করে যে, আমরা সমাজে যেসব নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান দেখেছি সেগুলি দীর্ঘকাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। সমাজের নিয়ম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নিয়ম বলবৎ হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট জগৎ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে– এগুলি ধীর ক্রমপরিবর্তনের ফল।

৫। বিবর্তনবাদের প্রকারভেদ

Different Theories of Evolution

বিবর্তনবাদ বিজ্ঞান সমর্থিত মতবাদ হলেও বিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা একমত নন। বিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে চারটি প্রধান মতবাদ আছে। যথা– যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ (Mechanical theory of evolution), পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ (Teleological theory of evolution), সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ (Creative evolution) এবং উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ (Emergent evolution)। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন যান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেকটি পূববর্তী অবস্থা পরবর্তী অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার পশ্চাতে কোনো উদ্দেশ্যমুখীনতা নেই। পক্ষান্তরে পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদীরা মনে করেন যে বিবর্তন প্রক্রিয়া একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আবার সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত-বিবর্তন প্রক্রিয়ার নব নবসৃষ্টির উন্মেষ সাধিত হচ্ছে। উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তর সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রত্যেক পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তর থেকে স্বতন্ত্র ও উন্নতর। বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রত্যেক নতুন স্তরে নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে থাকে। এবার আমরা মতবাদসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করব।

৫.১. যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ

Mechanical Theory of Evolution

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে জড় থেকে বিশ্বজগৎ উদ্ভূত হয়েছে। আকস্মিকভাবেই বিশ্বজগতের বিবর্তন আরম্ভ হয়। জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন– জড়, প্রাণ, মন প্রভৃতি স্তরের মধ্য দিয়ে জগৎ সুদীর্ঘকালের বিবর্তনের ফলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। জড়, গতি ও শক্তি– এই তিনটি জগতের আদিম উপাদান– এই আদিম উপাদান থেকেই জগতের যাবতীয় জিনিসের উদ্ভব হয়েছে। বিপুল সৌরজগৎ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র বালুকণা পর্যন্ত সব কিছুই জড়শক্তির বিবর্তনের ফল।

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ জড়বাদ ও নিসর্গবাদের (Materialism and Naturalism) ওপর প্রতিষ্ঠিত। জড়বাদীরা জড়শক্তির সাহায্যেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দান করেন। এই মতানুসারে জড়শক্তিই যাবতীয় বস্তু, প্রাণি ও চৈতন্যের মূলীভূত উপাদান– দীর্ঘ দিনের বিবর্তনের ফলে ধীর গতিতে জড় থেকে প্রাণ, মন প্রভৃতির ক্রমবিকাশ ঘটেছে। নিসর্গবাদ অনুযায়ী শক্তি, গতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম জগতের যাবতীয় সত্তার ব্যাখ্যা দিতে পারে। বিবর্তনাদের ব্যাখ্যার জন্য কোনো উদ্দেশ্যের অবতারণা করার প্রয়োজন নেই।

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের বিভিন্ন সমর্থক : বিজ্ঞানী ও জড়বাদীরা বিবর্তনবাদের শক্ত সমর্থক। গ্রিক দার্শনিক এম্পিডকলিস (Empedocles), ডেমোক্রিটাস (Democritus) ও অন্য জড়বাদীরা এই মতবাদ প্রচার করেন। এই সকল দার্শনিকের মতবাদ বাস্তব প্রমাণের অভাবে তেমন জনপ্রিয় হতে পারে নি। টিনডাল (Tyndall), টমাস হাক্সলি (Thomas Huxley), লাপ্লাস (Laplace), ডারউইন (Darwin), স্পেন্সার (Spencer) ও অন্য জড়বাদীরা আধুনিককালের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের বাস্তব ব্যাখ্যা দান করেন।

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের সমর্থনে বিভিন্ন বিজ্ঞান : জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, তুলনামূলক শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের ভিত্তি। জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের পৃথিবী গ্রহটি লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে সূর্যেরই অংশ ছিল এবং সূর্যও উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভূ-তত্ত্ব অনুমান করে, পৃথিবীর মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবতনের ফল। প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জানা যায় যে, একই আদিম জীবের শ্রেণীর ক্রমিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের মাধ্যমেই আজকের জগতের অগণিত জীব শ্রেণীর উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। তুলনামূলক শবব্যবচ্ছেদবিদ্যাও প্রাণির দৈহিক সাদৃশ্যের বিষয় নির্দেশ করে।

যান্ত্রিক বিবর্তন দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, জড়বস্তুর বিবর্তন ও জৈবিক বিবর্তন। যান্ত্রিক বিবর্তনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে হলে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের প্রধান রূপ দুটি–(১) জড় সম্পর্কীয় যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ও (২) জীবজগৎ সম্পর্কীয় যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ।

৫.১.১ জড়জগৎ সম্পর্কীয় যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ : জড়জগৎ সম্পর্কীয় যান্ত্রিক বিবর্তনকে আমরা দুই শ্রেণীতে পাই, লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ (Laplace's Nabular Bypothesis) ও স্পেন্সারের যান্ত্রিক বিশ্ববাদ (Spencer's Cosmological Evolution)।

লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ (Laplace's Nabular Bypothesis) : ফরাসি বিজ্ঞানী লাপ্লাস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (Mecanique Celeste) বিবর্তনবাদের এক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে, গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বময় বিভিন্ন নীহারিকামণ্ডল দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। নীহারিকা হলো আকাশ দৃষ্ট বহুদূরস্থ নীহারপুঞ্জ সদৃশ বাস্পীয় পদার্থ। কোনো কোনো নীহারিকামণ্ডলে বহুযোজনব্যাপী হালকা গ্যাসের মেঘ আছে। কোনো কোনো নীহারিকামণ্ডলে আছে অদ্ভুত দ্রুতগতিসম্পন্ন কোটি কোটি নক্ষত্র। এই মতবাদ অনুসারে নীরারিকামণ্ডল মহাশূন্য পরিব্যাপ্ত অগ্নিময় দ্রুতগতিসম্পন্ন বাস্প।

নীহারিকাবাদ অনুসারে বিশ্বজগৎ সুদূর অতীতে ছিল উত্তপ্ত ও অনলকুণ্ড। এই অনলকুণ্ড মহাশূন্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বিচরণ করত। এই অনলকুণ্ডে তাপ বিকিরণের ফলে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে তারকা বা নীহারিকামণ্ডলে রূপান্তরিত হয়ে আপন কক্ষপথে মহাশূন্যে বিচরণ করতে থাকে। নীহারিকামণ্ডল বহুযুগ ধরে বিকিরণের ফলে অংশবিশেষ ঘনীভূত হয়ে অসংখ্য দ্রুতগতিসম্পন্ন নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। সূর্যের সৃষ্টিও এইভাবে সাধিত হয়েছে। প্রথমে নক্ষত্রগুলি দ্রুতগতিসম্পন্ন অসংবদ্ধ অগ্নিপিণ্ড ছিল। জাগতিক মাধ্যাকর্ষণ তাপ বিকিরণজনিত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে এই গতিশীল অসংবদ্ধ অগ্নিময় সূর্য থেকে কিছু কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দূরত্বে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই গুলি হলো গ্রহ। অনুরূপভাবে গ্রহ থেকে সৃষ্টি হলো নক্ষত্র।

এই মতবাদ অনুসারে প্রাকৃতিক নিয়মে গ্রহগুলির উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল হলেও অভ্যন্তরভাগ এখনও উত্তপ্ত রয়েছে। আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগ একই নিয়মে শীতলতাপ্রাপ্ত হওয়ায় ঘনীভূত হয় ও পানি, বাতাস ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। পরে জীব সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি থেকে জীবনের আবির্ভাব ঘটে। লাপ্লাসের বিবর্তবনাদে অন্ধ যান্ত্রিক নিয়মে নীহারিকা থেকে বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে।

সমালোচনা
Criticism

লাপ্লাসের নীহারিকাবাদ বিবর্তনবাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয়। কারণ অনির্দিষ্ট জড়বস্তু থেকে জীবন ও মানের আবির্ভাব কীভাবে ঘটতে পারে তা ভেবে পাওয়া যায় না। জড়বস্তু থেকে প্রাণ স্বতন্ত্র, প্রাণ থেকে চৈতন্য স্বতন্ত্র– কাজেই জড়বস্তু থেকে সমুদ্র বিশ্বচরাচর সুপরিকল্পিতভাবে উদ্ভূত হয়েছে বলে মানতে হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে : জড়বস্তুর বা অগ্নিময় গ্যাসীয় পদার্থ থেকে পরিকল্পিত বিশ্ব কীভাবে উদ্ভূত হতে পারে? উদ্দেশ্যমুখীনতা, নির্বাচন ও বুদ্ধির প্রকাশ বিশ্বের সর্বত্র; সৃষ্টি পরিকল্পনার সৃষ্টি কৌশলতার স্বরে ঘোষণা করে যে বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে এবং এক সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান স্রষ্টার মহিমা ঘোষণা করে চলেছে।

৫.১.২. বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের বিরোধী : জড়বস্তু থেকে উদ্ভব সম্ভব কি-না এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে। পাস্তুর প্রমুখ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছেন যে, প্রাণ থেকে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে, জড়াত্মক উপাদান থেকে প্রাণের উদ্ভব হয় নি। এমন কী পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত জৈবিক উপাদান থেকে জীব সৃষ্টি সম্ভব হয় নি।

স্পেন্সারের বিশ্বের ক্রমবিকাশে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ

Spencer's Mechanical Theory of Cosmological Evolution

বিবর্তনের সংজ্ঞা : হার্বার্ট স্পেন্সার লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের ওপর ভিত্তি করে বিবর্তনবাদকে সমগ্র বিশ্বের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তিনি মনে করেন যে উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ থেকে শুরু করে জটিলতম মানব সমাজ একই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। তাঁর মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া সব সময়েই সহজ থেকে জটিল অবস্থায়, সদৃশ ও সমসাত্ত্বিক অবস্থা থেকে অসদৃশ ও বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায়, অনির্দিষ্ট ও অসংবদ্ধ অবস্থা থেকে নির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ অবস্থায় চালিত হয়। তিনি বিবর্তন প্রক্রিয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন। এই তিনটি প্রক্রিয়া হলো– ঐক্যবিধান (Integration), পৃথকীকরণ (Differentiation) ও নিয়মানুগত্য (Determination)।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, আদিমবিক্ষিপ্ত উপাদান গ্যাসীয় পদার্থ (Cloud-dust/nabula) থেকে বিশ্বজগৎ উদ্ভূত হয়েছে। এই অগ্নিময় গ্যাসীয় পদার্থ ঐক্যবদ্ধ, ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হয়ে স্থানে স্থানে অসংখ্য গোলাকার পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। এইগুলি তারকা বা নক্ষত্র। সূর্য নক্ষত্রসমূহের অন্যতম। বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথম স্তরে বিক্ষিপ্ত উপাদান ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। তাই অসঙ্গবদ্ধ বিশৃঙ্খলা উপাদানের ঐক্য বিধানই বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথম স্তর।

পৃথকীকরণ : বিবর্তন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় স্তর হলো পৃথকীকরণ। আদিম উপাদান শীতল ও সঙ্কুচিত হয়ে একদিকে যেমন ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে অন্যদিকে তেমনি সূর্য থেকে গ্রহ, গ্রহ থেকে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী ছিল একটি উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ; এও পৃথকীকরণের মাধ্যমে স্থলভাগ, বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি করল। জীবকোষের বিবর্তনেও ঐক্যবিধান ও পৃথিকীকরণ নিয়ম কাজ করেছে; বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে জীবকোশের উৎপত্তি। অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবকোষ সৃস্টি করেছে, আবার একটি মাত্র জীবকোষ থেকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই প্রাণ ও জীবন কোনো মৌলিক শক্তি নয়। সমাজ সৃষ্টিতেও এই ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ নীতি কাজ করেছে। একদিকে বিভিন্ন মানুষ একত্র হয়ে সমাজ গড়েছে অন্যদিকে সুবিধার জন্য সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত হয়ে সমাজের বিবর্তনকে সম্ভব করে তুলছে। জৈবিক বিবর্তনের মতে, সামাজিক বিবর্তনেরও ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ নীতি সক্রিয়।

নিয়মানুগত্য : স্পেন্সারের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য নিয়মানুগত্য। বিবর্তন প্রতিক্রিয়া সব সময় বিশ্বজগৎকে বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে শৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। কাজেই বিবর্তন প্রক্রিয়া প্রলয় বা ধ্বংসক্রিয়া থেকে পৃথক। প্রলয় ধ্বংসের দিকে ঠেলে, বিবর্তন সামনের দিকে আগায়। সুতরাং বিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়মানুগ প্রক্রিয়া। এ একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি।

সমালোচনা

Criticism

এই মতবাদ প্রমাণিত নয়। স্পেন্সারের মতবাদ বেশ ব্যাপক, বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে এই মতবাদ আলোচনা করেছে, কিন্তু মতবাদটি সন্তোষজনক নয়।

প্রথমত, তাঁর মতে, আদিম অবস্থায় জগৎ ছিল বিক্ষিপ্ত অগ্নিময় গ্যাসীয় পদার্থ, এ কথা নিছক একটি প্রকল্প মাত্র, তিনি জগতের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচার করেছেন তা প্রমাণ করতে পারে নি। সুতরাং জগতের বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের মতো স্পেন্সারের যান্ত্রিক বিশ্ববাদও একটি মতবাদ। এই মতবাদের মূল্য ঐতিহাসিক।

দ্বিতীয়ত, জড় ও জীবের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। পদার্থের বিশেষ সংমিশ্রণের ফলে জীবকোষ বা প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই জড়বস্তু ও প্রাণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই– স্পেন্সারের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রাণ ও জীবনের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রাণের এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি জড়বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় না। আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন ক্ষমতা জীবনের বৈশিষ্ট্য, প্রাণের লক্ষণ, এইগুলি জড়জগতের কোনো বস্তুতে নেই।

তৃতীয়ত, এই মতবাদে বিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা হয় নি। স্পেন্সার মনে করেন যে জগতের মূল উপাদান সমসাত্ত্বিক অবস্থা থেকে বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ার ফলেই বিশ্বজগতের বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কেন এইরূপ হয়, কি কারণে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় জগতের মূল উপাদান পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কে স্পেন্সার বিশদভাবে কিছুই বলেন নি।

চতুর্থত, এই মতবাদে আকস্মিকতার ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অন্ধ যান্ত্রিক উপায়ে এই সুন্দর, সুশৃঙ্খল জগতের উদ্ভব কীভাবে হতে পারে সে বিষয়ে কোনো যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। উদ্দেশ্যমুখীনতা বা লক্ষ্যাভিমুখিতা ব্যতিরেকে বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আকস্মিকভাবে জড় হতে জীবন, জীবন হতে মনের উৎপত্তি অবাস্তব ও অযৌক্তিক প্রকল্প। বিশ্বজগতের সর্বত্র বুদ্ধির দীপ্তি উদ্ভাসিত, প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত। সুতরাং স্পেন্সারের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়।

৫.২. জীবনজগৎ সম্পর্কীয় যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ

Mechanical Theory of Biological Evolutionn

জৈবিক বিবর্তনবাদ : কানিংহাম বলেন যে, জৈবিক বিবর্তনবাদ হলো জীবের প্রকাশ, সহজ আরম্ভ হতে ক্রমবর্ধমান জটিলতার বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে জীবের আকারের সুশৃঙ্খল বিকাশ ও পরিবর্তন।[১] আমরা লক্ষ করেছি যে যান্ত্রিক বিবর্তন অনুসারে, এই বিশ্বজগৎ আদিম অগ্নিময় গ্যাসীয় পদার্থ থেকে ধীরে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীদের কেউ কেউ মনে করেন যে, আদিম উপাদান থেকে বিবর্তনের ফলে আকস্মিকভাবে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে সজীব জীবকোষ থেকে বিভিন্ন প্রাণির উদ্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ডারউইনের মতে, স্রষ্টা কয়েকটি প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিলেন; এই সজীব

---

[১] Biological evolution means the unrolling of organisms, the orderly growth and transformation of the organic forms from relatively simple beginnings through various stages of creating complexity.

জীবকোষগুলি থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন জাতীয় প্রাণির উদ্ভব ঘটছে। অবশ্য প্রথম প্রাণির আবির্ভাব সম্পর্কে গবেষণা করে লাভ নেই, কেননা সে অতীত জগৎ অন্তহীন রহস্যে আবৃত।

দ্বিবিধ উপশ্রেণীবাদ : আমরা এখানে যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হই তা হলো প্রাণিদের মধ্যে আমরা যে শ্রেণী বা উপশ্রেণী দেখতে পাই, তারা কি প্রকৃতির দিক দিয়ে স্বতন্ত্র, না এক বা একাধিক আদিম শ্রেণী থেকে উদ্ভূত? এই প্রশ্নের সম্পর্কে আমরা দুটি মতবাদ প্রচলিত দেখতে পাই :

(১) অপরিবর্তনশীল উপশ্রেণীবাদ (Theory of Immutability of Species) এবং (২) পরিবর্তনশীল উপশ্রেণীবাদ (Theory of Mutability of Species)।

৫.২.১ অপরিবর্তনশীল উপশ্রেণীবাদ (Theory of Immutability of Species) : এই মতবাদ অনুসারে শ্রেণী বা উপশ্রেণীসমূহ প্রাকৃতিক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র, কোনো একটি শ্রেণীর পরিবর্তন হয়ে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তিত হতে পারে না। সৃষ্টিবাদীরা ও দার্শনিক প্লেটো এই মতবাদ সমর্থন করেন। সৃষ্টিবাদীদের মতে, স্রষ্টা স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন প্রাণিকুল সৃষ্টি করেছেন। একটি শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটতে পারে না। সৃষ্টির পর থেকে প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে আসছে, এই সব বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক জাতির মধ্যে বর্তমান। দার্শনিক প্লেটো একমাত্র জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তিনি বিশেষের কোনো সত্তা স্বীকার করেন নি। কোনো বিশেষ জীব সেই জীব শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। একটি বিশেষ মানুষ মানুষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জাতি শাশ্বত, জাতির কোনো পরিবর্তন নেই। সুতরাং এক জাতি অন্য জাতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে না।

৫.২.২ পরিবর্তনশীল উপশ্রেণীবাদ (Theory of Mutability of Species)

: ডারউইন ও লামার্ক পরিবর্তনশীল উপশ্রেণীবাদ স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, কোনো জাতি নিত্য নয়, এক জাতি কালক্রমে অন্য জাতিতে পরিবর্তিত হয়। ডারউইনের মতে, জীবকোষের মধ্যে আবস্মিক পরিবর্তনের জন্য এক জাতি থেকে অন্য জাতির উদ্ভব ঘটে। আর লামার্কের মতে, পরিবেশের প্রভাবেই এক জাতি থেকে অন্য জাতির উদ্ভব ঘটে। উচ্চতর জাতিগুলি নিম্নতর জাতিগুলি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই বিবর্তনের পশ্চাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই। হয় আকস্মিকভাবে নয় বাইরের প্রভাবে শক্তি নিরন্তর জীবদেহে ক্রিয়া করছে। আর এর ফলেই নতুন নতুন পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

ডারউইন, লামার্ক, ভাইসম্যান, মেন্ডেল, মরগ্যান ও দ্য ভ্রিজ জৈবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আলোকপাত করেছেন। আমরা নিম্নে এইসব বিজ্ঞানী দার্শনিকের মতবাদ বিশেষভাবে আলোচনা করব :

৫.৩ ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদ (Darwin's Theory of Biological Evolution) :

প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী ডারউইন তাঁর 'Origin of Species' এবং 'Descent of Man' গ্রন্থদ্বয়ে জৈবিক বিবর্তনবাদ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট তথ্য প্রদান করেন। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করে সেখানকার

জীবজন্তু ও উদ্ভিদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণের বলে সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেন যে, সৃষ্টির আদিতে এক কোষবিশিষ্ট (unicelluler) জীব ছিল, পরে এক কোষবিশিষ্ট জীব বহু কোষবিশিষ্ট জীবে পরিণত হয়। ডারউইনের মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকার নীতি অনুযায়ী আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে নতুন জীবের উদ্ভব ঘটে। ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদ নিম্নলিখিত নীতিগুলির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(১) আত্মবিভাজনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি (Multiplication by selfdivison) : ডারউইনের মতে, পৃথিবীর বুকে আদিম জীবকোষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। জীবকোষের ধর্ম দ্বিধাবিভক্ত করে বংশবৃদ্ধি করা। একটি জীবদেহে নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুটি জীবকোষে পরিণত হয়। আবার এই জীবকোষগুলি বংশবৃদ্ধি করতে থাকে।

(২) আকস্মিক পরিবর্তন (Frotuitous Varation) : যদিও জীবকোষ (Protoplasmic) দেখতে সরল তথাপি এটি অত্যন্ত জটিল, ফলে এই জীবকোষের মধ্যে নিরন্তন পরিবর্তন চলছে। জীবকোষের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন চলছে তা আকস্মিক, এর মূলে কোনো উদ্দেশ্য নেই। জীবকোষের এই নিয়ম আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে জীবদেহে নানা রূপ পরিবর্তন ঘটে।

এই পরিবর্তন জীবের জন্য অনুকূল ও প্রতিকূল দুই-ই হতে পারে। জীবদেহের পরিবর্তন যদি জীবকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য করে তবে সেই পরিবর্তন অনুকূল। কিন্তু পরিবর্তন যদি জীবকে পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানে সাহায্য না করে তার পরিপন্থি হয় তবে সেই পরিবর্তন প্রতিকূল। অনুকূল পরিবর্তন জীবের স্থায়িত্ব আনয়ন করে, প্রতিকূল পরিবর্তন জীবের ধ্বংস সাধন করে।

৩. বংশগতির মাধ্যমে আকস্মিক পরিবর্তনের সঞ্চার (Transmission of the variations by Heredity) : পুরুষানুক্রমে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ সন্তানসন্ততিতে সংক্রমিত হয় তাকে বলা হয় বংশগতি। জীবকোষে যে স্বতঃস্ফূর্ত ও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চারিত পরিবর্তনগুলি জীবদেহের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। যদি সঞ্চারিত পরিবর্তনসমূহ জীবের পক্ষে অনুকূল হয় তবে জীবের বংশবৃদ্ধি হয়, আর যদি সঞ্চারিত পরিবর্তনসমূহ জীবের পক্ষে প্রতিকূল হয় তবে জীবের বংশ লোপ পেতে থাকে।

(৪) জীবন সংগ্রাম (Struggle for Existence) : এ জগতে জীবের জীবন সংগ্রামময়। বাঁচবার জন্য জীবনকে অবিরত সংগ্রাম করতে হয়। খাদ্য জীবের জন্য অপরিহার্য, কিন্তু জগতে জীবের পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব আছে, কাজেই বিভিন্ন জীবের মধ্যে খাদ্যসংগ্রহের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়। জগতে একদিকে প্রকৃতির বিরোধী শক্তির সাথে জীবের দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে জীবে জীবে দ্বন্দ্ব। জীবজগতে এই দ্বিমুখী প্রতিযোগিতা সতত সক্রিয় এবং জাতি বা উপজাতির স্থায়িত্ব বা বিনাশের জন্য দায়ী।

(৫) প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের বাঁচবার অধিকার (Natural selection or Survival of the fittest) : জীব নিয়ত বিরোধী পরিবেশ ও প্রতিযোগী জীবের সাথে সংগ্রাম করে চলেছে। এই সংগ্রামে যে জীব সাফল্য অর্জন করে অর্থাৎ জয়ী হয় সেই জীব টিকে থাকে, আর যে জীব সংগ্রামে হেরে যায়, সে জীব ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়।

(৬) জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব ও তার ক্রিয়া (Organs and their functions) : ডারউইনের মতে, জীবকোষের স্বতঃস্ফূর্ত ও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনের ফলেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সৃষ্টির পরে তাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াবলি প্রকাশ পায়। যেমন– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রথমে আবির্ভূত হয় পরে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির কাজ নির্দিষ্ট হয়। পরিবেশের প্রভাবে কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভব নয়। জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব আকস্মিক।

সমালোচনা (Criticism)

ত্রুটিসমূহ (Demerits)

(১) ডারউইনের বিবর্তনবাদ যান্ত্রিক, এখানে উদ্দেশ্যের কোনো স্থান নেই। জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও পরিকল্পনার মধ্যে উদ্দেশ্যমুখীনতা ও বুদ্ধির যে ছাপ পাওয়া যায় ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।

(২) 'আকস্মিক পরিবর্তনের ফল' বলে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা দেয়া অবৈজ্ঞানিক। ডারউইন তার জৈবিক পরিবর্তনবাদের মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন যে, জীবকোষের মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে এক জাতি থেকে অন্য জাতির উদ্ভব ঘটে। কিন্তু কীভাবে এক জাতি থেকে অন্য জাতির আবির্ভাব ঘটতে পারে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেন নি।

(৩) ডারউইনের মতে, জীবকোষের পরিবর্তনের ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব ঘটে এবং তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রিয়া করতে থাকে। এই মতবাদ অনুযায়ী কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব ঘটে, পরে এই ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়। এই মতের বিপক্ষে লামার্ক বলেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যে ধরনের ক্রিয়া করতে হয়, সে ক্রিয়ার উপযোগী ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব ঘটে। জিরাপের গ্রীবা দীর্ঘ হওয়ার পশ্চাতে পরিবেশের প্রভাবই ক্রিয়াশীল বলে লামার্ক উল্লেখ করেন। শীত প্রধান দেশ ও মরুভূমিতে লোমশ জাতীয় জীবের অধিবাস ও দেশের জলবায়ু অনুযায়ী জন্তুর গঠনের বিভিন্নতা লামার্কের মতবাদের সাক্ষ্য বহন করে।

(৪) প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাপারটি কল্পনাপ্রসূত, নির্বাচন বুদ্ধিমূলক ক্রিয়া কিন্তু চেতনাবিহীন, প্রকৃতি কীভাবে নির্বাচন ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে ডারউইন তার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নি।

৫.৪ লামার্কের জৈবিক বিবর্তনবাদ

(Lamark's Theory of Biological Evolution)

ডারউইনের জন্মের অর্ধশতাব্দী পূর্বে লামার্ক তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতবাদের নিম্নবর্ণিত **বৈশিষ্ট্যগুলি** বর্তমান।

(১) পরিবেশের প্রভাব (Influence of Environment) : লামার্কের মতে, জীবদেহের পরিবর্তন আকস্মিক বা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে এই পরিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে। তিনি মনে করেন যে, উদ্দেশ্যবিহীন আকস্মিক পরিবর্তন কখনও ফলপ্রসূ হতে পারে না। বাইরের প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ যখন জীবদেহের ওপর ক্রিয়া করে তখন জীবের অঙ্গপ্রতঙ্গের সৃষ্টি হয়। আলো বা শব্দ জীবদেহের ওপর ক্রিয়া করার ফলে চক্ষু বা কর্ণ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব ঘটে।

(২) জৈবিক প্রয়োজন বা বাসনা (Organic needs or disires) : ডারউইনের মতে, প্রথমে আকস্মিকভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভব ঘটে, পরে তাদের কার্য সুনির্দিষ্ট হয়। কিন্তু লামার্ক মনে করেন যে জীবদেহের উপর প্রাকৃতিক শক্তি ক্রিয়া করার ফলে জীবের মধ্যে অভাব অনুভূত হয়। এই অভাব দূর করার জন্য জীবদেহের অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়াজাত পরিবর্তন থেকে ধীরে ধীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে লামার্ক জৈবিক প্রয়োজন বা অভাববোধকে স্বীকার করেন, কিন্তু ডারউইন তা স্বীকার করেন না।

(৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার (Use and disuse of Organs) : যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যত অধিক ব্যবহৃত হয় সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তত শক্তিশালী হয়। আর যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হত কম ব্যবহৃত হয় সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তত দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পরিবেশে প্রভাব ও অভাববোধজনিত প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়, আর ব্যবহার বা অব্যবহারের ফলে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ধন বা বিলুপ্তি ঘটতে থাকে।

(৪) অর্জিত পরিবর্তনের সংক্রমণ (Inheritance of Acquired Modification) : লামার্কের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে ও জীবের মধ্যে অনুভূত বাসনার ফলে জীবদেহের যে পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তনের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জিরাফের গ্রীবা দীর্ঘ। আমরা বর্তমানে দীর্ঘ গ্রীবা বিশিষ্ট জিরাফই দেখতে পাই। কিন্তু এক সময় জিরাফের গ্রীবা দীর্ঘ ছিল না। দীর্ঘ বৃক্ষের পত্র ভক্ষণের জন্য গলা বাড়ানোর ফলে গ্রীবা দীর্ঘ হয়েছে। এই অর্জিত পরিবর্তন জিরাফের পরবর্তী বংশধরে সংক্রমিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সারস পাখির দীর্ঘ চঞ্চুর পশ্চাতেও এমনি পরিবেশের প্রভাব ও জৈবিক বাসনার ইতিহাস বর্তমান।

ডারউইন ও লামার্কের মতবাদদ্বয়ের তুলনা

ডারউইন ও লামার্ক উভয় বিজ্ঞানীর মতে, জগতে অপরিবর্তিত নিত্য কোনো জাতি নেই। জগতে আমরা জীবের যত উপশ্রেণী দেখি সবই বিবর্তনের ফল। তাঁরা মনে করেন যে, এক শ্রেণী থেকে বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। তবে ডারউইন ও লামার্কের মতবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈসাদৃশ্য বর্তমান।

১. ডারউইনের মতে, জীবকোষের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটার ফলে জীবদেহে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু লামার্ক মনে করেন যে বাইরের পরিবেশের প্রভাবই জীবদেহের পরিবর্তনের কারণ। জীবদেহের পরিবর্তন আকস্মিক নয়, জীবের নিজের চেষ্টার পরিণতি।

২. ডারউইনের মতে, জীবকোষের আকস্মিক পরিবর্তনই বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়, কিন্তু লামার্কের মতে, জীবের অর্জিত পরিবর্তনই বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়।

৩. ডারউইনের মতে, প্রথমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়, পরে সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ নির্দিষ্ট হয়। প্রথমে চক্ষু-কর্ণের উদ্ভব ঘটে, পরে সেগুলির কাজ নির্ধারিত হয়। কিন্তু লামার্ক মনে করেন যে কর্মের ইচ্ছাই ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করে। দর্শনের প্রয়োজন থেকেই চক্ষুর উদ্ভব, শ্রবণের প্রয়োজন থেকেই কর্ণের উদ্ভব।

৪. ডারউইন আকস্মিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের ওপর সব চাপিয়েছেন। কিন্তু লামার্ক জীবদেহের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জীবের অভাববোধকে স্বীকার করেছেন।

সমালোচনা
Criticism

লামার্কের জৈবিক বিবর্তনবাদ ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদ অপেক্ষা উন্নততর মতবাদ। আকস্মিকতার ওপর নির্ভর না করে লামার্ক প্রাকৃতিক পরিবেশকে জীবনের পরিবর্তনের কারণ হিসেবে মনে করেন। বাইরের পরিবেশে যে জীবদেহের গঠন বা আকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে আধুনিক বিজ্ঞানে তা স্বীকৃত হয়েছে। তবে জীবদেহের পরিবর্তনে বাইরের প্রভাব পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয়। প্রকৃতি জীবের প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করে'। আর সেই প্রাণশক্তি জীবদেহের ক্রমবর্ধমান জটিলতা সৃষ্টি করে। তবে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া প্রাণশক্তি অন্ধভাবে কাজ করতে পারে একথা স্বীকার করা চলে না।

লামার্কের মতে, প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবদেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে জীবদেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে পরিবেশের প্রভাবে জীবদেহের বাহ্য পরিবর্তন সাধিত হলেও জীবদেহের অভ্যন্তরীণ কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবকোষের কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না।

লামার্কের মতে, জীবদেহের অর্জিত পরিবর্তন বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হয়। লামার্কের এই অভিমতের জবাবে ভাইসম্যান বলেন জীবকোষের পরিবর্তন সংক্রমিত হয় না। জীবের নিজের চেষ্টায় যে দৈহিক পরিবর্তন সাধিত হয় সে পরিবর্তন পরবর্তী বংশধরদের দেহে সংক্রমিত হয় না। ভাইসম্যানের মতে, জননকোষে (Germ cell) যে পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তনই বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়।

কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার দ্বারা সেই অঙ্গের দৈহিক গঠনের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু তাতে নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্ভবের কথা ওঠে না।

পরিশেষে লামার্কের মতে, জৈবিক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত ইচ্ছাই জীবদেহের নতুন নতুন ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করেছে। জীবদেহের ওপর পরিবেশের উদ্ভূত ইচ্ছাই জীবদেহের অভাববোধ, পরে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়ার জন্য পরিবর্তন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি। কাজেই লামার্কের মতে জীবদেহের প্রয়োজনই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎস। কিন্তু কোনো ইন্দ্রিয় উদ্ভবের পূর্বে জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অভাব অনুভূত হয়েছে, এ কীভাবে সম্ভব ভেবে পাওয়া যায় না। আর কোনো অঙ্গ সৃষ্টি না হলে সেই অঙ্গের ক্রিয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ কোনো চেতনার অস্তিত্ব অনুমান করলে যান্ত্রিক উপায়ে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়।

৫.৫ ভাইসম্যানের জৈবিক বিবর্তনবাদ (Weismans Theory of Biological Evolution) : ডারউইন লামার্কের মতবাদের সমালোচনা থেকে উৎসারিত হয়েছে অগাস্ট ভাইসম্যানের জৈবিক বিবর্তনবাদ। তাঁর মতে জীবদেহের কোনো পরিবর্তন পরবর্তী বংশধরের মধ্যে সংক্রমিত হয় না। ডারউইনের আকস্মিক ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন কিংবা লামার্কের পরিবেশ প্রভাবিত ও ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তন বংশানুক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে। তিনি দুই প্রকারের কোষ সম্পর্কে বলেছেন, জীবকোষ ও প্রজননকোষ। প্রজননকোষ থেকে আসে জীবকোষ।

এই জননকোষ অমর। কেননা যে জননকোষ বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হয় সে জননকোষের কোনো বিনাশ নেই। জনকের জননকোষ কেবলই যে সন্তানের দেহ সৃষ্টি করে এমন নয়, সন্তানের জননকোষও সৃষ্টি করে। কাজেই জনকের জননকোষের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই সন্তান-সন্ততিতে সংক্রমিত হয়। ফলে সন্তান-সন্ততির জননকোষ ও জীবকোষে পরিবর্তন ঘটে। জননকোষের ধারাবাহিকতাই ভাইসম্যানের শ্রেষ্ঠ অবদান।

সমালোচনা

Criticism

ভাইসম্যানের জৈবিক বিবর্তন যান্ত্রিকভাবে নিস্পন্ন হয় কিন্তু আকস্মিক পরিবর্তনের কথা অস্বীকার করে তিনি পরোক্ষভাবে পরিণতিবাদকে সমর্থন করেছেন।

৫.৬ মেনডেলের ক্রোমোজোমবাদ (Mendle's Theory of Chromosmes) : গ্রেগর জোহান মেনডেল (Gregor Johan Mendel) ভাইসম্যানের সাথে একমত যে জীবকোষের পরিবর্তন (স্বতঃস্ফূর্ত বা পরিবেশজাত) বংশানুক্রমে সংক্রমিত হতে পারে না। জননকোষের পরিবর্তনই বংশপরম্পরায় নিয়মানুসারে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর মাঠের বাগানের মটরদানার ওপর কতগুলি পরীক্ষা চালান। এই পরীক্ষণ ক্রিয়ার পরিণতি হলো মেন্ডেলের ক্রোমোজোমবাদ। এই প্রমাণের ফলে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হলো যে জননকোষ একক পদার্থ নয়, জননকোষের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় সে পরিবর্তন আসে জনক-জননীর ক্রোমোজোম সংমিশ্রণের ফলে।

প্রকট গুণের প্রাধান্য : মেন্ডেল দেখলেন যে, লম্বা ও বেঁটে মটরদানা কিংবা গোল ও কোঁচকানো মটরদানা সংমিশ্রিত করলে লম্বা গোল মটর পাওয়া যায়। আবার এই পরবর্তী জাত মটর দানা সংমিশ্রিত করলে প্রকট ও অপ্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অনুপাত ৩ঃ১। এটি এক পুরুষ পরেও দীর্ঘত্ব কিংবা গোল আকৃতি একমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্য হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ পিতামাতার মধ্যে একটি প্রকট ও একটি অপ্রকট গুণ থাকবে, প্রকট গুণই ক্রিয়াশীল হবে। এই পিতামাতার দ্বিতীয় স্তরে (পৌত্রীতে) প্রকট ও অপ্রকট গুণের অনুপাত ৪ঃ১। অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ সন্তান অপ্রকট গুণের অধিকারী হবে। ক্রোমেজোমবাদ অনুসারে একটি জননকোষের বিশ্লেষণে চবিক্বশ জোড়া ক্রোমোজোম পাওয়া যায়। জননকোষ এত ক্ষুদ্র যে এ খালি চোখে দেখা যায় না। আর ক্রোমোজোম আরও ক্ষুদ্র। জননকোষের এই ক্ষুদ্র অংশের নাম ক্রোমোজোম। মেন্ডেল এর নাম দিয়েছিলেন ইউনিট ফ্যাক্টরস। পরবর্তী বিজ্ঞানীরা একে ক্রোমোজোম নামে অভিহিত করেন। চব্বিশ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি আসে পিতার জননকোষ থেকে, অপরটি আসে মাতার জননকোষ থেকে। এই সব ক্রোমোজোম জীবদেহের কতগুলি নির্দিষ্ট গুণ নিয়ন্ত্রিত করে। প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজোমে একটি প্রকট গুণ ও একটি অপ্রকট গুণ থাকে। জীবদেহের শুধু প্রকট গুণই পরিদৃষ্ট হয়। পিতামাতার গুণাবলির মধ্যে কোন কোন গুণ সন্তান-সন্ততিতে সংক্রমিত হবে তা নির্ভর করে মাতাপিতার প্রকট গুণের ওপর। এই মতবাদ অনুসারে যদি পিতা ও মাতার দুটি গুণ এমন হয় যে একটি প্রকট গুণ ও অন্যটি অপ্রকট গুণ তবে পিতামাতার ওরসজাত সন্তানদের মধ্যে গুণাবলি এইভাবে থাকবে (ক প্রকট ও খ

অপ্রকট গুণ ধরলে) : কখ, কখ, কখ, কুখ। এই সন্তানদের একটি পুরুষ ও একটি নারীর মিলনে যে সন্তানগুলি জন্মাবে তাদের মধ্যে গুণের সংমিশ্রণ ঘটবে। এমনিভাবে; কক, কখ, খক, খখ অর্থাৎ তাদের তিন-চতুর্থাংশের মধ্যে প্রকট গুণ ও এক-চতুর্থাংশের মধ্যে অপ্রকট গুণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আবার অপ্রকট গুণযুক্ত একটি পুরুষ ও একটি নারীর মিলনে যেসব সন্তান উৎপন্ন হবে তাদের মধ্যে কক, কক, কক, কক, দুটি প্রকট গুণই প্রকাশ পাবে। অনুরূপভাবে দুটি অপ্রকট গুণবিশিষ্ট একটি পুরুষ ও একটি নারীর মিলনে যেসব সন্তান জন্মাবে তাদের মধ্যে খখ, খখ, খখ, খখ, দুটি অপ্রকট গুণই প্রকাশ পাবে। এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে, যে ক্ষেত্রে পিতার একটি প্রকট গুণ ও মাতার একটি প্রকট গুণ (মাতার গুণাবলির মধ্যে প্রকট, পিতার গুণাবলির প্রেক্ষিতে অপ্রকট) থাকবে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু একাধিক এমনি গুণ যেসর্বক্ষেত্রে পাওয়া যাবে সেখানে সংক্রমিত রূপও জটিলতর হবে।

মেন্ডেলের ক্রোমোজোমবাদ ডারউইন লামার্কের মতবাদ খণ্ডন করে জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি অধিকতর যুক্তযুক্ত সন্তোষজনক মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে। জীবকোষের পরিবর্তন যে বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয় বাস্তব প্রমাণের সাহায্যে মেন্ডেল তা প্রতিপন্ন করেছেন। এ ছাড়া ভাইসম্যানের মতবাদকে মেন্ডেল অনেকাংশ শোধন করেছেন। পিতা-মাতার জননকোষ থেকে নয় বরং পিতামাতার জননকোষের মাধ্যমেই সন্তানসন্ততি নতুন নতুন সংমিশ্রিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। তবে একথা ঠিক যে জননকোষের জটিল সংগঠন সম্পর্কীয় সুস্পষ্ট ধারণা আমরা মেন্ডেল পরবর্তী জীববিজ্ঞানীদের কাছে থেকে পেলেও মেন্ডেল যে এই পথের অন্যতম পূর্বসূরী, সে কথা অনস্বীকার্য।

৫.৭. মরগ্যানের জিনবাদ (Margans's Theory of Genes) :

টি.এইচ, মরগ্যানের জিনবাদ জৈবিক বিবর্তনের ইতিহাসে একটি বলিষ্ঠ আবিষ্কার। তিনি মেন্ডেলের ক্রোমোজোমের ওপর বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন যে, ক্রোমোজোম একক অবিভাজ্য পদার্থ নয়, এ মেন্ডেলের 'ইউনিট ফ্যাক্টরস' নয়। ক্রোমোজোমের ব্যাপক বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি এই সত্যে উপনীত হলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখালেন যে, ক্রোমোজোম এক ধরনের সূক্ষ্ম পদার্থের সমষ্টি। তিনি এই পদার্থের নাম দিলেন জিন (Genes)। এই মতবাদের দুটি বিষয় লক্ষণীয়।

প্রথমত, জিনের নিজস্ব অস্তিত্ব বর্তমান, ক্রোমোজোম কতগুলি জিনের সমষ্টি ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন বৈশিষ্ট্য জীবদেহে সঞ্চারিত হবে তা জননকোষ বা ক্রোমোজোমের ওপর নির্ভর করে না, জীনের ওপর নির্ভর করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কোন জীব বংশের কোন কোন গুণের অধিকারী হবে তা এক একটি জীনের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে।

মরগ্যানের জিনবাদ জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। জীবের অর্জিত বৈশিষ্ট্য যে বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয় না জিনবাদ তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। মরগ্যান ও তাঁর অনুসারীরা জিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেও জিনের গঠন কৌশল সম্পর্কে তাঁরা বিশদ ব্যাখ্যা দেন নি। এ ছাড়া, একই প্রাণির বিভিন্ন

বংশধরদের জিনসমূহ আলাদা কেন হবে, সে সম্পর্কে তাঁরা কিছুই বলতে পারেন নি। এই মতবাদের অসম্পূর্ণতা যাই থাকুক না কেন ডারউইন, লামার্ক, ভাইসম্যানের মতবাদ অপেক্ষা এ যে উন্নততর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৫.৮. দ্য ভ্রিজের পরিব্যক্তিবাদ (De Varie's Theory of Mutations) :

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ডাচ জীববিজ্ঞানী হিউগো দ্য ভ্রিজ প্রজনন সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত মতবাদ পরিব্যক্তিবাদ প্রকাশ করেন। তিনি সান্ধ্য প্রিমরোজ সম্পর্কে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, কোনো কোনো সময় আকস্মিকভাবে শ্রেণী থেকে উপশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। পরিব্যক্তি (Mutation) বলতে সাধারণ পরিবর্তন বুঝায়, কিন্তু এই পরিবর্তন বিরামহীন পরিবর্তন, এই পরিবর্তন আকস্মিক। দ্য ভ্রিজ দেখলেন যে, দীর্ঘদিনব্যাপী সঞ্চিত পরিবর্তন হচ্ছে যে নতুন উপশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে না, এমন নয়, নতুন ধরন বা উপশ্রেণী আকস্মিকভাবেই আবির্ভূত হয়।

হিউগো দ্য ভ্রিজের পরিব্যক্তিবাদ বংশগতি সম্পর্কীয় সাধারণ মতবাদ এবং ডারউইন ও লামার্ক প্রমুখের বিবর্তনবাদের বিরোধী। বংশগতি অনুসারে সদৃশ্য থেকে সদৃশ আসে; আর পরিবৃত্তি (Variation) অনুসারে সদৃশ থেকে সদৃশ আসে, কিন্তু অবিকল সদৃশ নয়। দ্য ভ্রিজের মতে, সদৃশ থেকে সাধারণত সদৃশ উৎপন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অসদৃশও উৎপন্ন হয়। পরিবৃত্ত হলো একটানা পরিবর্তন আর পরিব্যাপ্তি হলো আকস্মিক পরিবর্তন উল্লম্ফন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন পরিবর্তনও বিবর্তন, আবার ক্রমিক ও অবিরাম পরিবর্তনও বিবর্তন।[১] পরিব্যাপ্তিবাদ অনুসারে নতুন গুণাবলির আবির্ভাবের ফলে শ্রেণী থেকে নতুন উপশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। সদৃশ শ্রেণীর মধ্যে পরিবর্তন চলছে, এই পরিবর্তনের আকস্মিকভাবে নতুন উপশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

দ্য ভ্রিজের পরিব্যাপ্তিবাদের সাথে ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদের পার্থক্য বর্তমান। ডারউইনের মতে, উপশ্রেণী সমজাতীয় উপশ্রেণী সৃষ্টি করলেও পিতামাতার সাথে সন্তানসন্ততির পার্থক্য থাকে; উপশ্রেণীর এই পরিবর্তন একটানা বা পরিবৃত্তি। কিন্তু দ্য ভ্রিজের মতে, একটানা পরিবর্তন নয়, বরং আকস্মিক পরিবর্তনই জীবজগতের বৈশিষ্ট্য। দ্য ভ্রিজের এই মতবাদ উপশ্রেণীর আবির্ভাবের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই আকস্মিক পরিবর্তন কেন ঘটে দ্য ভ্রিজ তার কোনো ব্যাখ্যা দেন নি।

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের সমালোচনা

প্রথমত, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীরা বিবর্তনের মূলে কোনো উদ্দেশ্যের অবস্থিতি স্বীকার করেন না, যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করেন। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অন্ধ জড়শক্তির সাহায্যে বিশ্বজগতের বিভিন্ন সত্তার ব্যাখ্যা করে, ফলে এই মতবাদকে আকস্মিকতার ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করতে হয়। ডারউইনের জৈবিক বিবর্তনবাদে, স্পেন্সারের বিশ্ববাদে আকস্মিকতার মাধ্যমে জগতে নিয়ম-শৃঙ্খলার সামঞ্জস্য ব্যাখ্যার প্রয়াস রয়েছে, কিন্তু আকস্মিকতা শৃঙ্খলা, নিয়ম ও সামঞ্জস্যের ভিত্তি

---

১ "Unbroken continuity of descent coupled with abrupt discontinuity or change in bodily form is common striking and well-known phenomenon in all types of animal life.

হতে পারে না। জগতের বিভিন্ন বস্তু একটা পারস্পরিক উদ্দেশ্য সাধন করছে, প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সে সত্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয়ত, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে প্রাণ ও মনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নি। এই মতবাদ অনুসারে জড় থেকে প্রাণ প্রাণ থেকে মনের উৎপত্তি ঘটে। অর্থাৎ প্রাণ ও মন স্বরূপত জড়াত্মক। কিন্তু প্রাণের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা জড়ের নেই; আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিকাশ প্রজনন ক্ষমতা প্রাণের লক্ষণ, প্রাণি এইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এছাড়া মনের বৈশিষ্ট্য চৈতন্য। যেখানে মন আছে সেখানেই চৈতন্য বিদ্যমান। জড় অচেতন। সুতরাং জড় থেকে প্রাণ ও মনের ব্যাখ্যা করা চলে না।

তৃতীয়ত, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিবর্তন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে; কোনো বুদ্ধি বা চেতনার নিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না। ভৌত রাসায়নিক শক্তির যান্ত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলছে ও জগতের ঐক্য, শৃঙ্খল, নিয়ম, সামঞ্জস্য রক্ষিত হচ্ছে, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না; জগতের বিভিন্ন বস্তুর গঠন কৌশল ও বিন্যাসের দিকে নজর দিলে জগৎ পরিকল্পনায় ঐক্য, শৃঙ্খলা, নিয়মানুগত্যের প্রতি মনোযোগী হলে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, সৃষ্টি পরিকল্পনায় বুদ্ধিময় শক্তি ক্রিয়া করছে। অন্যকথায় এ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবর্তন প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

চতুর্থত, বিবর্তন মানে নিছক পরিবর্তন নয়। বিবর্তন হলো উচ্চতর ও উন্নততর অবস্থার দিকে পরিবর্তন। বিবর্তন হলো ক্রমবিকাশ, কাজেই বিবর্তনের একটি গতিপথ থাকবে। বিবর্তন উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ধারক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে এক বুদ্ধিময় সত্তার অনুমান অপরিহার্য। সুতরাং যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ বিবর্তন প্রক্রিয়ার আসল চেহারা ফুটিয়ে তুলতে পারে নি।

৬. পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ

Teleological Evolution

পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূলে বুদ্ধিময় সত্তা বর্তমান। এক পরম আধ্যাত্মিক শক্তি বিশ্বচরাচরকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়াস পাচ্ছে। ভাববাদী দার্শনিকরা এই মতবাদের সমর্থক। তাঁদের ভৌত রাসায়নিক শক্তির সাহায্যে বিশ্বজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিশ্বজগতের সর্বত্র নির্বাচন, সংযোগ ক্রমিক স্তরভেদের বিস্ময়কর লক্ষণ এবং উপায় ও উদ্দেশ্যের সঙ্গতিবিধান দৃষ্ট হয়। এই সকল লক্ষণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিবর্তন প্রক্রিয়া এক বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত, আর এই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বুদ্ধিময় চেতন সত্তা আছে এবং এই চৈতন্যময় পরমসত্তা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এই জগতের বিবর্তন প্রক্রিয়া এক আধ্যাত্মিক সত্তার আত্মপ্রকাশ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদীরা তাঁদের মতবাদের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেন :

প্রথমত, জগতে উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে এমন এক উপযোগিতা রয়েছে, বিভিন্ন উদ্দেশ্যের এমন এক সামঞ্জস্য আছে, অন্ধ যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে যার ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। উদ্দেশ্য ও উপায়ের উপযোগিতা, বিভিন্ন স্তরের উদ্দেশ্যের মধ্যে পারস্পরিক

উপাযোগিতা এবং জগৎ পরিকল্পনার এক বুদ্ধিময় সত্তার নির্দেশ করে। ডা. মার্টিনের মতে জগতের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে নির্বাচনের (Selection), সংযোগ (Combination) ও ক্রমিক স্তরভেদ বিবর্তন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যমুখীনতার ইঙ্গিত দেয়। পাখির পালক জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের পশুর বিভিন্ন রকমের পশম প্রাকৃতিক নির্বাচনকেই জাহির করে। আবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রাণির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পারস্পরিক উপযোগিতা ও তাদের সামঞ্জস্য বিবর্তন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যমুখীনতা ব্যক্ত করে। প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রাণিকে পরিবেশের সঙ্গতিবিধানে সহায়তা করে। প্রাণির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস বৃক্ষলতাগুল্মের সৃষ্টি পরিকল্পনায় নির্বাচন ও. সংযোগ সাধনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এ ছাড়া জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ক্রমিক স্তরভেদ পরিলক্ষিত হয়। জড়বস্তু, উদ্ভিদ, ইতরপ্রাণি ও মানুষ এদের মধ্যে ক্রমিক স্তরভেদ রয়েছে। জড়বস্তুর তুলনায় উচ্চস্তরের কেননা ইতর প্রাণির মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা উদ্ভিদের মধ্যে নেই। মানুষ ইতর প্রাণির তুলনায় উচ্চ স্তরের, কেননা ইতর প্রাণির মধ্যে চেতনা নেই। জগতের বিভিন্ন বস্তু ও জীবের ক্রমিক স্তরভেদ বিবর্তন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যমুখীনতাই প্রমাণ করে।

দ্বিতীয়ত, কার্যকারণ সম্পর্ক পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদের সপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কার্যকারণ সম্পর্ক বিচার করলে দেখা যায় যে, কারণ কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। কার্য সংঘটিত হলে পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তনের পশ্চাতে কারণ বর্তমান, পরিবর্তন আপনাআপনি আসতে পারে নি। এই কারণ হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের জন্যই জগতে নিরন্তর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে ও জীবজগতের ক্রমবিকাশ ঘটছে।

কার্যকারণের মধ্যে চেতনা সত্তার প্রকাশ : আবার একই কারণ সর্বদা একই কার্য সৃষ্টি করে। অন্ধ যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে এর ব্যাখ্যা চলে না। একটি কার্যের জন্য একটি কারণকে নির্বাচন করা ও অন্যান্য কারণকে বর্জন করা কেবল মনের ইচ্ছার পক্ষেই সম্ভব, আবার এই ইচ্ছাশক্তি একটি উদ্দেশ্যেরই নির্দেশ দেয়। সুতরাং বস্তুজগতের সমস্ত কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত চেতন সত্তার ইচ্ছার প্রকাশ।

তৃতীয়ত, জড়বস্তুর মধ্যেও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন : হেন্ডারসনের (Henderson) মতে, জড় প্রকৃতির মধ্যেও উদ্দেশ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। নীহারিকা থেকে সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি ও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রাণির আবির্ভাবের মূলে এক বিশেষ উদ্দেশ্য কাজ করেছে। অগ্নিময় গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তন ও প্রাণির আবির্ভাবকে যান্ত্রিক বিবর্তন বলা চলে না। কারণ বিক্ষিপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ কেন সুন্দর ধরণীতে বিবর্তিত হলো; কেন চেতনাসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব ঘটল সে বিষয়ে সুরাহা করতে গেলে জড়জগতের বিবর্তনের মাধ্যমেও উদ্দেশ্যমুখীনতার অবস্থিতি স্বীকার না করে উপায় নেই। জড়জগৎ বা বস্তুজগতের মধ্যে ঐক্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ক্রিয়াশীল। নিষ্প্রাণ-নিশ্চেতন জড়ের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার রাজত্ব বিশ্বজগতের পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

ভাববাদী দার্শনিকদের ইঙ্গিত

ভাববাদী দার্শনিকদের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা উদ্দেশ্যমুখীনতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের সম্মুখীন হই। উদ্দেশ্যের অবস্থিতি বুদ্ধি বা মনের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। কাজেই বিশ্বজগতের বিভিন্ন সত্তা তারস্বরে এক বুদ্ধিময় পরম শক্তির অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

৬. পরিণতিবাদের প্রকারভেদ

পরিণতিবাদী দার্শনিকরা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে পরিণতিমূলক বা উদ্দেশ্যমুখী বলে স্বীকার করলেও পরিণতি বা উদ্দেশ্যের স্বরূপ সম্পর্কে দুটি ভিন্ন মত পোষণ করেন। ফলে পরিণতিবাদ (পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ)- বাহ্য পরিণতিবাদ (External Teleology) এবং আন্তর পরিণতিবাদ (Internal Teleology) এই দুইভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

বাহ্য পরিণতিবাদ (External Teleology) বাহ্য পরিণতিবাদ অনুসারে জগতের উদ্দেশ্য জগতের বাইরে অবস্থিত। নিজের কোনো উদ্দেশ্য না থাকায় জগৎ স্রষ্টার উদ্দেশ্যই সাধন করছে। অ্যারিস্টটলের মতে, খোদা জগতের নিয়ামক। তিনি এই জগতের বাইরে অবস্থান করেন। জাগতিক বিবর্তনবাদের উদ্দেশ্য অতিবর্তী। স্রষ্টার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সৃষ্টির বিভিন্ন বস্তু মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাহ্য পরিণতিবাদের অতিবর্তী উদ্দেশ্যেই বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

খোদা জগৎ বহির্ভূত : বাহ্য পরিণতিবাদ দ্বৈতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ অনুসারে খোদা জড় থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। জগতকে যথাযথ পরিচালনা করার জন্য তিনি জগতে শক্তি সঞ্চার করেন। তিনি বাহির থেকে জগতের পরিচালনা করছেন।

সমালোচনা

Criticism

সীমিত খোদা ও বাহ্য পরিণতিবাদের বিরুদ্ধে নিচে বর্ণিত ত্রুটিসমূহ উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

প্রথমত, খোদাকে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় অতিবর্তী নিয়ামক বলে স্বীকার করলে খোদা জগতের দ্বারা সীমিত হয়ে পড়েন। খোদা অনন্ত ও অসীম। সীমিত খোদাকে খোদাই বলা চলে না।

দ্বিতীয়ত, খোদা যন্ত্রীর পর্যায়ে উন্নীত। খোদা বাইরে থেকে জগৎ নিয়ন্ত্রিত করলে খোদার সাথে জগতের সম্পর্ক বাহ্য হয়ে দাঁড়ায়। সে ক্ষেত্রে জগতের সাথে খোদার সম্পর্ক কল্পনা করলে খোদাকে মানুষ্যোচিত গুণাবলি আরোপ করতে হয়। খোদাকে মানুষ হিসেবে কল্পনা করা অযৌক্তিক।

তৃতীয়ত, ঐক্যের ব্যাখ্যা অসম্ভব। খোদা জগতের বহির্ভূত সত্তা হলে খোদার সাথে জগতের সম্পর্ক বা যোগাযোগ কীভাবে সম্ভব হতে পারে, এই মতবাদ অবৈজ্ঞানিক। কেননা আধুনিক বিজ্ঞানও সৃষ্ট জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করেছে। কাজেই বিবর্তন প্রক্রিয়া মূলীভূত সত্তার সাথে জগতের সম্পর্ক অবান্তর, বাহ্য নয়।

আন্তর পরিণতিবাদ (Immanent Teleology) : আন্তর পরিণতিবাদ অনুসারে জগতের উদ্দেশ্য জগতের মধ্যেই রয়েছে। জগতের সাথে খোদার সম্পর্ক আন্তর, বাহ্য নয়। হেগেলে, ব্রাডলি প্রভৃতি ভাববাদী দার্শনিক এই মতবাদের প্রধান সমর্থক। এই মতবাদ অনুসারে এই জগৎ এক চৈতন্যময় পরমসত্তার প্রকাশ। এই চৈতন্যময় সত্তাই জগতের মধ্যে ঐক্যবিধান করছে। জগতের মধ্যে কোনো আকস্মিকতা নাই, অংশ সমগ্রের মধ্যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করছে। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করছে। সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে ঐক্য, সংহতি, নিয়ত কাজ করছে; নদ-নদী, পাহা-ড়পর্বত, গাছপালা, জীবজন্তু মিলে জগৎ এক নিয়মের রাজত্ব বলে প্রতীত হচ্ছে; জগতের যাবতীয় জিনিস মিলে একটি সমগ্র হিসেবে চলছে। উদ্ভিদের বীজ থেকে অঙ্কুর কিংবা উদ্ভিদের মূল থেকে উদ্ভিদ জন্মাচ্ছে, ডালপালা, কাণ্ড, মূল সব মিলে উদ্ভিদ জীবনের সংহতি, সমগ্রতা রক্ষিত হচ্ছে। সেকেলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস এমনই যে জীবের বিভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সেগুলি অনুকূল। এইভাবে জগতের বিভিন্ন বস্তু, উদ্ভিদ, জীব ও মানুষের গঠনকৌশল, ক্রিয়াকলাপ সব মিলে এমন ঐক্য ও সংহতি বিরাজ করছে যে, সমগ্র জগতের মধ্যে দিয়ে সর্বজনীন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে চলেছে তা একটু খেয়াল করলেই বুঝা যায়। সমগ্র জগতের ঐক্য, নিয়ম সংহতি, সামঞ্জস্য থেকে আমরা এই অনুমান করতে বাধ্য হই যে, সমগ্র জগৎ এক পরম চৈতন্যময় শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

আকারগত কারণ ও উদ্দেশ্য কারণ পরিণতিবাদের নির্দেশক : আন্তর পরিণতিবাদ যান্ত্রিকতা ও পরিণতিবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। যান্ত্রিক কার্যকারণ বলতে আমরা বুঝি একটি উপায় যার মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রত্যেক ঘটনার কোনো একটি পূর্ব কারণ আছে তেমনি তার একটি অন্তিম কারণও আছে। এই অন্তিম কারণ হলো উদ্দেশ্য। অ্যারিস্টটল কারণের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে কারণের চতুর্বিধ রূপের বিবরণ দিয়েছেন। যেমন– উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ, আকারগত কারণ, পরিণতি কারণ। কোনো বস্তু কি উদ্দেশ্য সাধন করবে সেই উদ্দেশ্যের ওপরই সেই বস্তুর আকার নির্ভর করে। পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর আকৃতিতে আকারগত কারণ এমনই যে, তা বস্তুর বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার উপযোগী। বিভিন্ন শ্রেণীর দৈহিক গঠনের দিকে নজর দিলে সে সত্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। জড়বস্তু, জীব ও মানুষের দৈহিক বিন্যাস এবং জগতের যাবতীয় বস্তু, জীব ও মানবসত্তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা তারস্বরে ঘোষণা করে যে, জগতের পরিণতি মূলত বিবর্তনবাদ বা সৃষ্টিবাদের নির্দেশক।

জড়জগৎ ও জীবজগতের মধ্যে উদ্দেশ্যমুখীনতা সক্রিয় থাকলেও আত্মচৈতন্যের মধ্যেই উদ্দেশ্যমুখীনতা পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বজগতের সর্বত্র সমগ্রকে প্রকাশ করার এক দুর্নিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। এক পরম চৈতন্যশক্তি বিশ্বজগতের মূলীভূত শক্তি হিসেবে ক্রিয়া করছে। বিশ্বজগতের সবকিছুর ভিতর দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। জড়, প্রাণ ও মনের মধ্যে এক অখণ্ডতা বা ধারাবাহিকতা ক্রিয়া করছে। সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যে উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে তা বাইরের উদ্দেশ্য নয়। বিবর্তনের

সর্বোচ্চ স্তর চৈতন্যই বিশ্বজগতের সবকিছুর মধ্য দিয়ে কাজ করে ফিরছে। অসীমের আত্মোপলব্ধি বিশ্বজগতের বিবর্তনের মূল প্রেরণা। জগতের উদ্দেশ্য জগতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আন্তর পরিণতিবাদই বিবর্তন প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারে।

টীকা : যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ও পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদের পার্থক্য

Difference Between Mechanical and Teleological Evolution

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ও পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যসমূহ দৃষ্ট হয়–

প্রথমত, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে এই জগৎসহ সৌরজগৎ আদিম উপাদান অগ্নিময় গ্যাসীয় পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আদিম উপাদান ঐক্যবিধান ও পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসারে সৌরজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ, জড়বস্তু, জীব, মানবসত্তা, সবকিছুর আদিম উপাদানের বিবর্তিত রূপ। অপরপক্ষে, পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে আত্মসচেতন আধ্যাত্মিক সত্তাই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল শক্তি ও প্রেরণাই আত্মোপলব্ধির নিমিত্ত বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুর প্রাণ ও মানস সত্তার উদ্ভব ঘটছে। সুতরাং যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ জড়াত্মক প্রক্রিয়া, আর পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ আত্মসচেতন প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়ত, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ উদ্দেশ্যবিহীন, আর পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ উদ্দেশ্যমূলক। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীদের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া কোনো বুদ্ধিময় সত্তার নির্দেশনা ছাড়াই আপনি চলছে। জড় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীব, মানবসত্তা, বিশ্বজগতের সব কিছুই উদ্ভূত হচ্ছে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার পশ্চাতে কোনো চেতনাশক্তি ক্রিয়াশীল নয়। পক্ষান্তরে, পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদীর মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া এক আত্মসচেতন আধ্যাত্মিক সত্তার আত্মোপলব্ধির ফল। এক পরম আধ্যাত্মিক শক্তির বিবর্তনের সকল স্তরে ক্রিয়া করছে, বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করছে। পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন লক্ষ্যাভিসারী, আর যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অন্ধ ও যান্ত্রিক।

তৃতীয়ত, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে, বিবর্তনের পশ্চাতে কোনো পরিকল্পনা নেই। বিশ্বজগৎ আদিম উপাদান থেকে যান্ত্রিক নিয়মে উদ্ভূত। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ আকস্মিকতার ওপর নির্ভরশীল; যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের ভিত্তি আকস্মিক, স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন। পক্ষান্তরে, পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তনবাদ সৌন্দর্য, ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সংহতির সাক্ষ্যের ওপর নির্ভরশীল। জগৎ পরিকল্পনায় বুদ্ধির যে আভাস পাওয়া যায় তাই হলো পরিণতিবাদের ভিত্তি, কিন্তু যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণরূপে অনুমানসঞ্জাত।

চতুর্থত, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ কোনোরূপ উদ্দেশ্যকে স্বীকার করে না, কাজেই যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ পরিণতিবাদকে অগ্রাহ্য করে, কিন্তু পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যাকে পরিবর্জন করে না বরং অতিক্রম করে। সুতরাং পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ সমন্বয়ধর্মী, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ সমন্বয়ধর্মী নয়।

৭. সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ

Creative Evolution

ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁ (Bergson) সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের প্রবর্তক। তাঁর মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া সৃজনমূলক, অনিয়মিত ও অজ্ঞাতপূর্ব। বিবর্তন প্রক্রিয়া নিরন্তর অজানার পথে ধাবিত হচ্ছে এবং নিত্যনতুন বস্তু সৃষ্টি করে চলেছে। এতে পুরাতনের প্রত্যাবর্তনই নয়, আছে সম্পূর্ণ নতুনের আবির্ভাব। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ও পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদের সমালোচনার মাধ্যমেই তিনি সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর মতে, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ও পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ উভয়ই অযৌক্তিক। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের প্রত্যেক পূর্বস্তর প্রত্যেক উত্তর স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে, আবার পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদও প্রত্যেক উত্তর স্তর প্রত্যেক পূর্ব স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ও পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ উভয়ই যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার মতে, অতীতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া এবং ভবিষ্যতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই– উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রনের চাপ, স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। এখানে নিয়ন্ত্রণবাদ বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। তাই বার্গসঁ যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ও পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদ উভয়ই পরিবর্জন করেন এবং সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ প্রচার করেন।

বার্গসঁর মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া সৃজনধর্মী। প্রাণপ্রবাহ নব নবসৃষ্টির মাধ্যমে নিজেকে সার্থক করে তুলছে। বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীন, লাগামশূন্য। কোনো কিছুই এর গতিকে রোধ করতে পারে না। বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিণতি সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। জীবজগতের দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। জীবের ক্রিয়াপদ্ধতির দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, জীবের ক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা চলে না, কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা অবস্থায় জীব কীভাবে প্রতিক্রিয়া করবে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। জীবের কার্যকলাপের মতোই জীবদেহের অযুত পরিবর্তনেরও কোনো যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ বিবর্তন নিয়ন্ত্রণবিহীন, নব নবসৃষ্টির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হওয়াই বিবর্তন প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য।

বার্গসঁ ডারউইন ও লামার্কের জৈবিক বিবর্তনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, ডারউইন জীবদেহের আকস্মিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। লামার্কের পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানই যদি বিবর্তন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হতো, তবে বহু পূর্বেই বিবর্তন ক্রিয়া থেমে যেত। কারণ উচ্চস্তরের জীবের তুলনায় নিম্নস্তরের জীব পরিবেশের সাথে সহজেই সঙ্গতি বিধান করতে পারে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার নতুন সৃষ্টি প্রবণতা যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে অনুপস্থিত। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদে বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর নিয়ন্ত্রিত। জড় থেকে জীবের সৃষ্টি, জীবন থেকে মনের সৃষ্টি– উচ্চতর স্তর পূর্ববর্তী স্তরের জটিল সৃষ্টি। বার্গসঁ এই নিয়ন্ত্রণ ও পুনরাবৃত্তিকে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ সৃষ্টি বৈচিত্র্যের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদও এক ধরনের নিয়ন্ত্রণবাদ। এখানে পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে, একটি উদ্দেশ্য বিবর্তন প্রক্রিয়াকে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রিত করে। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের বিবর্তন প্রক্রিয়া অতীতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কারণে বার্গসঁ উভয় প্রকারের বিবর্তনবাদ বর্জন করে সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, বিবর্তনবাদ যান্ত্রিকও নয়, পরিণতিমূলকও নয়– সৃজনমূলক।

বার্গসঁর এই সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ তাঁর পরমতত্ত্বের ধারণা থেকে উৎসারিত। তাঁর মতে, পরমসত্তা হলো প্রাণপ্রবাহ (Elan Vital)। এ অন্ধ ও বিরামহীন, স্বীয় প্রাণপ্রবাহের প্রচণ্ডতায় সৃষ্টিমুখর প্রাণপ্রবাহ অন্ধ আবেগে ছুটে চলেছে অজানার পানে, কোনো বিরাম নেই, কোনো যতি নেই, অবিরাম ছুটে চলাই এর ধর্ম। এই প্রাণপ্রবাহকে কালপ্রবাহও (Duration) বলা হয়ে থাকে। প্রাণপ্রবাহ ও কালপ্রাবহ এক ও অভিন্ন। উভয়ই এক বিরামহীন গতি। কাল এক অনাদি-অনন্ত প্রবাহ, এর মধ্যে কোনো যতি নেই, কোনো বিরাম নেই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে কোনো বিভাগ কালের মধ্যে নেই। এ মনের কল্পনা নতুন সৃষ্টির পথে প্রাণপ্রবাহ থেকে এক বিপরীত শক্তির সৃষ্টি হয়। "এই বিপরীত শক্তি থেকে জন্মগ্রহণ করে জড়।"[১] বস্তুত প্রাণ হলো গতি, জড় হলো বিপরীত গতি।

বার্গসঁর মতে, বুদ্ধির সাহায্যে প্রাণপ্রবাহকে জানা যায় না। অবশ্য জড়কে বুদ্ধি জানতে পারে। প্রাণপ্রবাহকে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। এই স্বজ্ঞার সাহায্যেই প্রাণ বা কাল প্রবাহের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। স্বজ্ঞা হলো মনের উচ্চতর শক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা। স্বজ্ঞার সাহায্যে আমরা সত্তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারি ও তার সাথে একাত্মতা অনুভব করতে পারি।[২]

সমালোচনা

Criticism

সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের উৎকর্ষ : বার্গসঁর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ দর্শনের ইতিহাসে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি বিবর্তনবাদ প্রক্রিয়ার একটা উল্লেখযোগ্য দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বিবর্তন প্রক্রিয়া সৃষ্টিদর্শী, নতুন নতুন বস্তুর সৃষ্টির মাধ্যমে, এ সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিবর্তন প্রক্রিয়া যে পুনরাবৃত্তিমূলক নয়, জড়, প্রাণ ও মনের প্রকৃতিগত পার্থক্য থেকেই তা হৃদয়াঙ্গম করা যায়। জগতের যুগান্তকারী সৃষ্টিসমূহ বার্গসঁ মতের পরিপোষক। সুতরাং যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে বার্গসঁর অভিযোগ সমর্থনযোগ্য।

বাহ্য পরিণতিবাদ ও সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ : বার্গসঁ পরিণতিমূলক বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আরোপ করেছেন তা অতিবর্তী পরিণতিবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু আন্তরপরিণতিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ অচল। কারণ আন্তর পরিণতিবাদ অনুসারে যে উদ্দেশ্য বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করছে তা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কাজেই বিবর্তন প্রক্রিয়া স্বনিয়ন্ত্রিত– স্বাধীন। অন্ধ

---

[১] The elan-vital is a creative impulsion of endiess duration but its continual movement does not proceed without interruption; at a certain point the flow is interrupted and like recoil of a spring; turns back upon itself. This inverse movement is matter. – C.M. Joad, *Introduction to Modern Philosophy*, P. 100

[২] It is by intuition that we enter into and appreciate the meaning of the symphony as an indivisible whole; it is by intuitiion that we enter into and grasp the nature of reality as an indivisible whole. – Ibid, P. 96.

আবেগ বিশ্বের ঐক্য সংহতি ব্যাখ্যা করতে পারে না। বার্গসঁ প্রাণপ্রবাহকে অন্ধ আবেগ বলেছেন। এই অন্ধ প্রাণপ্রবাহ নতুন সৃষ্টির পথে চলেছে অকারণ, অবারণ। কিন্তু বিশ্বের সৃষ্টি-কৌশল ও গঠন বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ করলে আমরা বলতে পারি না যে, বিবর্তন এক অন্ধ আবেগময় শক্তির তাণ্ডবলীলা। কেননা উচ্ছৃঙ্খল অন্ধ আবেগ শক্তি বিশ্বচরাচরে সঙ্গতি বিধান করতে পারে না। উদ্দেশ্যের ধারণা ব্যতিরেকে বিতরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায়।

বিনিয়ন্ত্রণবাদ অবাস্তব : বার্গসঁ, বিবর্তন প্রক্রিয়া অনিয়ন্ত্রিত, অজ্ঞাতপূর্ব ও সৃজনমূলক; এটি কোনো শৃঙ্খলার অধীন নয়। কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের লক্ষণ প্রকট রয়েছে তা নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ করে। বার্গসঁর বিনিয়ন্ত্রণবাদ অবাস্তব।

দর্শন বুদ্ধিকে উপেক্ষা করতে পারে না : বার্গসঁ সত্তার সপক্ষে অত্যধিক ওকালতি করেছেন, পরমতত্ত্বের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বুদ্ধির ব্যর্থতা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দর্শন, বুদ্ধি বা চিন্তানির্ভর। কাজেই বার্গসঁর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারে না। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি যে পরম আদর্শের বাস্তবায়নের দিকে, সৃজনমূলক বিবর্তনবাদে তার কোনো ইঙ্গিত নেই।

৮. উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ

Emergent Evolution

দার্শনিকরা বিবর্তন প্রক্রিয়াকে দুই দিক থেকে বিচার করেছেন। কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন যে, বিবর্তন প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তিমূলক (Repetitive) আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, এটা উন্মেষমূলক (Emergent)।

পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনবাদ ও যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ পুনরাবৃত্তিমূলক। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদকে তলিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, এই মতবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে নতুন কোনো কিছুর আবির্ভাব ঘটে না। এখানে প্রত্যেক পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের নিছক পুনরাবৃত্তি ও জটিলতর রূপ। জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ জড় থেকে স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নয়; প্রাণ থেকে মনের উৎপত্তি, মন প্রাণ থেকে স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নয়। প্রাণ জড়ের জঠিলতর রূপ, মন প্রাণের জটিলতর রূপ। কাজেই নিয়মতান্ত্রিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে।

পক্ষান্তরে, উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরে নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে। এখানে প্রত্যেক পরবর্তী স্তরে পূর্ববর্তী স্তরে হতে কোনো নতুন গুনের আবির্ভাব ঘটে থাকে। জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব। প্রাণের স্তরে এমন কিছু মেলে যা জড়ের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত, আবার মনের ক্ষেত্রে এমন কিছু উদ্ভূত হয় যা প্রাণের স্তরে অনুপস্থিত। কাজেই উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রত্যেক নতুন স্তরে এমন কিছুর উদ্ভব ঘটে যা তার পূর্ববর্তী স্তরে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উন্মেষমূলক ও যোগগত গুণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যে গুণ আছে, বিভিন্ন উপাদান যোগ করলে যখন সেই গুণের আবির্ভাব ঘটে তখন তাকে বলা হয় যোগগত গুণ (Resultant) কিন্তু উন্মেষমূলক গুণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে নেই এমন গুণের আবির্ভাব ঘটে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনের ফলে পানি পাওয়া যায়, এটি যোগগত গুণ, কিন্তু পানি তৃষ্ণা

নিবারণের ক্ষমতা উন্মেষমূলক গুণ, যোগগত গুণ নয়। জড় থেকে প্রাণের আবির্ভাব বটে, ক্ষমত. উন্মেষমূলক গুণ যোগগত গুণ নয়। জড় থেকে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে, প্রাণ জড়াত্মক হলেও প্রাণের মধ্যে এমন গুণের আবির্ভাব ঘটে যা প্রাণের মূলীভূত উপাদানের মধ্যে উপস্থিত নেই। কাজেই প্রাণ জড়ের পুনরাবৃত্তি নয়। অনুরূপভাবে মন প্রাণের পুনরাবৃত্তি নয়। উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদে প্রত্যেক পরবর্তী স্তরে নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে। লয়েড মর্গান (Lioyd Morgan) ও স্যামুয়েল আলেকজান্ডার (Samuel Alexander) উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের প্রবর্তক।

লয়েড মর্গান : লয়েড মর্গান সর্বপ্রথম উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ (Emergent Evolution) কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রত্যেক নতুন স্তরে নবসৃষ্টির উন্মেষ বুঝায়– জড়, জীব ও চৈতন্যকে একই বর্ণহীন সত্তায় মিশিয়ে দেওয়া বুঝায় না। বিবর্তন প্রক্রিয়া আদিম উপাদান একাধারে জড় ও মানসশক্তি। এই আদিম উপাদানের সংমিশ্রণে বিবর্তনের প্রত্যেকটি নতুন স্তরে নতুন গুণ বিশিষ্ট বস্তুর আবির্ভাব ঘটে। এক বিশেষ শক্তি এই নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে থাকে। এই শক্তি হলো সক্রিয়তা (Activity), মন (Mind) বা খোদা (God)। মর্গান বিবর্তনের মূলীভূত উপাদানকে তেজশক্তি (Nisus/Urge) বলেছেন। লয়েড মর্গান বলেন, "আমি স্বীকার করি, খোদা হলেন তেজশক্তি যার কার্যক্ষমতা নূতনের উন্মেষ ঘটায় এবং উন্মেষমূলক বিবর্তনের সমস্ত গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।"[১]

স্যামুয়েল আলেকজান্ডার : স্যামুয়েল আলেকজান্ডারের মতে, দেশ-কাল (Space-time) বিশ্বের আদিম উপাদান। দেশ-কালকে শুদ্ধগতিও বলা হয়ে থাকে। এই আদিম উপাদান থেকে জড়ের উদ্ভব ঘটেছে, তারপর উদ্ভূত হয়েছে জড়ের মুখ্য ও গৌণ গুণসমূহ। জড়বস্তু থেকে প্রাণ ও মনের উন্মেষ হয়েছে। প্রতি স্তরেই নতুন গুণের উন্মেষ হয়েছে। মন বা চৈতন্য বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ স্তর নয়। মনের পরেও আর এক সত্তার আবির্ভাব ঘটবে– এই সত্তার নাম খোদা (Deity)। এই নতুন শক্তির আবির্ভাবের জন্য তিনি এক সৃজনী শক্তির কল্পনা করেছেন– এই শক্তির নাম তেজশক্তি (Nisus)। আলেকজান্ডারের মতে, খোদা বিবর্তন ক্রিয়ার শেষ স্তর।

আলেকজান্ডারের উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদও অনেকটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মতো। কিন্তু তেজশক্তি, মনের আবির্ভাব ও মূল্যবোধের ধারণার ফলে উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ অনেকটা ভাববাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে।

আলেকজান্ডার ও মর্গানের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে আলেকজান্ডারের মতে, দেশ ও কাল বা শুদ্ধগতি বিবর্তন প্রক্রিয়ার আদিম উপাদান। এই উপাদান আধ্যাত্মিক বা মানসিক উপাদান নয়। অপরপক্ষে, লয়েড মর্গানের মতে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার আদিম উপাদান জড় থেকে প্রাণ; প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, আলেকজান্ডার বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রেরণা হিসেবে দেশ-কালকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, দেশ ও কালের বিবর্তনের ফলে খোদার আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু লয়েড মর্গান মনে করেন যে বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রেরণা হলো খোদা যিনি বিবর্তনকে

---

[১] I acknowledge God as the Nisus through Whose activity emergent emerges and the whole course of emergent evolution is directed. – Loyd Morgan

নিয়ন্ত্রিত করছেন। পরিশেষে বলতে হয়, আলেকজান্ডারের মতবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক। এ অতিবর্তী পরিণতিবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই একথা বলা যায় যে, আলেকজান্ডারের চেয়ে লয়েড মর্গানই বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্বরূপ উপলব্ধির পথে অনেক বেশি অগ্রসর।

সমালোচনা

Criticism

উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ পুনরাবৃত্তিমূলক নয়। এই মতবাদ প্রাণ ও মনের নতুনত্ব স্বীকার করে, নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাকে স্বীকার করে থাকে।

লয়েড মর্গান বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল প্রেরণা হিসেবে খোদার সক্রিয় শক্তিকে স্বীকার করেছিলেন। এখানে প্রশ্ন ওঠে : খোদা কি জগতের বাইরে, না ভিতরে অবস্থান করেন? খোদা বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত প্রেরণা হলে বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু খোদা যদি জগতের বহির্ভূত হন তবে তাঁর সাথে জগতের সম্পর্ক বাহ্য হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় লয়েড মর্গানের মতবাদ অতিবর্তী পরিণতিবাদের দোষের অধীন হয়ে পড়ে।

আলেকজান্ডারের মতবাদও ত্রুটিমুক্ত নয়। কীভাবে বিবর্তন প্রক্রিয়ার আদিম উপাদান দেশ-কাল থেকে জড়ের গুণাবলির উৎপত্তি ঘটে এবং বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরে নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয় আলেকজান্ডার তার কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি। তাঁর মতে, তেজশক্তি (Nisus) বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু অচেতন তেজশক্তি কীভাবে বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে তা অবোধ্য।

কাজেই উন্মেষমূলক বিবর্তনকে একটা সঙ্গত মতবাদ বলে মনে করা চলে না। বিবর্তন যে উদ্দেশ্যমুখী, এক মহান লক্ষ্যর দিকে নিয়ত এগিয়ে চলেছে। সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশ নেই।

সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ ও উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের পার্থক্য

Difference between Creative and Emergent Evolution

সৃজনমূলজ বিবর্তনবাদ উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। উভয় মতবাদই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নতুনত্বের সপক্ষে রায় প্রদান করে। এই মতবাদদ্বয়ের সমর্থকরা মনে করেন যে, বিবর্তন পুনরাবৃত্তিমূলক নয় বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই নতুন নতুন সৃষ্টির দ্বারা নিজেকে সার্থক করে তুলছে। প্রাণপ্রবাহ মুক্ত ও স্বাধীন। আর উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের নিছক পুনরাবৃত্তি নয়। প্রত্যেক পরবর্তী স্তরে নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে থাকে।

উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রত্যের স্তরেই নতুন সৃষ্টি হয়ে থাকে, এই সৃষ্টি অজ্ঞাতপূর্ণ ও পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের কোনো সাদৃশ্য নেই– পরবর্তী স্তর পূর্ববর্তী স্তরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, কিন্তু উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদে পরবর্তী স্তর পূববর্তী স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, একেবারে অচিন্তিতপূর্ব ও অজ্ঞাপূর্ব নয় তবে নিঃসন্দেহে নতুন। অন্যকথায় সৃজনমূলক বিবর্তন অনিয়ন্ত্রিত বাধাবন্ধনহীন, কিন্তু উন্মেষমূলক বিবর্তন নিয়ন্ত্রিত– সৃজনমূলক বিবর্তনবাদে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোনো প্রয়াস নেই, কিন্তু উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের পরবর্তী স্তরে নতুন আবির্ভাব ঘটলেও তা অসঙ্গত নয়।

টীকা : বিবর্তনবাদ সম্পর্কে রুমি

Rumis Conception of Evolution

আধুনিক বিজ্ঞানে ডারউইন, লামার্ক, ভাইসম্যান, ম্যানডেল, দ্য ভ্রিজ প্রমুখ বিবর্তনবাদীদের পূর্বেও মানুষের ইতিহাসে বিবর্তনের ধারণা অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন যুগে প্লাটিনাম নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। উচ্চতর সত্তা থেকে নিম্নতর সত্তা উদ্ভূত হয়, কিন্তু প্রত্যেক পূর্ববর্তী স্তর পূর্ববর্তী ঐশী স্তর থেকে উৎসাহিত হওয়ার জন্য তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায়। কাজেই নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে, উচ্চতর থেকে নিম্নতর স্তরে যাতায়াত চিরন্তন। তবে প্লটিন (Plotin)-এর মতে পরিবর্তন কালিক নয়। প্রত্যেক সত্তার নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উচ্চতর সত্তা থেকে তা জীবন ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। চিন্তার ইতিহাসে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী 'এখওয়ানুস সাফা'। তাঁদের মতবাদ অ্যারিস্টটলীয় মতবাদ ও নব্য প্লেটোবাদের সমন্বয়। বস্তুত এখওয়ানুস সাফা ডারউইন ও স্পেন্সারের পূর্বসূরি মুতাযিলা চিন্তাবিদ নাজ্জামও বিবর্তনবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীত থেকে উদ্ভূত হয়েছে– বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অতীতেরই বিকাশ। মরমি কবি রুমিই মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিবর্তনবাদী। রুমি তাঁর পূর্বসূরি সব চিন্তাবিদদের ধারণা সমন্বিত করে তাঁর নিজস্ব মতবাদ গঠন করেন।

ডারউইন ও রুমি : মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি শুধু মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বিবর্তনবাদী চিন্তাবিদই ছিলেন না আধুনিক যুগের বিপ্লবাত্মক বিবর্তনবাদী ডারউইনেরও পূর্বসূরী তিনি। অবশ্য ডারউইন ও রুমির চিন্তায় যে পর্যায়ে মিল রয়েছে তা প্রক্রিয়ায়। ডারউইন মানুষের বিবর্তন পর্যন্ত গেছেন এবং তার পরে বিবর্তনের কোনো অবকাশ আছে কি-না সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। রুমি মানুষ থেকে ফেরেশতায় ফেরেশতা থেকে খোদায় বিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিবর্তন সম্পর্কে রুমির মতবাদ ডারউইনের মতবাদের চেয়ে বলিষ্ঠতর ও ব্যাপকতর।

রুমির বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর : রুমির মতে সৃষ্টির পূর্বে পরমসত্তা নিজের কাছে অজ্ঞাত ছিলেন। সৃষ্টি ক্রিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে শুরু হয়েছিল এবং সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। পরমসত্তা প্রথমে বস্তু বা পরমাণুরূপেই প্রকাশ পেয়েছিলেন। মহাসমুদ্রের মধ্যে ফেনার মতোই আবির্ভূত হয়েছিলেন। বস্তুজগৎ তখন অত্যন্ত নগণ্য ছিল। যখন খোদা নিজেকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি একটি আর্শী তৈরি করেছিলেন। এই আর্শী সামনের দিকে আত্মা, পিছনের দিকে বিশ্বজগৎ। আত্মা থেকে দেহের উৎপত্তি– দেহ থেকে আত্মার উৎপত্তি নয়। আত্মা বায়ু মেঘ হিসেবে জীবন শুরু করে; দীর্ঘদিন আত্মা এই আদিম উপাদান হিসেবে সক্রিয় ছিল। আত্মার পরবর্তী বিবর্তিত রূপ উদ্ভিদ। রুমি বলেন যে, আমাদের বস্তুর দিকে তাকালে চলবে না, বস্তুর বিবর্তনের অন্তরালবর্তী সৃজনশীল শক্তির কথা ভাবতে হবে। আসলে বিবর্তনের মূলীভূত শক্তিই প্রধান কথা। অজৈব পদার্থ জীবে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ অজৈব উপাদান পরবর্তী পর্যায়ে শাকসবজি প্রভৃতি উদ্ভিদে রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদ প্রাণিতে রূপান্তরিত হয়। রুমির মতে একটি স্তর বিনাশপ্রাপ্ত না হলে পরবর্তী স্তরে

আত্মা
|
পরমাণু

উদ্ভিদ
|
জীব
|
মানুষ
|
ফেরেশতা
|
ঐশীগুণে
|
উদ্ভাসিত
|
হওয়া।

উন্মেষিত হতে পারে না। বিনাশ বিবর্তন প্রক্রিয়ার আবশ্যিক শর্ত। একটি স্তর হতে অন্য স্তরে বিবর্তিত হতে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের প্রয়োজন। এখানে আকস্মিকতার কোনো অবকাশ নেই। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিবর্তনীয় সত্তা পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়। প্রাণি বহিস্তর পার হয়ে মানুষের স্তরে উন্নীত হয়। মানুষ সাধনার মধ্য দিয়ে উচ্চতর স্তর ফেরেস্তার গুণে গুণান্বিত হয়। এর পরবর্তী স্তরে মানুষ খোদার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। পরমসত্তা খোদায় উপনীত হওয়াই বিবর্তন প্রক্রিয়ার চরম লক্ষ্য। প্রেমই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূলীভূত শক্তি। নিম্নে ড. মুহম্মদ ইকবালের The Development of Metaphysics in Persia গ্রন্থে উদ্ধৃত রুমির মসনবী শরীফের বিবরণ বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্তর সম্পর্কীয় পঙক্তিগুলি উৎকলিত হলো :

First man appeared in the class of inorganic things.
Next he passed there from into that of plants.
For years he lived a one of the plants.
Remembering nought of his inorganic state so different.
And when he passed from the vegetative to the animal state.
He had no remembrance of his state as a plant,
Except the inclination he left to the world of plants.
Especially at the time of spring an sweet flowers?
Like the inclination of infants towards their mothers
Which know not the cause of their inclination to the breast,
Again the great creator creator as you know.
Drew man out not of the animal into the human state.
Thus man passed from one order of nature to another.
Till he became wise and knowing and strong as he is now.
Of his first soul he has now no remembrance.
And he will be again changed from his present soul.
(Mathṇavi : Book IV)

অষ্টম অধ্যায়
জ্ঞান ও বিশ্বাস
KNOWLEDGE AND BELIEF

"We have but faith : We cannot know,
For Knowledge is of things, We see. – **Tennyson**

- আভাস
- জ্ঞান ও বিশ্বাস
- সমকালীন চিন্তাধারায় জ্ঞান ও বিশ্বাস
- জ্ঞানের অবস্থাসমূহ
- বিশ্বাসের শর্তাবলি

১। আভাস
Introduction

জ্ঞান কি? সাধারণভাবে বস্তুর যথাযথ ধারণাকে তার জ্ঞান বলা যায়। বহির্জগতের বস্তুর সঙ্গে যখন আমাদের মনের ধারণার সাদৃশ্য থাকে এবং এই সাদৃশ্য সম্পর্কে যখন আমাদের বিশ্বাস থাকে, তখনি জ্ঞান হয়েছে বলা যায়। জ্ঞানের নিম্নলিখিত চারটি অঙ্গ রয়েছে– (১) জ্ঞান মনের সুসংবদ্ধ ধারণা (২) বহির্জগতে ঐ সুসংবদ্ধ ধারণা অনুযায়ী বিষয়বস্তুর বিদ্যমানতা (৩) এই ধারণা ও বিষয়বস্তুর পরস্পর সঙ্গতি এবং (৪) এই সঙ্গতিতে বিশ্বাস। উদাহরণস্বরূপ যখন আমরা বলি চন্দ্রের জ্ঞান আমাদের আছে, তার অর্থ এই যে, আমাদের মনের স্নিগ্ধ আলোকপিণ্ডে চন্দ্রের ধারণা আছে, বাস্তব জগতে চন্দ্র আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এখানে উল্লেখ্য যে এই চারটি অঙ্গের উপস্থিতি জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য, কোনোটির অভাব থাকলে চলবে না।[1]

[1] ড. রশীদুল আলম, সহজ যুক্তিবিদ্যা পরিচয়, পৃ. ৩-৪ (মুদ্রণ-১৯৮৯)

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বস্তুর জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য, কিন্তু অনুমানলব্ধ, স্বজ্ঞালব্ধ, প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান সম্পর্কে উক্ত মানদণ্ডের নিশ্চিত প্রয়োগ সম্ভব নয়। জ্ঞান একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। এর সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক সংশ্লিষ্ট, এ ছাড়া মানুষের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা প্রভৃতি মানসিক অবস্থাও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

'বিশ্বাস' শব্দটি জ্ঞানের সঙ্গে অনিবার্যরূপে সংশ্লিষ্ট। সাধারণভাবে 'বিশ্বাস' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের কথাই মনে স্মরণ করে দেয়। কিন্তু 'বিশ্বাস' শব্দটির প্রাত্যহিক প্রয়োগের দিকে লক্ষ করলে বুঝা যায় যে, শব্দটি সাধারণভাবে জ্ঞানমূলক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত। নিজের ওপর বিশ্বাস এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'আত্মবিশ্বাস' শব্দটি আমাদের সবার কাছে পরিচিতি। এই শব্দটি সাধারণত নিজের সম্পর্কে বিশ্বাস, নিজের পরিচয় (Identity), নিজের শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসকে বুঝায়। এটি এতই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যে মহামতি সক্রেটিস উচ্চারণ করেছিলেন, "Know thyself ।"এই পথ ধরেই জ্ঞানবিদ্যার বিশ্বাস রাজ্য আমাদের কাছ উন্মোচিত হয়ে চলেছে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র পার্থক্য প্রথমেই আমাদের চেতনাকে অধিকার করে। আমি যখন কোনো কিছু জানতে চাই, তখন আমি আমার সম্পর্কে অবহিত হই, তেমনি আমি ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কেও অবহিত হই। অর্থাৎ জ্ঞাতা বা আমি এবং জ্ঞেয় বা আমি ছাড়া অন্য কোনো বস্তু সম্পর্কে অবহিত জ্ঞানের দুটি অপরিহার্য দিক। এখানে লক্ষণীয় যে এই জ্ঞানের পূর্বশর্ত হিসেবে নিজ সম্পর্কে বিশ্বাস এবং আমি ছাড়া আমার সামনে অবস্থিত বস্তু সম্পর্কে বিশ্বাস ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সক্রিয়। সুতরাং আলোচ্য অর্থে বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে জ্ঞান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় না। এই দিক দিয়ে জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্যভাবেই জড়িত রয়েছে।

এই অর্থের দিক দিয়ে 'বিশ্বাস' ধর্মবিশ্বাসের এলাকা অতিক্রম করে আমাদের জ্ঞানের একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে জ্ঞানের জটিলতর স্তর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় 'বিশ্বাস' শব্দটি বিশ্লেষণ নানা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে।

২। জ্ঞান ও বিশ্বাস

Knowledge and belief

প্রথমেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় জ্ঞান ও বিশ্বাস কি একই পর্যায়ভুক্ত। এই দুটি বিষয় কি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়? এই মান কি একই? সমস্যাটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারটি বেশি স্পষ্ট। কোনো বিষয়কে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে হলে তাকে যৌক্তিকতাসম্পন্ন হতে হয়। যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে কোনো বিষয় জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়। শুধু বিশ্বাসই কোনো বিষয়কে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের যৌক্তিক সমর্থনও চাই। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমি বলি 'আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে' তখন আমাকে আমার বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হয়, আমাকে বিশ্বাসের কারণ দেখাতে হয়। কাজেই জ্ঞানের দাবি ও বিশ্বাসের দাবি এক পর্যায়ভুক্ত নয়। জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান পদবাচ্য হওয়ার যৌক্তিকতা উপস্থিত কিন্তু বিশ্বাসের জন্য যৌক্তিকতা অপরিহার্য নয়।

তবে জ্ঞান ও বিশ্বাস যোগসূত্র বর্জিত নয়, উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র বিদ্যমান। বিশ্বাস বলতে খামখেয়ালীপূর্ণ স্বেচ্ছাচারমূলক ধারণা বুঝায় না, বরং অনেক বিশ্বাসকে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, আমি টেবিলে হাত রেখে লিখছি। এ শুধু আমার বিশ্বাস, এ আমার জ্ঞানও। বস্তুজগতের বস্তুনিচয়ের বিশ্বাস আমাদের জ্ঞানের অন্যতম প্রদান উপাদন। কোনো কোনো চিন্তাবিদ সাধারণ বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে সাধারণ বিশ্বাস থেকে ভিন্নতর বলে মনে করেন। এক. তারা ধর্মীয় বিশ্বাসকে জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বলে দাবি করেন। দুই. আবার তাদের কেউ কেউ ধর্মীয় বিশ্বাসকে উচ্চতার জ্ঞান অথবা জ্ঞাননির্ধারক বলে অভিমত পোষণ করেন।

বুদ্ধির মাধ্যমে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তা দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন– আরোহ পদ্ধতি এবং অবরোহ পদ্ধতি। আরোহ পদ্ধতিতে একটি আপেল ফল পতিত হলে তিনি তাঁর কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবীর আকর্ষণে মাটিতে ফল পতিত হয়। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি মাধ্যকর্ষণ তত্ত্ব (Law of Gravitation) আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব জগতের অসংখ্য ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়। এই ধরনের পদ্ধতি আরোহ পদ্ধতি নামে অভিহিত।

আরোহ পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি অবরোহ পদ্ধতি। এই ধরনের যুক্তিপদ্ধতিতে পূর্বনির্মিত সূত্র। সত্য থেকে তার ভিত্তিতে বিশেষ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। এখানে আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে উন্নীত হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় :

সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল
করীম হয় একজন মানুষ
করীম হয় মরণশীয়।

এখানে লক্ষ করার বিষয় এই যে, 'করীম হয় মরণশীল' সিদ্ধান্তটি 'সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল' এবং 'করীম হয় একজন মানুষ'– এই দুটি আশ্রয়বাক্যের ভিত্তিতে অনুমিত। উভয় পদ্ধতিতে জানা থেকে অজানায়, জ্ঞান থেকে অজ্ঞাতে উত্তরণ রয়েছে। তবে উভয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। আরোহের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত ঘটনা থেকে সত্য আবিষ্কৃত হয়– নিয়ম বা তত্ত্ব খাড়া করা হয়; আর অবরোহের ক্ষেত্রে ঘটনা বা বিশেষ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় না, বরং কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্য সত্য থেকে সিদ্ধান্তে অনুমিত হয়। আরোহ অনুমান পদ্ধতিতে আশ্রয়বাক্য আবিষ্কার করা হয়, কিন্তু অবরোহ অনুমান পদ্ধতিতে আশ্রয়বাক্যে অনুমেয়। আরোহ অনুমানে প্রথমেই নতুন কিছুর সংযোজন দিয়ে কাজ শুরু হয়। অবরোহ অনুমানে প্রথমে যা অস্পষ্ট থাকে তা ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে বা স্পষ্টতর করে তোলা হয়। কোনো জ্যামিতিবিশারদ যখন কোনো পিথগোরীয় স্বতঃসিদ্ধ থেকে সিদ্ধান্ত অনুমান করেন তখন তিনি তার প্রতিপাদ্য বিষয়কে পূর্বাপেক্ষা স্পষ্ট করে তোলেন। আরোহে, আশ্রয় বাক্য নতুন তথ্য প্রদান করে, আর অবরোহ অনুমানে নতুন তথ্য পরিবেশনের পরিবর্তে আশ্রয় বাক্যের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে।

আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ই যৌক্তিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান। অন্য কথায় বলা যায়, আরোহ ও অবরোহ একই যৌক্তিক প্রক্রিয়ার দুটি দিক– একটি অপরটির পরিপূরক।

অনুমান ছাড়াও বাহ্যবস্তুকে জানার আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। এর নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। পঞ্চইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান আমরা লাভ করে থাকি। এই জ্ঞান অনুমানলব্ধ জ্ঞান থেকে পৃথক। এই জ্ঞানে বস্তু সরাসরি জানা যায়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান তিনটি পথে এসে থাকে। যথা– (১) বিশেষ, (২) সার্বজনীন ও (৩) চেতনার অবস্থান।

(১) বিশেষ : আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ও সরাসরি জ্ঞান লাভ করতে পারি। স্পর্শের সাহায্যে কোনো জিনিস শক্ত কি নরম তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়। একটি গোলাপ ফুল নাকের কাছ ধরলে তার সুগন্ধ পাওয়া যায়।

(২) সার্বজনীন : অপর এক ধরনের জ্ঞান আমরা সরাসরিভাবে পেয়ে থাকি। যেমন– আমরা বলি, যা লাল তা কালো নয়। লাল এবং কালোর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, কারণ তাদের অবস্থান দেশ-কালের নয়। এই কারণে বিশেষের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। বর্ণের কোনো বিশেষ অস্তিত্ব নেই।

(৩) চেতনার অবস্থা : মানুষ তার চেতনার গভীরে প্রবেশ করে তার মনে কি ঘটেছে তা জানতে পারে। এই জ্ঞান সে সরাসরি লাভ করে থাকে। এ চেতন অবস্থার জ্ঞান, এটি অর্ন্তদর্শন।

এটি ছাড়া, স্বজ্ঞা (intuition)-এর মাধ্যমেও আমরা জ্ঞান লাভ করে থাকি। অনুমানলব্ধ ও প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান থেকে এই জ্ঞান পৃথক। এক বিশেষ মুহূর্তে আমাদের চেতনার ওপর নির্দেশনার (suggestion) আকারে চমকিত হয়, ঠিকরে পড়ে। গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস-এর 'ইউরেকা' অর্থাৎ পেয়েছি শব্দটি উচ্চরিত হয়েছিল এমন একটি মুহূর্তে। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের জ্ঞান এমনি একটি বিশেষ মুহূর্তে লাভ করেছিলেন একটি নির্দেশনার আকারে।

স্বজ্ঞার জ্ঞানও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা– (ক) অনতিবিলম্বে নিশ্চয়তাবোধ, (খ) কোনো বাক্যের অন্তর্দৃষ্টি ও (গ) সমবেদনামূলক অন্তর্দৃষ্টি।

(ক) অনতিবিলম্বে নিশ্চয়তা বোধ : কোনো কোনো সময়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুভূতি কোনো ঘটনা বা বাক্যের সত্যতা সম্পর্কে নির্দেশ করে। যেমন, "বৈকালে ঝড় বৃষ্টি হবে' এখানে স্বজ্ঞা রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ ঘটনা বা বাক্যের সঙ্গে অনুভূতির সম্বন্ধ প্রমাণভিত্তিক নয়। এর ফলে স্বজ্ঞার অনতিবিলম্বের নিশ্চয়তার সঙ্গে সত্য বা জ্ঞানের দাবি করা হয়, বিশ্লেষণে এর অস্পষ্টতা প্রকাশ হওয়া বিচিত্র নয়।

(খ) কোনো বাক্যের অন্তর্দৃষ্টি : গণিতশাস্ত্র বা আকারিক বিজ্ঞানের বচনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টির বহুল প্রয়োগ পলিক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'দুটি বিন্দুর মধ্যে একটি সরলরেখা টানা সম্ভব', 'দুটি দেহ একসঙ্গে একই জায়গায় অবস্থান করতে পারে না'। –এই বাক্যগুলির সত্যতার দাবি এইভাবেই প্রতিপন্ন হয়ে থাকে যে, এইগুলি এইভাবে অনুমিত হয়ে থাকে।

(গ) সহানুভূতিমূলক অন্তর্দৃষ্টি : গণিতশাস্ত্রের বা যুক্তিবিদ্যার বচনের ক্ষেত্রে মনের প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টিরও সংবেদনমূলক অন্তর্দৃষ্টির দাবি অনুপস্থিত। সহানুভূতিমূলক অন্তর্দৃষ্টি প্রশংসাসূচক। কোনো কবিতার অর্থ বুঝতে হলে কবিতাটিতে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থের মাধ্যমে আমরা তা করে থাকি। কিন্তু সমবেদনামূলক অন্তর্দৃষ্টির সমর্থকরা মনে করেন যে কবির মেজাজকে সমবেদনামূলক অনুভূতির সাহায্যে যে সম্যক উপলব্ধি

করতে পারলেই কবিতার গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। এই পদ্ধতি যৌক্তিক বিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া। সুফিদের আত্মার আলোকিতকরণ (spiritual illumination)-এর সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে।

৩। সমকালীন চিন্তাধারায় জ্ঞান ও বিশ্বাস

Knowledge and belief in contemporary thinking

সমকালীন দর্শনে জ্ঞান ও বিশ্বাস একটি জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে একাধিক কারণে। 'জ্ঞান' ও 'বিশ্বাস' আপাতদৃষ্টিতে সহজ ও সরল বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। দার্শনিকরা জ্ঞান ও বিশ্বাসের তাৎপর্য উদ্ঘাটনের জন্য এই দুটি ধারণার বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রায়োগিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়াস পেয়েছেন। কোনো কোনো চিন্তাবিদ জ্ঞান ও বিশ্বাসকে এক করে দেখার চেষ্টা করেছেন। আবার কেউ কেউ জ্ঞান ও বিশ্বাসের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। আবার অন্য একদল দার্শনিক জ্ঞান বিশ্বাসকে পরস্পর সম্পূরক দেখানোর নমনীয় মনোভাবও ব্যক্ত করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান ও বিশ্বাসের ওপর আলোকপাত করেছেন।

ধর্মীয় লেখকদের ভাষা সুস্পষ্ট ও নির্ভুল– এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোনো কোনো দার্শনিক ধর্মবিষয়ক রচনার বিশ্লেষণ করেন। তারা ধর্মবিষয়ক রচনা আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করেন। অবশ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজনও রয়েছে। বিশ্বাস সাধারণ দর্শনেরও সমস্যা এবং তা আগ্রহও সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিককালে ধর্মদর্শনের ইতিহাসের ধর্মবিশ্বাসের যে রূপ বিশ্লেষণ হয়েছে তা একজন লোক কীভাবে ধর্মবিশ্বাসী হতে পারে– এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত। মি. পলহেম এ সমস্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মি. ম্যালকম তাঁর প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিশ্বাস, মাইন্ড, এপ্রিল ১৯৫২) জানার আবশ্যিক শর্ত হিসেবে নিশ্চয়তা দাবি করেছেন। মি. উজলি এই মতের বিরোধিতা করেছেন। কোনো বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারলে সে বিষয় সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়– একথা উজলী বিশ্বাস করেন না।

মি. এইচ. এ. প্রিচার্ড জ্ঞান ও বিশ্বাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, আমরা যখনই কোনো কিছু জানতে চাই আমরা যেন জানতে পারি যে আমরা কিছু জানছি। যখন আমরা কোনো কিছু বিশ্বাস করি তখন আমরা বিশ্বাসের কথা মেনে নিয়েছি যেন এই কথা বলি। তিনি দাবি করেন যে, 'জানা' ও 'বিশ্বাস' ভিন্ন। তাঁর মতে, যখন আমরা কোনো কিছু জানার কথা বলি তা নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলে থাকি, অপরপক্ষে, আমরা যখন কোনো কিছুতে বিশ্বাসের কথা উচ্চারণ করি তখন তা অনিশ্চয়তার সঙ্গেই করে থাকি। প্রিচার্ড বলেন, জ্ঞান মিথ্যাও নয়, সত্যও নয়, কিন্তু বিশ্বাস হয় সত্য না হয় মিথ্যা। কতগুলি বিশ্বাস স্বীয় বৈশিষ্ট্য গুণে অন্যান্য বিশ্বাস থেকে সত্য– এমন কথা বলা যায় না। তার মতে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সত্য বা মিথ্যা বলে বিশেষ কোনো বিশ্বাস নেই। তিনি বলেন যে কতগুলি শর্ত পালনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। এই শর্তগুলি জ্ঞানের, বিশ্বাসের নয়। জ্ঞানকে তাই বিশ্বাস বলা চলে না। বিশ্বাসকেও জ্ঞান বলে ভুল করা উচিত নয়।

ইংরেজি ভাষায় জানা (Knowing), জ্ঞান (Knowledge) ও বিশ্বাস (Belief) রয়েছে– এই শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োগের দিক দিয়েও শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। তাই শব্দগুলির ধারণাগত ভিন্নতাই আলোচনার বিষয়।

কোনো শব্দকেই উঁচু বা নীচু মানের মনে করা ঠিক নয়। তবে এখানে লক্ষ করার বিষয় হলো তিনটি ভিন্ন অর্থে জ্ঞান ও বিশ্বাসকে পর্যায়ভুক্ত করা যায় এবং এই তিনটি ক্ষেত্রেই জ্ঞান বিশ্বাস বলে প্রতীয়মান।

প্রথমত, মি. এইচ. প্রাইস জানাকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এই অর্থে 'জানা' ও 'বিশ্বাসের' মধ্যে তিনি কোনো গুরুত্বের বৈপরীত্য দেখেন নি। ব্যক্তির নিশ্চয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি এই অভিমত পোষণ করেন। এ ক্ষেত্রে জানা অর্থই সত্যতার প্রমাণ নয়। আর জানার অবশ্যম্ভাবী ফলও সত্য বলে ঘোষিত হয় না। এতদসত্ত্বেও যখন আমরা জানার ওপর গুরুত্ব দিই, তখন ব্যক্তির জানার ওপরই আমরা গুরুত্বারোপ করি। যখন করীম বলে যে, সে জানে যে তার বাবা এখন অফিসে আছেন তখন করিমের জানার ওপর গুরুত্বটি অধিকভাবে বর্তায়। কিন্তু করিমের জানাটাই, যা সে জেনেছে তার ফল নয়। তবে এই ধরনের জানা উত্তম পুরুষ হয়। জানার এই অর্থে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সর্বাপেক্ষা শূন্য চিন্তার জ্ঞানের দাবি করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ 'আমরা জানি আমার বন্ধু শহরে' অথবা 'আমি জানি আমার চাকর বাজারে'।

দ্বিতীয়ত, মি. ম্যালকম বলেন যে, আর এক ধরনের জানার দাবি করা হয় যে জানার বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলার অবকাশ নেই এবং সত্য বলে দাবি করার প্রমাণও দেওয়া যায় না। তবে তিনি দেখান যে, যারা জানার এই অর্থের সত্যতা দাবি করেন, তারা জানার বিষয়টি যে মিথ্যায় পর্যবসিত হতে পারে, সে কথাও স্বীকার করেন। অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে, জানার বিষয়ে সত্য-মিথ্যা প্রমাণের অনুসন্ধানের পথ বন্ধ। বিশ্লেষণাত্মক বাক্যে, বাক্যের সত্যমিথ্যা বাক্যের অর্থ দ্বারা নিরূপিত হয়। এক্ষেত্রে প্রমাণের কোনো প্রয়োজন হয় না। দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ চরমভাবে সংবেদোপাত্ত জানার দাবি করেন। এই সংবেদোপাত্ত যৌক্তিকভাবে বাহ্যগত বিষয় গঠন করে। মি. ম্যালকম বাহ্যগত বিষয়ক কোনো বাক্যকে চরম অর্থে জানা যায় বলে গ্রহণ করেন। এখানে তার অভিমত এই যে, জ্ঞাতা যা প্রত্যক্ষণ করে তা সত্য বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় অপরের প্রতিষ্ঠিত সত্যের প্রমাণের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ মি. ম্যালকম বলতে চান যে এক শ্রেণীর বাক্যের সত্যতা অপর শ্রেণীর সত্যতা দ্বারা ভুল প্রমাণ করা যায় না। তিনি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন আমার টেবিলে একটি কালির দোয়াত রয়েছে এবং তা আমার সামনেই রয়েছে। তিনি স্বীকার করেন যে, যে কোনো মুহূর্তে দোয়াতটি স্থানান্তরিত হতে পারে। তিনি দোয়াতটি স্পর্শ করতে পারেন। এ সত্ত্বেও তিনি জানেন যে দোয়াতটি এখনও তার সম্মুখে রয়েছে। তিনি অন্য কোনো ব্যক্তিকে ডেকে দোয়াতটি দেখাতে পারেন। এখানে ম্যালকম বলতে চান যে দোয়াতটি এখনও তাঁর সম্মুখে রয়েছে। ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তা তিনি জানেন না।

ম্যালকমের এই মতবাদটি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ পরিবর্তন শুধু ভাষার প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। তিনি বলতে চান যে, পরে দোয়াতটির যে কোনো পরিবর্তন হোক না কেন তার দোয়াতের অস্তিত্বের কোনো হেরফের ঘটে না। ম্যালকমের ধারণা মুরের বহির্জগৎ সম্পর্কীয় প্রমাণের সমপর্যায়ভুক্ত। তবে ভিটগেনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর মতবাদের ভিন্নতা আছে। ভিটগেনস্টাইনের মতে, কতগুলি বাক্য আছে যা প্রমাণ বা স্বতঃসিদ্ধের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। এই সব বাক্য ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বলে ভিত্তিহীন

নয়। ম্যুর যে অর্থে 'জানা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা ক্রটিপূর্ণ। মুর বলেছেন যে, কোনো মানুষের সম্পর্কে যখন বলে যে সে জানে, তখন জানে বলে যা সে বলে তা নিঃশর্তহীনভাবে সত্য। এই যে সত্যের দাবি তা ভাষার মারপ্যাচেই সত্য– ম্যুর এই অভিমত পোষণ করেন। অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যেসব প্রশ্নের সন্দেহের কথা আমি বলি সেই সব এমন কতগুলি বাক্যের ওপর নির্ভরশীল যেগুলি প্রশ্নাতীত বা সন্দেহমুক্ত। আর সেই সব প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত উল্লিখিত বাক্যের ওপর বর্তায়।

ম্যালকমের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে তাঁর দাবি যখন আমি বলি, আমি জানি যে 'ক' কে জোরালো অর্থে ব্যবহার করি কি-না, তা জানি না। তবে ম্যালকম তাঁর পূর্বালোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'ক' সত্য না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি উচ্চারণ করতে পারে না যে আমি জানি। 'ক' যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা হতবুদ্ধিকর। আমার ঘরের কোনো লোককে যদি আমি বলি, নিশ্চয় আমি জানি করিম এখানে ঘরের ভিতরেই আছে, এই দাবি যদি জোরালো অর্থেও করে থাকি, তার অর্থ এ নয় করিমকে আমি যেখানে দাবি করেছি সেখানেই আছে। এখানে ঘটনা যে ধরনের তাতে আমি জানাকে জোরালোভাবে ব্যবহার করতে পারি না। এ আমার একটি ঘটনা যেখানে আমি মনে করতে পারি যে কেউ অন্য ঘরে আছে। ফলে জ্ঞানের বিষয় মিথ্যায় পর্যবসিত হচ্ছে।

এখানে লক্ষ করার বিষয় যে, চরম অর্থে জানা বা বিশ্বাস বিশ্লেষণাত্মক কিংবা সংবেদোত্ত বিষয়ক বাক্যসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অধিকন্তু বহির্জগৎ সংক্রান্ত কিছু বাক্য চরম অর্থে জানা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, জানা বা বিশ্বাসকে সাধারণত সত্য বিশ্বাস বলে গণ্য করা হয়। মি. এয়ার কোনো কিছু জানার অপরিহার্য ও পর্যাপ্ত শর্ত পূরণের দাবি করেন। (১) কেউ যা জানে বলে দাবি করে তা সত্য হতে হবে। (২) তিনি দাবির বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। (৩) জানার বিষয় সম্পর্কে একজনের নিশ্চিত হওয়ার অধিকার থাকতে হবে এবং এই অধিকার পরবর্তীতে তার দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রমাণকে উপেক্ষা করার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। জানার এই নিশ্চিত রূপককে বিশ্বাস না বলে জ্ঞান বলা যেতে পারে। এই আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, জ্ঞান তিনটি আবশ্যিক ও যৌথ শর্ত পূরণের ব্যবস্থা। যথা : বিশ্বাস, সত্য ও প্রমাণ।

এইসব শর্তের মধ্যে কেউ 'জানা' শব্দটিকে বেছে নেন। আবার কেউ কেউ 'জানা' শব্দটিকে বাকি দুটি শব্দের অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। যেখানে 'ক' কে বিশ্বাস করা হয় কিংবা জানা যায়, এ ক্ষেত্রে আমরা এ বিশ্বাসকে তাত্ত্বিক বলে মনে করি। এখানে বিশ্বাসীর বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তি আছে, তবে তা সার্বজনীন হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া অন্যান্য কারণ রয়েছে যার জন্য দাবিকৃত জ্ঞান গ্রহণযোগ্য হয় না। এইগুলি নিম্নরূপ :

(১) জগত সম্পর্কীয় সম্ভাব্য বাক্যে 'বিশ্বাস' সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে বিশ্বাসটির ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ঘটনা এবং ব্যাখ্যার মধ্যে তারতম্য করা হয়েছে। যখন কিছু কিছু লোক বিশেষ ক্ষেত্রে কতগুলি ঘটনার ঐকমত্যে পৌঁছে, তাদের তাত্ত্বিক দাবির ভিন্নতার জন্য তাকে ভিন্ন বলা হয়ে থাকে। এই ভিন্নতা আসলে মূল্যায়নের ভিন্নতা, ঘটনার নয়।

(২) যেখানে বিশ্বাস বোধগম্য নয় সেখানে আপত্তি উঠে বাক্যের অর্থকে কেন্দ্র করে। কোনো বাক্যে জামিল দাবি করল যে, সে ঈশ্বরকে জানে। এর প্রতিবাদ করে

কবীর বলল যে, ঈশ্বর বলতে বড় জোর এক ব্যক্তিত্ব বুঝায়। ঈশ্বর পূর্ণ ধারণা জাত নয়। ধর্মসংক্রান্ত আমাদের জানা বাক্যগুলি নিয়ে প্রায়ই এই ধরনের আপত্তি উঠে থাকে। এ দাবি করা হয় যে, ঈশ্বর আছেন এমন বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না। তবু এ ধরনের বাক্যের নিশ্চয়তা দাবি করা হয়।

(৩) গোপন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষণীয় নয়, এমন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। গোপনীয় অভিজ্ঞতা বলতে বুঝায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কোনো ব্যক্তি তিনি সরাসরি ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভের সহায়তা করার আশা করতে পারেন। 'শিক্ষণীয় নয়' বলতে অভিজ্ঞতা পথনির্দেশের অন্তরায় বুঝায়। শিক্ষণীয়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলো বিশ্বাসের যুক্তিকে বাস্তবে প্রমাণ করা। কোনো যুক্তি প্রদর্শনের অপরিহার্য শর্ত হলো বাক্য শিক্ষা দেওয়া। যদি এভাবে বিশ্বাসের যুক্তি বাক্যের সত্যতার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে বিশ্বাস হবে যৌক্তিক। এর অভাব ঘটলে তা হবে অযৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে অস্টিনের মতে জানার অন্তর্নিহিত অর্থ আছে, যা ব্যক্তির নিশ্চয়তার ধারণা আনে। যে কোনো জোরের সঙ্গে কেউ জ্ঞানের দাবি করতে পারে না, সেখানে 'বিশ্বাসই' প্রযোজ্য। আমরা যেখানে সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত নই, সেখানে আমরা বলে থাকি, আমরা বিশ্বাস....... আমি বিশ্বাস করি.......... । এক্ষেত্রে আমরা জানি যে, আমাদের বিশ্বাস সত্যও হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে।

রাজনৈতিক কারণেও বিশ্বাস শব্দটি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন– (১) বহু ধর্ম রয়েছে, (২) সেসব ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে থাকে। এই সব ধর্ম শাসনতন্ত্রে বিশ্বাস অথবা মতামত হিসেবে উল্লিখিত হয়ে থাকে। তবে রাজনৈতিক ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ম কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। কাজেই মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জ্ঞানের চেয়ে বিশ্বাসের ব্যবহার অধিক যুক্তিযুক্ত। মানুষ নিশ্চিত হয়ে কিংবা অনিশ্চিত হয়েও বিশ্বাসের প্রয়োগ করতে পারে। তবে এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, তার বিশ্বাসের অধিকার রয়েছে। প্রাইস বলেন যে যখন জানাকে নিশ্চিতভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন জানা ও বিশ্বাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু এও ঠিক নয়। কেননা কোনো মানুষ যুক্তি প্রদর্শন না করেও কোনো জিনিসে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। বিশ্বাস যে-সব সময়েই নিশ্চয়তা বর্জিত স্বীকৃতিস্বরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এমন নয়। এমন হতে পারে যে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ সম্ভব হচ্ছে না, তাই নিশ্চয়তাকে বাদ দেওয়া যায়। 'বিশ্বাস' জানার বিপরীতে অস্বীকৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশ্বাসকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করা যায় না। যদিও বিশ্বাস জ্ঞানের চেয়ে ভিন্নধর্মী, তবু বিশেষ অর্থে ধর্মীয় বিশ্বাস সত্য বিশ্বাসেরই একটি ঘটনা।

বাটলারের মতে, 'ক' ধর্মীয়ভাবে 'খ'-তে বিশ্বাস করে, এর অপরিহার্য ফল এই দাঁড়ায় যে, 'ক' সঙ্গতভাবে 'খ'-তে বিশ্বাস করে। জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে দ্ব্যর্থকতা নিশ্চয়তাকে বিনষ্ট করে। এই ধরনের চারটি ক্ষেত্রের বিষয় নিম্নে আলোচিত হলো :

(১) জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই এ প্রযোজ্য হতে পারে। ম্যুর বলেন যে, যে বস্তু সম্পর্কে কেউ জানে না তা রীতিমতভাবে সত্য হতে পারে। তবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ম্যুরের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। ম্যুরের মত মেনে নিলে দাবি করা যায় যে, 'ক' সত্য হওয়ার অর্থই তা নিশ্চিত। এ বড় কথা নয়। আমরা কোনো জ্ঞানতত্ত্বীয় পদকে সত্য বানাতে পারি। যদি তা করতে পারি তাহলে 'ক' নিশ্চিত। অর্থাৎ 'ক'-কে জানা মানে 'ক' সত্য।

(২) যেখানে উক্তি করা হয় 'ক' নিশ্চিত, এর অনিবার্য ফলস্বরূপ 'ক' সত্য। কিন্তু 'ক' অজানা। যেখানে সত্যভাবে উক্তি করা যেতে পারে সেখানে যুক্তিগুলি সম্ভাবনার চেয়েও জোরালো কিন্তু জ্ঞান প্রদানের যুক্তির চেয়ে কম জোরালো। এখানে দেখানো যেতে পারে যে, ক্ষেত্রটি অনুমানভিত্তিক।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, বিশ্বাস জ্ঞান ও বিভিন্ন ধারণা এই অর্থ প্রকাশ করে না, যে কোনো একটিকে উদাসীনতার সঙ্গে অসতর্কভাবে গ্রহণ করা যায়। এ সন্দেহাতীতভাবে অস্বীকৃত যে, যাকে আমরা ভাবতত্ত্ব জ্ঞান বলছি তা জ্ঞানের বিষয়। সত্য বলতে গেলে বলতে হয় যে জ্ঞানের দাবি আমরা করে থাকি তা গ্রহণযোগ্য অনুমান। কেউ কেউ অবিশ্বাসও করেন যে কতগুলি জ্ঞানতত্ত্বীয় নিশ্চয়তা রয়েছে, আর সেগুলি জ্ঞানের বিষয় নয়। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, যদি কেউ 'ক'-এর নিশ্চয়তার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদশন করতে না পারে তবে সে দাবি প্রত্যাহার করে নেওয়াই ভালো। এখানে লক্ষ করা যেতে পারে যে, এমন সব ধারণা এবং জানা, বিশ্বাস করা ইত্যাদি ক্রিয়াপদের সাধারণ ব্যবহার হয়ে থাকে যার মধ্য দিয়ে উল্লিখিত সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোনো বাক্যে বিশ্বাস করার অর্থ কি কোনো ব্যক্তিতেও বিশ্বাস করা? একালের অনেক ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মদর্শনের লেখকের কাছে ব্যাপারটি অসঙ্গত মনে হবে। কেননা ব্যক্তি ও বাক্যের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে যে ব্যক্তিজ্ঞান অঙ্গীকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেগুলি পুনঃ 'আমি', 'তুমি' সম্পর্কের অন্য দিকে বাহ্যজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি অসংখ্য ভিন্নতার সঙ্গে যুক্ত। এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

ব্যক্তি ও বাক্যে বিশ্বাসের কোনো বিরোধ নেই যদি সংশ্লিষ্ট বাক্যটি কোনো ব্যক্তির উক্তি বলে বোঝা যায়। কারণ 'চ'-কে 'ছ'-তে বিশ্বাস করতে হলে 'ছ' অবশ্যই ক-এর উক্তি করবে এবং 'ক', 'চ'-তে বিশ্বাস করবে।[১] 'মতীন' 'রফিক'কে বিশ্বাস করে– এই বাক্যে প্রায়ই সালাম যা উক্তি করে গফুর তা বিশ্বাস করে– এই অবস্থার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ।

'জানা'র ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। সালামের 'ক' তে বিশ্বাসের প্রেক্ষিত কি– এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ রয়েছে। সালাম কীভাবে 'ক'-কে জানল তার পরিষ্কার কোনো অর্থ নেই। কোনো অবস্থাতে 'ক'-কে জানার অর্থব্যক্তিকে জানার ঘটনা থেকে পারে না। কেননা ব্যক্তিকে জানার অর্থ ব্যক্তি সম্পর্কে অবশ্যই কিছু বলার সামর্থ্য থাকতে হবে। বাক্য সম্পর্কে কারও জ্ঞান আছে তা প্রমাণের খাতিরেই তাকে তা করতে হবে যদি তার সামর্থ্যের ব্যবহার কখনও করে নি। সালামকে জানতে হলে গফুর অবশ্যই নিজের জন্য জানবে। গফুরের পক্ষ হয়ে তাহের কখনও সালামকে জানতে পারে না।[১]

অতীতে ব্যক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করা হতো। গফুর বা হালিমের বিশ্বস্ততা গফুর বা হালিমের অস্তিত্বের প্রকাশ করে। কিন্তু বিশ্বাস সর্বত্রই অস্তিত্বের প্রকাশ নয়। অস্তিত্ব নেই অথচ অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিশ্বাস অস্তিত্বহীনতার সঙ্গে তুলতে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে

---

[১] প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম, সাধারণ দর্শন, পৃষ্ঠা ১৪৬, অবসর প্রকাঃ ২০০০

বিশ্বাস নারীর ভোটদানে বিশ্বাস থেকে ভিন্নতর। ঈশ্বরে বিশ্বাস অন্তত ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস। যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হয়েছে সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁর প্রতি অনুভূতি থাকার কথা বলা সমান। ম্যালকম যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বর বিশ্বাসের অর্থ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি কিছু অনুভূতির মনোভাব থাকা। ঈশ্বরে বিশ্বাস অন্যান্য জড়বস্তু থেকে ভিন্নতর। অনুভূতির মনোভাব ব্যতিরেকে কেউ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে পারে না। কেউ তা করলে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আলোচনাযোগ্য নয়। বস্তুত মি. ম্যালকমের নির্দেশানুযায়ী বিশ্বাসের ভালো বা মন্দ কোনো যুক্তি থাকতে পারে না, সেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাসের অর্থই ঈশ্বরকে সম্ভ্রম করা বা ভয় করা।

জ্ঞানের প্রসঙ্গ আলোচনা বর্ণনামূলক জ্ঞানের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। যেটুকু ব্যতিক্রম উল্লেখের দাবি রাখে, তা ম্যালকমের। তিনি দাবি করেন যে জ্ঞাতা জ্ঞেয়র সম্মুখে উপস্থিত থেকেই জ্ঞানের দাবি করেন। এই শর্তটি ম্যালকম কর্তৃক আরোপিত। এখানে বর্ণনামূলক জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের প্রবণতা লক্ষিত হয়।

রাসেল তাঁর Problems of Philosophy (1910) গ্রন্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বর্ণনামূলক জ্ঞান (Knowldege by acunaintance and Knowledge)-এর মধ্যে পার্থক্য দেখান। এই পার্থক্য প্রদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল সংবেদনের সংজ্ঞা সার্বজনীনতার জ্ঞান এবং যৌক্তিক সত্যের কাঠামো নিরূপণ করা। এই পার্থক্যকরণের জন্য রাসেলকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বার্শাড মেয়ো দাবি করেছেন যে রাসেলের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা বাঞ্ছনীয় ছিল। এই না করার ফলে জ্ঞানবিদ্যার বৃহত্তর পরিসরে রাসেলের সৃষ্ট নতুন সঙ্কটের সংযোজন ঘটেছে।

এই পার্থক্য স্বয়ং সমালোচনার অধীন। হাবীব তার কোনো বন্ধুকে বলল, "আমিনরা একটি ঝি পেয়েছে জেনে তুমি খুশি হবে।" হাবীব এই অর্থে বলতে পারে, 'তুমি জেনে খুশি হবে আমিনরা ঝি পেয়েছে অথবা অন্যভাবে বলতে পারে "যে ঝিটা আমিনেরা পেয়েছে তাকে জেনে তুমি খুশি হবে।" প্রসঙ্গ হচ্ছে হাবীবের বন্ধু যা জেনে খুশি হবে তা হলো আমিনের যে একটি ঝি আছে বাক্যটি সত্য জেনে। দ্বিতীয়ত হাবীবের বন্ধু যা জেনে খুশি হবে তা হলো ব্যক্তি ঝি যাকে আমিনরা সম্প্রতি জোগাড় করেছে।[১]

এ থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে যা জানা যায় তা বাক্যিক নয়– অবাক্যিক। যখন হাবীব আমিনকে জানে, তখন তাকে ব্যক্তি হিসেবেই জানে, বাক্য হিসবে নয়। কিন্তু হিনটিক্কা দেখিয়েছেন যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বাক্যিক মনোভাব বিশ্বাস থেকে ধারণাকে বচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে দাবি করতে হলে তবে তা কতগুলি অবস্থার প্রেক্ষিতেই করতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো বচনকে সত্য বা নির্ভুল বলে দাবি করতে হলে এই শর্তগুলি পূরণসাপেক্ষ তা ধরে নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : আমরা যখন নির্ভুল বচন ব্যবহার করতে যাই তখন তাদের একটি অপরটির সঙ্গে এবং আমাদের বোধশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এতদ্ব্যতীত আমরা যখন দাবি করি, কোনো যুক্তিসঙ্গত অস্তিত্ব আছে, তখন আমরা এ শর্ত বা ব্যবস্থা

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৭

পূরণের নির্দেশ করতে পারি। যেমন, আমরা বস্তুটিকে দেখতে পারি। যে সকল ধারণার ক্ষেত্রে নিয়মটি সত্য তাকে ধারণা বলা যেতে পারে।[২]

এমন কতিপয় ধারণা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা সাধারণভাবে শর্তপূরণের দাবি করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যথার সঙ্গে সম্পর্কিত অবস্থা আচরণগত প্রতিক্রিয়ার সজনসমক্ষে ধরা না পড়ে, ততক্ষণ ব্যথার কারণ সাধারণভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। এ ধারণাকে খ ধারণা বলা যেতে পারে।

বিশ্বাসকে খ ধারণার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাকে অন্য খ ধারণায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। অবশ্য এখানে অভিপ্রেত যে, বিশ্বাস চিন্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কেননা যে বিষয় চিন্তা করা যায় না তা বিশ্বাসের মধ্যে আসতে পারে না। কোনো ব্যক্তি জীবনে যা শোনে নি কিংবা চিন্তাভাবনা করে নি, সে বিষয়ে বিশ্বাসও করতে পারে না। গ্রিফিথস বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের কারণ কার্যকারণসূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়। কেননা তার অভাব ও আচরণের মধ্যে সম্পর্কের মূল কারণ বিশ্বাস।

বিশ্বাসকে ক ধারণার অন্তর্ভুক্ত করার অনেকগুলি অসুবিধা অনেকেই দেখতে পান না। ফলে তার জ্ঞান ও বিশ্বাসকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করে থাকেন। আমি কি বলব তা না জেনেও আমি কি বিশ্বাস করি তা জানতে পারি। আমি অসতর্কতাবশত যা বলি অন্তত আমি জানি তাতে আমি বিশ্বাস স্থাপন করি না। এমন হতে পারে যে, কোনো লোক যা বিশ্বাস করে তা সে অজ্ঞানে কিংবা ভুলবশতই করে থাকে। এমনও হওয়া বিচিত্র নয় যে, একটি লোক সারা জীবন যে বিশ্বাসটি লালন করল তা তার নিজস্ব নয়। এই মতের সমর্থকরা এইভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন যে মানুষ কোনো কিছুর প্রেক্ষিতেই কোনো কিছু বলে বা করে থাকে। তারা ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে থাকে বলে ব্যর্থ হয়। আবার যারা তাদের চেতনার আলোকে বিশ্বাসটির ভালোমন্দ বিচার করে তারা ভুল করে না কিংবা ব্যর্থ হয় না। বিশ্বাসটির ভালোমন্দ বিচার এমন থাকতে পারে যে, কোনো কিছু বিচার-বিশ্লেষণ না করেও সারা জীবন কোনো কিছুতে বিশ্বাসী।

৪। জ্ঞানের অবস্থানসমূহ

Condition of Knowledge

আলোচ্য যৌক্তিক বাক্যটি যদি 'প' হয় তবে নিম্নে উল্লিখিত অবস্থাসমূহের কোনোটিতেই কোনো ব্যক্তি 'প'-কে জানতে পারেন না, এমন কি তিনি 'প' সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং 'প' যদি সত্যও হয়।

(ক) প-এর সম্পর্কে তার হাতে কোনো প্রমাণ নেই,
(খ) তিনি প্রমাণ সম্পর্কে ভ্রান্ত,
(গ) তিনি প-এর সঙ্গে প্রমাণটির সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত।

যে নৈরাশ্যবাদী এটি জানার দাবি করেন যে, তার আতসবাজির উৎসবটি বৃষ্টির জন্য পণ্ড হয়ে যাবে, সেই নৈরাশ্যবাদী (প্রকৃতপক্ষে) তা জানা থাকে না। এটা বলার স্বপক্ষে তার কোনো প্রমাণ নেই যে, উৎসবটি এইভাবে পণ্ড হয়ে যাবে। এই অবস্থায় তিনি ক-এর অধীন হয়ে পড়েন। খ এবং গ অবস্থাসমূহ প্রমাণবিষয়ক ভুলভ্রান্তির সঙ্গে

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮

সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এই শেষোক্ত দুই ধরনের ভুলভ্রান্তিসমূহ ভিন্ন জাতীয় ভুলভ্রান্তি। খ-এর অধীনে ভুলভ্রান্তিসমূহ এই উপাত্তগুলি সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশিত হওয়ার মধ্যে নিহিত থাকে যা কোনো প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেন। যেমন– আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণ হিসেবে কেউ যখন মনে করেন যে, এ বৃষ্টির মেঘমালা পুঞ্জিভূত হওয়া থেকে সংঘটিত হয়েছে, যখন প্রকৃতপক্ষে এবং ধারণাটি হচ্ছে প্রজ্বলিত তেলের গুদাম থেকে ধূম্ররাশির উদগীরণ, এই ভুল ধারণাটির বশবর্তী হয়ে আমি অসঙ্গতভাবে অনুমান করতে পারি যে, বৃষ্টি আজ রাত্রিতে আমার আতসবাজির উৎসবটি পণ্ড করে দিবে। গ-এর অধীন ভ্রান্তিসমূহ সম্ভবত আরও বেশি সাধারণ। এই ভ্রান্তির স্বয়ং প্রমাণ সম্পর্কে নয়, বরং প্রমাণ সম্পর্কে এর কার্য সম্বন্ধে, সিদ্ধান্তটির সঙ্গে এর সম্পর্ক সম্বন্ধে। কেননা, হয়তো সিদ্ধান্তটির জন্য এটি একটি প্রমাণ হলেও পর্যাপ্ত প্রমাণ নয়। প্রথমটি উদাহরণ হিসেবে জালের (forgery)-এর একটি অভিযোগকে উপস্থাপন করা যেতে পারে, সে অভিযোগটি দুটি স্বাক্ষরকে তাড়াহুড়ার মাধ্যমে মিলিয়ে দেখে তা থেকে এই অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে স্বাক্ষর দুটি তা একই ব্যক্তির স্বাক্ষর, যখন অধিকতর সতর্ক অনুসন্ধান পরিচালিত হবে তখন প্রমানিত হবে যে স্বাক্ষর দুটি একই ব্যক্তির স্বাক্ষর নয়। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসেবে হত্যার একটি অভিযোগকে উপস্থাপন করা যেতে পারে যা, যে কক্ষে মৃতদেহটি পাওয়া গেছে সে কক্ষের দরজার হাতলে অভিযুক্ত ব্যক্তিটির আঙুলের ছাপ দেখতে পাওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আঙুলের ছাপ নিশ্চিতভাবেই এর কিছু প্রমাণ, তবে তা পর্যাপ্ত প্রমাণ নয়, কারণ হত্যা সংঘটিত হওয়ার সময়ে হত্যার উদ্দেশ্য নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির মতো অন্যান্য কিছু ব্যক্তিও হয়তো ঐ কক্ষটিতে প্রবেশ করেছিল। আর সন্দেহটি যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর গিয়ে বর্তায় তার জন্য সতর্কতামূলক পন্থা হিসেবে এই সব ব্যক্তি হয়তো দস্তানা পরিধান করেছিলেন অথবা দরজার হাতল স্পর্শ না করার দিকে সদাসতর্ক ছিলেন। এই দুটি দৃষ্টান্তের প্রত্যকটিতে অভিযোগগুলি অভ্রান্ত হতে পারে। কেননা অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রকৃতপক্ষেই জাল ও হত্যা করেছিল। কিন্তু প্রমাণ হিসেবে যেসব বিষয় উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির থেকে এ জানা যেতে পারে না যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণই দোষী। জানার জন্য একজন ব্যক্তির অবশ্যই **ক** প্রমাণ থাকতে হবে। **খ** প্রমাণটি সম্বন্ধে সঠিক হতে হবে, **গ** সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্রমাণটির সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক হতে হবে। তাকে অবশ্য এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে যে **খ** ও **গ**-এর অধীনেও সঠিক আছেন। 'প' কে জানার জন্য উক্ত ব্যক্তিটির খ ও গ-এ উল্লিখিত আত্মজিজ্ঞাসার সুদীর্ঘ ও সুস্পষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয় না। কোনো ব্যক্তি যদি প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে, মহাত্মা গান্ধী মৃত, তা হলে তার এ জানার দাবিটি বৈধ হবে, তার জন্য এ আবশ্যক নয় যে, তিনি ইতোমধ্যে তা প্রমাণ করেছেন।[১]

৫। বিশ্বাসের শর্তাবলি

Condition of Belief

বিশ্বাস করা নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ের একটি সংযোগের মধ্যে নিহিত থাকে– (১) প্রত্যয়ের (Conviction) মাত্রাভেদে 'প' সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ-সূচক একটা জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং (২) প-এর সপক্ষে কিছু প্রমাণ থাকা। প্রমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেখানে প্রত্যয়ের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়, সেখানে বিশ্বাসটি যুক্তিসঙ্গত হয়।

---

[১] এ. ডি. উবলি (অনুবাদ : মোঃ আব্দুর রশিদ) জ্ঞানতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ২৫৬-২৫৬ এবং নূরনবী, দর্শনের সমস্যাবলি, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৬১০-৬১১।

কোন ব্যক্তি আতসবাজির উৎসবের আয়োজন করেছে। শুধু এই কারণে আমরা বিশ্বাস করি যে, আজ রাত্রিতে বৃষ্টি হবে, তাহলে বিশ্বাসটিকে আমরা একটি অযৌক্তিক বিশ্বাস বলে অভিহিত করব এবং সরকারি আবহাওয়া সংক্রান্ত পূর্বাভাসে আজ রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে– এই কারণে আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, আজ রাত্রিতে বৃষ্টি হবে, তাহলে আমরা বিশ্বাসটিকে একটি যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস বলব। প্রমাণের ব্যাপ্তি, প্রকৃতি ও মান অনুযায়ী বিশ্বাস যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার সমগ্র পরিধি জুড়ে ব্যাপৃত থাকতে পারে। কিন্তু আমরা যাকে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করি তার যদি সম্পূর্ণভাবে অভাব থাকে তবে আমরা আদৌ কখনও বিশ্বাস করি এই কথার কোনো সঙ্গত কারণ থাকে না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারও হয়তোবা এমনভাবে কাজ করতে হতে পারে, যেমন তিনি বিশ্বাস করেন। যেমন কোনো ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সক্ষমতা সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনে কেউ যখন ব্যাট করার অনুক্রমের ব্যাপারে (batting order) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যায়। কিন্তু বিশ্বাস করার মতো করে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকা বিশ্বাস করা থেকে পৃথক এবং বিশ্বাস করার মতো করে কাজ করা থেকে উদ্ভূত আচরণ বিশ্বাস করা উদ্ভূত আচরণ থেকে পৃথক। এমন সব দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে যেখানে কারও 'কোনো প্রত্যক্ষ স্বজ্ঞা (অনুভূতি) থাকে" কিংবা কেউ যখন অন্ধভাবে প্রত্যয়শীল হয়, কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে কেউ এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপনে অসুবিধা বোধ করে। এখানে এই অসুবিধা বোধের কারণ প্রমাণ উপস্থাপনের অক্ষমতার কোনো চেতনা নয়; বরং কারণটি এই যে কারণ উপস্থাপনের অসম্পূর্ণতার চেতনা। কেউ তাই অন্ধ স্বজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ করে।

যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস জ্ঞানে পরিণত হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রমাণ যখন সাধারণভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয় তখন কোনো প্রকৃত সমস্যা সেখানে রয়েছে কি-না তা অনুসন্ধান করার কোনো কথা নেই। আমরা মনে করি এর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই; আর সমস্যা থাকলে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। অসংখ্য অভিজ্ঞতানির্ভর যুক্তি বাক্যসমূহের বৈশিষ্ট্য বিশেষ ও সাধারণ সপক্ষে আমাদের প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ রয়েছে এবং কোনো যৌক্তিক বাক্যের সপক্ষে আমাদের যখন কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ থাকে তখন আমরা তাকে সত্য বলে জানি।

পাঁচটি বিষয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত : (১) যে প্রমাণ চূড়ান্ত নয় সে প্রমাণটির ওপর ভিত্তি করে নিশ্চিত হওয়া ও সঠিক হওয়া। (২) যে প্রমাণ চূড়ান্ত নয়, সে প্রমাণটির ওপর ভিত্তি করে নিশ্চিত হওয়া ভ্রান্ত হওয়া। (৩) যে প্রমাণ চূড়ান্ত নয় সে প্রমাণটির ওপর ভিত্তি করে অনিশ্চিত হওয়া ও সঠিক হওয়া। (৪) যে প্রমাণ চূড়ান্ত নয়, সেই প্রমাণটির ওপর ভিত্তি করে অনিশ্চিত হওয়া এবং ভ্রান্ত হওয়া। (৫) যে প্রমাণ চূড়ান্ত, সেই প্রমাণটির ওপর ভিত্তি করে নিশ্চিত ও সঠিক হওয়া।

এই শেষোক্ত বিষয়টি বিশ্বাসের শর্ত নয়, বরং এ জ্ঞানের শর্ত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রমাণ চূড়ান্ত হওয়া অপরিহার্য। প-কে জানার মধ্যে আছে প যেখানে সত্য সেখানে প-তে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা, এবং প-এর সপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ থেকে সে বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হওয়া। প-এর সপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া এবং হয়তো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণে মনোযোগ দিয়ে এবং সচেতনভাবে একে প্রমাণ হিসেবে গণ্য করে তা থেকে প-কে অনুমান করার মধ্যে নিহিত থাকে, নয়তো প্রয়োজন হলে সুষ্ঠুভাবে এতে মনোযোগ দেওয়া সক্ষমতা ইত্যাদির অর্থাৎ প-তে অনুমান করা সম্ভাব্যতার মধ্যে নিহিত থাকে। জ্ঞানকে তাই বিশ্বাস থেকে শ্রেণীগতভাবে পৃথক একটা কিছু হিসেবে বিশ্লেষণে না করে বরং সংযত বিশ্বাস হিসাবে বিশ্লেষণ করা হয়, এমন একটা কিছু হিসেবে যেখানে গিয়ে বিশ্বাস পৌঁছায় সেখানে প্রমাণটি পর্যাপ্ত হয়।

নবম অধ্যায়
অবধারণ ও অনুমান
JUDGEMENT AND INFERENCE

"Inference is simply a deep insight into the necessary connection of things, It is an act of thought which discovers the essential relations between things which at first sight appear to hve no connection with one another." – Mreighton and Smart.

- আভাস
- চিন্তার স্বরূপ
- চিন্তার সরলতম রূপ অবধারণ
- অবধারণের বৈশিষ্ট্য
- অবধারণের শ্রেণীবিন্যাস
- অনুমানের স্বরূপ
- অনুমানের প্রকারভেদ : অবরোহ ও আরোহ

১। আভাস

Introduction

দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার আবশ্যকতা : দর্শন জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন। কিন্তু দর্শনের প্রকৃতি এমনই যে জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে দর্শনের আলোচ্য বিষয় বোধগম্য হতে পারে না; তত্ত্বগত ও আদর্শ বিষয়ক আলোচনা জ্ঞান সমস্যার সাথে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যে জ্ঞানবিদ্যার যথাযথ আলোচ্য কিংবা জ্ঞানবিদ্যার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যুক্তিবিদ্যার আলোচনা ছাড়া দর্শনের মৌল সমস্যাগুলির বিশদ আলোচনা অসম্ভব। জীবন ও জগতের তত্ত্বগত ও আদর্শবিষয়ক আলোচনা জ্ঞানের মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়। আলোচনাকালে সত্তা ও চিন্তার মধ্যে সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়। চিন্তার বিষয়বস্তু সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন ও স্বপ্রকৃতি বিশ্লেষণ। এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যুক্তিসম্মত হওয়া চাই। কাজেই দর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার আলোচনা অপরিহার্য।

জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি, বিষয়বস্তু, সীমা ও বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করে, আর যুক্তিবিদ্যা চিন্তার মৌলিক নিয়মাবলির বিষয় আলোচনা করে, আলোচনা করে কীভাবে চিন্তা করলে আমাদের যুক্তি সিদ্ধ বা নির্ভুল হতে পারে।

জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য : জ্ঞানবিদ্যা একটি বিশাল আলোচ্য বিষয়। জ্ঞানবিষয়ক সমুদয় সমস্যার আলোচনা হয়ে থাকে জ্ঞানের এই শাখায়, কিন্তু যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় জ্ঞান প্রকাশের দিক অর্থাৎ যুক্তির দিক। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিবিদ্যার পরিসরের তুলনায় জ্ঞানবিদ্যার পরিসর ব্যাপকতর, আর জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা তত্ত্বগত, যুক্তিবিদ্যার আলোচনা ব্যবহারিক। জ্ঞানবিদ্যার

আলোচনা নিছক জ্ঞান লাভের জন্য, বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিদ্যা কোনো বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানের নির্ভুলতা প্রতিপন্ন করে না; কিন্তু যুক্তিবিদ্যা একাধারে বিজ্ঞান ও ফলিত কলা, এ একদিকে যেমন যুক্তিবিন্যাসের নিয়মাবলির জ্ঞান দান করে, অন্যদিকে তেমনি কোনো বিশেষ যুক্তি ভুল কিংবা নির্ভুল তাও স্থির করে। এছাড়া জ্ঞানবিদ্যা বর্ণনামূলক। জ্ঞানের সমস্যাসমূহের বর্ণনা করাই এই বিদ্যার কাজ। পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্যা আদর্শভিত্তিক বিশেষ আদর্শের আলোকে চিন্তার বৈধতা বা অবৈধতা আলোচনা করাই যুক্তিবিদ্যার কাজ।

জ্ঞানবিদ্যা তত্ত্ব ও আদর্শ আলোচনার পূর্বগামী : যা হোক, জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য যাই থাকুক না কেন উভয়ের সাহায্য ছাড়া তত্ত্বগত ও আদর্শগত আলোচনা সার্থক হতে পারে না। কাজেই দর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আমরা ইতিপূর্বে জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করেছি। এবার দর্শনে যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তার আলোকে অল্পবিস্তর যুক্তিবিদ্যার আলোচনা সন্নিবেশিত হচ্ছে।

২। চিন্তার স্বরূপ
(Nature of Thinking)

চিন্তা সচেতন প্রক্রিয়া : যুক্তিবিদ্যা চিন্তার স্বরূপ নিয়ে সরাসরি আলোচনা না করলেও চিন্তার বৈধ প্রয়োগ বা প্রকাশ যুক্তিবিদ্যার মুখ্য আলোচনার বিষয়। যুক্তিবিদ্যা চিন্তার প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনাকালে চিন্তাস্বরূপ মৌলিক নীতি প্রভৃতির আলোচনা করে থাকে। চিন্তা আমাদেরকে সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে থাকে, জ্ঞান প্রদান করে। চিন্তা একটি সচেতন প্রক্রিয়া। এর বিবর্তন আছে, অগ্রগতি আছে। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মতো মানস জীবনেরও বিবর্তন আছে, আমাদের চিন্তারও তেমনি বিবর্তন আছে। অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনেও চিন্তার বিবর্তন ঘটে। বিবর্তনের তিনটি নীতি রয়েছে : পৃথকীকরণ, ঐক্যবিধান ও নিয়মানুগত্য (Differentiation Integration and Determination)। বিবর্তন প্রক্রিয়া সহজ থেকে জটিল অবস্থায়, সদৃশ ও সমসাত্ত্বিক থেকে বিসদৃশ ও বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায়, অনির্দিষ্ট ও অসংঘবদ্ধ থেকে সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ অবস্থায় চালিত হয়। জাগতিক, জৈবিক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে বিবর্তনে পৃথকীকরণ, ঐক্যবিধান ও নিয়মানুগত্য পরিস্ফুট। বিবর্তনের নীতিত্রয় ব্যষ্টি ও সমষ্টির চিন্তাজগতেও সক্রিয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে চিন্তা সরল ও সহজ অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম অবস্থায় কোনো বস্তুকে একটি বস্তু হিসেবেই গ্রহণ করা হয়, যেমন একটি শিশু বস্তুর বৈশিষ্ট্যের আলোকে বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে পারে না। মানব জীবন যেমন : শৈশব-কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে, বার্ধক্যে জীবনের বিভিন্নমুখী অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়, তেমনিভাবে চিন্তা সরল ও সহজ অবস্থা অতিক্রম করে জটিল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। শিশু, কিশোর, যুবক ও পরিণত বয়স্ক মানুষের চিন্তাধারার দিকে মনোযোগ দিলে এ সত্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। পরিণত বয়স্ক বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ যে ধরনের জটিল গভীর বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে এটাকে সহজ ও সরল করে তুলতে পারে, কোনো শিশু, অপরিণত বয়স্ক কিশোর ও যুবক তা পারে না, পারারও কথা নয়। মানুষের অন্যান্য শক্তির ক্রমবিকাশের মতো তার চিন্তারও পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে

তেমনি বস্তুর বৈশিষ্ট্যের আলোক তার শ্রেণীবিন্যাসও করতে পারে। সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে ঐক্যবিধান এবং বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে পৃথকীকরণের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা নিয়মানুগত্য আবিষ্কার করে।

চিন্তার বিবর্তন বিশ্ববিবর্তনের অনুরূপ : মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশের পদ্ধতি জৈবিক বিবর্তন বা বিশ্ববিবর্তনের অনুরূপ। পরিপূর্ণ সমন্বিত জ্ঞানই আমাদের মানস জীবনের লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জটিল রূপ তার সরল অবস্থা হতে উদ্ভূত। চিন্তার সরল ও জটিল উভয় রূপের ক্ষেত্রেই একই নিয়ম প্রযোজ্য।

৩। চিন্তার সরলতম রূপ অবধারণ
Judgement as the Simplest Form of Thinking

অবধারণ চিন্তার সরলতম রূপ। চিন্তা মানবমনের একটি জটিল প্রক্রিয়া। অবধারণ থেকে মানুষের চিন্তার শুরু। অবধারণ চিন্তার সরলতম রূপ। অবধারণ ছাড়া জ্ঞানের ব্যাখ্যা অসম্ভব। মন বহির্জগৎ থেকে সংবেদন লাভ করে, সংবেদন ব্যাখ্যা না হলে তা জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। অবধারণ সংবেদনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অবধারণ জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য, অবধারণ ছাড়া জ্ঞান অসম্ভব।

দুটি ধারণা সংযুক্ত করার মানসিক প্রক্রিয়ার নাম অবধারণ। এই ধারণা ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত হলে তাকে বলা হয় যুক্তিবাক্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মানুষ' ও 'মরণশীল' এই দুটি ধারণাকে মনে মনে সংযুক্ত করলে আমরা পাই 'মানুষ হয় মরণশীল'। এটি একটি অবধারণ। তেমনিভাবে 'কমলালেবু ও 'হরিদ্রাভ' এই দুই ধারণা সংযুক্ত করলে আমরা পাই 'কমলালেবু হয় হরিদ্রাভ' এই অবধারণ। অবধারণ ও সংযুক্তি এই দুয়ের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু প্রকাশের ব্যাপারে। যখন কোনো অবধারণ ভাষায় প্রকাশিত হয় তখনই তা যুক্তিবাক্যে রূপান্তরিত হয়– একটি চিন্তার, অন্যটি ভাষার।

ধারণা ও অবধারণের সম্পর্ক : অবধারণ ধারণার পূর্বগামী : উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি ধারণার মানসিক সংযুক্তি হলো অবধারণ। ধারণা ও অবধারণের মধ্য সম্পর্ক কি? এ সম্পর্কে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোনো কোনো চিন্তাবিদ বলেন যে, ধারণা ছাড়া অবধারণ গঠিত হতে পারে না, কেবল দুটি ধারণা সংযুক্ত হলেই অবধারণ হতে পারে, তার পূর্বে নয়। কিন্তু এই মতবাদ ভ্রমাত্মক। ধারণা গঠন অবধারণের মধ্যেমেই হয়ে থাকে। 'ঘাসের' ধারণা অনেকগুলি প্রত্যক্ষজাত অবধারণের মাধ্যমেই গঠিত হয়ে থাকে। অবধারণ প্রক্রিয়া ও ধারণার প্রক্রিয়া একই মানসিক প্রক্রিয়া। অনেকগুলি অবধারণ গঠনের মাধ্যমই ধারণা গঠিত হয়ে থাকে। ধারণা অবধারণের পূর্বগামী নয়। পূর্বগঠিত অবধারণের সাহায্যে নতুন অবধারণ গঠিত হয়ে থাকে। ধারণা অবধারণের মাধ্যমেই গঠিত হয়। আবার গঠিত ধারণা নতুন অবধারণ গঠনে সাহায্য করে। এইভাবে জ্ঞান অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়।

৪. অবধারণের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Judgement

প্রথমত, অবধারণ মিথ্যা হোক কিংবা সত্য হোক, সকল অবধারণই সামান্য। আমরা যখন কোনো অবধারণ গঠন করি তখন তা হয় সকলের জন্য সত্য হবে, না হয়

সকলের জন্য মিথ্যা হবে। 'সকল মানুষ মরণশীল' এই অবধারণ যে গঠন করে তার পক্ষেই যে তা সত্য হয় তা নয়, সকল মানুষের পক্ষেই তা সত্য। আবার 'সূর্য একটি উপগ্রহ' এই অবধারণটি যে গঠন করে তার কাছে এবং অন্যান্য মানুষের কাছেও তা মিথ্যা।

তাই বলা হয়ে থাকে যে, সকল অবধারণই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অবধারণের প্রকৃতি তার বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়ত, সকল অবধারণ নিশ্চয়াত্মক। অবধারণের নিশ্চয়তা তার সার্বিক ধারণা থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে। অবধারণ বস্তুনির্ভর বলে বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকে। যেমন–

সকল মানুষ মরণশীল
রহিম একজন মানুষ,
কাজেই রহিম মরণশীল।

এখানে সিদ্ধান্ত অনিবার্য। আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত সরাসরি নিঃসৃত হয়েছে। এখানে সিদ্ধান্ত ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না, বিষয়বস্তুই অবধারণের প্রকৃতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অনুমানের স্বরূপ বিচার করলে অবধারণ যে নিশ্চয়াত্মক তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

তৃতীয়ত, সকল অবধারণই নির্বাচনাত্মক। যখন আমরা কোনো বস্তুর গুণ প্রত্যক্ষ করি তখন আমরা বস্তুর একটি বিশেষ দিক বা গুণের প্রতি মনোযোগী হই, সকল দিকের প্রতি মনোযোগ দিই না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আম মিষ্টি, এই অবধারণে আমরা আমের একটি গুণের প্রতি মনোযোগী হই, একটি গুণকেই নির্বাচন করি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নির্বাচন ছাড়া অবধারণ সম্ভব নয় অর্থাৎ অবধারণ নির্বাচনাত্মক।

চতুর্থত, প্রত্যেক অবধারণেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ক্রিয়া করে। ক্রেইটন ও স্মার্ট বলেন যে, প্রতিটি চিন্তার ক্ষেত্রে, "প্রত্যেক অবধারণে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ পাশাপাশি চলে, একটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হলে অপরটির কোনো অর্থই হয় না।"[১]

কোনো বস্তুকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে দেখাই বিশ্লেষণ, আর কোনো বস্তুর অংশকে একত্র করে দেখাই সংশ্লেষণ। কাজেই অবধারণ হলো বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি। কোনো ঘড়ির প্রক্রিয়া বুঝতে হলে ঘড়ির বিভিন্ন অংশ যেমন বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন সমগ্র ঘড়ির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশ কীভাবে সংশ্লিষ্ট তা জানাও তেমনি প্রয়োজন। কাজেই প্রত্যক্ষ অবধারণে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ উভয় পদ্ধতি সক্রিয়।

পঞ্চমত, অবধারণ জ্ঞানের সংহতি রচনা করে। অবধারণ মনের কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং অবধারণ মনের সমগ্রতার একটি অনিবার্য অংশ; অবধারণ পুরাতন বিষয়কে নতুন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে এবং জ্ঞানের এক সুসংহত মণ্ডলী গঠন করে। কাজেই অবধারণের মাধ্যমে জ্ঞানের এক সামগ্রিক রূপ রচিত হয়। অবধারণ নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে, আমাদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অংশকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে, পুরাতন সত্যকে নূতনের সঙ্গে সুসংবদ্ধ করে জ্ঞানের এক সামগ্রিক রূপ গঠন করে।

---

[১] In every act of thinking in every judgement, analysis and synthesis go hand in hand and one has no meaning except with reference to other. – Creighton and Smart,

৫. অবধারণের শ্রেণীবিন্যাস

Calssification of Judgement

বিভিন্নভাবে অবধারণের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে। যেমন– (১) গুণ বিষয়ক অবধারণ (Judgement of quality), (২) পরিমাণ বিষয়ক অবধারণ (Judgement of quantity), (৩) কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ক অবধারণ (Judgement of Causal Connection), (৪) উদ্দেশ্য বিষয়ক অবধারণ (Judgement of purpose or Teleology) এবং (৫) তথ্য বিষয়ক অবধারণ (Judgement of fact and judgement of Value)। এবার এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

১। গুণ বিষয়ক অবধারণ

গুণ বিষয়ক অবধারণ মানুষের বুদ্ধির ক্রমবিকাশের প্রথম স্বাভাবিক প্রকাশ। বস্তুর গুণই প্রথমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিশুরা বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ক, বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতে পারে না, কিন্তু বস্তুর পরিস্ফুট গুণাবলি সহজেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২। পরিমাণ বিষয়ক অবধারণ

বুদ্ধি ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরে আসে পরিমাণ বিষয়ক অবধারণ। বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্তরে উন্নীত হয়, বস্তুর গুণ থেকে বস্তুর পরিমাণের দিকে আমাদের নজর পড়ে। এই স্তরে আমরা পরিমাণগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি।

৩। কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ক অবধারণ

বুদ্ধির বিকাশের তৃতীয় স্তরে আসে কার্যকারণ সম্বন্ধ নিরূপণের প্রয়াস। বুদ্ধির অগ্রগতির সঙ্গে আমরা নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করার প্রয়াস পাই। বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে একটা আন্তরিকতা রয়েছে সে বিষয়ে আমাদের চেতনা জাগে। মেঘের সঙ্গে বর্ষণ, পরিমিত বর্ষণের সঙ্গে পর্যাপ্ত শস্যোৎপাদন, শস্যের বাড়তির সঙ্গে দেশের সমৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে আমরা কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করতে পারি। মানুষ চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বস্তুর, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করে এই বিরাট বিশ্ব পরিকল্পনার মধ্যে নিয়মের রাজত্ব খুঁজে পায়।

৪। উদ্দেশ্য বিষয়ক অবধারণ

বুদ্ধির ক্রমবিকাশের পরবর্তী স্তরে আসে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর প্রতিটি ঘটনার মূলীভূত উদ্দেশ্য। এই বিশ্ব চরাচরের প্রত্যেক বস্তুই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছে, কোনো বিশেষ লক্ষ্যের দিকে সব কিছুই এগিয়ে চলেছে, এই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করাই মানবমনের পরম লক্ষ্য। বস্তুর নিছক অস্তিত্ব মানুষের চিন্তার একটি পর্যায়, কিন্তু জ্ঞানের চৌহদ্দি নিছক বাস্তবতাকে অতিক্রম করে বিশ্বপরিকল্পনার এক মহতী উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বুদ্ধির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর অবধারণ গঠিত হয়ে থাকে।

৫। তথ্য বিষয়ক অবধারণ ও মূল্য বিষয়ক অবধারণ

তথ্য বিষয়ক অবধারণে কোনো বস্তু বা কোনো ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন– 'আমি একটি লাল ঘোড়া দেখেছি' 'আকাশে রঙধনু উঠেছে' 'বৃষ্টি হচ্ছে', 'আমি দর্শনের ভূমিকা লিখছি' ইত্যাদি অবধারণে নিছক ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত হচ্ছে, কোনো মূল্যবোধের ইশারা নেই। পক্ষান্তরে, মূল্যবিষয়ক অবধারণে বস্তুর মূল্য নির্ধারণের প্রয়াস রয়েছে। এই ধরনের অবধারণে কোনো বিষয়ের অনুমোদন বা অননুমোদন ব্যক্ত হয়ে থাকে। যেমন– 'গোলাপ ফুলটি সুন্দর', 'সরোবর কি মনোহর', 'দৃশ্যটি কি রমণীয়'– এই অবধারণগুলিতে গোলাপ ফুল, সরোবর ও বিশেষ একটি দৃশের বর্ণনার পরিবর্তে এসব বিষয়ে কোনো বিচারকের অনুমোদন প্রকাশ পেয়েছে।

নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ : সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর– এইসব নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের আলোকে আমরা কোনো বস্তুর মূল্য বিষয়ে আলোচনা করি। নৈয়ায়িক নৈতিক ও সৌন্দর্যবিষয়ক অবধারণে আমরা যথাক্রমে কোনো অনুমানের যাথার্থ কোনো কার্যের যাথার্থ এবং কোনো বস্তুর সৌন্দর্য সম্পর্কে বিচার করি।

৬। অবধারণ ও অনুমান

Judgement And Inference

অবধারণ ও অনুমানের পার্থক্য : দুটি ধারণার মানসিক সংযুক্তিকে বলা হয় অবধারণ। অবধারণ মানবচেতনার সরলতম রূপ। কিন্তু অনুমান জ্ঞাত বিষয়ের ভিত্তিতে অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আকাশে মেঘ দেখে বৃষ্টি হতে পারে বলে আমরা অনুমান করি। অনুমান অবধারণের জটিল রূপ। অনুমান ও অবধারণের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু জটিলতার। অবধারণ মাবনচেতনার সরলতম রূপ; কেননা কোনো একটি ঘটনা বা বস্তুর ব্যাখ্যা দেওয়া হয় অবধারণে। কিন্তু অনুমান জটিল প্রক্রিয়া কেননা অনুমানে এক বা একাধিক অবধারণ থেকে অন্য একটি অবধারণে উত্তরণ আছে। অবধারণ বুদ্ধির একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া, কিন্তু অনুমানে বস্তু থেকে বস্তুতে ঘটনা থেকে ঘটনায় নিক্রমণ রয়েছে।

জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে উত্তরণ : অবধারণ যে তথ্য সরবরাহ করে তার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি বা প্রমাণ খাড়া করে না, অবধারণ প্রত্যক্ষণের বিবৃতি। কিন্তু অনুমানের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার অনিবার্য সম্পর্ক বের করার প্রয়াস রয়েছে। জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে যাওয়ার কারণ বিবৃতি হয়ে থাকে অনুমানে, আশ্রয় বাক্য থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে তার ইশারা থাকে অনুমানে। চিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথকীকরণ ও ঐক্যবিধানও (Differentiation and integration) ব্যাপকতর আকার ধারণ করে। অনুমানে আমরা তথ্য থেকে সত্যে কিংবা সত্য থেকে তথ্যে উপনীত হতে পারি। একদিক দিয়ে বলা যায় যে, অবধারণ যখন আপনার যৌক্তিকতা অনুসন্ধান করে তখন তা অনুমানে পর্যবসিত হয়। আমরা অবধারণ থেকে শুরু করি, পরে তার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদানের প্রয়াস পাই।

৭। অনুমানের স্বরূপ

Nature of inference

অনুমান বলতে এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে বুঝায় যাতে জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে উত্তরণ আছে। কোনো জ্ঞাত বিষয়ের মাধ্যমে কোনো অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান লাভ

করা মানসিক প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা দূরে ধোঁয়া দেখলে তার মূলে আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করি। কারণ আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক বর্তমান। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমরা অনুমানে জ্ঞাত তথ্য থেকে অজ্ঞাত তথ্যে গমন করি। অনুমানের তিনটি উপাদান আছে : (১) এক বা একাধিক প্রদত্ত যুক্তিবাক্য, (২) একটি নতুন যুক্তিবাক্য ও (৩) তাদের অনিবার্য সম্পর্ক। অনুমানে সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। ভাষায় প্রকাশিত অনুমানকে যুক্তি (Argument) বলে। যেমন–

সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল,
মতীন হয় একজন মানুষ,
অতএব, মতীন হয় মরণশীল।

এখানে 'মতীন হয় মরণশীল' এই যুক্তিবাক্যটি (সিদ্ধান্ত) 'সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল' ও 'মতীন হয় একজন মানুষ' এই দুটি আশ্রয়বাক্য (প্রদত্ত যুক্তিবাক্য) থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত।

অনিবার্যতা ও নতুনত্ব : এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়। যুক্তিবিদ ও দার্শনিক বোসানকে বলেন, "প্রদত্ত ঘটনা বা সত্য বলে কোনো একটি নতুন ঘটনা বা সত্যের বিবৃতি হলো অনুমান যে সত্য বা ঘটনা প্রদত্ত ঘটনা বা সত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে না এবং আশ্রয়বাক্যের অতিরিক্ত কিছু হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমরা অনুমান বলতে পারব না।"

অনুমানের বৈশিষ্ট্য : (১) অনিবার্যতা, (২) অভিনবত্ব, (৩) সংহতি : অনুমানের প্রকৃতি অনুধাবন করলে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথমত, অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা অভিজ্ঞতালব্ধ আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পূর্বে আমরা দেখেছি যে, অভিজ্ঞতার দুটি অংশ আছে : আশ্রয়বাক্য (প্রদত্ত তথ্য) এবং সিদ্ধান্ত। আশ্রয়বাক্য এবং সিদ্ধান্তের ওপর অনুমানের অস্তিত্ব নির্ভর করে। অর্থাৎ আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়।

দ্বিতীয়ত, আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তের অনিবার্য পরিণতি শুধু অনুমানের বৈশিষ্ট্য নয়। অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে অভিনব। জ্ঞাত বিষয়ের মাধ্যমে অজ্ঞাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই অনুমানের লক্ষ্য। তাই অনিবার্যতার মতো অভিনবত্বও অনুমানের একটি বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়ত, অনুমান বিভিন্ন অবধারণের মধ্যে ঐক্য বিধানের প্রয়াস। অনুমানের আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত উভয়ই একটি সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চাই। ক্রেইটন বলেন "সকল অনুমানই একটা সমগ্রতার মধ্যে ঘটে থাকে, যেখানে বিভিন্ন অংশগুলি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এমনভাবে যুক্ত হয় যে, কয়েকটি প্রকৃতি দেখে আমরা ফুটনোট দরকার

অপরগুলির প্রকৃতি বুঝে উঠতে পারি।"[১] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অবধারণ জ্ঞানের যে সংহতি রচনা করে অনুমান সেই সংহতির পরিধি বাড়িয়ে দেয়। অনুমান বিভিন্ন অবধারণকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে জ্ঞানের মণ্ডলী রচনা করে।

৮। অনুমানের প্রকারভেদ : অবরোহ ও আরোহ
Kinds of Inference : Deduction and inductions

অবরোহ অনুমানে সামান্য থেকে বিশেষে গমন : অনুমান প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত : অবরোহ ও আরোহ। অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য অপেক্ষা ব্যাপকতর হতে পারে না। অবরোহ অনুমানে আমরা অধিকতর সামান্য আশ্রয়বাক্য থেকে অল্প সামান্য আশ্রয়বাক্য কিংবা বিশেষ আশ্রয়বাক্য সিদ্ধান্ত অনুমান করে থাকি। যেমন– 'সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল'। 'সক্রেটিস হয় একজন মানুষ' সুতরাং 'সক্রেটিস হয় মরণশীল'। আবার অন্য দৃষ্টান্ত 'সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল', 'সমস্ত কবি হয় মানুষ' সুতরাং সমস্ত কবি হয় মরণশীল'। অবরোহ সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। উপরের দৃষ্টান্ত দুটির দিকে লক্ষ করলে সে বিষয় পরিস্ফুট হবে।

আরোহ অনুমানে অংশ থেকে গমন : অপরপক্ষে, আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত সব সময়েই আশ্রয়বাক্য অপেক্ষা ব্যাপকতর হবে। এখানে আমরা বিশেষ ঘটনা থেকে সামান্য নিয়ম আবিষ্কার করি। কাজেই একথা বলা যায় যে, অবরোহ অনুমান অংশ থেকে সমগ্র উত্তরণ। যেমন– 'মতীন হয় মরণশীল,' 'জামান হয় মরণশীল,' 'হাসান হয় মরণশীল', কাজেই 'সমস্ত মানুষ হয় মরণশীল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আরোহ অনুমানে আমরা সামান্য নিয়ম থেকে আরম্ভ করি, সামান্য নিয়মের সাহায্যে বিশেষ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করি। অপরপক্ষে, অবরোহ অনুমানে আমরা বিশেষ ঘটনা থেকে আরম্ভ করি, বিশেষ ঘটনার সাহায্যে সামান্য নিয়ম আবিষ্কার করি :

অবরোহ ও আরোহ অনুমানের সম্পর্ক : অবরোহ ও আরোহ অনুমান মূলত স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া নয়। উভয় প্রকার অনুমানই এক অনুমান পদ্ধতির দুটি দিক। অবরোহ ও আরোহ উভয়ের উদ্দেশ্য হলো সত্য আবিষ্কার, কিন্তু উভয়ের পদ্ধতি ভিন্ন। অবরোহ অনুমানে আমরা সমগ্রের সাথে পরিচিত এবং সমগ্র থেকে অংশে গমন করি, আর কিভাবে সাধারণ নিয়মে বিশেষ ঘটনা থেকে যাত্রা আরম্ভ করি। বিশেষ ঘটনাসমূহের মধ্যে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করার প্রয়াসী হই। আরোহ অনুমানলব্ধ সাধারণ নিয়মের সাহায্যে আমরা বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করি। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারেও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে অবরোহ ও আরোহ উভয় প্রকারের অনুমান পদ্ধতিই ক্রিয়াশীল। প্রয়োজন অনুসারে আমরা কখনো ঘটনা থেকে নিয়মে, কখনো নিয়ম থেকে ঘটনায় উপনীত হয়ে থাকি। কাজেই অবরোহ ও আরোহ উভয়ই একই অনুমান প্রক্রিয়ার দুটি দিক– একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

---

[১]. All inference takes place within a system where the parts are so held together by a common nature that you can judge from some of them what the nature of the others must be– Creighton.

দশম অধ্যায়
জ্ঞানের মৌলিক অপরিহার্য ধারণা
CATEGORIES OF KNOWLEDGE

"There can be no synthetic judgement without a synthetic mind, no spatial judgement without a space perceiving mind, no causal judgement without a mind thinking in terms of cause and effect". – **Frank Thilly**

- ❑ ভূমিকা
- ❑ দ্রব্য
- ❑ কার্যকারণ তত্ত্ব

১। ভূমিকা :

মৌলিক ধারণা বা আকার : ইংরেজি 'Category' শব্দটি গ্রিক Kategoria থেকে এসেছে। গ্রিক শব্দটির অর্থ হলো "যা কোনো কিছু সম্পর্কে স্বীকার করা হয় বা যা কোনো উদ্দেশ্যের বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।" পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, অবধারণ জ্ঞানের সরলতম রূপ। প্রত্যেক অবধারণের দুটি ধারণার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এদের একটি উদ্দেশ্য, অপরটি বিধেয়। উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য বিধেয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন অবধারণের উদ্দেশ্যকে বুঝাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিধেয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন– 'আকাশ নীল', 'ফলটি সুপক্ব', ও 'নারী শক্তিসঞ্চারিণী'। এই অবধারণগুলির উদ্দেশ্য 'আকাশ', 'ফলটি', ও 'নারী' অবধারণত্রয়ের বিধেয়গুলি 'নীল', 'সুপক্ব', ও 'শক্তিসঞ্চারিণী গুণ। আবার 'দুধ পানে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়', 'বিষপানে মৃত্যু ঘটে' ইত্যাদি অবধারণে 'দুধ' ও 'বিষের' সঙ্গে 'বলবৃদ্ধি' ও 'মৃত্যুর' কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অবধারণ বিচার করলে দেখা যায় যে, 'দ্রব্য' 'দেশ', 'কাল', 'কার্যকারণ' সম্পর্ক প্রভৃতি কতগুলি মৌলিক ধারণা অবধারণের পক্ষে অপরিহার্য।

দ্রব্য, কার্যকারণতত্ত্ব দেশ, কাল : কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত তত্ত্ব সর্বদা ব্যবহৃত হয় ও একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় সেগুলিকে জ্ঞানের মৌলিক ধারণা (Category) বলা হয়। যখন আমরা কোনো বস্তুকে চিন্তা করি তখন তাকে একটি দ্রব্য হিসেবে চিন্তা করি, যে দ্রব্য অন্যান্য বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে এবং যা এক বিশেষ সময়ে এক বিশেষ স্থানে অবস্থান করে। এই মৌলিক ধারণা ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব নয়। জ্ঞানের এই অপরিহার্য মৌলিক ধারণাগুলি অভিজ্ঞতার পূর্বগামী।

অ্যারিস্টটল : জ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলির সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক মৌলিক ধারণাসমূহের বিভিন্ন সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, জ্ঞানের মৌলিক ধারণার সংখ্যা দশ। যেমন–

১. দ্রব্য (Substance)
২. পরিমাণ (Quantity)
৩. গুণ (Quality)
৪. সম্পর্ক (Relation)
৫. দেশ (Space)
৬. কাল (Time)
৭. অবস্থান (Position)
৮. অধিকার (Possession)
৯. ক্রিয়া (Action)
১০. অনুরাগ (Passion)

কান্ট : জার্মান দার্শনিক কান্টের মতে, জ্ঞানের মৌলিক ধারণাসমূহ সংখ্যায় বারোটি। যেমন–

(ক) পরিমাণ (Quantity)
১। ঐক্য (Unity)
২। বহুত্ব (Plurality)
৩। সমগ্রতা (Totality)

(খ) গুণ (Quality)
১। সত্তা (Reality)
২। নেতিবাচকতা (Negation)
৩। সীমাবদ্ধতা (Limitation)

(গ) সম্পর্ক (Relation)
১। দ্রব্যত্ব ও দৃঢ়সংলগ্নতা (Substantiality and Inherence)
২। কারণতত্ত্ব ও নির্ভরতা (Causality and Dependence)
৩। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা পারস্পরিক যোগাযোগ (Reciprocity or Communtity)

(ঘ) নিশ্চয়তা (Modality)
১। সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা (Posibility and Impossibility)
২। বাস্তবতা ও অবাস্তবতা (Actulity and Non-Existence)
৩। অনিবার্যতা ও আকস্মিকতা (Necessity and Contingency)

হেগেল ও সোপেনহাওয়ার : হেগেল জ্ঞানের মৌলিক ধারণার সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন সত্তর। সোপেনহাওয়ার (Schopenhaur) সমস্ত মৌলিক ধারণাকে কার্যকারণতত্ত্বে সীমাবদ্ধ করেছেন; কিন্তু সকল দার্শনিক চারটি মৌলিক ধারণা সম্পর্কে একমত। এই চারটি মৌলিক ধারণা হলো : (১) দ্রব্য (Substace), (২) কার্যকারণতত্ত্ব (Causality), (৩) দেশ (Space) ও (৪) কাল (Time)।

২। **দ্রব্য** (Substance)

দ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের দুটি দিক থেকে তা করতে হবে। (ক) দ্রব্যের স্বরূপ ও (খ) দ্রব্যের উৎপত্তি। এবার এই দুটিকে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

(ক) দ্রব্যের স্বরূপ (Nature of Substance) : দ্রব্যের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা– (১) সাধারণ মতবাদ (Common Conception) (২) বুদ্ধিবাদী মতবাদ (Idealistic View) (৩) অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ (Empeirical View) (৪) কান্ট ও হেগেলের মতবাদ (Views of Kant and Hegel) ও (৫) আধুনিক মতবাদ (Modern Views)।

১.১ দ্রব্য সম্পর্কে সাধারণ মতবাদ (Common conception of Substance) : পরিবর্তনের মধ্যে যা অপরিবর্তিত থাকে তাই দ্রব্য। সাধারণভাবে দেখলে পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ জগৎ অসংখ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন সম্পর্ক বর্তমান। বস্তুনিচয়ের মধ্যে বস্তু থেকে পৃথক। বস্তু কতগুলি গুণের সমষ্টি। গুণ একইভাবে অবস্থান করতে পারে না। গুণ যাকে আশ্রয় করে থাকে তাকে সাধারণত দ্রব্য বলা হয়। কাজেই বলা যায় যে, বস্তু হলো দ্রব্য ও গুণের সমষ্টি। দ্রব্যের স্বরূপ সাধারণত নিম্নোক্তভাবে অনুমিত হয়ে থাকে।

প্রথমতম, দ্রব্য পরিবর্তনের ধারক ও রক্ষক : বস্তুর মধ্যে নিরন্তর পরিবর্তন চলছে, কিন্তু দ্রব্য পরিবর্তনীয়। এই পরিবর্তন কখনো বর্ণের, কখনো আকৃতির। এই ধরনের পরিবর্তন সত্ত্বেও দ্রব্য অপরিবর্তিত থাকে। দ্রব্য সকল পরিবর্তনের ধারক ও রক্ষক। সকল অপরিবর্তনের মধ্যে সমতা, ঐক্য ও সংযোগ স্থাপন করা দ্রব্যের কাজ। দ্রব্যের গুণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় এবং তার সমুদয় গুণের মধ্যে একটা সমতা বা ঐক্য সংরক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্য ক্রিয়ার উৎস : দ্রব্য শক্তি, ক্রিয়া ও চেষ্টার উৎস। দ্রব্যের শক্তি নিরন্তর সব পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করে আত্মনিয়ন্ত্রণ করছে। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই দ্রব্য। একটি বস্তু অন্য বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে, তার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে, কার্য উৎপন্ন করে। বস্তুর এই ক্রিয়া ও শক্তি হলো তার দ্রব্যত্ব।

তৃতীয়ত, দ্রব্য ও গুণ পরস্পর সংযুক্ত : গুণের মধ্য দিয়ে দ্রব্য আত্মপ্রকাশ করে। গুণ ছাড়া দ্রব্য অর্থহীন। আবার দ্রব্য হলো গুণের আধার। দ্রব্য ও গুণ পৃথকভাবে চিন্তা করা যায় না।

১.২ দ্রব্য সম্পর্কে বুদ্ধিবাদী মতবাদ (Idealistic View of Substance) :
প্লেটো (Plato) : প্লেটোর মতে দ্রব্য অপরিবর্তনীয় ধারণা : তাঁর দ্রব্য সম্পর্কীয় মতবাদ ইলয়াটিক দার্শনিকদের (Electic Philosophers) সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইলয়াটিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক পারমিনিডিস প্রমুখের মতে, সত্তা হলো নিত্য, যার পরিবর্তনের অধীন তা সত্তা পদবাচ্য নয়। এই মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্লেটো বলেন যে, সত্তা হলো দ্রব্য– দ্রব্য হলো ধারণা (Ideas)। তাঁর মতে, ধারণা হলো সাধারণ নমুনা। এটা চিরন্তন। বিভিন্ন জাগতিক বস্তু ধারণার প্রতিলিপি। প্রত্যেক বস্তু ধারণার দৈশিক প্রকাশ (Spatial)। ধারণার সঙ্গে জড়ের মূর্ত সম্পর্ক নেই।

অ্যারিস্টটল (Aristotle) : অ্যারিস্টটলের মতে দ্রব্য হলো আকার : তাঁর ভাষায় দ্রব্যের নাম হলো আকার (Form)। প্লেটোর ধারণা ও অ্যারিস্টটলের আকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্লেটোর ধারণার সাথে জড়ের কোনো মূর্ত সম্পর্ক নেই, কিন্তু অ্যারিস্টটলের আকারের সাথে জড়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। জড় ও আকারের সমন্বয়ে জগতের বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হয়। জড়বস্তুর উপাদান। উপাদান পরিবর্তনের অধীন, কিন্তু আকার কোনো পরিবর্তনের অধীন নয়। তাঁর মতে, বস্তু যা পরিবর্তিত হয় তাই জড়, আর যাতে পরিবর্তিত হয় তাই হলো আকার। অ্যারিস্টটলের খোদা বিশুদ্ধ আকার (Pure form), শুদ্ধ ক্রিয়া (Pure Activity)। খোদার কোনো উপাদান নেই। খোদা জগতের আকার-কারণ ও নিমিত্ত কারণ (Formal and Efficient Cause)।

দেকার্তে (Descartes) : দেকার্তের মতে, দ্রব্য স্বনির্ভর : তাঁর মতে, যাকে অস্তিত্বের জন্য অপরের ওপর নির্ভর করতে না হয়, যাকে অন্য ধারণার সাহায্য ছাড়াও হৃদয়ঙ্গম করা যায় তাকেই দ্রব্য বলা যায়। সংজ্ঞা অনুসারে একটি মাত্র দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুভবযোগ্য। কিন্তু তিনি তিনটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। যেমন– খোদা, মন ও জড়। খোদা অন্য-নিরপেক্ষ দ্রব্য। মনের ধর্ম চৈতন্য, জড়ের ধর্ম বিস্তৃতি। দেকার্তের মতে, জড় ও মন পরস্পরবিরোধী।

স্পিনোজা (Spinoza) : স্পিনোজার মতে, খোদার পরম দ্রব্য : তাঁর মতে, খোদাই একমাত্র দ্রব্য। জড় ও মন সসীম দ্রব্য; অসীম দ্রব্য আসলে দ্রব্য পদবাচ্য নয়। যা সসীম ও আপেক্ষিক তা অন্যের ওপর নির্ভর না করে টিকতে পারে না, কাজেই একমাত্র খোদাই পরম দ্রব্য। জড় ও মন দুটি গুণ। অসংখ্য গুণের মধ্যে আমরা পরম দ্রব্যের এই দুটি গুণই জানতে পারি। খোদাকে তাঁর অসংখ্য গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ করলে তাঁকে জানা যায় না।

লিবনিজ (Liebnitz) : লিবনিজের মতে, দ্রব্য স্বনির্ভর : তাঁর মতে, স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করা হলো দ্রব্যের লক্ষণ। অপরের ওপর নির্ভর না করে যা নিজেই নিজের কার্য করতে পারে তাই হলো দ্রব্য। লিবনিজের মতে, দ্রব্য এক নয়, বহু। পরমাণুবাদীদের মতে, বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু। পরমাণু অদৃশ্য, অভিভাজ্য। লিবনিজের মতে, চিৎপরমাণু (Moand) হলো দ্রব্য। চিৎপরমাণু জড় নয়, চৈতন্যসম্পন্ন। চিৎপরমাণু অগণিত, একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করতে পারে না।

বার্কলি (Berkely) **: বার্কলির মতে, দ্রব্য নেই :** তিনি জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বার্কলির মতে, বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। যা প্রত্যক্ষণের আওতাভুক্ত নয় তার অস্তিত্ব নেই। জড় দ্রব্য আমাদের প্রত্যক্ষণের অন্তর্ভুক্ত নয়। জড় সংবেদনের সমষ্টি মাত্র। মনই সংবেদন প্রত্যক্ষ করতে পারে।কাজেই মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের মনের ওপর নির্ভর করে না– খোদার প্রত্যক্ষণের ওপর নির্ভর করে। বার্কলি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

১.৩ দ্রব্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ (Empirical View of Substance) **:**
লক দ্রব্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী : অভিজ্ঞাতাবাদী দার্শনিকদের মতে, অভিজ্ঞতাই সকল জ্ঞানের উৎস। দুটি পথে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকি– সংবেদন ও অন্তর্দর্শন (Sensation and introspection)। সংবেদনের মাধ্যমেই আমরা বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করি, অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা মনের বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞান লাভ করি। সংবেদনের মাধ্যমে গুণের অতিরিক্ত কোনো দ্রব্যের সাক্ষাৎ লাভ করি না, কিন্তু আমরা চিন্তা করতে বাধ্য হই যে, কোনো আধার ছাড়া গুণগুলি শূন্যে অবস্থান করতে পারে না, দ্রব্য অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। অনুরূপভাবে আত্মা ও খোদাকেও জানতে পারা যায়। আত্মা মানস দ্রব্য, এতে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও অবস্থার অস্তিত্ব ও সংহতি অনুধাবন করা যায় না। আবার খোদা ছাড়া জগৎ পরিকল্পনার মধ্যে ঐক্য সংহতি ইত্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, লক বুদ্ধিবাদী হলেও তিনি দেকার্তের মতো দ্রব্য, আত্মা ও খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

বার্কলি জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন : বার্কলি সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তিনি জড়ের অস্তিত্ব খণ্ডন করেছেন। তিনি ধারণা, মন ও খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেননা অভিজ্ঞতার সংহতির জন্য এই তিনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

হিউম (Hume) : হিউমের মতে, দ্রব্য সংবেদন অথবা মানসিক অবস্থার সমষ্টি : হিউম চরম অভিজ্ঞতাবাদী। তিনি দ্রব্য, আত্মা, খোদা, প্রভৃতি কোনো দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, যা অভিজ্ঞতার মধ্য পাওয়া যায় না, এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব বোধের অতীত। অভিজ্ঞতায় যা পাওয়াা যায় তাই হলো সংবেদন ও অনুভূতি। তথাকথিত জড়, দ্রব্য কতগুলি সংবেদনের সমষ্টি, আত্মা, ইচ্ছা, অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক প্রবাহ।

মিল (Mill) : দার্শনিক ও যুক্তিবিদ মিলও একজন অভিজ্ঞতাবাদী। তাঁর মতে, দ্রব্য মনের কল্পনা মাত্র। তিনি বলেন যে, জড় দ্রব্য 'সংবেদন স্থায়ী সম্ভাবনা', মন ধারণা ও অনুভূতি। চিরন্তন কোনো দ্রব্যের অস্তিত্ব নেই।

১.৪ দ্রব্য সম্পর্কে কান্ট ও হেগেলের মতবাদ (View of Kant and Hegel as to Substance)

কান্ট (kant) : দার্শনিক কান্টের মতে, দ্রব্য মনের অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা। এটি সংবেদন বা অনুভূতির সমষ্টি নয়। তিনি দেখান যে, বস্তুর পরিবর্তন হৃদয়ঙ্গম করতে হলে অপরিবর্তিত সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তা সম্ভব। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা এসব সত্তার সাক্ষাৎ লাভ করি না। কাজেই হিউমের মতবাদ একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কান্ট বলেন যে, দ্রব্যের কোনো বস্তুগত সত্তা নেই, দ্রব্য সংবেদন বা অনুভূতির সমষ্টিও নয়; দ্রব্য মনের অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা। এটি আমাদের জ্ঞানের পক্ষে মৌলিক ও অপরিহার্য ধারণা। দ্রব্য জ্ঞানের অন্যতম আকার, অন্যান্য মৌলিক ধারণার মতো দ্রব্যের ধারণা আমাদের অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে। তবে কান্টের মতে, জ্ঞানের আকার ও মৌলিক ধারণাসমূহ (Categories) পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য, অতীন্দ্রিয় জগৎ বা পরম সত্তা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। এখানে লক্ষণীয় যে, কান্ট পরিদৃশ্যমান ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতবাদ দ্বৈতবাদে পর্যবসিত হয়েছে।

হেগেল (Hegel) : কান্টের পরিদৃশ্যমান ও অতীন্দ্রিয় জগতের পার্থক্য বা দ্বৈতবাদ হেগেল স্বীকার করেন নি। হেগেলের মতে যা বাস্তব তাই বুদ্ধিসম্মত, আর যা বুদ্ধিসম্মত তাই বাস্তব। সুতরাং দ্রব্য শুধু মনের ধারণা নয়, এর বস্তুগত রূপও আছে- এটি মন ও বস্তু উভয়েরই আকার। মন ও বস্তু উভয়ই পরম ধীশক্তির প্রকাশ- যা মনের আকার, তা বস্তুরও আকার। কাজেই দ্রব্য শুধু ব্যক্তি মনেরই ধারণা নয়, বাস্তব জগতেও এর অস্তিত্ব রয়েছে। দ্রব্য আছে বলেই আমরা দ্রব্যের ধারণা গঠন করতে পারি।

হেগেলের মতে, দ্রব্য ও গুণ উভয়ের সমন্বয়ে বস্তুর পূর্ণ রূপ গঠিত হয়। দ্রব্য ছাড়া গুণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, আবার গুণ ছাড়া দ্রব্যের অস্তিত্ব তাৎপর্যহীন। গুণ কোনো আধার বা আশ্রয় ছাড়া অবস্থান করতে পারে না, আবার গুণ ছাড়া শূন্য আধারের অস্তিত্বও অসার। সত্তার দুটি দিক রয়েছে, একটি অস্তিত্ব ও অপরটি প্রকাশের। অস্তিত্ব ও প্রকাশ, দুটি দিক অচ্ছেদ্য- একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন। দুই দিকের মিলিত রূপের মাধ্যমে সত্তার পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দ্রব্য নিজেকে প্রকাশ করে, উপলব্ধি করে; গুণ ও অবস্থার বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে ঐক্যসূত্র বজায় রাখে। এই কারণে বস্তুর হাজারও পরিবর্তনের মধ্যে আমরা বস্তুকে চিনতে পারি। দ্রব্য সম্পর্কে হেগেলের মতবাদ সন্তোষজনক।

১.৫. দ্রব্য সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ (Modern Views of Substance)

ব্রাডলি (Bradley) : ব্রাডলির মতে, অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা জ্ঞানাতিরিক্ত কোনো দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা গুণের অতিরিক্ত কোনো দ্রব্যের সাক্ষাৎ লাভ করি না। যখন আমরা একটি ফুলকে বিশ্লেষণ করি তখন ফুলের আকার, বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি গুণগুলি ব্যতিরেকে অতিরিক্ত কোনো দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি না।

আবার বুদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানাতিরিক্ত দ্রব্যের সন্ধান মেলে না। যদি আমরা ধরে নিই যে, জ্ঞানাতিরিক্ত দ্রব্য আছে, তবে তা হলে এই গুণগুলি কোনো সম্বন্ধের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে দুটি গুণকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হতে হলে সম্বন্ধটিকে গুণ দুটির সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সংযুক্ত হতে হবে। আবার সম্বন্ধটিকে গুণের সাথে সংযুক্ত হতে হলে অন্য একটি সম্বন্ধের মাধ্যমে তা হতে হবে। এভাবে একটির পর একটি সম্বন্ধের সাথে সংযুক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়বে এবং অনবস্থা দোষের (Infinite regress) সৃষ্টি হবে।

এতদ্ব্যতীত ব্রাডলি সত্তার ক্ষেত্রে কোনো অন্তর্বিরোধ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, যার মধ্যে অন্তর্বিরোধ আছে তা সত্তা পদবাচ্য নয়। দ্রব্য ও গুণের মধ্যে অন্ত বিরোধ আছে। দ্রব্য গুণ থেকে পৃথক হলে সেই দ্রব্যের সাথে গুণের কোনো সম্পর্ক নেই। আর যদি দ্রব্য গুণ থেকে পৃথক না হয় তবে সেই গুণের সঙ্গে দ্রব্যের সম্পর্ক স্বীকার করার কোনো অর্থই হয় না। কাজেই দ্রব্য ও গুণ একক নয়, পৃথকও নয়। দ্রব্য ও গুণ সত্তা নয় অবভাস মাত্র। ব্রাডলির এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা দ্রব্য ও গুণ মিলে বস্তুর পূর্ণসত্তা।

আলেকজান্ডার (Alexander) : আলেকজান্ডারের মতে দেশ-কাল (Space-Time) বা বিশুদ্ধ গতি (Pure Motion) জগতের মূল উপাদান। বস্তুর অস্তিত্ব দুই দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। বস্তুকে যখন স্থিতির দিক দিয়ে দেখা হয় তখন তা দ্রব্য, আর যখন গতির দিক দিয়ে দেখা হয় তখন তা কারণ। বস্তুই পরিবর্তনের অধীন। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে যে কোনো বস্তু দেশ-কালের আওতার মধ্যে নিজের স্বকীয়তা রক্ষা করে। সেজন্য তাকে দ্রব্য বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর মতে, আমরা যা সরাসরি প্রত্যক্ষ করি তা বস্তুর অবভাস– দৈশিক কালিক প্রাকৃতিক পদার্থ।

রাসেল (Russel) : রাসেলের বিশেষণ-বিরহিত অদ্বৈতবাদ (Neutral Monism) অনুসারে কোনো অতীন্দ্রিয় স্থায়ী পদার্থ নেই। আমরা শুধু ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করি। দৈশিক কালিক পদার্থই ঘটনা। এটি নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলছে। এই জগতের স্থায়ী কিছুই নেই। আধুনিক বিজ্ঞান ঘটনার সমষ্টিকে জড় দ্রব্য বলে থাকে। আমাদের অভিজ্ঞতা পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোকে আমরা দ্রব্যের কোনো সাক্ষাৎ পাই না। তাই রাসেলর মতে, ঘটনাই বিশ্বের সরলতম রূপ, দ্রব্য মানুষের মনে কল্পনা। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে স্থিতি ছাড়া ঘটনা কিভাবে সম্ভব রাসেলের পক্ষে তা দেখানো সম্ভব হয় না।

বার্গসঁ (Bergson) : হেনরি বার্গসঁর মতে কাল বা পরিবর্তন একমাত্র বাস্তব সত্তা; দ্রব্য বা স্থায়ী পদার্থের কোনো অস্তিত্ব নেই। কালই হলো সত্তা আর সত্তাই হলো কাল। প্রাণপ্রবাহ (Elan vital) বিশ্বজগতের পরিবর্তনের মূল উৎস– প্রাণপ্রবাহের ফলে নব নবসৃষ্টির উন্মেষ সাধিত হচ্ছে। কাজেই অপরিবর্তনীয় দ্রব্যের কোনো অস্তিত্ব আমরা

জানতে পারি না বরং পরিবর্তনের অন্তরে প্রবেশ করাই প্রকৃত দার্শনিকদের কাজ। বার্গসঁর মতবাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, দ্রব্য ছাড়া পরিবর্তন হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

লোটজার (Lotzar) : লোটজার মনে করেন যে, দ্রব্যের ধারণা বস্তুর গুণাবলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি আনয়ন করে। আসলে বস্তুর কোনো আন্তর সত্তার পরিচয় আমরা পাই না। বিভিন্ন গুণ ও সম্বন্ধের মধ্যে সঙ্গতি দেখি না। কাজেই দ্রব্য মনের ধারণা মাত্র।

হোয়াইটহেড (Whitehead) : হোয়াইটহেডের মতে, সত্তার ধর্ম পরিবর্তিত হওয়া। বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের স্রোত চলছে। আমরা শুধু এই পরিবর্তন অবলোকন করি। এর মূলে অবস্থিত কোনো দ্রব্য– সত্তা অবলোকন করি না। আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে আমরা অপরিবর্তিত ও স্থায়ী দ্রব্যসত্তার কল্পনা করি। কাজেই হোয়াইটহেডের মত কান্টের মতবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তার মতে দ্রব্য মনের অবশ্যস্বীকার্য মৌলিক ধারণা।

(খ) দ্রব্যের ধারণার উৎপত্তির বিষয়ক মতবাদ (Views regarding the origin of the idea of Substance) : দ্রব্যের ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এ বিষয়ে আলোচনা সন্নিবেশিত হচ্ছে।

১. লৌকিক মতবাদ (Common Sense Views) : সাধারণ লোক মনে করে যে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমেই দ্রব্যের ধারণা পাওয়া যায়। সংবেদনের মাধ্যমে জড় দ্রব্য এবং অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে মানসদ্রব্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

২. অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ (Empirical Views) : অভিজ্ঞতাবাদী লোকের মতে, প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমরা কোনো বস্তুকে জানতে পারি না, জানি কতগুলি গুণকে। কিন্তু গুণ কোনো আশ্রয় ছাড়া টিকে থাকতে পারে না; গুণের আধার রূপে আমরা দ্রব্যের অনুমান করি। বার্কলির মতে, অভিজ্ঞতায় আমরা শুধু কতগুলির সংবেদনকে জানতে পারি; মনই সংবেদনকে জানতে পারে। জড়দ্রব্য বলে কিছুই নেই। তাঁর মতে মনকে আমরা জানি প্রত্যয়ের দ্বারা।

হিউম জড়দ্রব্য ও মানসদ্রব্য উভয়কেই মনের অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ও অনুষঙ্গ নীতি দ্রব্যের ধারণার মূল উৎস। তিনি বলেন যে আমাদের অভিজ্ঞতায় কতগুলি সংবেদন বারবার আবর্তিত হতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যখনই আমরা চিনি ব্যবহার করেছি তখনই তার শুভ্রতা ও মিষ্টতার গুণ ছাড়া চিনির মধ্যে দ্রব্য বলে উৎপন্ন করে। মন বলে স্থায়ী কোনো সত্তা নেই। দ্রব্য সংবেদনের সমষ্টি, মন ধারণা ও সহজাত ধারায় পর্যবসিত হয়েছে।

হার্বার্ট স্পেনসারের মতে দ্রব্যের ধারণা আমাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষে ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা, আমাদের পক্ষে হয়েছে সহজাত ধারণা। পূর্বপুরুষদের অর্জিত অভিজ্ঞতার বংশানুক্রমে লাভ করায় এটা আমাদের ক্ষেত্রে সহজাত ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে।

সমালোচনা

দ্রব্যের ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদের ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নয়। লকের মতে, দ্রব্যের ধারণা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত নয়, কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই। কাজেই লকের মতবাদের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা (A periori idea) বার্কলির মতবাদ অস্পষ্ট। হিউম ও হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদ অভিজ্ঞতার ক্রটিকন্টকিত।

৩. ভাববাদী মতবাদ (Idealistic Views) : কান্টের মতে দ্রব্যের ধারণা অভিজ্ঞতাপূর্ব, অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। দ্রব্যে.. ধারণা জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য ও মৌলিক ধারণা। অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় মৌলিক ধারণার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। ভাববাদীদের মতে আত্মসচেতনতাই দ্রব্যের ধারণায় উৎস। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যও এক স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব আছে। বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্য আত্মা অপরিবর্তিত। আত্মাই বিভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। বিভিন্ন সংবেদন ধারণা অনুভূতি ও ইচ্ছা সম্পর্কে আমরা সচেতন, আত্মার সঙ্গে এইগুলি অভিন্ন নয়। এই সব মানসিক প্রক্রিয়া আত্মারই প্রকাশ এবং এই সমস্ত প্রক্রিয়া ও অবস্থার মাধ্যমে আত্মা নিজেকে একক সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করে।

আত্মসচেতনতাই দ্রব্যের ধারণার উৎস। পরিবর্তনের মধ্যে অভিন্ন ও স্থায়ী সত্তা যা আমরা দেখি তাই আত্মা– আত্মসচেতনতার মাধ্যমেই আমরা আত্মার উপলব্ধি করি।

সরল বস্তুবাদ ও জড়বাদ দ্রব্যের যে ধারণা প্রদান করে তা ভাববাদী মতবাদের বিপরীত। এই মতবাদদ্বয় অনুসারে আমরা সংবেদনের সাহায্যে বস্তু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে থাকি। আর বাহ্য বস্তুর জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আত্মা দ্রব্যের ধারণা পেয়ে থাকি।

সরল বস্তুবাদ ও জড়বাদের ত্রুটি : উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, সরল বস্তুবাদ ও জড়বাদের দ্রব্যের উৎপত্তি সম্পর্কীয় ধারণা অযৌক্তিক। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা দ্রব্যের ধারণা পাই না– পাই কোনো অস্থায়ী মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ। কাজেই সরাসরি দ্রব্যের ধারণার সাক্ষাৎ মেলে না। একমাত্র আত্মসচেতনতার (self-consciousness) মাধ্যমেই আমরা দ্রব্যের ধারণা পাই; এক অপরিবর্তিত ও অস্থায়ী সত্তারূপে আত্মার ধারণা পাই।

৩. কার্যকারণতত্ত্ব (Causality)

আকস্মিক ও অনিবার্য : কার্যকারণতত্ত্ব দর্শনের ইতিহাসে একটি জটিল ও প্রয়োজনীয় সমস্যা। জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন কেন ঘটছে, কিভাবে ঘটছে, এই ধরনের চিন্তা মানুষের মনে সতত উদয় হয়। জগতে বিভিন্ন বস্তুর বিন্যাস ও পরিবর্তন বস্তুনিচয় ও ঘটনাসমূহের মধ্যে সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। তলিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, জাগতিক বস্তু ও ঘটনাসমূহের যে সম্পর্ক তা আকস্মিক ও অনিবার্য দু-ই হতে পারে। বর্ণের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আকস্মিক। মানুষের মধ্যে কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ আবার শ্যামল। মানুষের দেহের বর্ণের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক তা আকস্মিক। কার্যকারণ পক্ষান্তরে, ম্যালেরিয়ার সাথে মশকের সম্পর্ক কিংবা তাপের সাথে আয়তন বৃদ্ধির সম্পর্ক অনিবার্য। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে কার্যকারণ সম্বন্ধ বা কার্যকারণতত্ত্ব বলা হয়। যা কার্য সংঘটন করে তাকে কারণ বলে আর কারণ যা উৎপন্ন করে তাকে কার্য বলে।

কার্যকারণতত্ত্ব ঘটনাবলির মধ্যে সংহতি স্থাপন করে : জ্ঞানের পরিকল্পনায় কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা অপরিহার্য। নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে কার্যকারণতত্ত্ব। জগতের বিভিন্ন ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে সংহতি বিধান করে জ্ঞান সম্ভব করে তোলে। কার্যকারণতত্ত্ব

আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয় যে, জগতের প্রত্যেক ঘটনার কিংবা প্রত্যেক পরিবর্তনের কারণ আবিষ্কার করতে পেরেছি, এ দাবি আমাদের নেই, তবে বিশ্বজগৎ যে কার্যকারণের অধীন, এ প্রতীতি আমাদের মধ্যে দৃঢ়মূল। আর এই কার্যকারণ নিয়তই বিশ্বজগতের ঐক্য ও সংহতির কথা ঘোষণা করে ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা স্থাপন করেছে।

কার্যকারণতত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের একটি মৌলিক অপরিহার্য ধারণা। আমরা প্রথমে (ক) কার্যকারণতত্ত্বের স্বরূপ ও পরে (খ) কার্যকারণতত্ত্বের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করব।

(ক) কার্যকারণতত্ত্বের স্বরূপ (Nature of Causality) : কার্যকারণতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে নিম্নলিখিত মতবাদগুলি প্রচলিত আছে : (১) সাধারণ মতবাদ (Common Sense), (২) অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ (Empirical Views), (৩) হিউমের মতবাদ (Hume's Views), (৪) কান্ট ও হেগেলর মতবাদ (Views of Kant & Hegel) ও (৫) আধুনিক মতবাদ (Modern Views)। এখানে মতবাদগুলির বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হচ্ছে।

৩.১ কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মতবাদ (Common Sense Views of Causality) : সাধারণ মতবাদ কারণ কার্যোৎপাদক শক্তি : সাধারণ লোক মনে করে যে, কারণ এমন একটি শক্তি যা কার্য উৎপন্ন করে। কারণ ও কার্যের সম্পর্ক অনিবার্য কারণ উপস্থিত না থাকলে কার্য ঘটে না। কাজেই এই মতানুসারে কারণ কার্যোৎপাদক শক্তি। দার্শনিক লকের অভিমতও লৌকিক মতবাদকে সমর্থন করে। কারণ বলতে তিনিও কার্য উৎপাদনের শক্তিকে বুঝিয়েছেন। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন শক্তিবিহীন কোনো কাজ হয় না, তেমনি বাহ্য জগতে কোনো পরিবর্তন সূচিত হতে হলেও শক্তির প্রয়োজন। কাজেই কারণ হলো শক্তি।

শক্তির অবিনশ্বর তত্ত্ব : বৈজ্ঞানিকরা কারণের লৌকিক মতবাদের সংস্কার সাধন করেছেন, শক্তির অবিনশ্বর তত্ত্বের মাধ্যমে কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শক্তির অবিনশ্বর তত্ত্ব (Law of Conservation of Energy) অনুসারে জগতের সমুদয় শক্তি সমপরিমাণ বিশিষ্ট, এর হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। এটা শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। শক্তির হ্রাস ছাড়াই এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। কাজেই কারণ গুণগতভাবে পৃথক হলেও পরিমাণগতভাবে সমান। বিজ্ঞানে কারণ বলতে শক্তির রূপান্তর বুঝায়।

৩.২ অ্যারিস্টটলের মতবাদ (Aristtole's Views of Causation) : গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল কারণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কারণের চতুর্বিদ রূপের উল্লেখ করেছেন। যথা– (১) উপাদান কারণ (Material Cause), (২) নিমিত্ত কারণ (Efficient Cause), (৩) রূপগত কারণ (Formal Cause) ও (৪) উদ্দেশ্য কারণ (Final Cause)।

৩.২.১ উপাদান কারণ : যে উপাদান বা উপাদান সমষ্টিযোগে কোনো বস্তু প্রস্তুত হয় তাকে সেই বস্তুর উপাদান কারণ বলা হয়। যেমন– কাঠের আলমারির উপাদান কারণ হলো কাঠ, লোহা ইত্যাদি।

৩.২.২. নিমিত্ত কারণ : যে যুক্ত প্রয়োগে কোনো বস্তু প্রস্তুত হয় তা হলো নিমিত্ত কারণ। যেমন– কাঠের আলমারি তৈরি করতে মিস্ত্রি ও হাতিয়ারের প্রয়োজন। মিস্ত্রি ও হাতিয়ার নিমিত্ত কারণ।

৩.২.৩ আকারগত কারণ : যে আকার অনুসারে কোনো বস্তু তৈরি করা হয় তাকে আকারগত কারণ বলে। যেমন– কাঠের আলমারিকে যে আকার মিস্ত্রি প্রদান করে তাই আমলমারীর আকারগত কারণ। সৌধ বা অট্টালিকার যে পরিকল্পনা ইঞ্জিনিয়ার উদ্ভাবন করেন তাই সৌধ বা অট্টালিকার আকারগত কারণ।

৩.২.৪ উদ্দেশ্য কারণ : যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ অর্জনের জন্য কোনো বস্তু তৈরি করা হয় তা সেই বস্তুর উদ্দেশ্য কারণ। বস্তুর উপযোগিতা বস্তুটির উদ্দেশ্য বলা যায়। আলমারি যে উদ্দেশে প্রস্তুত বা যে কাজে আসে তাই আলমারির উদ্দেশ্য কারণ।

৩.৩ কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদীর মতবাদ (Empirical Views of Causality) : অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কার্যকারণতত্ত্ব পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, অভিজ্ঞতাই হলো জ্ঞানের একমাত্র উপায়। সংবেদন অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমরা সম্ভাব্য সকল জ্ঞান লাভ করে থাকি। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কারণকে কার্য উৎপাদন শক্তি হিসেবে জানা যায় না। আর কার্যকারণতত্ত্ব সার্বিক অনিবার্য সম্বন্ধ হিসেবেও জানা যায় না। যাঁরা কার্যকারণতত্ত্বকে সার্বিক ও অনিবার্য সম্পর্ক হিসেবে গণ্য করেন তাঁরা মনে করেন যে, কার্যকারণ সম্পর্ক শুধু অতীতেই সত্য হয়েছে এমন নয়, এটি বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও সত্য হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন যে, অতীতে যা সত্য হয়েছে, ভবিষ্যতেও তা সত্য হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। অভিজ্ঞতাবাদী হিউম, মিল প্রমুখ দার্শনিক উপরোক্ত মতের সমর্থন করেছেন।

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতবাদগুলির মধ্যে হিউমের মতবাদেরই কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কাজেই এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা যাচ্ছে।

৩.৪. কার্যকারণ সম্পর্কে হিউমের মতবাদ (Hume's Views of Causality) : কারণকার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা : হিউম একজন বিখ্যাত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তিনি কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কে প্রচলিত লৌকিক মতবাদের সমালোচনা করেন ও তাঁর নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্য অভিজ্ঞতাবাদীদের মতো হিউমও মনে করেন যে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা জ্ঞান পাই। আর প্রত্যেক্ষণের সাহায্যে আমরা কারণকে কোনো শক্তি বা কার্যোৎপাদক ক্ষমতা হিসেবে জানতে পারি না এবং কারণ ও কার্যের মধ্যে কোনো অনিবার্য সম্পর্কেরও সন্ধান পাই না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, কারণ সর্বত্র কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা। সাধারণ লোক বিশ্বাস করে যে, কারণ ও কার্যের মধ্যে একটি অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বিষপানে মৃত্যু ঘটে', 'দুগ্ধপানে স্বাস্থ্য ভালো হয়।' অতীতে দেখা গেছে যে, বিষপানে কোনো কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে, দুগ্ধপানে কোনো কোনো ব্যক্তির স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, কাজেই 'বিষপান' ও মৃত্যু' এবং 'দুগ্ধপান' ও 'স্বাস্থ্য ভালো হবার' মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে করি এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটার প্রত্যাশা করি।

কার্যকারণের মধ্যে আছে ঘটনার পারম্পর্য : হিউমের মতে, কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কের মধ্যে কোনো নিশ্চয়তা নেই, আছে ঘটনার পারম্পর্য। একটি ঘটনার সাথে অনুরূপ ঘটনার পরে অন্য একটি ঘটনা ঘটলে উভয়ের মধ্যে পূর্বাপর সম্পর্ক বর্তমান। নিয়ত একটি ঘটনার সাথে অনুরূপ ঘটনা পরস্পর যুক্ত হচ্ছে। আমরা অনেক সময় দেখি একটি ঘটনা ঘটলে অপর একটি ঘটনাও এসে পড়ে। অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা

এই দুটি ঘটনাকে পরস্পর যুক্ত করি– একটিকে অন্যটির কারণ বলে অভিহিত করি। কাজেই কার্যকারণ সম্বন্ধে ঘটনার পূর্বাপর একরূপতা। কারণ সব সময়ে অপরিবর্তিত পূর্ববর্তী ঘটনা, কার্য অপরিবর্তিত পরবর্তী ঘটনা অভ্যাসজনিত প্রত্যাশার বলেই কারণ ও কার্যের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধের ধারণা জন্মে।

কার্য ও কারণ পরস্পর পৃথক : দুটির মধ্যে কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই । হিউম বলেন যে, কারণ ও কার্য দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা। একটি ঘটনাকে অন্য একটি ঘটনার মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর মতে, যতই সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করা যাক না কেন কল্পিত বা তথাকথিত কারণের মধ্যে কার্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কার্য ও কারণ পরস্পর পৃথক, একটিকে অন্যটির মধ্যে পাওয়া যায় না। মানবমনের স্বভাব এমন যে, একই ধরনের দুটি ধারণা কার্যকারণ সম্পর্কে জড়িত বলে বিশ্বাস স্থাপন করে। এদের বুদ্ধিগত সম্বন্ধ থাকলেও বস্তুগত কোনো সম্পর্ক নেই, এদের সম্পর্কে নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি না। এ ছাড়া কারণ ও কার্য দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা, উভয়ের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্কের ধারণা করলে কারণ ও কার্যকে দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা বলে অভিহিত করা চলে না। কাজেই কারণ কার্যের মধ্য কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই, এদের সম্পর্ক নেই, এদের সম্পর্ক আমাদের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে।

সমালোচনা

মিলের মতে, কারণ শর্তহীন অপরিবর্তিত পূর্ববর্তী ঘটনা : হিউমের কার্যকারণতত্ত্বের তীব্র সমালোচনা হয়েছে। ভাববাদী দার্শনিক ছাড়াও অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে জন স্টুয়ার্ট, মিল, হিউমের মতবাদের সমালোচনা করেছেন। মিল বলেন যে, কারণ যদি কার্যের অপরিবর্তিত পূর্ব ঘটনা হয় তবে দিন রাত্রির কারণ ও রাত্রি দিনের কারণে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এটা সত্য নয়। আমরা জানি যে, দিন ও রাত্রির কারণ পৃথিবীর আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ ২৪ ঘন্টায় একবার প্রদক্ষিণ। মিলের মতে, কারণ শুধু অপরিবর্তিত পূর্ববর্তী ঘটনা নয়, কারণ হলো শর্তহীন অপরিবর্তিত পূর্ববর্তী ঘটনা (An nuconditional invariable antecedent to the effect)। অর্থাৎ কোনো শর্তের অধীন না হয়ে কারণ কার্যকে অনুসরণ করে।

হিউমের মতবাদ ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা কোনোরূপ সার্বিক ও অনিবার্য সত্যে উপনীত হতে পারি না। হিউমের কার্যকারণতত্ত্ব ধারণার পারম্পর্য (Succession of idea), পারম্পর্যের ধারণা নয়। ধারণাসমূহের মধ্যে একটা যে অপরের পারম্পর্যে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে সেখানে কোনো সার্বিক ও অনিবার্য সত্য পাওয়া যায় না।

হিউমের মতবাদ স্বীকার করলে আরোহ অনুমান, বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বাণী বা গণনা কার্যের কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু কার্যকারণতত্ত্ব ও প্রকৃতির একানুবর্তিতার ওপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে। এ অবস্থায় হিউমের মতবাদ গ্রহণ করলে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

কাজেই আমাদের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, কার্যকারণতত্ত্ব পূর্বাপর, সম্পর্ক নয়, এটা অনিবার্য সম্পর্ক।

৩.৫ কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কে কান্ট ও হেগেলের মতবাদ (Views of Kant and Hegel about Causality)

কান্ট : কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা অভিজ্ঞতাপূর্ব : কান্টের মতে, কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। এটি অভিজ্ঞতাপূর্ব মৌলিক ধারণা। এটা আমাদের অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে। কার্যকারণতত্ত্ব জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার, অভিজ্ঞতাজাত নয়। কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আসে না বরং অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য মন আপন থেকে এই অপরিহার্য মৌলিক ধারণাগুলিকে জন্ম দেয়। কার্যকারণতত্ত্ এমন একটি মৌলিক ধারণা যা অভিজ্ঞতার বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে অভিজ্ঞতাকে বোধগম্য করে তোলে।

মনের সংশ্লেষণাত্মক শক্তি অভিজ্ঞতার মধ্যে সংহতি আনে : কান্টের মতে, সকল পরিবর্তন কার্যকারণতত্ত্বের নিয়ম অনুসারেই ঘটে থাকে। এই বিশ্বে আমরা বিভিন্ন ঘটনা দেখি; একটির পর একটি ঘটনা ঘটে। দেশকালের পটভূমিতে অসংলগ্ন ও অসংযুক্ত বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলির প্রত্যক্ষণ আমাদেরকে কোনো অনিবার্য জ্ঞান দিতে পারে না। সূর্যের প্রত্যক্ষণ ও উত্তপ্ত পাথরের প্রত্যক্ষণ একটির পর অন্যটি আসে। এই দুটি অভিজ্ঞতাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে একত্র করে আমরা একটি অবধারণ বা যুক্তিবাক্য গঠন করি। যেমন, সূর্য পাথরকে উত্তপ্ত করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মনের সংশ্লেষণাত্মক শক্তি ছাড়া অভিজ্ঞতার মধ্যে সংহতি স্থাপন করা যায় না। এই সংহতি জ্ঞানের মূল শক্তি। কান্টের মতে, কার্যকারণতত্ত্ব জ্ঞানের আকার বিশেষ। এটাকে অবভাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, অতীন্দ্রিয় সত্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। অতীন্দ্রিয় সত্তা চিরকাল আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় থেকে যায়।

হেগেল : কার্যকারণতত্ত্ব আত্মগত ও বস্তুগত : হেগেল কান্টের পরিদৃশ্যমান ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, যা বাস্তব তাই বুদ্ধিসম্মত, যা বুদ্ধিসম্মত তাই বাস্তব। হেগেলের মতে, প্রকৃতি ও মানুষ বিশ্বজগতের সব কিছুই একই পরম ধীশক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। একই পরম ধীশক্তি বস্তু-জীব-চৈতন্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। কাজেই যা জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য তা প্রকৃতিতেও বর্তমান। কাজেই কার্যকারণ ধারণা শুধু মনেরই মৌলিক ধারণা নয়, বাস্তব জগতেও এই সম্বন্ধের অস্তিত্ব বর্তমান। যেহেতু চৈতন্যলোকে ও প্রাকৃতিক জগতে একই সত্য ক্রিয়া করছে। সুতরাং কার্যকারণতত্ত্বের সাহায্যে আমরা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারি। কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা আত্মগত ও বস্তুগত দুই-ই।

হেগেলের মতে, বস্তুজগতের পরিবর্তন কোনো জড় শক্তির ফল নয়, বরং তা পরম ধীশক্তির ইচ্ছাময় প্রকাশ। এই হিসেবে খোদার ইচ্ছা ব্যতিরেকে জাগতিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে না। বিশ্বজগতের ক্রমিক পরিবর্তন সেই পরম ধীশক্তির ঐচ্ছিক প্রকাশ। কার্যকারণতত্ত্ব সসীম মনের আকার নয় এটা অসীম মনেরও আকার, যা বিশ্বজগতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। হেগেলের মতবাদই সন্তোষজনক।

৪. কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ (Modern views of Causality) :

ব্রাডলি (Bradley) : কার্যকারণ সম্পর্কে আত্মবিরোধ কন্টককিত : ব্রাডলির মতে, কার্যকারণতত্ত্ব এমন একটি সম্পর্ক যা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। কারণ হয় কার্যের সাথে অবিচ্ছন্ন থাকে, নতুবা বিচ্ছিন্ন থাকে। কারণ যদি কার্যের অবিচ্ছিন্ন থাকে

তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কিংবা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই ওঠে না। আবার কার্য কারণের সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে না। এ অবস্থায় কার্য উৎপন্ন করার জন্য যদি এই তৃতীয় বিষয়টির ওপর নির্ভর করতে হয় তবে তৃতীয় বিষয়টিরও একটি চতুর্থ বিষয়ের প্রয়োজন হবে। এইভাবেই অনবস্থা দোষের (adinfintum) উদ্ভব হবে। কাজেই কারণের মধ্যে আত্মবিরোধ রয়েছে। ব্রাডলি মনে করেন যে, সকল প্রকারের সম্পর্ক আত্মবিরোধ কন্টকিত, কাজেই কার্যকারণ সম্পর্ক নিষ্ফল।

অনবস্থা দোষ : ব্রাডলির এই মত গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তিনি মনে করেন যে, কার্যকারণ হলো দুটি পদ। আমরা জানি যে, কার্যকারণ হলো সম্পর্ক, একে পদ বলে গণ্য করলে অনবস্থা দোষের সৃষ্টি হবে। স্টেবিং-এর মতে, কার্যকারণ সম্বন্ধ দুটি সম্বন্ধযুক্ত পদ। দুটি ঘটনা স্বতন্ত্র হয়েও কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত হয়। কেননা এভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া তাদের ধর্ম। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্ক দুটি ঘটনাকে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত করতে পারে।

হোয়াইটহেড (Whitehead) : কার্যকারণ সম্পর্ক বস্তুগত : অধ্যাপক হোয়াইটহেডের মতে, হিউম বা কান্ট, কেউই কার্যকারণতত্ত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। উভয়ই প্রকৃতিকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। কাজেই অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার মধ্যে প্রকৃত কার্যকারণতত্ত্বের সন্ধান তাঁরা পান নি। হিউম পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড সংবেদনকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেছেন, আর কান্ট মনের মধ্যেই কার্যকারণতত্ত্বের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হন নি। হোয়াইটহেডের মতে, সত্তার বৈশিষ্ট্য হলো ক্রমিক (Process)। এই গতিপথে প্রত্যেকটি বস্তু প্রত্যেকটি বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই তাঁর মতে, কার্যকারণ সম্পর্ক বস্তুগত। কার্যকারণ পরস্পর দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়– দুটি ঘটনার মধ্যে রয়েছে এক অবিচ্ছিন্নতা– পূর্ববর্তী ঘটনা হলো কারণ ও পরবর্তী ঘটনা হলো কার্য।

আলেকজান্ডার (Alexander) : বস্তু দেশকালের জটিল সংগঠন : স্যামুয়েল আলেকজান্ডার একজন বাস্তববাদী দার্শনিক। তাঁর মতে, গতিই হলো পরমতত্ত্ব; গতিই হলো দেশকাল। বস্তু গতি বা দেশকালের এক জটিল সংগঠন। প্রত্যেক বস্তুর দুটি দিক আছে– গতির দিক ও স্থিতির দিক। স্থিতির দিক থেকে দেখলে বস্তুটি দ্রব্য, গতির দিক থেকে দেখলে তা কারণ। আলেকজান্ডারের এই মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

রাসেল (Russel) : কার্যকারণতত্ত্ব ভাষাভিত্তিক ও সহজ বুদ্ধিনির্ভর : রাসেলের মতে, কার্যকারণতত্ত্ব ভাষাভিত্তিক ও সহজ বুদ্ধিনির্ভর মতবাদ। কার্যকারণতত্ত্বের প্রকৃতি বিচার করলে আমরা এর অন্তর্নিহিত বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হই। গরুকে লাঙল টানতে দেখে আমরা মনে করি যে, গরুর শক্তি লাঙলের গতির কারণ, আর অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পূর্বাপর সম্পর্ক থেকে আমরা আশা করি যে, এই সম্পর্ক অনিবার্য সম্পর্ক হবে।

রাসেলের মতে, কার্যকারণ সম্পর্ক পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া কিছুই নয়। এতে কোনো বাধ্যতাবোধ নেই। কারণ কিংবা কার্য কোনোটার মধ্যেই শক্তি বলে কিছুই নেই। আর্শীতে দেখা বস্তুর গতি যেমন প্রকৃত গতি নয়, তেমনিভাবে বাইরের জগতের ক্ষেত্রের গতি কিংবা শক্তির কল্পনা অবান্তর।

পরিমাণগত : বহির্জগতের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও শক্তি বা বাধ্যতাবোধ নেই। বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক

হলো পরিমাণগত পারস্পরিক সম্বন্ধ, অনিবার্য সম্পর্ক নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রাসেলের মতে, কার্যকারণতত্ত্বের লৌকিক মতবাদ স্বীকার করা যায় না। রাসেলের এই মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

৫. কার্যকারণতত্ত্বের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ (Views as to the origin of the Idea of Causality) : কার্যকারণতত্ত্বের উৎপত্তি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা :

১. লৌকিক বা সাধারণ মতবাদ (Common Sense Views) : প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা পাওয়া যায় : সাধারণ লোক মনে করেন যে, প্রত্যক্ষণের মাধ্যমেই আমরা কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা পেয়ে থাকি। যখন আমরা দেখি যে, ঝড়ে রাস্তার পাশে গাছটি উপড়িয়ে নিয়েছে, তখন আমরা মনে করি যে, কারণের শক্তির জন্যই কার্য ঘটেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লৌকিক মতবাদ অনুসারে আমরা কার্যকারণতত্ত্ব বাহ্য প্রত্যক্ষণের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি।

২. অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ (Empirical Views)

কার্যকারণতত্ত্ব মানসিক অভ্যাস : হিউম লৌকিক মতবাদের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে বহির্জগতে আমরা ঘটনার পারম্পর্য সম্পর্কই প্রত্যক্ষ করি, কোনো শক্তি অথবা দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো অনিবার্য সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করি না। আমাদের অভিজ্ঞতায় অগ্নি তাপকে নিয়ত অনুসরণ করছে। ফলে দুটি ঘটনা এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে যে একটিকে আবির্ভূত হতে দেখলে অপরটি আবির্ভূত হবে বলে প্রত্যাশা করি। কাজেই হিউমের মতে, কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা উৎপন্ন হয় আমাদের মানসিক অভ্যাস বা সংস্কার হতে। অতঃপর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনার অপরিবর্তনীয় পারম্পর্য লক্ষ করে সামান্যীকরণের সাহায্যে আমার কার্যকারণতত্ত্বের সঠিক ধারণা গঠন করি।

চক্রক দোষ : কার্যকারণের অনিবার্য তত্ত্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। আজ আমরা যদি বলি যে, কার্যকারণতত্ত্ব আরোহ অনুমানের সাহায্যে পাওয়া যায় তবে যুক্তিটি চক্রক দোষে (Fallasy of Petitio Principil) দুষ্ট হয়, কেননা কার্যকারণতত্ত্বকে আরোহ অনুমানের ভিত্তি বলে মনে করা হয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত : হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা আমাদের পূর্বপুরুষরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করেছেন। কিন্তু আমরা বংশানুক্রমে এই ধারণা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। কাজেই আমাদের কাছে এই ধারণা সহজাত ধারণায় পরিণত হয়েছে।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদ অভিজ্ঞতাবাদেরই একটি বিশেষ সংস্করণ। কাজেই আমাদের কাছে এই মতবাদ অভিজ্ঞতাজাত ত্রুটিসমূহের অধীন।

৩. ভাববাদী মতবাদ (Idealistic Views) : কার্যকারণতত্ত্ব মানসজাত : কান্ট একজন প্রসিদ্ধ ভাববাদী দার্শনিক। তাঁর মতে, কার্যকারণতত্ত্ব আমাদের মনের একটি মৌলিক ধারণা, এতে আমাদের অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে। কার্যকারণতত্ত্ব ছাড়া জগতের ঘটনাবলি ঐক্যসূত্র স্থাপন করা সম্ভব নয়।

অধ্যাপক হোয়াইটহেড মনে করেন যে কার্যকারণতত্ত্বকে বস্তুগত সম্পর্ক হিসেবে গণনা করতে পারলেও এর অনিবার্যতা প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়।

হেগেল : আত্মসচেতনতার মধ্যে কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা পাওয়া যায় : ভাববাদী দর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হেগেলের মতে কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা আমরা আত্মসচেতনতার মধ্যে পেয়ে থাকি। যখন আমরা কোনো কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে বহির্জগতের কোনো পরিবর্তন আনতে চাই তখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা শক্তি প্রয়োগ করছি। আমরা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করি যা সম্পর্কে আমরা সচেতন। এইভাবে কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা শক্তির ধারণা পাই এবং আমরা যে আমাদের কার্যের নিয়ন্তা সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হই। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার আত্মসচেতনতা থেকে জন্মে কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা। আত্মসচেতনতা থেকে প্রাপ্ত এই কার্যকারণতত্ত্ব আমরা বহির্জগতের বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কার্যকারণতত্ত্বের ধারণা আমাদের আত্মচৈতন্যের মধ্যে পাই, পরে তা আমরা বহির্জগতেই প্রসারিত করে দেই। কার্যকারণতত্ত্বের উৎপত্তি সম্পর্কে হেগেলের মতই সন্তোষজনক বলে মনে হয়।

টীকা ১. দ্রব্য ও কারণ (Substance and Causality) : দ্রব্য ও কারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দ্রব্য ও কারণের ধারণা অবিচ্ছেদ্য ধারণা– দ্রব্য ছাড়া কারণ থাকতে পারে না, আবার কারণ ছাড়াও দ্রব্য থাকতে পারে না।

জগতের অসংখ্য দ্রব্য আছে। এই সমস্ত দ্রব্য পরস্পরের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। এই পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই পরিবর্তন সাধিত হয়। দ্রব্য ছাড়া কারণ ব্যাখ্যা হতে পারে না। যখন আমরা দুটি বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্কে কথা বলি, তখন আমরা দুটি বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বল লেগে একজন খেলোয়াড় আহত হলো। এখানে বল আঘাতের কারণ কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, বলের একটি বিশেষ অবস্থাই আঘাতের কারণ। বলটি নিশ্চল থাকলে খেলোয়াড়টি আহত হতো না, বলের চলমান অবস্থাই আঘাতের কারণ। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে বলের স্থির ও চলমান উভয় রূপই বলেরই অবস্থা। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে দ্রব্য কারণ, দ্রব্য ছাড়া কারণকে ব্যাখ্যা করা যায় না, এ ছাড়া কোনো বস্তুকে বুঝতে হলে অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তা বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তাপ আগুনের একটি বৈশিষ্ট্য। বস্তু আগুনের সংস্পর্শে এলেই এর বৈশিষ্ট্যর প্রকাশ সম্ভব হয়; অন্যথায় সম্ভব নয়। কাজেই অন্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেই কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্য উদঘাটিত হতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া দ্রব্যের স্বরূপ জানা যায় না। আবার দ্রব্যের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়ে থাকে। কাজেই দ্রব্যই কার্যের কারণ। আরও বলা যায় যে কার্য উৎপন্ন করার জন্য কারণকে সক্রিয় হতে হয়। দ্রব্য হলো কারণ, কেননা দ্রব্যের দ্রব্যত্ব সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। দ্রব্য ও দ্রব্যের বিভিন্ন প্রকাশ কার্যকারণ সম্পর্কে জড়িত। দ্রব্য হলো কারণ, বিভিন্ন প্রকাশ হলো তার কার্য। কার্য ও কারণের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। কারণ কার্যের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, কার্য কারণেরই প্রকাশিত রূপ। ক খ-কে উৎপন্ন করে; ক হলো কারণ, খ হলো কার্য। কিন্তু ক খ-কে উৎপন্ন করতে না পারলে ক কারণ হতে পারত না। কাজেই খ-এর জন্য ক কারণ হতে পেরেছে। এই দিক থেকে বিচার করলে কার্যের জন্য কারণকে কারণ হতে হয়। সুতরাং দ্রব্য ও কারণ পরস্পর সাপেক্ষ পদ– একটি ছাড়া অন্যটির অর্থ হয় না।[১]

---

[১] Dr, J.N. Sinha–*Introduction to Philosophy* ; প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত–*দর্শনের মূলতত্ত্ব*; হযরত আলী–*সাধারণ দর্শন তত্ত্ব*।

স্যামুয়েল আলেকজান্ডার কার্য ও কারণের নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে বস্তুকে স্থিতির দিক দিয়ে দেখলে দ্রব্য এবং গতির দিক দিয়ে দেখলে কারণ প্রতীয়মান হয়। তাঁর শুদ্ধ গতিই হলো পরমসত্তা। কাজেই দ্রব্য ও কারণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

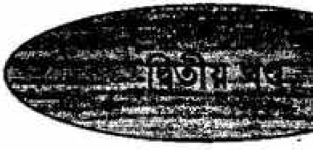
টীকা ২. যান্ত্রিক ও পরিণতিমূলক কার্যকারণতত্ত্ব (Mechanical and Teleological Causation)

জগতের বিবর্তনের ব্যাখ্যায় দার্শনিকরা যান্ত্রিক কার্যকারন সম্পর্ক ও পরিণতিমূলক কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। জড়জগতের যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কে অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। যান্ত্রিক কার্যকারণতত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। যন্ত্রের কার্যের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্যহীন একরূপতা ও অনিবার্যতা। একই কারণ সব সময়ে একই কার্য সংঘটন করে, এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। যান্ত্রিক ক্রিয়ার মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। একইভাবে কাজ করে চলাই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে, পরিণতিমূলক কার্যকারণ সম্পর্ক যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কের বিপরীত। পরিণতিমূলক কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসারে কোনো পূর্ববর্তী ঘটনা পরবর্তী ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে না, বরং ভবিষ্যতের কোনো উদ্দেশ্য ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। উদ্ভিদ, ইতর প্রাণি ও মানুষের কার্যাবলি তলিয়ে দেখলে তার মধ্যে উদ্দেশ্যমুখিনতা সচেতন না হলেও মানুষের মধ্যে এই উদ্দেশ্যমুখিনতা সচেতন। জড়বস্তুর কার্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। শক্তি ছাড়া যন্ত্র চলতে পারে না, কিন্তু যন্ত্রের চালক ভিতরের শক্তি দ্বারা চালিত হয়। মানুষ আত্মসচেতন সত্তা, মানুষের প্রত্যেক কাজের পশ্চাতে উদ্দেশ্য সচেতনতা বর্তমান। মানুষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই কাজ করে। ইতর প্রাণি উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ নয় তবে জৈবিক প্রবৃত্তি তাকে কার্যে প্ররোচিত করে থাকে।

জবাব ও ভাববাদ : কার্যকারণতত্ত্বের দ্বিবিধ ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে দার্শনিকরা জাগতিক ঘটনাবলির বিভন্নমুখী দুটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। জড়বাদীদের মতে, জড় থেকে বিশ্বজগতের উৎপত্তি হয়েছে। জড় থেকে জীবন, জীবন থেকে চৈতন্য উদ্ভূত হয়েছে। যান্ত্রিক নিয়মেই জগতের সকল পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। জাগতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ উদ্দেশ্যমুখীনতা সক্রিয় নয়। আবার ভাববাদী দার্শনিকরা মনে করেন যে, এক পরম চৈতন্য থেকে বিশ্বের সমুদয় বস্তু, জীব ও চেতনার উদ্ভব ঘটেছে। একটি পরিণতি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করছে। বিশ্বজগতের পরিবর্তনের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ সত্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা জীবনের ক্রিয়াবলি ব্যাখ্যা করা যায় না। একমাত্র পরিণতি বা উদ্দেশ্যমুখীনতাই জীবের ক্রিয়াবলির ব্যাখ্যা করতে পারে।

উভয় ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা : উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, জড়জগতের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা উপযোগী হলেও সত্তার উচ্চতর স্তরে এই ব্যাখ্যা অনুপযোগী। তবে দ্বিবিধ কার্যকারণ সম্পর্ক, সামগ্রিক সত্তার বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যার উপযোগী। কাজেই কার্যকারণের দুটি দৃষ্টিকোণ অপরিহার্য।



প্রথম অধ্যায়
জড়, দেশ ও কাল
MATTER, SPACE AND TIME

"The present state of knowledge furnishes us with no link between the living and non-living." – **Huxley, Encyclopaedia Britannica**

- ❑ **ভূমিকা**
- ❑ **দর্শনের দৃষ্টিতে জড়**
- ❑ **জড়ের স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদ**
- ❑ **দেশ ও কাল**

১. ভূমিকা

জড়বস্তুর মূল উপাদান, এর ধ্বংস নেই : পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা নিয়ত বস্তুর উৎপত্তি ও বিলয় অবলোকন করি। পার্থিব বস্তুর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। কোনো বস্তুর আকার ও গঠনের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হলে সেই বস্তুর ধ্বংস হয়েছে বলে আমরা মনে করি। আসলে কোনো বস্তুর ধ্বংস নেই, বস্তুর শুধু অবস্থান্তর ঘটে। যখন কোনো টেবিল ভস্মীভূত হয়, আমরা মনে করি টেবিলটি তার পূর্বাবস্থা থেকে ভস্ম অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। অনুরূপভাবে, মৃত্তিকার খণ্ড বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় রূপান্তরিত হয়, পানি উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। এমনি জগতের বিভিন্ন বস্তুর পরিবর্তনের দিকে অবলোকন করলে আমরা দেখতে পাই যে, বস্তুর পরিবর্তনের মধ্যেও বস্তুর মূল উপাদান বিনষ্ট হয় না। জড় বলতে আমরা বস্তুর এই মূল উপাদানকেই বুঝে থাকি। বিশেষ বস্তুর উদ্ভব ও বিলয় সাধিত হয়, কিন্তু জড়ের ধ্বংস নেই, জড় পরিবর্তনের অধীন নয়, অন্তত কোনো কিছুই জড়কে তার নিজের স্বভাব থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।[১] জড় পার্থিব সত্তার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। জড় স্থায়ী সত্তা ও সর্বব্যাপক। জড় বলতে আমরা এমন সত্তাকে বুঝি যা বস্তুর পরিবর্তনের মধ্যেও

[১] Cuningham : *Problems of Philosophy*, P-170

অপরিবর্তিত থাকে। জড় স্থিতিশীল। সাধারণ মানুষ জড়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেও জড়ের স্বরূপ সম্পর্কে তারা কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করে না। জড়ের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে বিভিন্ন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। গ্রিক দার্শনিক থেলিস (৬২৪ খ্রিঃ পূঃ-৫৪৮ খ্রিঃ) থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দার্শনিক জড়ের স্বরূপ ব্যাখা করার প্রয়াস পেয়েছেন। দার্শনিকদের মতবাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য না থাকলেও জড়ের ব্যাখ্যায় এই সব প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। আমরা প্রথমে জড় সম্পর্কে দার্শনিক মতবাদসমূহ ও পরে বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি আলোচনা করব।

২. দর্শনের দৃষ্টিতে জড়

Philosophical Views of Matters

গ্রিক দর্শনে পদার্থবিদ্যা : দর্শনের ইতিহাসে জড়ের ধারণা একটি বিশিষ্ট আসন দখল করে আছে। পাশ্চত্য দর্শনে খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে জড়ের যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে একদল চিন্তাবিদ পৌরাণিক ব্যাখ্যা বর্জন করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে নিজেদের সুচিন্তিত মতবাদ পেশ করেন। অ্যারিস্টটল তাদেরকে পদার্থবিদ (Physicists) নামে অভিহিত করেছেন। ভূত-প্রেত, দেব-দেবীর পরিবর্তে তারা প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য সচেষ্ট হন। এই সব চিন্তাবিদের মতবাদসমূহের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হলেও তাঁরা এক বিষয়ে একমত যে, জগতের বিভিন্ন বস্তু এক বা একাধিক উপাদান থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

থেলিস (Thales) : পাশ্চাত্য দর্শনের জনক থেলিস ছিলেন গ্রিক দেশের মিলিশিয়ান দর্শন সম্প্রদায়ের অন্যতম চিন্তাবিদ। আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৬২৪ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং খ্রিঃ পূঃ ৫৪৮ অব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি প্রাচীনতম দার্শনিক। তাঁর মতে, পানিই বস্তুর মূল উপাদান। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু পানি থেকে উৎপন্ন হয়, পানিতে সব কিছু বিলীন হয়ে যায়। অ্যারিস্টটল মনে করেন যে, থেলিস বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে আর্দ্রতার চিহ্ন লক্ষ করে পানিকেই জীবনের মূল উপাদান বলে স্থির করেছিলেন। তবে অ্যারিস্টটল যাই মনে করেন না কেন, থেলিস তাঁর মতবাদ সম্পর্কে কোনো বিশদ আলোচনা করেন নি অর্থাৎ পানি থেকে কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু উদ্ভূত হলো সে সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি।

অ্যানাক্সিমান্ডার (Anaximander-খ্রিঃ পূঃ ৬১১ খ্রিঃ পূঃ ৫০৭) :
তাঁর মতে, পানি পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অন্যতম। কাজেই পানি বিভিন্ন বস্তুর মূল উপাদান হতে পারে না। তিনি মনে করেন যে, মূল উপাদানের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই, জগতের মূল উপাদান সীমাহীন (Boundless)। এই সীমাহীন থেকেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি এবং এতে সব বস্তুর বিলয়। জল জগতের একটি নির্দিষ্ট অংশ। কাজেই হয়তো তিনি মনে করেন যে, অংশ সমগ্রের মূল হতে পারে না।

অ্যান্যাক্সিমিনিস (Anaximenes-খ্রিঃ পূঃ ৫৯৫-খ্রিঃ পূঃ৫২৪) : অ্যান্যাক্সিমিনস অনির্দিষ্ট সীমাহীনকে জগতের যাবতীয় বস্তুর মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ অনির্দিষ্ট ও নিরাকার 'সীমাহীন' থেকে আকায় বস্তুনিচয়ের উদ্ভব কীভাবে হতে পারে তিনি তা ভেবে পান নি। তাঁর মতে বায়ু জীবনের মূল উপাদান। বায়ু থেকেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব ঘটেছে। বায়ুকে তিনি মূল

উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো এই কারণে যে, তিনি জীবনধারণের মূল বায়ুর অপরিহার্যতার দিকে লক্ষ করেছিলেন। তিনি অন্যাক্সিমান্ডারের মতের সাথে একমত হতে পারেন নি তাঁর মতবাদের অস্পষ্টতার জন্য অবশ্য অন্যাক্সিমান্ডারের 'সীমাহীন' তাঁর দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল। কেননা বায়ুর প্রকৃতি অনেকটা অস্পষ্টা ও সীমাহীনতা পরিবেষ্টিত।

ঐ সকল মতবাদের সাদৃশ্য : থেলিস, অন্যাক্সিমান্ডার ও অ্যান্যাক্সিমিনিসের মতবাদের মধ্যে যাই থাকুক না কেন একটি বিষয়ে তাঁরা সকলে একমত যে, জগতের মূল উপাদান জড়াত্মক।

হিরাক্লাইটাস (Heracleitus, খ্রিঃ পূঃ ৫৩৫- খ্রিঃ পূঃ ৪৭৫) :

হিরাক্লাইটাসের মতে, "অগ্নি জগতের মূল উপাদান। অগ্নি থেকে পৃথিবীর বস্তুর উদ্ভব এবং অগ্নিতেই সব বস্তু মিশে যাবে। তিনি বলেন, এই পৃথিবী দেবতার এক শ্রেণী কিংবা মানবগোষ্ঠীর এক শ্রেণী সৃষ্টি করে নি, বরং এই জগৎ নিত্য অনির্বাণ অগ্নি হিসেবে আছে, ছিল এবং থাকবে।"[১] অগ্নি সতত গতিশীল। পরিবর্তন জগতের ধর্ম এবং অগ্নি প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তনশীলতার দিকে লক্ষ করে হয়তো তিনি অগ্নিকে জগতের মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অগ্নি জগতের বিভিন্ন বস্তুর অন্যতম; এ কীভাবে সকল বস্তুর উপাদান হতে পারে হিরাক্লাইটাস তা প্রতিপন্ন করেন নি।

এম্পিডকলিস (Empedocles, খ্রিঃ পূঃ ৪৯৫- খ্রিঃ পূঃ ৪৩৫) : এম্পিডকলিস তাঁর পূর্বসূরিদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি জগতের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক জাগতিক উপাদান স্বীকার করলেন না। তাঁর মতে, এই জগতের মূল উপাদান একটি নয়– চারটি। যথা– মৃত্তিকা, পানি, বায়ু ও অগ্নি। জগতের বিভিন্ন বস্তু এই চারটি উপাদান সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন মাত্রায় এই উপাদানগুলির সংমিশ্রণ ও বিচ্ছেদ ঘটার ফলেই জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়।

অ্যানাক্সাগোরাস (Anaxagoras, খ্রিঃপূঃ ৫০০- খ্রিঃ পূঃ ৪২৮) : অ্যানাকসাগোরাসের মতে, জগতের মূল উপাদান একাধিক। কেবল চারটি উপাদনের সাহায্যে সমুদয় বস্তুর ব্যাখ্যা প্রদান করা চলে না। কাজেই তিনি মনে করেন যে, পৃথিবীতে যতগুলি গুণ আছে, ঠিক তত শ্রেণীর উপাদান বর্তমান। প্রতিটি গুণের অনুরূপ একটি মূল উপাদান রয়েছে। যেমন– লাল, নীল, উষ্ণ, শীতল ইত্যাদি। অ্যানাক্সাগোরাসের মতে, জড় বলতে বুঝায় অসংখ্য উপাদান। গুণগতভাবে মূল উপাদানগুলি পরস্পর পৃথক। এই মতবাদের নাম গুণগত পরমাণুবাদ (Qualitative atomism)।

ডেমোক্রিটাস (Democritus, খ্রিঃ পূঃ ৪৬০- খ্রিঃ পূঃ ৩৭০) : ডেমোক্রিটাস অ্যানাক্সাগোরাসের সঙ্গে একমত এই বিষয়ে যে, বস্তুর উপাদান অসংখ্য। তিনি মূল উপাদানসমূহের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, উপাদানসমূহের পার্থক্য পরিমাণগত (quantitative)। তাঁর মতে, জড় দ্রব্য পরমাণুর সমষ্টি। কোনো

---

[১] This world neither one of the Gods nor of the human race has made; but it is, it was, and ever shall be an eternality living fire. Heracleitus (Quoted in *A Ceritical History of Greek Philosophy.'* P. 78.

জড়বস্তুতে ভাগ করতে করতে যে ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায়, তার নাম পরমাণু। পরমাণু বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, পরমাণুর চেয়ে জড়বস্তুর আর ক্ষুদ্রতম অংশ হতে পারে না। পরমাণুর জন্ম নেই। পরমাণু অবিনশ্বর। পরমাণুর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। পরমাণু সংখ্যায় অগণিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। পরমাণুসমূহের মধ্যে শুধু পরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে, "কোনো কোনো পরমাণু মসৃণ, গোলাকার, হাল্কা, আর কোনো কোনো পরমাণু অসমান, কোণাকার, ভারী। মহাশূন্যে সকল পরিমাণই গতিশীল, তবে কোনো কোনো পরমাণুর গতি অন্য পরমাণুর তুলনায় অধিক। পরমাণুর নিজস্ব কোনো গতি নেই, তার গতি আসে বাইরে থেকে।"[১]

প্রাথমিক গ্রিক দার্শনিকের গুরুত্ব : প্রাথমিক দার্শনিকদের আলোচনার মূল্য ঐতিহাসিক। তাঁরা প্রাক বৈজ্ঞানিক যুগের ধ্যান-ধারণা থেকে দূরে সরে নৈসর্গিক ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জড় সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানে প্রয়াস পান। দুটি বিষয় আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।

প্রথমত, জড়কে কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের সঙ্গে একীভূত করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, জড় ক্ষুদ্র কণাবিশিষ্ট। এটি পরিমাপের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা হতে পারে। আজ এই সব দার্শনিকের চিন্তা সেকেলে হলেও তাঁরা বৈজ্ঞানিক যুগের যথার্থ নকিব; চিন্তার জগতে এক নতুন দৃষ্টিকোণের উদগাতা।

প্লেটো (Plato, খ্রিঃ পূঃ ৪২৬- খ্রিঃ পূঃ ৩৪৭) : বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর মতে, জগতের বিভিন্ন বস্তুর ধারণার অনুলিপি। তিনি ধারণাকে (Idea) সত্তা বলে মনে করেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক বস্তুই একটি ধারণার দৈহিক প্রকাশ। কিন্তু বস্তুটির প্রকাশের জন্য উপাদন প্রয়োজন; এই উপাদন হলো 'জড়'। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক টুকরা হীরক খণ্ড। 'হীরক' ধারণার অনুলিপি। হীরক খণ্ডটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য– এর উজ্জ্বলতা, আকার, দোষ-ত্রুটি সবই উপাদান থেকে উদ্ভূত। কাজেই প্লেটোর মতে, বস্তুগুলি ধারণার অনুলিপি। যে উপাদানের সাহায্যে এই অনুলিপি গঠিত হয় তাকে বলা হয় জড়। জড়ের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে প্লেটো পরিষ্কারভাবে কিছুই বলেন নি।১ তাঁর মতে, জড় আকারহীন, গুণহীন, এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

অ্যারিস্টটল (Aristotle, খ্রিঃপূঃ ৩৮৪- খ্রিঃপূঃ ৩২২) : অ্যারিস্টটল 'আকার ও জড়ের' মতবাদের সাহায্যে জড় সম্পর্কীয় সমস্যার ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, আকার হলো দ্রব্য, আর এই আকার নিত্য অপরিবর্তিত। জগতের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে আকারের মূর্ত সম্পর্ক বিদ্যমান। জাগতিক বস্তু আকার ও জড়ের সমন্বয়ে গঠিত। তার মতে, জগতের প্রতিটি বস্তু নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে, আর এই পরিবর্তন বস্তুর অন্তর্নিহিত কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি আমের বীজ থেকে একটি আম গাছই হতে পারে, অন্য কোনো গাছ হতে পারে না। আম বীজের ধর্মই হলো আম গাছকে সম্ভবিত করে তোলা। আম বীজের স্বভাব আম গাছে রূপান্তরিত হওয়া, জাম বা অন্য কোনো গাছে রূপান্তরিত হওয়া নয়। জগতের

---

[১] Some of them are smooth, round and light, while others are rough, angular and heavy; all are in motion through the void' (empty space) but some are more mobile than others and travel with a greater velocity. – Cunningham.

পরিবর্তনের দিকে খেয়াল করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, একটা নির্দিষ্ট কিছু থেকে ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অ্যারিস্টটলের ভাষায় 'জড়' হলো যা পরিবর্তিত হয়, 'আকার' হলো যাতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ জড় আকারে রূপায়িত হচ্ছে। জড় বলতে পরিবর্তিত হওয়ার শক্তিকে বুঝিয়ে থাকে।

দেকার্তে (Descartes, খ্রিঃপূঃ ১৫৯৫- খ্রিঃ পূঃ ১৬৫০) : দেকার্তের মতে, 'জড়' ও 'বিস্তৃতি' (Matter and Extension) সমার্থক শব্দ। জড়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিস্তৃতি ছাড়া জড়ের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যেখানে জড় দ্রব্য রয়েছে সেখানেই বিস্তৃতি রয়েছে। তিনি জড় ও মনকে দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মনে করেন। জড় মনের বিপরীত। জড়ের ধর্ম বিস্তৃতি; জড় যান্ত্রিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়। মনের ধর্ম চিন্তন; মন চেতন দ্রব্য।

জন লক (John Locke, খ্রিঃ পূঃ ১৬৩২- খ্রিঃ পূঃ ১৭৩৪) : ব্রিটিশ দার্শনিক জন লকের মতে, জড় গুণাবলির অদৃশ্য আধার। আমরা বস্তুর দ্বিবিধ গুণ প্রত্যক্ষ করি। এই দুই প্রকারের গুণ হলো মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য গুন হলো বিস্তৃতি, ঘনত্ব ও অভেদ্যতা। গৌণ গুণ হলো রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি। এই গুণসমূহ আধার ছাড়া ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে না। গুণসমূহের আঁধার রূপেই জড়ের অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

জর্জ বার্কলি (Gerorge Berkeley, খ্রিঃ পূঃ ১৬৮৫- খ্রিঃ পূঃ ১৭৫৩) : বার্কলির মতে, জড়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণের আধার রূপে অদৃশ্য। জড়ের অস্তিত্ব অনুমানের কোনো প্রয়োজন নেই। জড় ও বস্তুর গুণ সমার্থক। তাঁর মতে, জড় গুণের সমষ্টি। বার্কলি মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার করেন না। তিনি জড় বলতে মনের ধারণা ছাড়া অন্য কিছুই বুঝেন না।

লিবনিজ (Liebnitz, খ্রিঃ পূঃ ১৬৪৬- খ্রিঃ পূঃ ১৭১৬) : লিবনিজের মতে, চিৎপরমাণুই একমাত্র সত্তা। তিনি গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতো অসংখ্য পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, ডেমোক্রিটাসের পরমাণু অবিভাজ্য হতে পারে না। কারণ যার বিস্তৃতি রয়েছে তা অবিভাজ্য হতে পারে না। লিবনিজের পরমাণু চেতন পদার্থ বা মানসিক বিন্দু। এটি বিস্তৃতিহীন ও অবিভাজ্য। লিবনিজের পরমাণুর নাম চিৎপরমাণু। চিৎপরমাণুসমূহ কমবেশি গতিশীল। কতগুলি চিৎপরমাণু বেশি গতিশীল, কতগুলি চিৎপরমাণু কম গতিশীল। কম গতিশীল চিৎপরমাণুকে স্থিতিশীল বলে মনে হয়। এই স্থিতিশীলতার ধারণা থেকেই জড়ের ধারণার উৎপত্তি। বাস্তবে জড়ের কোনো অস্তিত্ব নেই।

৩। জড়ের স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদ

Scientifc Views of the Nature of Matter

জড় সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ : প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জড়ের প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। গ্রিক দার্শনিক থেলিস থেকে আধুনিক দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল পর্যন্ত অনেকেই জড়ের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পরীক্ষাণাত্মক প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বৈজ্ঞানিকরা জড় সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ পরিত্যাগ করেছেন। আধুনিককালে বহু বিজ্ঞানী জড় সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই সব বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত হতে পারে। যথা– পরমাণুবাদ (The Atomic Theory of Matter) ও সচল জড়বাদ (The Dynamic Theory of Matter)।

৩.১ পরমাণুবাদ (The Atomic Theory of Matter) : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডেল্টন পরমাণুবাদ বিচার করেন। এই মতবাদ গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদের এক নতুন সংস্করণ। বৈজ্ঞানিক ডেল্টনের মতে, কোনো বস্তুকে ক্রমাগত ভাগ করতে করতে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পাই। এই অংশগুলিকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা যায় না। এই ক্ষুদ্রতম কণিকাগুলি অবিভাজ্য ও অবিনাশ্য। এদের নাম পরমাণু। পরমাণু প্রত্যক্ষণের অতীত। এই পরমাণুগুলি নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয়– এদের নিজস্ব কোনো গতি নেই, বাইরে থেকে গতি প্রয়োগ করলে এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। পরমাণুর কোনো নিজস্ব গৌণ গুণ নেই, পরমাণুর অবস্থান ও পারস্পরিক সংগঠন থেকে এর গুণ উৎপন্ন হয়। জগতের বিভিন্ন বস্তু পরমাণুর সংগঠন ও সংযোজনের ফলেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। ডেল্টনের পরমাণুবাদ নিশ্চল জড়বাদ নামেও পরিচিত। ডেল্টনের মতে, জড় ও শক্তি স্বতন্ত্র সত্তা; জড় ও শক্তি অবিনশ্বর। পদার্থ ও শক্তির কোনো বিনাশ নেই–শুধু একরূপ পদার্থ শক্তি অন্যরূপ পদার্থ ও শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। এই মতবাদ পদার্থ ও শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ (Conservation of Matter and Energy) হিসেবে সমাদৃত।

সমালোচনা

Criticism

এই মতবাদ পরিবর্তন ও গতির ব্যাখ্যা করতে পারে না। ডেল্টনের পরমাণুবাদ পরমাণু নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল বলে ব্যাখ্যা করে। ফলে পরিবর্তন ও গতির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই মতবাদ দ্বৈতবাদে পর্যবসিত হয়– যথার্থ ও বহিরাগত গতি এই দুয়ের সমন্বয়ে পদার্থ সচল ও সক্রিয় হয়। এই দুইয়ের সমন্বয় না ঘটলে কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না। পরবর্তী সচল জড়বাদীরা পরমাণুকে শক্তির আধার বলে ঘোষণা করেন এবং বাইরে থেকে গতি ধারণা করে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির মাধ্যমে পদার্থের সচলতা ব্যাখ্যা করেন। পরমাণু ও গতির দ্বৈত-সত্তা সচলতাবাদের ক্ষেত্রে অপসারিত হয়েছে। কাজেই পরমাণুবাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসঙ্গতি সচল জড়বাদে অপসারিত হচ্ছে।

৩.২ সচল জড়বাদ (The Dynamic Theory of Matter) : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আধুনিক পদার্থবিদ্যা জড়ের রহস্য উদ্ঘাটন করে পদার্থবিদ্যায় যুগান্তর আনয়ন করেন। পরমাণুর সচলতা সম্পর্কীয় প্রধান মতবাদগুলি নিম্নে সন্নিবেশিত হলো–

৩.২.১ ভাস্কভিচ (Boscovitch) ও ফ্যারাডের (Farady) মতবাদ : এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতে, পরমাণু বা বস্তুর আদিম উপাদান অভেদ্য ও নিষ্ক্রীয় উপাদান নয়। প্রত্যেকটি পরমাণু এক একটি শক্তি কেন্দ্র, এর আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি আছে। ইথার সমুদ্রের মধ্যে এই পরমাণু বা বস্তুর নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ক্রিয়া করে। এই মতবাদ অপরিবর্তনীয় পরমাণুতে বিশ্বাস করে না বরং এই মতবাদ পরমাণুর স্থিতিস্থাপকতা স্বীকার করে। ফলে এটি বস্তুর গতি ও পারস্পরিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দান করতে পারে।

৩.২.২. লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin) ও হেলমহোলজের (Helmholtz) মতবাদ : লর্ড কেলভিন ও হেলমহোলজের মতবাদ অনুসারে পরমাণুসমূহ ইথার

সমুদ্রের কতগুলি আবর্তন-চক্র মাত্র (Vortex rings, Whirlpools or rotatings portion of the ether) তাঁদের মতে, "ইথার সর্ববিস্তৃত মহাতরঙ্গ (perfect fluid)। এখানে ঘর্ষণজনিত কোনো বিরোধ নেই। বিশ্বের সমস্ত শূন্যস্থান ইথারে পূর্ণ। এই শূন্যস্থানে আবর্তন চক্রের মতো তরঙ্গ দেখা দিলে তা বিনা বাধায় ও বিনা ঘর্ষণে অসীমতার ভিতর দিয়ে তড়িৎ গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে।"[১]

৩.২.৩. অস্টওয়াল্ড (Ostwald) ও তাঁর অনুসারীদের মতবাদ : অস্টওয়াল্ড ও তাঁর অনুসারী বৈজ্ঞানিকদের মতে, প্রত্যেকটি পরমাণু একটি শক্তিগৃহ (Magazine of force)। পরমাণুগুলির শক্তির আধার। পরমাণুগলি সাধারণত সাম্যবস্থায় থাকে, এইগুলি অত্যন্ত জটিল। পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কক্ষপথে কেন্দ্রকে প্রচণ্ডবেগে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণকালে ইলেকট্রন যাতে কক্ষচ্যুত না হয় সেইজন্য পরমাণুর নিউক্লিয়াসের এক সমশক্তি ঐ ইলেকট্রনকে ধরে রাখে। এইভাবে পরমাণুর শক্তির সমতা রক্ষিত হয়। গুরু উপাদানের ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগে নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করছে– এর বেগ আলোর গতির বেগের প্রায় সমান। পরমাণুর সাম্যাবস্থায় পরিবর্তন ঘটলে এই শক্তির প্রচণ্ডতা অনুধাবন করা যায়। এ থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, ফ্যারাডের শক্তি কেন্দ্র কিংবা কেলভিনের আবর্তনচক্রের তুলনায় অস্টওয়াল্ডের পরমাণু মতবাদ অনেক বেশি জটিলতর।

৩.২.৪. রাদারফোর্ড, বোর প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের মতবাদ : রাদারফোর্ড (Rutherford) বোর (Boer) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পরমাণুর এক নতুন চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। তাঁরা গবেষণা করে দেখালেন যে, পরমাণু তড়িৎ শক্তির আঁধার। প্রত্যেকটি পরমাণু বিদ্যুৎশক্তির একটি জটিল সংগঠন। পরমাণু আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানের দ্বারা গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে ধ্বনাত্মক বিদ্যুৎ শক্তি (Positive electricity) আছে। এবং ধনাত্মক বিদ্যুৎ শক্তিকে কেন্দ্র করে ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তি পরিভ্রমণ করছে। এক একটি পরমাণু যেন এক একটি সৌরজগৎ। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহ যেমন পরিভ্রমণ করছে, তেমনি পরমাণুর মধ্যে প্রোটনকে কেন্দ্র করে ইলেক্ট্রন তীব্র গতিতে ছুটছে। পারমাণবিক শক্তির বৈশিষ্ট্য হলো একটি পরমাণুতে সমসংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে। উদ্‌যান পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে, আবার ইউরোনিয়াম পরমাণুর ক্ষেত্রে ৯২টি ইলেকট্রন ও ৯২টি প্রোটন বর্তমান। অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুতে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন বিদ্যমান। পরমাণুকে আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চল মনে হলেও এর মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি লুকায়িত আছে।

৩.২.৫. আপেক্ষিকতত্ত্ব (Theory of Relativity) : আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রথম কথা হলো দর্শক ও দ্রষ্টব্যের ওপর নির্ভরশীল পরিমাপকের বিশ্লেষণ। এ থেকে আপেক্ষিকতত্ত্বের সূত্রপাত ঘটেছে। আপেক্ষিকতত্ত্ব থেকে এক বলবিজ্ঞানের (Mechanics) জন্ম হয়েছে। এই বলবিজ্ঞান স্থান, কাল, ভর ও শক্তির মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হয়েছে। হাইগেন্সের আলোর তরঙ্গবাদ যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, আলো ইথারের মধ্যে দিয়ে গমন করে। সেই ইথার খুব হাল্কা কিন্তু খুবই স্থিতিস্থাপক।

---

[১] P. B. Chattarjee. *Outlines of General Philosophy*-P.103

আসলে খুব হাল্কা জিনিসের স্থিতিস্থাপকতা বেশি নয়। অতঃপর মাইকেলসন ও মরলে দেখালেন যে, কোনো পরীক্ষণের মাধ্যমে ইথারের অস্তিত্ব অনুধাবন করা যায় না। অর্থাৎ ইথারের অস্থিত্ব নেই।

এর পর আসলেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন। তিনি এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করলেন। তাঁর মতে, ইথারের মধ্য দিয়ে কোনো কিছুর গতি অর্থহীন ধারণা। তবে দর্শক ও দ্রষ্টব্যের আপেক্ষিক গতির অর্থ আছে। তিনি আপেক্ষিক তত্ত্বের নিম্নরূপ সূত্র প্রদান করেন।

"যে কোনো প্রেক্ষিতে (Frame of reference) দর্শন ও দ্রষ্টব্যের গতি যদি অপরিবর্তনীয় থাকে তবে পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলির ধরনও সব ক্ষেত্রে একই রূপ হবে।"

"আলোর গতি সব দর্শকের জন্য সমান যে ধরনেরই গতি হোক না কেন।"

কোনো ব্যক্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় একটা গতিশীল ট্যাক্সির যে গতি দর্শন করল, ট্যাক্সির মধ্যে থাকলে সে তা বুঝতে পারত না, সে দেখত যে, ট্যাক্সির কোনো গতি নেই। আবার সে যদি অন্য একটি ট্যাক্সিতে আরোহণ করে ট্যাক্সিটির বিপরীত দিকে যায় তবে দেখবে যে, গতি যেন বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আপেক্ষিক–স্বতন্ত্র নয়।

দর্শকের কাছে গতিমান কোনোর লম্বা বস্তু ক্ষুদ্র দেখাবে, আবার স্থির অবস্থায় ঐ বস্তুই বৃহৎ দেখাবে। সূত্র নিম্নরূপ :

$$LLc\sqrt{1-v^2/c^2}$$

Lc ⟶ গতিমান অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্য
L ⟶ স্থির অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্য
v - বস্তুর বেগ
c -আলোর গতি

তাই রকেট স্থির অবস্থায় (Launching pad) যত বড় দেখায়, গতিমান অবস্থায় তদপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখায়।

সময়ও তেমনি আপেক্ষিক গতিতে এক থাকে না। গতিমান দর্শকের ঘড়ি স্থির দর্শকের ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলে। একে বলা হয় সময়ের বিস্তৃতি। আইনস্টাইনের সূত্র :

$$\frac{t = to}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

t ⟶ স্থির দর্শকের ঘড়ির সময়
to ⟶ গতিমান ঘড়ির সময়
v ⟶ বস্তুটির বেগ
c ⟶ অলোর গতি

আইনস্টাইন দেখিয়েছেন, যে কোনো বস্তুর গতিমান অবস্থায় ভর ঐ বস্তুর স্থির অবস্থার চেয়ে বেশি। তাই একটা সামান্য ইলেকট্রন, প্রোটনের ভর আলোর গতিতে পরিভ্রমণ করলে এর ভর সীমাহীন হয়ে দাঁড়ায়।

সূত্রটি এই :

$$m = \frac{mo}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

mo ⟶ কোন বস্তুর স্থির অবস্থার ভর
m ⟶ কোন বস্তুর গতিমান অবস্থার ভর
v ⟶ বস্তুটির বেগ
c ⟶ আলোর গতি

তাই v = c হইলে $m = \frac{m0}{o}$ হয়।

আর একটি সমীকরণ দেন তিনি, তা হলো ভর ও শক্তির সম্পর্ক। ভরকে যদি সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে সামান্য ভর থেকে ভীষণ পরিমাণু শক্তি পাওয়া যাবে। সমীকরণ এইরূপ :

E = mc2
E ⟶ শক্তি
m ⟶ বস্তুর ভর
c ⟶ আলোর গতি (3×10^8 meter/sec অথবা, 1;86,000 miles/sec)

ইলেকট্রনের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। এই ইলেকট্রনের সমান ভর বিশিষ্ট ধ্বনাত্মক বিদ্যুৎবাহী পদার্থ কণিকা হলো পজিট্রন। প্রোটনের আছে অ্যানটিপ্রোটন। নতুন আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে রাশিয়াতে এই প্রোটন ও অ্যানটিপ্রোটন প্রথমে দুই দিক থেকে প্রায় আলোর গতিতে ঘোরানোর পর মাথামাথি ধাক্কা লাগানো হয়, ফলে উভয়ের ভর ধ্বংস হয়ে সম্পূর্ণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এ থেকে যে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যায় তদ্বারা সমগ্র মস্কো শহরকে কয়েক ঘন্টা আলোকিত করা যায়। কয়লা পুড়ালে ভস্ম থাকে, কিন্তু আণবিক চুল্লিতে কিছুই থাকে না।

৩.২.৬. কোয়ান্টামবাদ (Quantum Theory) : পরমাণু জগৎ ও আলোর জগৎ। পদার্থবিদদের পরমাণুর তত্ত্বের সাধনা বিস্ময়াবহ। আমরা দেখতে পাই যে, পরমাণুতত্ত্বের বা পরম বস্তুর অনুসন্ধানের ফলে আমরা উপাদান, পরমাণু, প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন ও পজিট্রনের সাক্ষাৎ পাই। একে জড়জগতের সব কথা বলে গ্রহণ করলেও বিশ্বজগতের শেষ কথা বলে গ্রহণ করা চলে না। আমাদের সামনে আলো জগৎ রয়েছে; রয়েছে বিকিরণের জগৎ (World of radiation)। বস্তুর জগতে বিচরণ করে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছি সত্য, কিন্তু আলোর জগতে সন্তরণ করছি; বিভিন্ন ধরনের রশ্মির দ্বারা আহত হচ্ছি। বিভিন্ন ধরনের রশ্মির মধ্যে আমাদের অতি পরিচিত হলো আলোক রশ্মি (Light rays)। এ ছাড়া তাপ রশ্মি, দীর্ঘ বেতার রশ্মি (Long

wireless rays), হ্রস্ব রঞ্জন রশ্মি (Short X-rays) ও মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic rays) রয়েছে। এই সব-প রশ্মি বিকীরণক্ষম শক্তি এবং প্রোটন ইলেকট্রনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এই সব রশ্মি গতিশীল এবং প্রতি সেকেন্ডে এরা ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু রশ্মিগুলির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এই রশ্মিগুলি কি? নিউটনের সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আলোর কণিকাতত্ত্ব (The corpuscular theory of light) সর্বজনগৃহীত মতবাদ হিসেবে প্রচলিত ছিল। এই মতবাদ অনুসারে আলোককণিকা বিচরণ করে। সূর্য থেকে আলোককণিকার পৃথিবীতে আসতে আট মিনিট সময় লাগে এবং নিকটতম স্থির নক্ষত্র থেকে চার বৎসর সময় লাগে। উনবিংশ শতাব্দীতে আলোর তরঙ্গান্দোলনতত্ত্ব (The undulatory theory of motion) গৃহীত হয় এবং আলোর কণিকাতত্ত্ব বর্জিত হয়। এই মতবাদ আলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় সমর্থ হয়। এই মতবাদ অনুসারে আলোক এক ধরনের তরঙ্গ গতি (Wave motion)। সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গ প্রবাহ যেভাবে চলে আলোক রশ্মিও তেমনিভাবে চলে। আলোক রশ্মি সম্পর্কে যা সত্য অন্যান্য রশ্মির সম্পর্কেও তা সত্য। এখন কথা হলো যে, আলোক রশ্মি যদি তরঙ্গ হয় তবে তার উঠানামার জন্য একটা মাধ্যমের প্রয়োজন। এই মাধ্যমের নাম হলো ইথার (Ether বা Carrier electromagnetic waves)।

বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার কণিকাতত্ত্বের পুনরাবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আলোক রশ্মি তরঙ্গের মতো প্রবাহিত হলেও কতগুলি বিষয়ে এটি মূল উপাদানের মতো আচরণ করে। কাজেই বলা যায় যে, আলোক রশ্মির মধ্যে কণিকা ও তরঙ্গ উভয়ের প্রকৃতি বিদ্যমান। এতে পরমাণু ও তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে। কোয়ান্টামবাদ অনুসারে আলোক রশ্মি বিচ্ছিন্নভাবে ঝলকে ঝলকে ক্ষুদ্র কণার মতো বিচ্ছুরিত হয়। কণার বাণ্ডিলের মতো আলোকরশ্মি শূন্যে বিচরণ করে। এর নাম ফোটন (Photons) জড় ও বিদ্যুতের মতো আলোক রশ্মিও পারমাণবিক। ফোটন প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীকে সাতবার পরিবেষ্টন করে।[১]

এটিই আলোক রশ্মির শেষ কথা নয়, দেখা গেছে যে, আলোক রশ্মি কণিকার মতো আচরণ করে এবং কণিকাগুলি বা ইলেকট্রন তরঙ্গের মতো আচরণ করে। আর.এ. মিলিক্যান (R.A. Milikan) বলেন, "অন্যভাবে বলা যায় যে, শুধু তরঙ্গের মধ্যে কণিকার সমুদয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এমন নয়, বরং কণিকার বিশ্লেষণেও

---

[১] Hence light has both particle and wave properties. It behaves like a stream of particles, quanta, droplets, fullets, darts of wave packets and has an atomic character as well as a wave character. Light energy travels through space in the form of bundles, these light units are called photons-and this word applies also to other forms of radiant energy. Energy is therefore atomic as are also matter and electricity. A photon encircles the earth seven times in a second. – Patrick *Introduction to Philosophy*, P. 195

তরঙ্গের সমুদয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। কোনো বিজ্ঞান এ অপেক্ষা বিস্ময়কর পরিস্থিতির সম্মুখে ইতিপূর্বে আসে নি।[২]

সমীকরণ : আলোক রশ্মির ঝলকে ক্ষুদ্র কণিকার আকারে বিচ্ছুরিত হয়। এই কণিকার নাম কোয়ান্টা (Quanta)। এই কারণে মার্কস প্লাংক (Marx Plank) প্রবর্তিত মতবাদ কোয়ান্টামবাদ (the Quantum theory) নামে পরিবিদিত। কোয়ান্টামবাদের সমীকরণ নিম্নরূপ :

E ⟶ hv
E ⟶ শক্তি
h ⟶ প্লাংকের ধ্রুবক (Constant)
v ⟶ বেগ

ফলে ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা হলে তাদের পরিমাণ কমে আসে। ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, আপেক্ষিক তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথা আমরা বলেছি। যেমন :

$$E = mc2$$

৩.২.৭. অনিশ্চয়তা নীতি (Principle of Uncertainty) : ইলেকট্রনের আচরণ সম্পর্কে পরীক্ষণাত্মক ফলাফলের প্রেক্ষিতে অনিশ্চয়তা নীতির জন্ম। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে হাইসেনবার্গ (Heisenberg) প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে 'অনিশ্চয়তা নীতি' (Principle of Uncertainty) নামে বিখ্যাত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, পদার্থের আদি প্রকৃতি থেকে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি। এই মতবাদ অনুসারে ইলেকট্রনের গতিবেগ ও অবস্থান একই সময়ে নির্ণয় করা অসম্ভব। আমরা যে উপায়ে একটিকে নির্ণয় করতে প্রয়াসী হই তা অপরটিকে ব্যবহৃত করে। পরিমাণের পরিমাপ তার পরিপূরক, পরিমাণের পরিমাপে অসুবিধা সৃষ্টি করে। অবস্থান ও গতিবেগে যুগপৎ নিরূপণের যথার্থের একটি নির্দিষ্ট সীমানা রয়েছে।[৩]

গোঁড়া বল-বিজ্ঞানী হয়তো বলবেন যে, অনিশ্চয়তা নীতি প্রমাণ করে না সে পরমাণুর পরীক্ষাকে অসার্থক বলার কোনো কারণ নেই। তবে কোনো ব্যক্তি এ প্রমাণ করতে পারেন না। নীতির দিক দিয়ে যাই বলা যাক না কেন বাস্তব পরীক্ষা ক্ষেত্রে পরমাণু অনিশ্চয়তা এনে দেয়।

অনিশ্চয়তা নীতি আসলে বিশেষ দৃষ্টিকোণের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা যদি মনে

---

[২] In other words, not only waves be made to show all the properties of particles but particles may also be made to show all the properties of waves. This is one of the most amazing situation ever encountered by any science. – R.A. Milikan, *Time. Matter and Values*, P. 61-92

[৩] The condition of measurement are such that it is impossible to determine at a given time, both the position and veloity of particle. The very means by which we use to determine the one disturbs the other the meaure of one quantity disturbs the determination of a complementary quantity. There is a difinite limit to the accuracy with which both the position and veloeity can be simultaneously determined. – Patric: *Introduction to Philosophy*, P. 197

করি, জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ ও পরিমাপের বহির্ভূত যে জগতের কার্যকারণতত্ত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-নীতি অপ্রতিহত, সেক্ষেত্রে পরীক্ষণের সীমাবদ্ধতা আসে পরমাণুর গঠন ও প্রকৃতি থেকে। পক্ষান্তরে, যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রত্যক্ষণ ও বৈজ্ঞানিক পরিমাপ প্রণালি প্রকৃতির গঠনের মূল উপাদান অথবা যদি নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদীদের সঙ্গে একমত হই যে,বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণ ও পরিমাপের বহির্ভূত কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা নীতি পরমাণুর অভ্যন্তরীণ জগতে এক ধরনের অনিশ্চয়তাবাদের নির্দেশ করে। স্যার জেমস জিনস (Sir James Jeans) ও আরও অনেকে এই আত্মগত মত সমর্থন করেছেন। প্রয়োগবাদী ছাড়া অন্যান্য সকলের কাছে জড়ের অস্তিত্ব শুধু প্রকল্প ও যান্ত্রিক নীতি– এইগুলি মহাজগৎ কিংবা পরমাণুর জগৎ– কোনো জগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

অনিশ্চয়তা নীতি ও আধুনিক যুগ : এই নিয়মের অপর একটি চমকপ্রদ পরিণতি হলো প্রাকৃতিক নিয়মের পরিসংখ্যানমূলক প্রকৃতির ওপর উত্তরোত্তর গুরুত্বারোপ। আমরা বলতে পারি না, কীভাবে একটি ইলেকট্রন আচরণ করবে, কিন্তু ইলেকট্রনের সমষ্টিগত আচরণ সম্পর্কে একটা গড় হিসাব নির্ধারণ করতে পারি এবং এতে পারমাণবিক জগতের নিয়ম-নীতির কোনো বিপর্যয় বা বিশৃঙ্খলা ঘটে না। অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মও অনেকাংশে পরিসংখ্যানমূলক, সমষ্টিগত আচরণের গড়পড়তা। সমাজবিজ্ঞান অনুসারে আমরা বলতে পারি যে, কোনো মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলি আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলে আমরা বলতে পারি না যে, এই অনিশ্চয়তা নীতি ব্যক্তির প্রতি অনেকটা স্বাধীনতা আরোপ করেছে।

উপসংহার : উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, জড়ের ধারণার অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। নিষ্ক্রিয় নির্জীব জড়ের ধারণা এখন সুদীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। পদার্থবিদ্যা ও গণিতের কৃপায় আমরা শক্তির এক বিস্ময়কর রাজ্যে প্রবেশ করেছি, এই জগৎ বস্তুর নিষ্ক্রিয় জগৎ নয়, শক্তির প্রচণ্ড লীলানিকেতন। পদার্থবিদ্যা ও গণিত এই শক্তির উৎস উদ্ঘাটিত করতে না পারলেও আমরা একথা বুঝতে পারছি যে, বিশ্বজগতের মূলশক্তি জড়াত্মক নয়। যে শক্তি বস্তুর সৃষ্টি ধ্বংসকে নিয়ন্ত্রিত করছে সেই শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তি। বহির্জগতে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা কাজ করছে, পরমাণুর মধ্যে যে সৌরজগতের লীলা চলছে, অনন্ত ইথারের মধ্যে যে শক্তি চাঞ্চল্য প্রবাহিত হচ্ছে– এককথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সুরের আলাপন তার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করতে গেলে এক মহাশক্তির কল্পনা বা অনুমান ছাড়া সম্ভব নয়। এই বিশ্বজগৎ এক মহা আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ, বিশ্বের যাবতীয় পরিবর্তন সেই শক্তির উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। বিজ্ঞান সেই শক্তির বাহ্য লীলা দর্শন করে বিস্মিত হয়েছে।

৪। দেশ ও কাল

Space and Time

আমাদের অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু ব্যাখ্যায় দেশ ও কালের ধারণা অপরিহার্য। দেশ ও কাল, এই দুটি মৌলিক ধারণা ব্যতিরেকে আমরা অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করতে পারি না, আর অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করতে না পারলে জ্ঞানও সম্ভব হতে পারে না। তাই এই দুটি ধারণা জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য। আমরা প্রথমে (ক) দেশ ও কালের স্বরূপ (Nature of

Space and Time), (খ) দেশকালের ধারণা উৎপত্তি (Origin of the Idea of Space and Time) এবং (গ) দেশ ও কালের আপেক্ষিক তত্ত্ব (Relativity of Space and Time) সম্পর্কে আলোচনা করব।

৪.১. দেশ ও কালের স্বরূপ (Nature of Space and Time) : জগতের বিভিন্ন বস্তু কতগুলি সম্পর্কে সম্পর্কিত। সম্পর্কগুলি এই ধরনের : উপরে-নিচে; কাছে-দূরে; ভিতরে-বাইরে; ছোট-বড় ইত্যাদি। এই জাতীয় সম্পর্ককে দৈশিক সম্পর্ক (Spatial Relation) বলা হয়। কানিংহামের মতে, জড়বস্তুর মধ্যে আর একটি সম্পর্ক আছে। তার নাম দেশকালিক সম্পর্ক (Temporal Relation)। যেমন– অগ্রগামিতা, সমকালীনতা, ধারাবাহিকতা ইত্যাদি। কাজেই কাল হলো একাধিক বস্তু বা ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ।

৪.২. দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Space)

১. দেশ সর্বত্র বিস্তৃত : দেশ বলতে আমরা সাধারণত পার্থিব বস্তুর আধার বুঝি। দেশ অসীম ও অনন্ত; দেশ সর্বত্র বিস্তৃত। আমরা যেখানেই যাই না কেন কোনোক্রমেই আমরা দেশের সীমানা অতিক্রম করতে পারি না।

২. দেশ ত্রি-মাত্রা বিশিষ্ট : দেশ তিন দিকে বিস্তৃত– দক্ষিণে-বামে, উপরে-নীচে, সামনে-পিছনে।

৩. দেশ অত্যন্ত বিভাজ্য : দেশ একদিকে একটা সমগ্র; অন্যদিকে দেশ অনন্ত ভাগে বিভক্ত। দেশ অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য না হলে বহু বস্তু দেশে সংরক্ষিত হতে পারত না এবং নানা ধরনের বিশেষ ক্ষেত্র অঙ্কনও সম্ভব হতো না। অবশ্যি দেশ কোনো বিচ্ছিন্ন অংশের সমষ্টি নয়, দেশ অখণ্ড অনন্ত; এক সমগ্রতা। প্রয়োজনের খাতিরে আমরা দেশকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করি।

৪. জাগতিক ধারণার ক্ষেত্রে এক মৌলিক সূত্র : দেশ এমন একটি অবস্থা যা সসীম বস্তুর সহঅবস্থানকে সম্ভব করে তোলে। সসীম বস্তুগুলি একে অন্য থেকে পৃথক। দেশই সসীম বস্তুসমূহের আধার– এ বস্তুসমূহের গতি ও পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে।

৫. দেশ বিন্দুসমূহের সহ-অবস্থান : দেশ বলতে আমরা অনেকগুলি বিন্দুর সহাবস্থানের সম্পর্ক বলে মনে করি। কোনো সরলরেখার বিন্দুগুলির অবস্থানের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই বিন্দুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এই বিন্দুগুলি একই সময়ে অবস্থান করছে। বিন্দুগুলি দূরত্ব, দিক ও অবস্থানের দ্যোতক।

৪.৩. কালের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Time) : বিভিন্ন ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তি হলো কাল। নিয়ত ঘটনা ঘটছে, কোনোটি আগে কোনোটিবা পরে, আবার কখনো দুটি ঘটনা যুগপৎভাবে। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন ও গতি কালের সাহায্যেই উপলব্ধি করা যায়। কালের বৈশিষ্ট্যগুলি এই :

১. কাল অনাদি ও অনন্ত : কালের আদি ও অন্ত নেই। আবার আদি ও অন্ত কালও কালের অসীমতায় লীন। আদির পূর্বেও কাল, আদির পরেও কাল– সর্বত্রকালের সর্বগ্রাসিতা। কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

২. কাল অসংখ্য ভাগে বিভাজ্য : কাল বিভাজ্য বলে মাস, সপ্তাহ, দিন, প্রহর, ঘণ্টা, মিনিট, মুহূর্ত ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা যায়। কালের এই বিভাগ সম্ভব হলেও

কাল এই বিভাগসমূহের সমষ্টি মাত্র নয়। কালের বিভিন্ন বিভাগ কালেরই অন্তর্ভুক্ত। কাল এক অখণ্ড সমগ্রতা।

৩. কাল দেশের মতো ত্রি-মাত্রাবিশিষ্ট নয় : কাল একমাত্রা বিশিষ্ট– কাল এক অনাদি অনন্ত প্রবাহ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনন্ত কাল প্রবাহের তিনটি স্তর মাত্র। কাল প্রবাহে গতি সম্মুখাভিমুখী। কালের এইমাত্রার নানা পারম্পর্য।

৪.৪. প্রত্যক্ষগত দেশ ও ধারণাগত দেশ

Perceptual Time and Conceptual Time

দেশ সম্পর্কে দ্বিবিধ ধারণা রয়েছে : প্রত্যক্ষগত দেশ বা ধারণাগত দেশ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে দৈশিক সুসম্পর্কগুলি প্রত্যক্ষ করি তাকে বলে প্রত্যক্ষগত দেশ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভিতরে বা বাইরে, উপরে বা নিচে, দক্ষিণে বা বামে প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে উপরে, নীচে, নিকটে, দূরে, বাইরে, ভিতরে প্রভৃতি বিভিন্ন দৈশিক সম্পর্কের জ্ঞান আমরা লাভ করি। সে জ্ঞান হলো খণ্ড দেশের জ্ঞান। প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে খণ্ড দেশের জ্ঞান হয় বলে এর নাম প্রত্যক্ষগত দেশ। এ অধিকৃত বা পূর্ণ (Filled) দেশ, শূন্য দেশের বিপরীত।

প্রত্যক্ষগত দেশ থেকে অনুমিত হয় ধারণাগত দেশ। যখন আমরা প্রত্যক্ষগত খণ্ড দৈহিক সম্পর্কসমূহের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে দৈহিক সম্পর্কের সাধারণ ধারণা করি, তখন তাকে ধারণাগত দেশ বলা হয়। বিন্দু, রেখা, সমতল সম্পর্কে যেসব সাধারণ ধারণা জ্যামিতিতে ব্যবহৃত হয়, সেসব দেশ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা। প্রত্যক্ষগত দেশ খণ্ড, ধারণাগত দেশ অখণ্ড। ধারণাগত দেশের ধারণা অমূর্ত প্রত্যক্ষগত দেশের ধারণা মূর্ত।

প্রত্যক্ষগত দেশ ও ধারণাগত দেশের মধ্যে মূলত পার্থক্য নেই। প্রত্যক্ষগত দেশে ধারণাগত দেশেরই খণ্ড প্রকাশ।

৪.৫ প্রত্যক্ষগত কাল ও ধারণাগত কাল

Perceptual Time and Conceptual Time

কালের দ্বিবিধ রূপ : প্রত্যক্ষগত কাল ও ধারণাগত কাল। আমাদের ভিতরে ও বাইরে যেসব পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি সেগুলিকে বলা হয় প্রত্যক্ষগত কাল (Perceptual Time)। আমরা বহির্জগতে নিয়ত অজস্র ঘটনা ঘটতে দেখি, ঋতুর পরিবর্তনের মধ্যে প্রকৃতির নবরূপ দেখতে পাই, প্রকৃতি যেন নানা রং ও রূপের খেলা। আবার যখন আমরা মনের দিকে তাকাই তখন দেখি নানা ভাবনা, চিন্তা, কামনা, অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যে যাওয়া-আসা করছে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে ঘটনার পারম্পর্য জ্ঞান আমার মধ্যে আসে, আর এই পারম্পর্য জ্ঞান হলো প্রত্যক্ষগত কাল। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কালের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি তাই প্রত্যক্ষগত কাল।

প্রত্যক্ষগত কালের ধারণা থেকে আমরা কালের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা গঠন করি। প্রত্যক্ষগত কালের ধারণা থেকে কালের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা গঠন করাকে বলা হয় ধারণাগত কাল (Conceptual Time)। এই কালের ধারণা কোনো খণ্ডকালের ধারণা নয়, এ অখণ্ডকালের ধারণা। কাল প্রবাহের মধ্যে জগতের অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। এই পরিবর্তনের চিন্তা না করেও স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্তন-নিরপেক্ষ অনন্তকালের ধারণা বিষয় ভাবা যেতে পারে। মাস, দিন, প্রহর, ঘন্টা, মিনিট; মুহূর্ত– এসব অনন্ত কাল প্রবাহের খণ্ডাংশ মাত্র। ধারণাগত কাল এক অখণ্ড সমগ্রতা।

প্রত্যক্ষগত কাল ও ধারণাগত কালের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। প্রাত্যহিক জীবনে দৃষ্ট কাল অনাদি অনন্ত কালের খণ্ড প্রকাশ।

৪.৬. দেশ ও কালের বস্তুগত মতবাদ

Objective view of Space and Time

দেশ ও কাল বস্তুগত সত্তা : লিউসিপাস, ডেমোক্রিটাস, নিউটন, গ্যালিলিও, আলেকজান্ডার প্রমুখ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দেশ ও কাল সম্পর্কে বস্তুগত মতবাদ উপস্থাপিত করেন। এই পরমাণু সরল, অবিভাজ্য, অভেদ্য, ক্ষুদ্রতম পদার্থ। লিউসিপাস, ডেমোক্রিটাস প্রমুখ পরমাণুবিদদের মতে, জাগতিক বস্তু বিপুল সংখ্যক সীমায়িত বিচ্ছিন্ন পরমাণুর সংমিশ্রণ বা বিমিশ্রণের পরিণতি। তাঁরা দেশের স্বতন্ত্র বস্তুগত সত্তা স্বীকার করেছেন দেশ অনন্ত আধার, আর এ আধারে গতিশীল জড় পরমাণু অবস্থান করছে যে, পরমাণুর মতো দেশও বস্তুগত সত্তা। গ্রিক পরমাণুবাদীরা কালের স্বরূপ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেন নি।

দেশ ও কাল এবং বস্তুর মধ্যে পার্থক্য : নিউটন ও গ্যালিলিও প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দেশ ও কালকে বস্তুগত সত্তা বলে মনে করেন। জগতের অন্যান্য বস্তুর মতো দেশ এবং কালও স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ অস্তিত্বের অধিকারী, তবে জগতের সাধারণ বস্তু এবং দেশ ও কালের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। জগতের সমুদয় দেশ ও কালের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু দেশ ও কাল কোনো বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দিক দিয়ে দেখলে দেশ ও কাল, বস্তু ও ঘটনার আধার। এই আধারের জন্য বস্তুর গতি ও অবস্থার রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে– এই আধারের মধ্যেই ঘটনার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

দেশের বৈশিষ্ট্য : বস্তুগত দিক থেকে দেশ হলো বস্তুর আধার। বস্তুর অবস্থানের জন্য দেশের প্রয়োজন। দেশের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বর্তমান : (১) দেশ বস্তুর আধার। ছোট-বড় বস্তুর অবস্থানের জন্য দেশের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য (২) দেশের তিনটি মাত্রা রয়েছে : দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ। (৩) দেশ অনন্ত অসীম। দেশের শেষ নেই, দেশ অন্তহীন। (৪) দেশ অসংখ্যভাবে বিভাজ্য। দেশ বিভাজ্য বলে বিভিন্ন বস্তু অবস্থান করতে পারে। (৫) দেশের সরলতম উপাদান হলো বিন্দু। দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকলে তা শেষ পর্যন্ত বিন্দুতে গিয়ে পৌছবে।

কালের বৈশিষ্ট্য : আবার কালও বিষয়গত দিক থেকে ঘটনার আধার। ঘটনা সংঘটনের জন্য কালের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিষয়গত দিক থেকে কালের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। (১) কাল একমাত্রা বিশিষ্ট। কালের গতি সামনের দিকে। গতি ছাড়া কালের অস্তিত্ব অননুমেয়। (২) কাল অনন্ত। এর আদি-অন্ত নেই। (৩) কাল জাগতিক বস্তুর সমস্ত পরিবর্তনের আধার। (৪) কালকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কালের মৌলিক উপাদান পরস্পর বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত। কাজেই কাল বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের সমষ্টি মাত্র।

দেশ ও কাল আত্মগত ও বস্তুগত : দেশ ও কালের বস্তুগত ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের ধোপে টেকে না। গ্রিক দার্শনিক জেনো (Zeno) দেশ ও কালকে যথাক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিন্দু ও মুহূর্তের সমষ্টি বলে গ্রহণ করেছেন, ফলে তিনি গতির ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। আধুনিক বিজ্ঞান দেশ ও কালের অস্তিত্ব জ্ঞাতার ওপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ দেশ ও কাল শুধু বস্তুগতভাবে জ্ঞাত নয়।

৪.৭. দেশ ও কালের আত্মগত মতবাদ

Subjective view of Space and Time

লিবনিজ (Liebenitz) : লিবনিজের মতে, চিৎপরমাণুই একমাত্র সত্তা। চিৎপরমাণুরসমূহ সচেতন– জড় নয়। গতিশীলতা চিৎপরমাণুর ধর্ম। তাঁর মতে, দেশ ও কাল বস্তুগত সত্তা নয়, এরা মানবমনের অভিজ্ঞতাজাত ধারণা। জগতের বস্তুসমূহ দেশ ও কালে অবস্থিত– এ ধারণা ভ্রমাত্মক। বস্তুনিরপেক্ষ, দেশ এবং বিভিন্ন ঘটনার পারম্পর্যের ধারণাকে কাল বলে মনে করেন। কাজেই তাঁর মতে, স্বতন্ত্র দেশ ও স্বতন্ত্র কাল বলে কিছুই নেই। অর্থাৎ দেশ ও কালের কোনো বস্তুগত সত্তা নেই, বাস্তব দেশ ও কাল মনের ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এ থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, লিবনিজের দেশ ও কালের ধারণা আত্মগত।

লক (Loke), **বার্কলি** (Berkeley), **হিউম** (Hume), **মিল** (Mill) প্রভৃতি দার্শনিক মনে করেন যে, দেশ ও কাল সাধারণ ধারণা। অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা বিশেষ বিশেষ দেশ ও বিশেষ বিশেষ কালের প্রত্যক্ষণ করি। এই অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের মাধ্যমে আমরা দেশ ও কালের সাধারণ ধারণা অর্থাৎ ধারণাগত দেশ ও কালের গঠন করি।

কান্ট : দেশ ও কালের ধারণা আত্মগত। কান্টের মতে, দেশ ও কালের ধারণা অভিজ্ঞতাপ্রসূত হলে জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্রে স্বীকৃত সার্বিক ও স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলি পাওয়া যেত না। জ্যামিতি ও গণিতশাস্ত্রে স্বীকৃত সত্য সংশয়াতীত। তিনি বলেন, দেশ ও কাল বস্তুগত সত্তাও নয়, আবার সাধারণ ধারণাও নয়– দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা– দেশ ও কালের ধারণা অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে। দেশ ও কাল অভিজ্ঞতার পূর্বগামী। কান্ট দেশ ও কালের জ্ঞানের আকার হওয়ার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ প্রদান করেছেন :

দেশ ও কালের বৈশিষ্ট্য : প্রথমত, অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা বিশেষ (Particular) ও ব্যক্তিগত, কিন্তু দেশ ও কালের ধারণা সামান্য। সুতরাং দেশ ও কাল অভিজ্ঞতার আকার– অভিজ্ঞতালব্ধ সত্তা নয়।

দ্বিতীয়ত, দেশ ও কালের অস্তিত্ব ছাড়া বস্তু অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়াও দেশ ও কালের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। সুতরাং দেশ ও কাল মানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তি।

তৃতীয়ত, দেশ ও কালের ধারণা ছাড়া অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর সম্পর্কে জ্ঞান সম্ভব নয়। কাজেই দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাপূর্ব।

কান্টের মতে, দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাপূর্ব : মৌলিক ও অপরিহার্য ধারণা বস্তুগত সত্তা নয়। দেশ ও কাল বস্তুর ও ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রত্যক্ষ করার উপায়। বস্তু ও ঘটনাকে দেশ ও কালের পটভূমিতে প্রত্যক্ষ করাই মনের প্রকৃতি। তবে উল্লেখযোগ্য যে, দেশ ও কাল এই অবভাসিক জগৎ সম্পর্কে সত্য– অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে নয়। দার্শনিক কার্ল পিয়ার্সনও কান্টের মত সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, দেশ ও কাল পরিদৃশ্যমান জগতের কোনো বিশেষ বস্তু নয়, বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মাধ্যম মাত্র।

হেগেলের মতে কাণ্ড পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে অনাবশ্যক বিরোধের সৃষ্টি করেছেন। বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তা পরিদৃশ্যমান সত্তার মাধ্যমে প্রকাশিত না

হলে অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায় না। হেগেল কান্টের দ্বৈতবাদের বিরোধ দূরীভূত করেন। তাঁর মতে, দৃশ্যমান জগৎ একই পরমসত্তার দুটি ভিন্ন প্রকাশ। দেশ ও কাল আত্মগত ও বস্তুগত উভয়ই। দেশ ও কাল আত্মগত, দেশ ও কাল আমাদের জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য মৌলিক ধারণা, কেননা দেশ ও কাল ছাড়া আমাদের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা হতে পারে না। দেশ ও কালের ধারণা ছাড়া বস্তুজগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। আবার অন্যদিক দিয়ে দেশ ও কাল পরমসত্তার ও জ্ঞানের আকার। এই জগৎ পরমাত্মা মনেরই বস্তুগত প্রকাশ ও ব্যক্তিচেতনা বিশ্বচেতনারই প্রতিরূপ। সুতরাং দেশ ও কাল একই সঙ্গে বস্তুগত ও আত্মগত সত্তা।

দেশ ও কালের স্বরূপ সম্পর্কে হেগেলের মতবাদই সন্তোষজনক। দেশ ও কালের যে স্বরূপ হেগেল উদ্ঘাটন করেছেন তা একাধারে দেশ ও কালের যথার্থ ব্যাখ্যা এবং অভিজ্ঞতার যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব করে তুলছে।

৪.৮ দেশ ও কালের ধারণার উৎপত্তি

Origin of the Idea of Space and Time

দেশ ও কালের ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে তিনটি প্রধান মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা– (১) লৌকিক ও স্বজ্ঞাবাদী মতবাদ (Popular and Intutionistic View) (২) অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ (Empirical View), (৩) ভাববাদী মতবাদ (Idealistic View) :

৪.৮.১. লৌকিক ও স্বজ্ঞাবাদী মতবাদ (Popular and Intutionistic View)

দেশ ও কাল প্রত্যক্ষণনির্ভর : এই মতবাদ অনুসারে দেশ ও কাল স্বনির্ভর স্বাধীন সত্তা। আমরা সরাসরি দেশ ও কালকে প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মনে দেশ ও কালের যে ধারণা রয়েছে তা আসলে বহির্জগতের বাস্তব দেশ ও কালের মানসরূপ। রিড (Reid), মার্টিন্যু (Martineau) প্রমুখ দার্শনিক এই মতবাদের সমর্থক। এই স্বনির্ভর স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট দেশ ও কাল কোনো ব্যক্তিমনের জানা বা না জানার ওপর নির্ভর করে না।

৪.৮.২. অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ (Empirical View)

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে, দেশ ও কালের ধারণা ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া যায়। বার্কলি, হিউম, মিল ও বেন (Bain) প্রমুখ দার্শনিক এই মতবাদের সমর্থক। স্পর্শগত ও পেশিগত সংবেদনের মাধ্যমেই আমরা দেশ ও কালের ধারণা পেয়ে থাকি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পেশিগত সংবেদন পাওয়া যায়। এ থেকে গতি ও দেশ সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। আমাদের কালের ধারণাও অভিজ্ঞতালব্ধ। পূর্বাপর ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে কালের ধারণা পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষণের বলে বর্তমান, স্মৃতির বলে অতীত এবং প্রত্যাশার বলে ভবিষ্যতের জ্ঞান পাওয়া যায়।

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spenser) : স্পেন্সার ও তাঁর অনুসারীদের মতে, দেশ ও কালের ধারণা মূলত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়। পরে এইসব ধারণা সহজাত ধারণায় পর্যবসিত হয়। দেশ ও কালের ধারণা বর্তমানে আমাদের কাছে সহজাত ধারণা, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে এই সব অভিজ্ঞতালব্ধ বা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ ধারণা ছিল।

জেমস ওয়ার্ড ও তাঁদের অনুসারীদের সমর্থকরা সংবেদনের ব্যাপ্তি থেকে দেশের ধারণার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। সংবেদনের দুটি দিক আছে– তীব্রতা ও

ব্যাপ্তি। কতটুকু জায়গা জুড়ে উদ্দীপনা ঘটছে তার ওপর নির্ভর করে সংবেদনের ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তি দেশের ধারণা দেয়। পরে সংযোজন বিয়োজন ও নির্বাচনের সাহায্য গ্রহণ করা হয় ও দেশ সম্পর্ক সঠিক ধারণা গঠন করা হয়।

লকের মতে, অভিজ্ঞতালব্ধ দেশ ও কালের ধারণা থেকে ধারণাগত দেশ ও কালের ধারণা গঠন করা হয়। বস্তুকে বাদ দিয়ে বস্তুর ব্যাপ্তির কথা চিন্তা করলে আমরা বিশুদ্ধ দেশের ধারণা পেয়ে থাকি।

৪.৮.৩. ভাববাদী মতবাদ (Idealistic View) **:** দেশ ও কাল বুদ্ধিজাত। কান্টের মতে, দেশের ও কালের ধারণা অভিজ্ঞতাপূর্ব দেশ ও কালের ধারণার সাহায্যে অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা হয়– জ্ঞান সম্ভব হয়ে থাকে। গতির সাহায্যে দেশকে ব্যাখ্যা করা যায় না, বরং দেশের সাহায্যে গতি ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। দেশ জ্ঞানের অপরিহার্য আকার। দেশ ছাড়া কোনো কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না। দেশ অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা। এই মতের সমর্থনে তিনি নিম্নবিত যুক্তি প্রদান করেছেন :

প্রথমত, আমাদের দেশের ও কালের ধারণা আছে বলে আমরা বাহ্য বস্তু ও পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করতে পারি।

দ্বিতীয়ত, দেশ ও কাল অসীম অনন্ত বিস্তৃত। যা অসীম ও অনন্ত তা অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়। কাজেই দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাপূর্ব।

তৃতীয়ত, ভাববাদীদের মতে, দেশেও কালের বৈশিষ্ট্য। দেশ ও কালের ধারণা অবশ্য স্বীকার্য ধারণা। আমরা কল্পনা করতে পারি দেশে কোনো বস্তু নেই, কালের কোনো ঘটনা নেই; কিন্তু দেশ ও কাল নেই-এ আমরা কল্পনা করতে পারি না। এ ছাড়া অভিজ্ঞাতা শামাদের অবশ্য স্বীকার্য ধারণা দিতে পারে না। কারণ অভিজ্ঞতা সব সময় বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে সম্ভব হয় ও বিশেষ পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অশ্য স্বীকার্য ধারণা সামান্য।

চতুর্থত, দেশ ও কালের অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা জ্যামিতি ও গণিত থেকে পাওয়া যায়। জ্যামিতি দেশ সম্পর্কে, গণিত কাল সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এই দেশ ও কাল সামান্য। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পাই বিশেষ দেশ ও বিশেষ কাল। কাজেই দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাপূর্ব।

পঞ্চমত, দেশ ও কাল সাধারণ ধারণা নয়, কেননা সাধারণ ধারণার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সাধারণ ধারণা বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে কান্ট বলেন যে, দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা যা অভিজ্ঞতার প্রাপ্ত সংবেদনকে দেশগত ও কালগত বিষয়ে রূপান্তরিত করে। কান্টের দেশ ও কালে অবভাসিক জগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য, অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কে নয়।

সমালোচনা

Criticism

আমরা দেশ ও কালের ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করেছি। স্বজ্ঞাবাদী ও লৌকিক মতবাদ অন্যান্য মতবাদের মধ্যে তেমন প্রাধান্য লাভ করে নি। অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদসমূহ গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা বিশেষকে পাই, সামান্য বা সার্বজননীকে পাই না, বরং অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের পর্যায়ে

উন্নীত করতে দেশ ও কালের ধারণা অপরিহার্য, এই ধারণা আসে মন থেকে। আবার স্পেন্সারের মতও অভিজ্ঞতাবাদের ক্রটির অধীন, কেননা এ অভিজ্ঞতাবাদেরই বিশেষ সংস্করণ। জেমস ওয়ার্ড প্রমুখের মতবাদও গ্রহণীয় নয়, কেননা ব্যক্তির ধারণা থেকে দেশের ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা– এই সব ধারণা অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে। লকের মতবাদও গ্রহণীয় নয় কেননা দেশ কালের সাধারণ ধারণা দেশ ও কালের বিশেষ ধারণা থেকে উদ্ভূত নয়। কান্ট যথার্থই বলেছেন যে, দেশ ও কাল জ্ঞানের পক্ষে মৌলিক ধারণা। দেশ ও কাল অভিজ্ঞতা পূর্বগামী ধারণা। অভিজ্ঞতা বোধগম্য করে তোলার জন্য দেশ ও কালের ধারণা অপরিহার্য। দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা। কিন্তু কান্টের মতে, ক্রটি হলো এই যে তিনি দেশ ও কাল শুধু দৃশ্যমান জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে মনে করেন; অতীন্দ্রিয় জগতের ক্ষেত্রে এই ধারণা অচল। কান্টের পরবর্তী দার্শনিক হেগেল কান্টের মতবাদের ক্রটি নিরসন করেন। তাঁর মতে, দেশ ও কাল শুধু আত্মগত নয়, বস্তুগতও বটে। মানুষের মনে যেমন দেশ ও কালের ধারণা রয়েছে, বাস্তব জগতেও তেমনি দেশ ও কালের অস্তিত্ব বর্তমান। কাজেই দেশ ও কাল আত্মগত ও বস্তুগত দুই-ই।

৪.৯. দেশ, কাল ও আপেক্ষিক তত্ত্ব

Space Time and Relativity

হ্যারম্যান মিনকস্কির মত নিউটনীয় মতবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। নিউটন ও গ্যালিলিওর সময় থেকে দেশ ও কালের বস্তুগত ধারণা প্রথা হিসেবে চলে আসছে। নিউটন দেশ ও কালকে নিত্য দ্রব্যরূপে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, দেশ ত্রি-মাত্রা বিশিষ্ট একটি বস্তুগত সত্তা, এর তিনটি মাত্রা। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ। কাল একমাত্রা বিশিষ্ট বস্তুগত সত্তা– এ হলো ঘটনার পারম্পর্য। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়, পুরাতন মতবাদ পরিবর্তিত হতে থাকে। দেশ ও কালের স্বতন্ত্র সত্তার বিরুদ্ধে হ্যারম্যান মিনকস্কি (Harman Minkowski) নতুন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, দেশ ও কাল স্বতন্ত্র সত্তা হলেও তারা পরস্পর নির্ভরশীল; দেশ ও কালকে নিরপেক্ষ সত্তা হিসেবে গ্রহণ করলে দেশ ও কাল ছায়ার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। একমাত্র উভয়ের মিলন এক চিরন্তন বাস্তব তত্ত্বের সত্তা অক্ষত রাখবে।[১]

দেশ-কাল চার মাত্রা বিশিষ্ট। তিনি দেখালেন, কাল দেশের চতুর্থ মাত্রা বিশেষ। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা দেশের এই তিন মাত্রা। পারম্পর্য দেশের চতুর্থ মাত্রা। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দেশ-কালের আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রচারে হ্যারম্যান মিনকস্কির নাম সর্বাত্র গণ্য। তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনেরও পূর্বসূরি। তবে আইনস্টাইনের দেশ-কালের আপেক্ষিক তত্ত্ব মিনকস্কির মতবাদের চেয়ে উন্নতর ও ভিন্নতার– আইনস্টাইনের মতবাদ পূর্ণাঙ্গ ও অতুলনীয়।

আইনস্টাইনের মতে, দেশ-কাল চার মাত্রা বিশিষ্ট। আইনস্টাইনের (Einstein) মতে, দেশ ও কাল চার মাত্রা বিশিষ্ট। এই চার মাত্রা বিশিষ্ট দেশ ও কালের কথা

---

[১] Hence forward space and Time as independent things must sink to mere shadows and the only things which can preserve some sort of subsistence is a kind of union of the two. – Harman Minkowski.

শুনলে অ-গাণিতিকদের দেহে শিহরণ সঞ্চারিত হবে।[২] বিজ্ঞানী নিউটন দেশের তিনটি মাত্রা ও কালের একটি মাত্রা নির্দেশ করেন। কিন্তু আইনস্টাইনের মত, দেশ-কাল চার মাত্রা বিশিষ্ট সত্তা। দেশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ ছাড়াও দেশ-কালের অপর একটি মাত্রা আছে, তা হলো কাল। তাঁর মতে, দেশ ও কাল একটি চরমতত্ত্ব। দেশ ও কাল পরস্পর পৃথক সত্তা নয়। দেশ ছাড়া কাল, কাল ছাড়া দেশের অস্তিত্ব অনুধাবনযোগ্য নয়।

আপেক্ষিকতাবাদ : দেশ ও কাল দুটি ভিন্ন সত্তা নয়, বরং একই সত্তার দুই দিক। কালবিহীন দেশ ও দেশবিহীন কাল টিকতে পারে না। কাজেই দেশ ও কাল দুটি স্বতন্ত্র সত্তা নয়, পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সত্তা। এই মতবাদ আইস্টাইনের দেশ কাল আপেক্ষিকতাবাদ (Space-Time Relativity) নামে পরিবিদিত। আবার, আইনস্টাইনের মতে, দেশ-কালের অর্থ বিশ্বজগতের সর্বত্র এক নয়। দেশ ও কাল দ্রষ্টার গতির ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সূর্যে যদি কোনো মানুষের অবস্থান সম্ভব হয়, তার দেশ-কাল পৃথিবীতে মানুষের দেশ-কাল অপেক্ষা স্বতন্ত্র হবে। সূর্যের গতি ও গতির মধ্যে যে পার্থক্য, এই পার্থক্যই এই বিভিন্নতার কারণ। আইনস্টাইন বলেন যে, দ্রষ্টার গতি ও পরিমাপক প্রণালির উপর দেশ-কাল সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। গতিশীল বস্তুর সঙ্গেই শুধু দেশ-কালের সম্পর্ক নয়, বস্তুর পরিবর্তনের ফলেও দেশ-কালের সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেশ-কাল কতগুলি যুগ্ম সম্পর্ক ছাড়া কিছুই নয়। যেমন– সম্মুখ-পশ্চাৎ, দক্ষিণ-বাম, উপর-নিচ এবং পূর্বাপর। গতিশীল বস্তুর সঙ্গে দ্রষ্টার অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে এই সম্বন্ধগুলিও পরিবর্তিত হয়।

আপেক্ষিকত্ব দর্শনের অত্যন্ত কাছাকাছি : আইনস্টাইনের এই মতবাদ তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদ দেশ ও কালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং তাদের আপেক্ষিকতা প্রমাণ করে। এই মতবাদ বিজ্ঞানকে দর্শনের অত্যন্ত নিকটবর্তী করে। দেশ-কাল সসীমের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার জন্য জগতের বিভিন্ন বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। প্রত্যক্ষকারী ও তার পরিমাপক প্রণালির ওপর নির্ভরশীল, কাজেই দেশ-কাল অনেকটা আত্মগত।

আলেকজান্ডারের মতে, দেশ-কাল পরমসত্তা : দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজান্ডার দেশ-কাল সম্পর্কে এক অভিনব ও মৌলিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে, দেশ ও কাল অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি দেশ ও কালকে পরমসত্তার দুটি দিক বলে মনে করেন। দেশ-কালই (Space-Time) এই পরমসত্তা। দেশ-কাল চার মাত্রা বিশিষ্ট বস্তুগত সত্তা। এই চারটি মাত্রা হলো : সম্মুখ-পশ্চাৎ, দক্ষিণ-বাম, উচ্চ-নিচ এবং পূর্বাপর-দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ও কাল। অর্থাৎ দেশ-কাল অবিচ্ছেদ্য, একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না। আবার, দেশ-কাল আদিম সত্তা, জগতের সরলতম

---

[২] The non-mathemitician is seized by a serious shuddering when he hears of four dimensional things, by a feeling not unlike that awakened by thoughts of the occult. And yet there is no more common place statement than that the world in which we live is a four dmensional space time countinuum. – Einstein's. Relativity, P. 65

উপাদান। দেশ-কাল থেকে সবকিছুই উদ্ভূত; দেশ-কাল থেকেই ক্রমশ জড়বস্তু, জীবন চৈতন্য ইত্যাদির উদ্ভব ঘটেছে।

কাল সব গুণের উৎপাদক : আলেকজান্ডার বলেন যে, কাল সমুদয় গুণাবলির উৎপাদক। দেশ-কাল সসীমের অস্তিত্ব মধ্যে বিভক্ত হওয়ার জন্য জগতের বিভিন্ন বস্তু লাভ করে। বিশেষ অর্থে কালকেই সসীমের জনক বলা যায়। কেননা পরিবর্তনকালে সূচিত হয়, কাল গতিতে বিভক্ত হয় এবং গতি দেশের কাল সূচিত হয়, কাল গতিতে বিভক্ত হয় এবং গতি দেশের মধ্যে শৃঙ্খলিত হয়। কালই নতুনের দেশ-কাল সূচনা করে। কেননা এই মতবাদ অনুসারে দেশ-কাল সঙ্গতিই বিশ্বের চরম বাহ্য বাস্তবতত্ত্ব। আলেকজান্ডার ও আইনস্টাইনের মতবাদদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আইনস্টাইন-আলেকজান্ডারের মতবাদের মধ্যে তুলনা : আইনস্টাইনের মতে, দেশ-কাল পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপক প্রণালির ওপর নির্ভরশীল, কাজেই দেশ-কাল আত্মনির্ভর সত্তা; কিন্তু আলেকজান্ডারের মতে, দেশ-কাল বিশ্বজগতের মূল উপাদান, কাজেই দেশ-কাল বস্তুগত। অন্য পার্থক্য এই যে, আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মাধ্যমে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক, আর আলেকজান্ডার একজন দার্শনিক। তিনি শুধু চিন্তা ও যুক্তির সাহায্যে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ছাড়া আইনস্টাইন দেশ-কালের সাহায্যে বস্তুজগতের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন; কিন্তু আলেকজান্ডারের তেমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। তাঁরা দার্শনিক মতবাদ প্রসঙ্গেই দেশ-কালের কথা পাড়িয়াছেন। আলেকজান্ডার দেশ-কালকেই পরমসত্তা বলে মনে করেন, কিন্তু বার্গসঁ কালকেই পরমসত্তা বলে অভিহিত করেন।

বার্গসঁর মতে, কালই পরমসত্তা : বার্গসঁর মতে, পরমসত্তা হলো অনাদি, অনন্তকাল প্রবাহ। এই কাল প্রবাহ (Time/Duration/Elan vital) থেকে বিশ্বের সমুদয় সত্তা উদ্ভূত হয়েছে। এ জগতে যা কিছু অপরিবর্তিত, স্থবির, তার কোনো সত্যতা নেই, পরিবর্তনই সত্য, পরিবর্তন সত্তা। তিনি বলেন যে, স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আমরা পরমসত্তাকে জানতে পারি।

দেশ-কাল প্রবাহের খণ্ড বা বিকৃতরূপ : যখন আমরা বুদ্ধির মাধ্যমে কাল প্রবাহকে জানতে চেষ্ট করি তখন তা খণ্ড খণ্ড করে ফেলি। এই অর্থে কাল প্রবাহের খণ্ড বা বিকৃত রূপই হলো দেশ। দেশ আসলে কোনো সত্তা নয়। তিনি পার্থিব কাল ও প্রকৃতকালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। প্রকৃত কাল বলতে বার্গসঁ কাল প্রবাহকে বুঝিয়েছেন। পার্থিব কাল তাঁর মতে, জড় বিজ্ঞানসমূহের অমূর্ত মুহূর্ত।

বার্গসঁর স্থিতির ব্যাখ্যা নেই : বার্গসঁর মতবাদ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সুকঠিন। দেশ বা স্থিতি ছাড়া কাল কীভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে, সে কথার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। অপরিবর্তিত ছাড়া পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা চলে না। তিনি পরিবর্তনকে এত ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছেন যে, সত্তা বা স্থিতির কথা একরূপ বিস্মৃত হয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাণের স্বরূপ
Nature of Life

"The present state of knowledge furnishes us with no link between the living and non-living." – **Huxley, Encyclopaedia Britannica**

- ❑ ভূমিকা
- ❑ প্রাণি বা জীবের প্রকৃতি
- ❑ যন্ত্রের প্রকৃতি
- ❑ যন্ত্র ও জীবনের মধ্যে তুলনা
- ❑ প্রাণের প্রকৃতি
- ❑ প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ

ভূমিকা
Introduction

প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাণ শব্দটির একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রাণ শব্দটি জীবনী শক্তির সমার্থক বলে মনে হয়। আমাদের ভাষায়, প্রাণ, মন, আত্মা শব্দ তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রাণ শব্দটি দৈহিক শক্তি বলে বিবেচিত হয়। অন্ততপক্ষে দেহ সংক্রান্ত ব্যাপারে শব্দটির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অন্নময় কোষ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার আছে। প্রচলিত 'প্রাণ' শব্দটির কোনো দার্শনিক তাৎপর্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা দেখি না। দার্শনিক কোনো বিষয়ে পরিস্ফুট করার জন্য দর্শনে শব্দটির বিশেষ তাৎপর্যবাহী কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। মন শব্দটি প্রাণের চেয়ে উচ্চতর শব্দ– এর সঙ্গে দর্শনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। মনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চৈতন্য শব্দটির ব্যবহার প্রায়ই নজরে পড়ে। ইংরেজি ভাষায় 'মন' শব্দের সঙ্গে আত্মা শব্দের একটা যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হলো ধর্ম দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় দর্শনে তার প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শন পার হলে আত্মা শব্দটির পরিবর্তে মন শব্দটির প্রয়োগই বহুল ব্যবহৃত হয় বা হতে দেখা যায়। এই 'মন' শব্দটি ব্যবহারবাদী চিন্তাবিদদের হাতে দৈহিক আচরণে পর্যবসিত হতে দেখি। অত্যাশ্চর্য একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলো মনের জড়ীয়করণ প্রবণতা (tendency towards materialisation of mind) আর জড়ের আধ্যাত্মিককরণ প্রবণতা (tendency towards spiritualisation of matter)। মনোবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান এভাবেই আধুনিক যুগে ধাবিত হয়েছে ও হচ্ছে। কাজেই দর্শনে প্রাণ, মন ও আত্মা– উচ্চ থেকে উচ্চতর সত্তা হিসেবে স্তরবিন্যাসের প্রয়োজন নেই। আধুনিক জ্ঞানে এইভাবে বিন্যাস করারও কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না।

আনুধ্যানমূলক অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে না গিয়ে প্রাণ শব্দটিকে জীবনীশক্তির সমার্থক শব্দ বলে মেনে নিলে অন্ততপক্ষে শব্দটির আধুনিক যুগে বোধগম্য একটি অর্থ জুড়ে দেওয়া হয়। তাতে দুই কুলই রক্ষা পায়। একদিকে প্রাচীন শব্দের আধুনিক প্রয়োগ সহজতর হয়। অন্যদিকে অহেতুক বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জীব বা প্রাণির যেসব বৈশিষ্ট্য– আত্মসংগঠক, আত্মসংস্কারক, আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম ও আত্মপুনরুৎপাদক শক্তি। এইসব কাজ বা বৈশিষ্ট্যসমূহকে একশব্দে 'প্রাণ' অথবা 'জীবনীশক্তি' বলে স্বীকার করে নিলে দার্শনিক বিতর্কের ঝঞ্ঝাট এড়ানো সহজ হয়। আর জীব বা প্রাণি নয় এমন সত্তার সঙ্গে তার পার্থক্য নিরূপণ সহজ হয়।

১। প্রাণি বা জীবের প্রকৃতি

Nature of Organism

জীব নিজস্ব উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত : প্রাণি বা জীব কতগুলি পরস্পর নির্ভর অঙ্গের সমষ্টি। যে সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমবায়ে জীবদেহ গঠিত সেগুলি কৃত্রিম উপায়ে গঠিত অংশসমূহের সমষ্টি নয় বরং এই সমস্ত অংশ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ও নয়। প্রাণি বা জীবের দেহ একটি কেন্দ্রীয় নীতি ও নিয়ামক শক্তির দ্বারা সুনিয়ন্ত্রতি, বিকশিত ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত। জীব বা প্রাণির উদ্দেশ্য আন্তর, বহিরাগত নয়। হকিং বলেছেন, "প্রাণশক্তিসম্পন্ন জিনিসের সর্বাপেক্ষা প্রদর্শক লক্ষণসমূহ 'আমি' কথাটির সাহায্যে সবচেয়ে সুন্দরভাবে বিবৃত হতে পারে। এই সব জিনিস আত্মসংগঠক, আত্মসংস্কারক, আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম, আত্মপুনরুৎপাদক।"[১]

জীবন যন্ত্র থেকে আলাদা। যন্ত্র কতগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র অংশের সমষ্টি এই অংশসমূহ কৃত্রিম উপায়ে সংযুক্ত যা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাইরে থেকে সংযোজিত ও গ্রথিত। মোটর গাড়ির বিভিন্ন অংশ মিলিত হলে তা চলতে পারে। মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের কোনো নিজস্ব উদ্দেশ্য নেই বরং চালকের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইঞ্জিনের ব্যবহার। চালক ছাড়া মোটর গাড়ি চলতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোনো যন্ত্রের আত্মনিয়ন্ত্রণ কিংবা আত্মপরীক্ষার শক্তি নেই।

জীব প্রা প্রাণির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান

প্রথমত, জীব বা প্রাণির দেহের অংশসমূহ বাইরে থেকে সংযোজিত নয়, এইগুলি একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরস্পর সুবিন্যস্ত। জীব বা প্রাণির দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশের একটি সমগ্র। জীব বা প্রাণির ক্ষেত্রে অংশ সমগ্রের পূর্বগামী নয়, সমগ্রই অংশের পূর্বগামী ও নিয়ামক। জীব বা প্রাণির ক্ষেত্রে অংশের সমবায়ে যে সমগ্রের উপলব্ধি হয় সেই সমগ্র অংশের নিছক সমষ্টি নয়, সমগ্রের মধ্যে

---

[১] The most striking characteristics of living things can best be told by aid of the world 'self : they are self-building, self-repairing, self-regulating, self-reproducing. – Hocking, *Types of Philosophy*, P. 52

যে ঐক্য বর্তমান তা অংশের মধ্যে আংশিকভাবে বর্তমান নয়।"[১] একটি ইটের পাঁজা থেকে কয়েকখানা ইট সরালেও পাঁজা থেকে যায়, কিন্তু জীবদেহ থেকে হৃৎপিণ্ডটি বিচ্ছিন্ন করলে জীবের বিনাশ ঘটে।

দ্বিতীয়ত, জীব বা প্রাণি বাইরের কোনো কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, জীব বা প্রাণি আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম ও আত্মবিকাশোপযোগী। জীবের প্রাণ সেই নিয়ামক শক্তি, প্রাণই জীবের সকল বিকাশের মূল, সকল প্রয়াসের উৎস। জীব কোনো বস্তুর মতো তৈরি নয়, জীব জন্মগ্রহণ করে, বর্ধিত হয়, পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে। জীব বিভিন্ন অংশের যান্ত্রিক ও কৃত্রিম সমাবেশ নয়, এখানে সমগ্র অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে, অংশ সমগ্রকে নয়। জীবনের ক্ষেত্রে অংশ ও সমগ্র পরস্পর নির্ভরশীল– অংশ যেমন সমগ্রের জন্য অপরিহার্য, সমগ্রও তেমনি অংশের জন্য অপরিহার্য। জীব তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই বাস্তবায়িত করার প্রয়াস পায়। জীবের সংগঠনে শুধু নিয়মতান্ত্রিকতা নয়, আত্মবিকশিত নিয়মতান্ত্রিকতা পরিদৃষ্ট হয়।"[২]

তৃতীয়ত, জীব নিজের উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত। জীব বা প্রাণি নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন কতিপয় শক্তির সদ্ব্যবহার করে থাকে যা যন্ত্রের নেই। জীব বা প্রাণি প্রয়োজনানুসারে বহির্জগৎ থেকে উপাদান নির্বাচন করে নিজের অভাব পূরণ করে এবং নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য বিরোধী শক্তির সাথে মোকাবেলা করে। জীবের আত্মসংশোধনের শক্তি আছে। একটি গাছের ডাল কেটে ফেললে সেখান থেকে এক ধরনের আঠা নির্গত হয় ও গাছটি ধীরে ধীরে নিজেকে সংশোধন করে নেয়। যন্ত্রের এই ধরনের কোনো শক্তি নেই। যন্ত্রের কোনো অংশ বিকল হলে কিংবা কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়লে যন্ত্র তার কোনো সংশোধন করতে পারে না। জীব প্রজনন ক্রিয়ার সাহায্যে বংশ বৃদ্ধি করে, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে, পরিবেশের বিরোধী পরিবেশ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার প্রয়াস পায়। সুতরাং জীব নিজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ থেকে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের ব্যবহার করে।

২। যন্ত্রের প্রকৃতি
Nature of Machine

যন্ত্র কতগুলি জড়ীয় অংশের সমষ্টি : কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতগুলি জড়ীয় অংশ মিলিত হয়ে যে একটি সমষ্টি গঠিত হয় তাকে যন্ত্র বলা হয়। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এমনভাবে সংযোজিত হয় যাতে সব মিলে একটি যুগ্ম ফল উৎপন্ন করতে পারে। যন্ত্র একদিক দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে গঠিত জড়বস্তু। যন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বর্তমান :

প্রথমত, যন্ত্র কতগুলি জড়ীয় অংশের কৃত্রিম সমষ্টি এবং এই অংশগুলির সম্পর্ক

---

[১] The totality here is something more than the sum of its parts, these are infused into the parts in visible elements of order. Proportion, diversity of form, distribution of function according to general idea of end. – John Caird.

[২] In organic structures we find not only the ideas of system but also the idea of system which is self developed, in other words, not only of a unity of diversified parts or elements correlated by one principle, but of a unity which is due to the self-activity of that principle. – John Caird.

বাহ্য : যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে তৈরি এবং এইসব অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংযোজিত, গ্রথিত। অংশসমূহ সংযোজিত হলে যেমন যন্ত্র গঠিত হয়, অংশসমূহ বিচ্ছিন্ন হলে তেমনি যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বি-চক্রযান একটি যন্ত্র। দুই চাকা, হ্যান্ডেল, একজোড়া পাদানি, একটি সিট (আসন) টায়ার, টিউব প্রভৃতি অনেকগুলি পৃথক অংশ সংযোজিত হলে দ্বি-চক্রযান গঠিত হয়। এসব অংশগুলি পৃথক হলে যন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক তা বাহ্য (External)।

দ্বিতীয়ত, যন্ত্র বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত কৃত্রিম সংগঠন। কাজেই যন্ত্রের আত্মসংরক্ষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মোন্নতি ও প্রজনন শক্তি নেই। এর অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি নীতি নেই। একটি সামগ্রিক নীতি যন্ত্রের বিভিন্ন অংশকে প্রাণবন্ত করে না, যন্ত্রের ক্ষেত্রে পূর্বেই বিভিন্ন অংশ তৈরি করা হয়, পরে অংশগুলি একত্রে যুক্ত করে যন্ত্রে পরিণত করা হয়।

তৃতীয়ত, যন্ত্র বাহ্য শক্তিনির্ভর। যন্ত্রের প্রকৃতি বিচার করলে দেখা যায় যে, যন্ত্রের নিজস্ব কোনো শক্তি নেই। বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করলেই যন্ত্র চালিত হয়। কাজেই যন্ত্র অভ্যন্তরীণ শক্তি বলে চালিত হয় না, বাইরের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

চতুর্থত, যন্ত্রের নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য নেই। যন্ত্রীর উদ্দেশ্যেই যন্ত্র চালিত হয়। যন্ত্র আসলে যন্ত্রীর হাতের পুতুল মাত্র। যন্ত্র পরিচালক যন্ত্রকে যেভাবে চালাবে যন্ত্র সেইভাবে চলবে। যন্ত্র পরনির্ভর, পরনিয়ন্ত্রিত, যন্ত্র যন্ত্রীর উদ্দেশ্য চরিতার্থের উপায়।

৩। যন্ত্র ও জীবের মধ্যে তুলনা
Comparison Between Machine and an Organism

যন্ত্র ও জীবের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, আবার কয়েকটি বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও আছে। যন্ত্র ও জীবের মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্য রয়েছে :

প্রথমত, যন্ত্র ও জীবদেহ উভয়ই কতগুলি অঙ্গের সমষ্টি। যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন একটি বিশেষ সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ, জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গও তেমনি একটি বিশেষ সূত্রে আবদ্ধ। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গসমূহও এক ধরনের উদ্দেশ্য পালনের জন্য সন্নিবিষ্ট হয়।

দ্বিতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো ধরনের উদ্দেশ্য বর্তমান। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মতোই এক ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। কোনো বিশেষ যন্ত্র বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নির্মিত হয়। সেই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ নিয়মে সন্নিবিষ্ট হয়। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গসমূহও এক ধরনের উদ্দেশ্য পালনের জন্য সন্নিবিষ্ট হয়।

যন্ত্র ও জীবদেহের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈসাদৃশ্য বর্তমান :

প্রথমত, যন্ত্র মানুষের সৃষ্টি, জীব প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার পরিণতি। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে যন্ত্র আবিষ্কার করে, কিন্তু সে বুদ্ধি বিচক্ষণতা ও নৈপুণ্যের সাহায্যে জীব সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং জীব প্রকৃতির নিয়মে জন্মলাভ করে. বর্ধিত হয় ও মৃত্যুবরণ করে, কিন্তু যন্ত্র কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি।

দ্বিতীয়ত, কোনো যন্ত্রের অস্তিত্ব তার অংশসমূহের ওপর নির্ভরশীল। যন্ত্রের কোনো অংশ নষ্ট হলে যন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়ে, কিন্তু যন্ত্রটির অন্যান্য অংশ নিখুঁত থাকতে

পারে। কারণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ পৃথকভাবে তৈরি। কিন্তু জীবদেহের ও তার বিভিন্ন অঙ্গ পরস্পর নির্ভরশীল, অন্যদিকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দেহের সমগ্রতার ওপর নির্ভরশীল। দেহ থেকে কোনো অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হলে তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কিন্তু কোনো যন্ত্র থেকে তার কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন হলেও তা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয় না।

তৃতীয়ত, যন্ত্র বিভিন্ন অংশের কৃত্রিম সমাবেশ, জীবদেহ বিভিন্ন অঙ্গের ঐক্য। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ যথাস্থানে লাগালে যন্ত্রটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যোপযোগী হয়, কিন্তু জীবদেহের কোনো বিচ্ছিন্ন অংশ সেই দেহ কিংবা অন্য দেহের সাথে যুক্ত হলে তা কোনো কাজে আসে না। সমগ্রতার মধ্য দিয়েই জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ সার্থকতা লাভ করে।

চতুর্থত, দেহী দেহে, যন্ত্রী যন্ত্রের বাইরে অবস্থিত। যন্ত্র পরিচালনার জন্য যন্ত্রীর প্রয়োজন। কিন্তু যন্ত্রচালক যন্ত্রের কোনো অংশ নয়। দেহী দেহ পরিচালনা করলেও দেহ থেকে পৃথক নয়, দেহের বাইরে অবস্থিত কোনো সত্তা নয়। যন্ত্র পরিচালনার জন্য বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন, কিন্তু দেহের পরিচালনার জন্য দেহের বাইরে অবস্থিত শক্তির প্রয়োজন নেই।

পঞ্চমত, যন্ত্র উদ্দেশ্যহীন, জীব উদ্দেশ্য প্রণোদিত। যন্ত্রের নিজস্ব কোনো লক্ষ্য নেই, লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতাও নেই। যন্ত্র অন্যের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। জীবের নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মাধ্যমে জীব তার উদ্দেশ্য সাধন করে।

ষষ্ঠত, যন্ত্র পরিবারের সাথে মোকাবেলা করতে পারে না, জীব পারে। যন্ত্রের আত্মসংরক্ষণ ও আত্মবিকাশের ক্ষমতা নেই। কিন্তু জীবনের আত্মসংরক্ষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিকাশের শক্তি আছে। জীব বাইরের পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধান করে, দেহের আন্তর শক্তির বলে ক্রমশ বিকাশের পথে অগ্রসর থেকে থাকে। জীবেরপ্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তির জন্যই জীবের বিকাশ সাধিত হয়, কিন্তু যন্ত্রের জীবনী শক্তি নেই। কাজেই যন্ত্রের মধ্যে জীবের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য নেই।

সপ্তমত, জীবের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে, কিন্তু যন্ত্রের জন্ম, বৃদ্ধি বা মৃত্যু নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, জীবের মধ্যে এমন শক্তি আছে যা জন্ম, বৃদ্ধি, প্রজনন ও পরিণতির মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে, কিন্তু যন্ত্রের মধ্যে এই ধরনের কোনো শক্তি না থাকায় এর মধ্যে জীবের প্রকৃতিগত কোনো বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

অষ্টমত, যন্ত্রের ভাবী আচরণ আন্দাজ করা যায়, জীবের যায় না। যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কারণ যন্ত্রের কোনো স্বাধীনতা ও ইচ্ছা নেই, কিন্তু জীবের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। কেননা জীব স্ব-নিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন।

৪। প্রাণের প্রকৃতি

Nature of Life

প্রাণ এক ধরনের শক্তি যার বলে জীব আত্মবিকাশ ও বংশ বৃদ্ধি করে : যন্ত্র ও জীবের পার্থক্য আমাদেরকে প্রাণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। যে শক্তির বলে জীবদেহ যন্ত্র থেকে পৃথক, যে শক্তি জীবকে আত্মসংরক্ষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংস্কার, আত্মবিকাশ ও আত্মপুনরুৎপাদনে সাহায্য করে সেই শক্তির নামই প্রাণ। কাজেই

প্রাণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রাণ হলো সেই শক্তি বা ক্ষমতা যা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ ঘটে তাদের মধ্যে এক স্থিতাবস্থা ও ঐক্য বজায় রাখে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে লয় এবং প্রাণির মধ্যে দিয়ে নিজেকে বহু বিভক্ত করে দেয়।[১]

প্রাণের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে তিনটি প্রধান মতবাদ দৃষ্ট হয়। যথা– (ক) যন্ত্রবাদ (Mechanism), (খ) প্রাণবাদ (Vitalism) ও (গ) ভাববাদ (Idealism)।

(ক) যন্ত্রবাদ (Mechanism) : যন্ত্রবাদীদের মতে, জীবদেহ ভৌত রাসায়নিক যন্ত্র বিশেষ। যন্ত্র যেমন বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত, জীবদেহ তেমনি কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। জীব ও যন্ত্রের মধ্যে কোনো মৌলিক বা গুণগত পার্থক্য নেই; পার্থক্য এই যে জীব যন্ত্রের চেয়ে জটিলতর। ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জীবকোষের সৃষ্টি হয়। এই জীবকোষ বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, আবার বহু জীবকোষ একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্র হলে জীবদেহের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং জীবদেহ ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল।

যন্ত্রবাদীরা জীবের ব্যাখ্যায় কোনো প্রাণশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। জড়শক্তি ও প্রাণশক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই– প্রাণশক্তি জড়শক্তিরই এক বিশেষ রূপ।

যন্ত্রবাদী দার্শনিকরা তাঁদের মতবাদের সপক্ষে নিম্নলিখিত **যুক্তিসমূহের** অবতারণা করেছেন :

প্রথমত, যন্ত্রবাদীরা দাবি করেন যে, একমাত্র যন্ত্রবাদই জীবনের সহজ, স্বাভাবিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারে। তাঁরা মনে করেন যে, প্রাচীনকাল থেকে একটা অন্ধ বিশ্বাস চলে আসছে যে জীবদেহের সাধারণ ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা জীবন বা প্রাণ ব্যাপকতর। ফলে জীবন রহস্যময় সত্তা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আসলে প্রাণকে জীবদেহের ক্রিয়াকলাপ থেকে স্বতন্ত্র কোনো সত্তা রূপে মনে করা অনুচিত, কেননা জীব দেহের ক্রিয়াকলাপ থেকে জীবন বা প্রাণকে পৃথক করে দেখা যায় না। জীবদেহের ক্রিয়াই জীবন বা প্রাণ। পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর মতো প্রাণ জড়েরই সৃষ্টি।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক বিজ্ঞান প্রাণের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সমর্থন করে। আধুনিককালে জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও জৈব-রসায়নের প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় জীবনের বহু ক্রিয়াকলাপের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অধুনা স্নায়ুমণ্ডলীয় ক্রিয়া টেলিফোনের ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা হয়েছে। কাজেই যন্ত্রবাদীদের দাবি এই যে, পূর্বের তুলনায় আধুনিককালে জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ব্যাপক ও জোরদার হয়েছে, ভবিষ্যতে এই ব্যাখ্যা আরও বিস্তৃত হবে ও যন্ত্রবাদের মহিমা সগর্বে ঘোষণা করবে।

তৃতীয়ত, যন্ত্রবাদীদের মতে, জীবনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যাই জীবনকে সহজবোধ্য করে তোলে। এ জাতীয় ব্যাখ্যার অভাবেই প্রাণশক্তি বা জীবন রহস্যময় হয়ে ওঠে। যেহেতু

---

[১] Life is that force or power which by its inner self differentiation into organs and their function maintains a unity and equilibrium amongst these organs and functions, purposively adapts the organism to environments recoups its losses and reproces other organisms.
– H. M. Bhattacharyya, *Principles of Philosophy*, P. 263.

জীবদেহ বিশ্লেষণে ভৌত রাসায়নিক উপাদান ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না, কাজেই জীবন বা প্রাণশক্তিকে জড়ের রূপান্তর ছাড়া অন্য কিছু মনে করার সঙ্গত কারণ নেই।

চতুর্থত, যন্ত্রবাদীরা মনে করেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় শুধু নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণই বিবেচিত হয়ে থাকে, উদ্দেশ্যকারণ বা অতীন্দ্রিয়তত্ত্বের আবশ্যক হয় না। যন্ত্রবাদ এই নৈসর্গিক ব্যাখ্যা অনুসরণ করে প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে। এই ব্যাখ্যা জড়বাদের মতো অত্যন্ত সহজবোধ্য ও জটিলতামুক্ত।

সমালোচনা

Criticism

যন্ত্রবাদ প্রাণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে না : প্রাণবাদীরা যন্ত্রবাদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করে এই মতবাদের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, প্রাণিদেহ যন্ত্রের জটিলতর ও উন্নত সংস্করণ নয় কিংবা প্রাণ ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল নয়। জীবদেহের এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ যন্ত্রের মধ্যে নেই। আত্মসংরক্ষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংস্কার, আত্মপুরুৎপাদন প্রভৃতি গুণাবলি কেবল জীবের মধ্যে দৃষ্ট হয়, কোনো যন্ত্রের মধ্যে এই ধরনের কোনো গুণ দৃষ্ট হয় না। জীবের এই বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণ হিসেবে প্রাণবাদীরা প্রাণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। প্রাণশক্তির ক্রিয়ার জন্যই জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রাণ এমন একটি শক্তি যা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিকাশ লাভ করে তাদের মধ্যে এক স্থিতিতাবস্থা ও ঐক্য বজায় রাখে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষা করে লয় এবং অন্য প্রাণির মধ্য দিয়ে নিজেকে বহুবিভক্ত করে দেয়। অবশ্য ভৌত রাসায়নিক উপাদানসমূহ শরীরের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে ক্রিয়া করছে। প্রাণশক্তি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ঐক্য বিধান করছে, সবকিছুর মধ্যে সংহতি স্থাপন করছে এবং জীবদেহের এক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন করছে।

(খ) প্রাণবাদ (Vitalism) : প্রাণের সংজ্ঞা : প্রাণবাদের মতে, প্রাণ জড়শক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক একটি শক্তি। অধ্যাপক হরিমোহন ভট্টাচার্য বলেন, "প্রাণ হলো সেই শক্তি যা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে তাদের মধ্যে এক স্থিতাবস্থা ও ঐশ্বর্য বজায় রাখে এবং পরিবেশে সাথে দেহের সামঞ্জস্য রক্ষা করে ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে রাখে এবং অন্য প্রাণির মধ্যে নিজেকে বহুধাবিভক্ত করে দেয়।

প্রাণশক্তির বৈশিষ্ট্য : প্রাণের এই ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, প্রাণ দেহ আশ্রয় করে থাকে। আত্মসংরক্ষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিকাশ এবং বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি জীবনের বিশিষ্ট্য লক্ষণসমূহ প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি। এই লক্ষণসমূহ অজৈব পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায় না। কাজেই দার্শনিকরা মনে করেন যে, কোনো ভৌতিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। প্রাণবাদীরা তাদের মতের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহের অবতারণা করেন।

প্রথমত, প্রাণবাদীরা মনে করেন যে, জীব ও অজৈব পদার্থের ক্রিয়াকলাপ একই ধরনের নয়, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। জীবন্ত প্রাণি যেভাবে কাজ করে অজৈব পদার্থ সেভাবে কাজ করে না। জীবের ক্রিয়াপ্রণালি বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যায় যে, জীবের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা চলে। প্রাণশক্তি এই সঙ্গতিবিধানের মূল উৎস। কোনো জীব

বা জীবাণু খাদ্য দেখলে সেই দিকে অগ্রসর হয়, কোনো বিষাক্ত পদার্থ দেখলে দূরে সরে যায়। জীবের কাজের মধ্যে তার মঙ্গল ও অমঙ্গলের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবের সঙ্গতি বিধানের প্রয়াস তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসংরক্ষণ, আত্মবিকাশ, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়ার মধ্যে বিস্তৃত হয়ে থাকে। জড় পদার্থ বা অজৈব পদার্থের মধ্যে এই ধরনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয়ত, যন্ত্র বা জড় পদার্থ কীভাবে কাজ করবে তা আগে থেকেই নির্ধারণ করা যায়, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। কিন্তু জীব সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। জীব স্বনিয়ন্ত্রিত, তার কাজের স্বাধীনতা আছে। যন্ত্র বা জড় পদার্থের স্বাধীনতা নেই, তাকে যেভাবে চালানো যায় সেইভাবেই চলে। একটি বল ছুঁড়ে দিলে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু পিপীলিকার গতি রোধ করলে তা অন্যপথে অগ্রসর হবে। জীবের কার্যপ্রণালি বা ক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। সুতরাং জীবের ক্রিয়াবলির যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, সাম্প্রতিককালে, নতুন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো কোনো জৈব প্রক্রিয়ার সুসঙ্গত যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। শ্বাস-প্রশ্বাস কাজ, পুষ্টিসাধন, বংশগতি প্রভৃতি জৈবিক গঠন ও ক্রিয়া এক জৈবিক ঐক্যের পরিচায়ক। সুতরাং পরিণতিমূলক কারণ তত্ত্বই প্রাণের ব্যাখ্যার উপযোগী।

চতুর্থত, যান্ত্রিক গতি ও জীবদেহের গতি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। যন্ত্রের গতি বাহ্য, যন্ত্রীর সাহায্য ছাড়া যন্ত্র অচল, জীব আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম, জীব নিজেকে নিজে পরিচালিত করে। আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই জীবনকে যন্ত্র থেকে পৃথক করে। কাজেই যন্ত্রবাদীরা প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

সমালোচনা

Criticism

প্রাণবাদ প্রাণের বৈশিষ্ট্যের নির্দেশক : প্রাণবাদীরা তাঁদের মতবাদের সপক্ষে যে যুক্তিগুলি প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে জীবের এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা যন্ত্রের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিকাশ, আত্মসংস্কার, আত্মপুনরুৎপাদনের ক্ষমতা আছে।

প্রাণবাদ প্রাণের বৈশিষ্ট্যের নির্দেশক : জীবের এই ক্ষমতাসমূহ বা বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাণশক্তির নির্দেশক। যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীবের এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে প্রাণবাদীদের সব যুক্তিই যে সমান শক্তিশালী সে কথা বলা যায় না। কারণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীবনকে মোটেই ব্যাখ্যা করা চলে না এমন নয়। তবে আধুনিককালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রাণের ব্যাখ্যায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে শুধু ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীবের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কাজেই যন্ত্রবাদ অসম্পূর্ণ। তেমনিভাবে প্রাণবাদও প্রাণের সাথে জীবদেহের ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সম্পর্ক উদ্ঘাটনে অসমর্থ হয়েছে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তবে একথা সত্য যে, প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যায় যন্ত্রবাদ অপেক্ষা প্রাণবাদ অধিকতর সন্তোষজনক।

(গ) ভাববাদ
Idnalism

ভাববাদী দার্শনিকরা মনে করেন যে, প্রাণের ব্যাখ্যায় যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদ উভয়ই অসম্পূর্ণ মতবাদ। তাঁদের মতে, ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যেমন জীবনকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তেমনি রহস্যময় প্রাণশক্তির সাহায্যেও জীব ও জড়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রাণের স্বরূপ বাখ্যা করা চলে না।

ভাববাদ বিবর্তন বা সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সম্পর্ক : ভাববাদীরা মনে করেন যে, এক পরম আধ্যাত্মিক প্রাণের স্বরূপ প্রাণ ও চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে চলছে। পরম আধ্যাত্মিক শক্তি, আত্মসচেতন শক্তি, চেতনার নব নব মনজিলে এই শক্তি নিজেকে উপলব্ধি করে ফিরছে। প্রাণশক্তি জড়শক্তি হিসেবে উন্নততর স্তর হলেও এ পরম আধ্যাত্মিক শক্তির আত্মপ্রকাশের একটি স্তর, একটি উপায়। ভাববাদীদের মতে, জড়শক্তির সাহায্যে কেবল যন্ত্রের ব্যাখ্যা করা চলে, জীবনের ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাণশক্তি জড়শক্তির তুলনায় উচ্চতর শক্তি। কাজেই যান্ত্রিক নিয়মে তার ব্যাখ্যা চলে না। পরম আধ্যাত্মিক সত্তার আত্মবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে স্তর হিসেবে পার্থক্য থাকলেও একই সত্তার আত্মবিকাশের মূল শক্তি হিসেবে প্রকৃতির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। ভাববাদে প্রাণবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় স্বীকৃত হয়েছে। তবে প্রাণবাদ সত্তার বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঐক্য বিধান করতে সমর্থ হয় নি, ভাববাদ বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

৫। প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদসমূহ
Views regarding the origin of life

জগতে প্রাণের উদ্ভব বিষয়ক সমস্যা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটি জটিল বিষয়। এ বিষয়ে তাঁরা বিভিন্ন মতবাদ উপস্থিত করেছেন। যথা– (১) অজীবজনি মতবাদ (Theory of abiogeresis), (২) জীবজনি মতবাদ (Theory of biogenesis), (৩) বিশেষ সৃষ্টিবাদ (Theory of special creation), (৪) উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ (Theory of emergent evolution) ও (৫) বস্তুগত ভাববাদ (Theory of realistic idealism)।

৫.১. অজীবজনি মতবাদ (Theory of abiogenesis) : প্রাণ ভৌত রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ : অজীবজনি মতবাদ জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সমর্থন করে। যন্ত্রবাদীরা এই মতবাদের সমর্থক। এই মতবাদ অনুসারে নিষ্প্রাণ জড় থেকে প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছে, জীবন থেকে নয়। সজীব দেহ বিশ্লেষণ করলে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পার্থিব উপাদান পাওয়া যায়। এই সমস্ত ভৌত রাসায়নিক উপাদান ছাড়া জীবদেহে প্রাণ বলে কিছুই নেই। এই সমস্ত উপাদানের পরমাণুর আকস্মিক সংমিশ্রণ থেকেই জীবনের উৎপত্তি। জীবকোষ (Protoplasmic cell) জীবনের প্রাথমিক আবির্ভাব, আর এই জীবকোষ থেকে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে উদ্ভিদ ও প্রাণি উদ্ভূত হয়ে থাকে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই মতবাদ অনুসারে জীব একটি জটিল যন্ত্র। জীবদেহ ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল। জীবন জড়শক্তির ক্রিয়া। প্রাণশক্তি বলে কোনো বিশেষ শক্তি নেই।

সমালোচনা

Criticism

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে অজীবজনি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। টিনডাল (Tyndal), হ্যাক্সলি (Huxley) ও পাস্তুর (Pasteure) প্রমুখ বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে নিষ্প্রাণ জড় থেকে জীবনের উৎপত্তি ঘটতে পারে না।

উপাদানের কৃত্রিম সমন্বয়ের উদ্ভব ঘটে না। আধুনিক বিজ্ঞান জীবদেহের বিশ্লেষণে যে সমস্ত উপাদানের সন্ধান লাভ করেছে সেই উপাদানগুলি সমন্বয়ে কৃত্রিম উপায়ে জীবদেহ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে, কিন্তু তাতে প্রাণ দেওয়া সম্ভব হয় নি। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি উপাদানের সমন্বয়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণের সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি।

আকস্মিকতা মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের জ্ঞানের বর্তমান পর্যায়ে আকস্মিক বলে কোনো মতবাদ চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের বদৌলতে কার্যকারণতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান জন্মেছে তাতে আকস্মিকতার ওপর নির্ভর করা চলে না। সুতরাং অজীবজনি মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

৫.২. জীবজনি মতবাদ (Theory of biogenesis) : জীবজনি মতবাদ অজীবজনি মতবাদের বিপরীত। যন্ত্রবাদীরা অজীবজনি মতবাদের সমর্থক, আর প্রাণবাদীরা সমর্থন করেন জীবজনি মতবাদ। জীবজনি মতবাদ অনুসারে প্রাণ থেকেই প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। প্রাণশক্তি জড়শক্তি থেকে উৎসারিত হয়। প্রাণবাদীরা মনে করেন যে, প্রাণশক্তি জড়শক্তি থেকে উৎসারিত নয়। প্রাণবাদীরা মনে করেন যে, প্রাণশক্তি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র। এ জড়শক্তি উচ্চতর জড়শক্তির নিয়ামক। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল আত্মাকে প্রাণনীতি বলে ভেবেছিলেন। অ্যারিস্টটলের মধ্যযুগীয় বহু অনুসারীও প্রাণের উৎস হিসেবে আধ্যাত্মিক নীতি স্বীকার করেছিলেন এবং প্রাণশক্তি ও জড়শক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। জার্মান দার্শনিক হ্যান্স ড্রিক (Hans Driesch) এই মতবাদ পুনরুজ্জীবিত করেন। তাঁর মতে, প্রাণ ভৌত রাসায়নিক শক্তি নয়, জীবদেহ যন্ত্র নয়; প্রাণশক্তি হলো মানসিক শক্তি, আর এই শক্তিই দেহ গঠন করে

পাস্তুর ও লিস্টারের পরীক্ষা : অজীবজনি মতবাদ সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে নস্যাৎ হয়ে গেছে। ডাক্তার পাস্তুর ও লিস্টার জীবাণু মুক্ত বোতলে পরিশ্রুত জল রেখে তার মুখ বন্ধ করে দেন। দীর্ঘদিন থাকার পরও তাতে কোনো জীবাণুর উৎপত্তি সম্ভব হয় নি। এ থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জড় থেকে জীবের উৎপত্তি সম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত বীক্ষণাগারে কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি উপাদানযোগ প্রস্তুত জীবকোষ প্রাণহীন। কাজেই জীব থেকে জীবের উৎপত্তি ঘটে– জড় থেকে নয়।

সমালোচনা

Criticism

প্রথম জীবের আবির্ভাব রহস্যাবৃত। জীবজনি মতবাদ অজীবজনি মতবাদের চেয়ে সন্তোষজনক। অন্ততপক্ষে একথা বলা চলে যে, জীবজনি মতবাদের বিপক্ষে কোনো শক্তিশালী যুক্তি নেই। এ পর্যন্ত আমরা এমন ঘটনার সাক্ষাৎলাভ করতে পারি নি যা

জীবজনি মতবাদের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। জীব থেকে যে জীবের উৎপত্তি, এ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নিশ্চিত; কিন্তু জগতে প্রথম জীবের আবির্ভাব ঘটল কীভাবে? জীবজনি মতবাদ এই প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারে না।

৫.৩. বিশেষ সৃষ্টিবাদ (Theory of Special Creation) : জীবজনি মতবাদ জগতের প্রথম জীবের আবির্ভাব সম্পর্কে কোনো যথার্থ ধারণা দিতে না পারলেও এই মতবাদের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে গেলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জীব সৃষ্টির মূলে রয়েছে পরমসত্তা। পরমসত্তা ছাড়া জীবদেহের পরিকল্পনায় শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সামঞ্জস্যের কথা কল্পনা করাও সুকঠিন; বিশেষ সৃষ্টিবাদ এমন একটি মতবাদ, এই মতবাদ অনুসারে খোদা এক বিশেষ মুহূর্তে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান জগতে আমরা যা কিছু দেখতে পাই তা খোদারই সৃষ্টি, বিভিন্ন প্রকার গাছপালা, জীবজন্তু যেভাবে আমাদের কাছে আজ প্রতীয়মান হচ্ছে সেইভাবে স্রষ্টা একদিন সেসব সৃষ্টি করেছেন। কাজেই খোদা অন্যান্য বস্তুর মতো জীব সৃষ্টি করেছেন। জীব সৃষ্টি খোদার অনন্ত লীলার একটি প্রকাশ মাত্র।

সমালোচনা
Criticism

ত্রুটি : বিশেষ সৃষ্টিবাদ প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যায় পরমসত্তার কল্পনা করে প্রাণের উৎসের একটি ইঙ্গিত দান করে। এ প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন না– পরমসত্তার সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাহ্য, না আন্তর সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ইশারা দেয় না।

৫.৪ উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ
Theory of Emergent Evolution

এই মতবাদ অনুসারে জড় থেকে জীবনের অভিব্যক্তি ঘটলেও জীবন বা প্রাণ জড়শক্তি থেকে স্বতন্ত্র একটি গুণ। এই মতবাদের একজন প্রবর্তক স্যামুয়েল আলেকজান্ডার বলেন যে, দেশ-কাল আদিম জাগতিক উপাদান। এই উপাদান থেকে জড়, প্রাণ, চৈতন্য ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছে এবং খোদার আবির্ভাব ঘটবে। এখনও অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে নি। আবার এই মতবাদের অপর প্রবর্তক লয়েড মর্গানের মতে, খোদাই বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রেরণা। এই প্রেরণার বলেই নতুন নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে থাকে। বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রাণ এমন একটি অভিনব গুণ।

সমালোচনা
Criticism

প্রাণ যে জড় থেকে স্বতন্ত্র এক সত্তা উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ সে কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। জাগতিক বিবর্তনের পশ্চাতে যে উচ্চতর নীতির প্রয়োজন, এই মতবাদ সে কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে। প্রকৃতিতে যে একটি সংগঠন প্রক্রিয়া কাজ করছে, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

৫.৪ বস্তুগত ভাববাদ
Realistic Idealism

এই মতবাদ অনুসারে এই জগৎ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। এই মতবাদের প্রবর্তন দার্শনিক হেগেলের মতে, এক পরম চৈতন্য বা আধ্যাত্মিক সত্তা থেকে সবকিছুই বিকাশলাভ করছে। সমগ্র বিশ্বজগৎ এই পরমসত্তার অভিব্যক্তি। জড়, জীব ও চৈতন্যের মধ্য দিয়ে পরম চৈতন্য নিজেকে বিকশিত করে ফিরছে। বিভিন্ন ধরনের সত্তা মূলত আধ্যাত্মিক, তবে সত্তার বিভিন্ন স্তরে চৈতন্যের রূপ বিভিন্ন। এই মতবাদ সন্তোষজনক।

তৃতীয় অধ্যায়
সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদ
THEORIES OF REALITY

"The more thoroughly the universe is studied and examined the more apparent does it become that it is a single self-consistent whole-a vast unity in which nothing is isolated or independent."

- আভাস
- জড়বাদ
- জড়বাদের সমর্থনে যুক্তিসমূহ
- জড়বাদের পরিণতি
- নিসর্গবাদ
- দ্বান্দ্বিক জড়বাদ
- অদ্বৈতবাদ
- দ্বৈতবাদ
- বহুবাদ

আভাস
Introduction

সাধারণ মানুষ জগতের পরিদৃশ্যমান রূপেই মুগ্ধ। জগতে অন্তরালবর্তী কোনো মহাসত্য কিংবা পরমসত্তার বিষয়ে ভাববার অবকাশ তাদের নেই– ইচ্ছাও নেই। কিন্তু সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে পরমসত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসু মনে বারবার উত্তর খুঁজে ফিরেছে। বহু দার্শনিক পরমসত্তা সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য চেষ্টিত হয়েছিলেন। এই প্রশ্ন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে :

প্রথমত, পরমসত্তা সংখ্যায় কয়টি?

দ্বিতীয়ত, পরমসত্তার প্রকৃতি কি? জড়বাদ ও ভাববাদের আলোচনাকালে পরমসত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে প্রথম প্রশ্নটির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই সম্পর্কে তিনটি মতবাদ উপস্থিত হয়েছে। যথা– বহুবাদ (Pluralism), দ্বৈতবাদ (Dualism) ও অদ্বৈতবাদ (Monism)।

২। জড়বাদ
Materialism

জড়বাদ অনুসারে জড়ই বিশ্বজগতের একমাত্র আদিম উপাদান। জড় হলো চরম সত্য ও পরমতত্ত্ব। বিশ্বজগতের সবকিছুই জড় থেকে উদ্ভূত। জড়শক্তি থেকেই জড়বস্তু, প্রাণ ও মন উদ্ভূত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বজগৎ জড়শক্তির সৃষ্টি। বস্তুজগৎ অণু-পরমাণুর আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফল জড় ও গতি জগতের সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে। কোনো কোনো জড়বাদীর মতে, গতি জড়ের অন্তর্নিহিত ধর্ম, আবার কোনো কোনো জড়বাদীর মতে, গতি জড় বহির্ভূত শক্তি, জড় ও গতির যুক্ত পরিণতি বিশ্ববিবর্তনের মূল।

জড়বাদ যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের সাহায্যে বিশ্বজগতের ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা প্রদান করে। জড়বাদীদের মতে, বিশ্বজগৎ বর্তমান অবস্থায় ছিল না। সুদীর্ঘ কালব্যাপী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূলে কোনো বুদ্ধির ভূমিকা নেই। জড় ও গতিশক্তির যুগ্ম ক্রিয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জগৎ বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব তুলনামূলক শরীর বিজ্ঞান ও ভ্রূণতত্ত্বের গবেষণালব্ধ উপাদানের বলেই জড়বাদীরা জগতের বিবর্তনের ধারণায় উপনীত হয়েছে।

জড়বাদীরা যান্ত্রিক বিবর্তনের মাধ্যমেই জীবনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে, প্রাণিদেহ ভৌতিক ও রাসায়নিক শক্তির জটিল সংগঠন। কোনো কোনো জড়বাদী মনে করেন যে, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ব্যারন প্রভৃতি উপাদানের আকস্মিক বিবর্তনের ফলে প্রাণির উদ্ভব ঘটে। তাঁরা প্রাণের ব্যাখ্যায় কোনো দুর্জ্ঞেয় জীবনীশক্তি কিংবা অধ্যাত্ম নীতি স্বীকার করেন না।

মন মস্তিষ্কের ক্রিয়া বা উপবস্তু : প্রাণের মতো মনের ব্যাখ্যায়ও জড়বাদীরা যান্ত্রিক ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। জড় ও গতির সাহায্যে তারা মনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের মতে, মন সূক্ষ্ম জড় ·পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এপিকিউরিয়াস জড়কেই মনের আধার বলে মনে করেন। হবসের মতে, মন মস্তিষ্কের গতি। জট টলেন্ডের মতে, চিন্তন মস্তিষ্কের ক্রিয়া। হলব্যাসচ মনকে স্নায়বিক পদার্থ বলে মনে করেন। তাঁর মতে, চিন্তা হলো মনের ক্রিয়া। কেবানিস দেহ ও মানকে অভিন্ন বলে মনে করেন। জুলিয়ান অফরে (Julien Offery) মানসিক প্রক্রিয়াকে স্নায়বিক প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে মনে করেন। আধুনিক জড়বাদীরে মতে, মন মস্তিষ্কের উপবস্তু। জড়ই প্রকৃত বস্তু। কারণ জড়েরই বস্তুসত্তা আছে। চেতনার কোনো বস্তুসত্তা নেই। এই শ্রেণীর চিন্তাবিদদের মতে, দুটি কঠিন বস্তুর ঘর্ষণে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তৈরি হয় তেমনি মস্তিষ্কের কোষে অনবরত ঘর্ষণের ফলে চেতনার উৎপত্তি ঘটে।

জড়বাদ যন্ত্রবাদের মুখপাত্র। জড়বাদ প্রাণ ও মনের সত্তা ও বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করে। এ খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। হর্নলি (Hornle) বলেন, "তিনটি অস্বীকৃতির মধ্যে যন্ত্রবাদের খোঁচা নিহিত। (১) জড়বাদ সমগ্র প্রকৃতি কিংবা প্রকৃতির জীবন্ত অংশকে খোদার সৃষ্টি বলে স্বীকার করে না। (২) জীবের আচরণে মানব মন বা পশু মন প্রকৃত কারণ হিসবে সক্রিয় বলে জড়বাদ স্বীকার করে না। (৩) জড়বাদ জীবনীশক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে। জড়বাদ প্রাকৃতিক ঘটনা প্রসঙ্গে প্রাণ, মন, খোদা প্রভৃতি

ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ।"[১]

জগতের যাবতীয় সত্তার ব্যাখ্যায় জড় ও গতি : উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জড়বাদ প্রাণ ও চেতনাসহ বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তুর ব্যাখ্যায় জড় ও গতির সাহায্য গ্রহণ করে। অন্য কথায়, জড় ও গতির মাধ্যমে জড়বাদ, বস্তু, জীব ও চৈতন্যের ব্যাখ্যা করে। জড়বাদ বস্তুজগৎকে অণু-পরমাণুর আকস্মিক সংমিশ্রণের ফল বলে মনে করে। অল্প কথায়, জড় ও গতি প্রকৃতির সব কিছুর কারণ। জড়বাদ প্রাণকে জীবকোষের পরমাণুর মধ্যস্থিত ভৌত রাসায়নিক শক্তির যান্ত্রিক পরিণতি বলে মনে করে। অর্থাৎ নিষ্প্রাণ জড় থেকে জীবের উৎপত্তি। জড়বাদ অনুসারে, মন হয় মস্তিষ্কের ক্রিয়া নয় মস্তিষ্কের উপবস্তু নতুবা সংগঠিত জড়ের গুণ।

২.১। জড়বাদের সমর্থনে যুক্তিসমূহ

Arguments of Materialism

মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে দৈহিক অবস্থার রূপান্তরের মধ্যে জড়বাদের মূল বক্তব্য নিহিত রয়েছে। জড়বাদীরা বিশ্বজগতের যাবতীয় সত্তাকে জড়াত্মক বলে প্রতিপন্ন করতে চান। তাঁদের যুক্তিগুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হলো :

প্রথমত, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, দৈহিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানস প্রক্রিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। যতদূর জানা গেছে জীবই চেতনাশক্তিসম্পন্ন এবং এ চেতনাশক্তি স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

কাজেই বিজ্ঞান যে জীবদেহের বিশিষ্ট শক্তির মাধ্যমেই চেতনার কারণ অনুসন্ধান করবে সে বিষয়ে বৈচিত্র্যের কিছুই নেই। বিজ্ঞানীরা স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার মধ্যেই মানসিক প্রক্রিয়ার সন্ধান করে থাকেন। পল্সন বলেন যে, জড়বাদীরা মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে দৈহিক প্রক্রিয়া বলে মনে করেন।

দ্বিতীয়ত, জড়বাদীরা শক্তির অবিনশ্বরতাবাদের সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার দৈহিক স্বরূপ প্রমাণ করতে চান। এ সত্য যে, মস্তিষ্ক কোষের অণুর আন্দোলনের সঙ্গে মনোবৈজ্ঞানিক/মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাও উপস্থিত হয়। যেমন : সংবেদন; আবার ইচ্ছাবাহী স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গেও ইচ্ছা জড়িত। যদি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে দৈহিক প্রক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয়, তবে শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়মকে উপেক্ষা করা হয়।

তৃতীয়ত, জীববিজ্ঞান ও জাগতিক বিবর্তন জড়বাদকে সমর্থন করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সাপেক্ষ বিবর্তনবাদ জড়বাদকেই সমর্থন করে থাকে। এক সময় ছিল যখন জগতে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। ধীর ক্রমপরিবর্তনের ফলে জড় থেকে জীবনের উদ্ভব ঘটে, আর প্রাণ থেকে মন বা চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। অনুরূপভাবে সরল জীব থেকে জটিল জীবের আবির্ভাব ঘটে। কাজেই জাগতিক বিবর্তন সম্পর্কীয় মতবাদ জড়বাদকে সমর্থন করে থাকে।

---

[১] The string of mechanism lies in its there denials. 1. It denies that nature as a whole or in its living parts, is the creation of God. 2. It denies that minds, human or animal, are operative as varge cause in the behaviour of living beings. 3. It denies the existence of my 'vital force'. It is a protest against taking of natural phenomena in the language of Life or mind, or of God. – Hornle– *Matter, Life and God.* P. 93-94

চতুর্থত, জড়ের ক্ষেত্রে বিপ্লবী পরিবর্তন ও তার পরিণতি, তুলনামূলক শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা জড়বাদকেই সমর্থন করে। এই বিজ্ঞান নির্দেশ করে যে, স্নায়ুতন্ত্র ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিবর্তন সমান্তরাল– একই সঙ্গে উভয় প্রক্রিয়ার বিকাশ সাধিত হয়। মস্তিষ্কের আকার, ওজন ও জটিলতা যত অধিক হবে বুদ্ধির পরিমাণও তত অধিক হবে। মস্তিষ্কের উন্নতি ও বুদ্ধির বিকাশ যুগপৎ ঘটে থাকে। বিভিন্ন প্রাণির ক্ষেত্রে এই যুগপৎ বিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের আঘাত মানসজীবনের বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রত্যেক মানসিক ব্যাধি মস্তিষ্কের ব্যাধি। কাজেই মস্তিষ্ক হলো মন। সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লবী পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় জড়বাদের পূর্ব ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। অপরিবর্তনীয় জড় শক্তির পরিবর্তে গতিশীল ধারণাই এ যুগের জড়বাদের প্রধান কথা। রাদারফোর্ড, এডিংটন, আইনস্টাইন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর সাধনার ফলে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। জড়বাদীরা আজ জড়ের জড়ীয় প্রকৃতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। হয়তো এই সন্দেহের মধ্য দিয়ে নবযুগের সূচনা হতে পারে।

সমালোচনা
Criticism

জড়বাদ জড় ও গতির সাহায্যে বিশ্বজগতের সমুদয় বস্তু, জীব ও চৈতন্যের ব্যাখ্যা করে। কিন্তু জড়বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে, জড়বাদে জীবনগত সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা ভ্রান্তিপূর্ণ, অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। জড়বাদ নিম্নলিখিত **ত্রুটিসমূহের** অধীন।

প্রথমত, জড় সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ জড় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। জড়বাদ অনেকগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ উপস্থাপিত করেছে। জড়বাদ সম্পর্কীয় একটি মতবাদ হলো পরমাণুবাদ। এই মতবাদ অনুসারে বিশ্বজগতের মূলীভূত উপাদান হলো অভেদ্য ও অবিনশ্বর পরমাণু। কিন্তু এই পরমাণুবাদ পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং সচল জড়বাদ এর স্থান অধিকার করেছে। এই মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বজগৎ পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই পরমাণু ধনাত্মক প্রোটন ও ঋণাত্মক ইলেকট্রন দ্বারা গঠিত। পরমাণু চূর্ণ করলে ইলেকট্রন, নিউট্রন ও পজিট্রন পাওয়া যায়। সচল জড়বাদ পরমাণুবাদের ধারণা পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং তার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি প্রকাশ করেছে। জড় অবিনশ্বর, গতি জড়ের ক্রিয়া, জড় মৌলিক সত্তা ইত্যাদি পরমাণুবাদের ধারণাগুলি সচল জড়বাদ নস্যাৎ করে দিয়েছে এবং গতির বিষয়কে জড়ের পুরোভাগে আনয়ন করেছে। আবার আধুনিক জড়বাদ নিসর্গবাদে (Naturalism) রূপান্তরিত হয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে পার্থিব জগৎ বিদ্যুৎশক্তির নৃত্য-চপল মূর্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। জড়বাদের এই অনিশ্চয়তা জড়বাদের অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতিরই পরিচায়ক।

দ্বিতীয়ত, জড়বাদ প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জড়বাদীরা মনে করেন যে, নিষ্প্রাণ জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। প্রাণের ব্যাখ্যায় অজীবজনি মতবাদের সাহায্যে জড়বাদ প্রচার করে যে, নিষ্প্রাণ জড় থেকে আকস্মিকভাবে প্রাণের উদ্ভব ঘটে। এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা জড় ও প্রাণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। কাজেই জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব নয় এ ছাড়া বীক্ষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে

উৎপাদিত জীবকোষ নির্জীব-সজীব নয়। এখন পর্যন্তও সজীব জীবকোষ উৎপাদনে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হন নি। পরন্তু বর্ধন, বংশবৃদ্ধি, উপযোজন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার ব্যাখা দেওয়া জড়বাদীদের সাধ্যাতীত।

তৃতীয়ত, জড়বাদ মনের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জড়বাদের মতে, মন হলো মস্তিষ্কের উপবস্তু। কিন্তু মনকে দেহের উপবস্তু মনে করলে একথা বলা যায় না যে, মন দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে কিংবা মনের স্বাধীনতা আছে। আমরা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারি যে, মন দেহ ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে। দেহ ও মন, দৈহিক ক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও এই দুইকে অভিন্ন মনে করার কোনো যুক্তি নেই। জড়বাদ আত্মসচেতনতা, মানসিক ক্রিয়ার ঐক্য ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

চতুর্থত, জড়বাদ জ্ঞানের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানে অক্ষম। জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই দুইয়ের ধারণা প্রদান করে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞান হতে পারে না। জ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং জ্ঞাতা অর্থাৎ যে জ্ঞানের অধিকারী এই দুই-ই জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য। কেবল বিষয়বস্তু জ্ঞান পদবাচ্য থেকে পারে না, আবার কেবল জ্ঞাতা ও জ্ঞানী পদবাচ্য হতে পারে না। তাই জ্ঞান বলতে যে জানে এবং যা জানা হয়– এই দুইকেই বুঝিয়ে থাকে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দুই ছাড়া জ্ঞানের ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। জড়বাদ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য প্রদর্শন করতে পারে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, জড়বাদ জ্ঞানের ব্যাখ্যা প্রদানে অসমর্থ।

পঞ্চমত, জড়বাদ মানুষের নীতিবোধ ও আত্মচেতনতার মূলে কুঠারাঘাত করে। জড়বাদীরা একমাত্র জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করায় এবং প্রাণ ও মনের স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করায় নীতিবোধ ও ব্যক্তিত্ব তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। নীতিবোধ বা নৈতিকতা অনুসারে মানুষ আত্মসচেতন আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম সত্তা স্বাধীনভাবে যে কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা তার আছে। জড়বাদ মন ও মনের সমুদয় ক্রিয়াকে দৈহিক ক্রিয়া বলে প্রচার করে, ফলে মানসিক ক্রিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে মানুষকে আত্মসচেতন সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি না দিলে নীতির ভিত্তি ধসে পড়ে কিন্তু মানুষ দেহের অধীন নয় বরং সে দেহকে পরিচালিত করে। মানুষ আত্মসচেতন, আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম। মানুষ নিজের কর্মপন্থা নির্বাচন করে স্বনির্বাচিত কার্য সম্পাদন করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জড়বাদ চৈতন্যের ব্যাখ্যা করতে না পেরে এটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

ষষ্ঠত, জড়বাদ মানুষের ধর্মীয় চেতনা ধ্বংস করে। জড়বাদ জড়কে বিশ্বজগতের মূলীভূত উপাদান বলে মনে করে এবং পরমসত্তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। কাজেই জড়বাদ পরমসত্তাকে অলীক বলে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু এই বিশ্বজগতের অপার বৈচিত্র্য ও সুষমা অন্ধ জড়শক্তির সৃষ্টি বলে গ্রহণ করা যায় না। বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তু ও প্রাণির সৃষ্টি কৌশলের মধ্যে বুদ্ধির আভাস পরিস্ফুট, জড়বাদীরা তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে ধর্ম বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করে, তাঁর জীবনের মূল্যমান বৃদ্ধি করে এবং জগৎ পরিকল্পনায় মানুষের স্থান, কর্তব্য ও দায়িত্বের নির্দেশ দান করে। জড়বাদ মানুষের ধর্মীয় চেতনার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জড়বাদ ধর্মীয় চেতনাকে দৈহিক ক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করে, ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করে।

সপ্তমত, জড়বাদ আদর্শকে ধ্বংস করে। জড়বাদ মানুষের সর্বপ্রকার মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। মানুষের উচ্চতর আদর্শসমূহ ও তাদের বাস্তবায়ন তার জাগ্রত আত্মার পরিচায়ক। কিন্তু জড়বাদ জড়ের সাহায্যে সব ব্যাখ্যা করার ফলে আদর্শবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার আত্মিক শক্তি দৈহিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়।

২.২। জড়বাদের পরিণতি

Practical Consequences of Materialism

জড়বাদের বাস্তব পরিণতি নীতিবোধ ও ধর্মের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। জড়বাদ নীতিবোধ ও ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করে। জড়বাদ অনুসারে জড় ও গতি জগতের মূলনীতি– বিশ্বজগতের সব কিছুই জড় ও গতি থেকে উদ্ভব হয়েছে। প্রাণ ও মন উভয়ই জড়ের ক্রিয়া। জড়বাদ প্রত্যেক ঘটনার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রদান করে। জাগতিক ঘটনার মতো মানসিক ঘটনাও যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। কাজেই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের নীতিবোধের কোনো তাৎপর্যই থাকে না। নীতিবোধ ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরতা এবং নৈতিক বিচারক হিসেবে খোদার অস্তিত্বসমূহ নীতিশাস্ত্রের স্বীকার্য সত্য। জড়বাদ নীতিশাস্ত্রের এই স্বীকার্য সত্যগুলি অস্বীকার করে।

এতদ্ব্যতীত জড়বাদে মন অর্থে কতগুলি বহিঃনিয়ন্ত্রিত চেতনার সমষ্টি বুঝায়। মন সুখ চায়, দুঃখ পরিহার করে। এই সুখই মানুষের কাম্য। জড়বাদিরা মনে করে যে, সকল মানসিক ক্রিয়াই মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো মানসিক ক্রিয়ার স্বাধীনতা নেই, ইচ্ছা মানসিক ক্রিয়া, কাজেই ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। এইভাবে স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে জড়বাদীরা নীতিবোধকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁদের মতে, নীতিবোধ বা নৈতিক আদর্শ বলে যদি কিছু থাকে তবে তা ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কাজেই সুখ বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই একমাত্র কাম্য। জড়বাদে সুখবাদই একমাত্র নৈতিক আদর্শ।

জড়বাদীদের এই মত মানুষ ও পশুকে একই পর্যায়ে নামিয়ে ফেলে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবন। মানুষ ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে। ভালো বা মন্দ যে কোনো পন্থা নির্বাচন করে তদানুযায়ী কাজ করতে পারে। কাজেই সুখ মানুষের জীবনের আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

জড়বাদ ধর্মের মূলেও কুঠারাঘাত করে। জড়বাদীদের মতে, জড়শক্তি ও গতি থেকে বিশ্বজগৎ উদ্ভূত হয়েছে। অণু-পরমাণুর জটিল সংমিশ্রণের ফলেই জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। জগতের মূলে কোনো বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা নেই। কাজেই জড়বাদ স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। কিন্তু ধর্ম মানুষকে সৃষ্টিকর্তার চেতনা প্রদান করে। এক পরম আধ্যাত্মিক সত্তা বিশ্বজগতের উৎস। মানুষ উপাসনা বা আত্মিক সাধনার মাধ্যমে এই পরমসত্তার সাথে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারে, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। জড়বাদ জড়, শক্তি ও গতি ছাড়া কোনো পরমসত্তা বা আধ্যাত্মিক শক্তি স্বীকার করে না। জড়বাদীদের মতে, ধর্ম সুবিধাবাদীদের হাতে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র। সহজ, সরল সাধারণ লোককে প্রতারিত করাই এর লক্ষ্য। এইভাবে জড়বাদ মানুষের ধর্মীয় চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করে। মানুষের আত্মিক স্বরূপ অস্বীকার করে।

জড়বাদ মানুষের অধ্যাত্ম চেতনা ও নীতিবোধকে উড়িয়ে দিলেও এসবের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তাই বলে জড়বাদীরা যে বাস্তব জীবনের নীতিবোধকে মানেন না– এমন নয়। আধুনিক নীতিবিদরা নীতিবোধকে সামাজিক ঘটনা বলে মনে করেন। তাঁরা উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। জড়, প্রাণ ও মনকে তাঁরা বিবর্তনের বিশিষ্ট স্তর বলে মনে করেন। মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদের (Dialectical Materialism) সমর্থক রাশীয়ান কমিউনিস্টরা উপযোগিতাবাদ ও সার্বজনীন বদান্যতায় বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, উদ্দেশ্য উপায় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। চলতি নীতিবোধ বা নৈতিকতাকে তাঁরা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি বলে মনে করেন।

জড়বাদ ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। জড়বাদীরা ধর্মকে মনের আত্মগত সৃষ্টি, শূন্যগর্ভ স্বপ্ন বলে মনে করেন। তাঁরা ধর্মকে পুরোহিত বা ধর্মযাজকদের আয়ের উপায় স্বরূপ বলে মনে করেন। তাঁরা খোদার অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরতা ও ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য এবং মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জীবন অধিবিদ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে, অধিবিদ্যা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। পলসন যথার্থই বলেছেন, "শূন্যগর্ভ নীচ জীবন সরাসরি জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক দর্শনের জন্ম দেয়। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো জীবন ও জীবের পরিণতির নীচ মূল্যায়ন; মানব প্রকৃতির মহত্ত্বব্যঞ্জক গুণাবলির প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক মনোভাব; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের প্রতি সম্মানের অভাব; সর্বপ্রকার মহৎ আদর্শের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা। জীবন সম্পর্কীয় এই ধারনের নঞর্থক মতবাদ স্বভাবত জড়বাদভিত্তিক দর্শনের জন্ম দিয়ে থাকে। অপরপক্ষে সক্রিয় কল্যাণপ্রদ ও মহৎ জীবন স্বভাবত অধ্যাত্মবাদী দর্শনের জন্ম দিয়ে থাকে। মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়াস থেকে জন্মে ধারণার প্রভুত্বের প্রতি বিশ্বাস, মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্তনে বিধাতার নিয়ামক শক্তির প্রতি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই সত্তা যে সামগ্রিকভাবে ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, জগৎ যে খোদার সৃষ্টি, এই চিন্তা তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে সমাদৃত হয়।"[১]

২.৩। নিসর্গবাদ

Naturalism

সাম্প্রতিককালে জড়বাদের পরিবর্তে 'নিসর্গবাদ' কথাটি অধিক প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীন জড়বাদে লৌকিক ও নির্বিচারবাদী প্রকৃতি ও 'জড়' শব্দটির অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এর জন্য দায়ী। জড়বাদ বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায়

---

[১] An empty and low life has the immediate tendency to produce a nihilistic conception of life, its features are a low estimate of life and its destiny a deperciation and scorn of the nobler phases of man's nature, a loss of reverence from moral and spiritual greatness disbelief and derision as regards all idea aspiration such a nihilistic view of the life naturally tends to a materialistic philosophy. Conversely and active and honourably good and great life naturally tends to an idealistic metaphysics. From the striving after great ends, grows the belief in the supremacy of ideas, in the governance of providence in the historical life of man, and this belief finds a theoritical basis in the thought that reality as a whole is founded on ideas, that the world is the works of God. – Paulson. *Introduction to Philosophy.*

পৌঁছেছে। গ্রিক পরমাণুবাদ জড়বাদের প্রাচীনতম রূপ। পরে এ সচল জড়বাদে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে এই মতবাদ নিসর্গবাদ নাম গ্রহণ করেছে। প্রাচীন জড়বাদীরা জড়শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু নিসর্গবাদীরা শক্তি, গতি, প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্য-কারণতত্ত্বের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। সাম্প্রতিককালে নিসর্গবাদীরা প্রাণ ও মনের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, জড় থেকে যখন প্রাণের উদ্ভব ঘটে তখনও নতুন গুণের উন্মেষ লক্ষ করা যায়। কাজেই নিসর্গবাদ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নতুন উপাদানের উন্মেষ স্বীকার করেছে। প্রাচীন জড়বাদ অপেক্ষা নিসর্গবাদ অনেকটা উদার মতবাদ বলে বিবেচিত হয়।

চরম মতবাদ হিসেবে দেখলে নিসর্গবাদ ও জড়বাদের মধ্যে খুব কম পার্থক্যই দৃষ্ট হয়। জড়বাদ জড়ের ওপর নিসর্গবাদ শক্তির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অধুনা নিসর্গবাদ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রশাসিত জগতের ব্যাখ্যা না হয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞানের সমন্বয়ে জগতের ব্যাপক ধারণা গঠনের জন্য চেষ্টিত।

সমালোচনা
Criticism

নিসর্গবাদ জড়বাদের উন্নত সংস্করণ হলেও এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা বিশ্বজগতের পরিকল্পনায় বুদ্ধির যে প্রকাশ ঘটেছে নিসর্গবাদ তা ব্যাখ্যা করতে পারে না। এছাড়া, প্রাণ যে জড়ের রূপান্তর নয়, মন যে প্রাণের রূপান্তর নয়, এই মতবাদ তা নির্দেশ করতে পারে না।

২.৪। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ
Dialectical Materialism

দ্বান্দ্বিক জড়বাদ হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অনুসরণ করে। কার্ল মার্কস (Karl Marx) দ্বান্দ্বিক জড়বাদের প্রবর্তক। তিনি এঙ্গেলসের সহযোগিতায় এই মতবাদ ঘোষণা করেন। মার্কসের শিষ্য লেলিন দ্বান্দ্বিক জড়বাদকে শক্তিশালী মতবাদে পরিণত করার প্রয়াস পান; স্ট্যালিন, মার্কস, এঙ্গেলস ও লেলিনের গুরুত্বপূর্ণ উক্তিসমূহ সংগ্রহ করেন ও ঐগুলি পরিবর্ধন করেন। এইভাবে তাঁর 'ডায়ালেকটিক্যাল ও হিস্টেরিক্যাল মেটারিয়ালিজম' (Dialectical and Historical Materialism) গ্রন্থখানি জন্মলাভ করে।

হেগেল ও মার্কসের মধ্যে সামঞ্জস্য : মার্কস একজন বামপন্থি হেগেলীয় দার্শনিক। তিনি হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সদর্থক ধারণা, নঞর্থক ধারণা এবং তাদের সমন্বয়ে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। কান্ট ও হেগেলের পাস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ধারণা দ্বারা তিনি প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হন। কারণ ফল উৎপন্ন করে, অংশ সমগ্রকে সৃষ্টি করে, কিন্তু ফল অংশগুলির ওপর এমনভাবে প্রতিক্রিয়া করে যে ফল বা পরিণতি অংশকে পরিমার্জিত করে। এই প্রক্রিয়া জীবজগতে ও সমাজ জীবনে ক্রিয়াশীল। অঙ্গসমূহ ও দেহী, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র পরস্পর নির্ভরশীল। সদর্থক ধারণা ও নঞর্থক ধারণা (Thesis and anti-thesis) উভয়ই পরস্পরের কারণ ও ফল এবং সমন্বয় (Synthesis) হলে উভয়ের সৃষ্টি নতুন পরিস্থিতি। এ পর্যন্ত হেগেল ও মার্কসের মধ্যে মিল রয়েছে।

হেগেল ও মার্কসের মধ্যে পার্থক্য : কিন্তু হেগেলের মতবাদের সাথে পার্থক্য প্রদর্শনকালে মার্কস বলেন, "আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হেগেলের পদ্ধতি থেকে শুধু স্বতন্ত্র নয় বরং তা একটি বিপরীত পদ্ধতি। গেলের দৃষ্টিতে চিন্তা বা ধারণা হলো জগৎ স্রষ্টা এবং প্রকৃত জগত হলো মননির্ভর জগৎ। অপরপক্ষে, আমার কাছে জড়জগৎ হলো একমাত্র আদর্শ জগৎ এবং মানুষ তার মনের সাহায্যে এই জড়জগৎকে চিন্তার মাধ্যমে জ্ঞাত হতে চেষ্টা করে।"[১] মার্ক্সীয় জড়বাদ জড়ের দ্বন্দ্ব-চিন্তার দ্বন্দ্ব নয়। এঙ্গেল্‌স বলেন, "প্রকৃতির ক্রিয়া-পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক" (Nature's Process is dialectical)।

লেলিন বলেন, "বস্তুর মূল উপাদানের অন্তর্নিহিত বিরোধ পর্যালোচনার পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক। বিবর্তন পরস্পরের বিরোধী জিনিসের সংগ্রাম।

হেগেলীয় জগৎ ভাবাত্মক, মার্কসীয় জগৎ জড়াত্মক। মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ হেগেলের দ্বান্দ্বিক মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র।

প্রথমত, ভাববাদীদের মতে, এই জগৎ পরম ধীশক্তির (Absolute idea) প্রকাশ। হেগেল জগৎকে ধারণার বিবর্তন বলে বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে মার্কসের মতে, জগতের প্রকৃতি জড়াত্মক। জড় ও গতি জগতের যাবতীয় বস্তুর মূল কারণ। জড় ও গতিই জগতের সকল সমস্যার ব্যাখ্যা দান করতে পারে। জগৎলীলা ব্যাখ্যা করার জন্য সার্বজনীন মন বা চিন্তার কোনো আবশ্যক নেই।

দ্বিতীয়ত, হেগেলে মন মুখ্য, মার্কসে জড় মুখ্য। ভাববাদ অনুসারে আমাদের মন অস্তিত্বশীল এবং জড়জগৎ আমাদের মনের ওপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে; মার্কসবাদী জড়বাদীদের মতে, জড় আমাদের মনের বাইরে অবস্থিত ও মননিরপেক্ষ সত্তা। জড় মৌলিক বা প্রাথমিক সত্তা– এ সরল সংবেদনের উৎস, আর মন গৌণ সত্তা, এ জড়ের সৃষ্টি, মস্তিষ্ক চিন্তার ইন্দ্রিয়, মার্কসের মতে, আমাদের চেতনা ও চিন্তা মস্তিষ্কের সৃষ্টি। মন জড়ের সৃষ্টি, জড় মনের সৃষ্টি নয়। চিন্তাকে জড় থেকে পৃথক করা চলে না। গতি ছাড়া জড়ের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। গতির মাধ্যমে জড়কে জানা যায়।

মার্কসের মতে, জগতের ঘটনাবলি কোনোরূপ উদ্দেশ্যমুখিনতার নির্দেশ করে নানা পার্থিব ঘটনা কোনো চৈতন্যের ইঙ্গিত ছাড়াই জড় ও গতির সাহায্যে ব্যাখ্যা হতে পারে। জগতের সর্বত্র জড়ের সার্বভৌমত্ব বিঘোষিত। কাজেই হেগেলীয় চিন্তনের নিয়মাবলি ভ্রমাত্মক অনুমান। মানবীয় চিন্তা জড়েরই ক্রিয়া– জড়ের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন। মার্কসের মতে, ব্যক্তিগত চেতনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনার যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায় না, বরং প্রকৃতির ক্রিয়াপদ্ধতি এবং মানুষের ইতিহাসের গতির পর্যালোচনার মাধ্যমেই ঘটনার যথার্থ নৈয়ায়িক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

জগৎ প্রক্রিয়া চক্রবৎ মুক্ত প্রক্রিয়া : মার্কসের মতে, জগৎ প্রক্রিয়া চক্রবৎ। জগৎ প্রক্রিয়া সদর্থক ধারণা নঞর্থক ধারণা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ত এগিয়ে চলেছে।

---

[১] My dialectical method is not only different from the Hegelian, but it's direct opposite. To Hegel, the process of thinking, idea, is the creator of the real world and the real world is only external, phenomenal form of the idea. With me, on the contrary, the ideal is nothing else than the material world, reflected by the human mind and transformed forms of thought. – Marx, *Capital.*

এ একটি মুক্ত প্রক্রিয়া। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নব নব স্তরের উদ্ভব ঘটছে। মানুষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়ত উদ্ভব ঘটছে। মার্কস জগতের বিবর্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, যদিও মানব মন প্রকৃতির সৃষ্টি তথাপি মন প্রকৃতির একটি সক্রিয় শক্তি এবং প্রকৃতির অন্যান্য শক্তির মতো মানুষের ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ মানুষের পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করতে পারে। মানুষ তার ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক নয়, মানুষ আপনার ভাগ্যবিধাতা।

মার্কসের মতে, জ্ঞান তত্ত্বগত নয়– ব্যবহারিক। দ্বান্দ্বিক জড়বাদের জ্ঞানমূলক মতবাদ ব্যবহারিক ও কৌতুকপ্রদ। কোনো কিছু জানা মানে সেই বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং তাতে প্রতিক্রিয়া করা। বস্তু দ্বারা ব্যক্তি প্রভাবিত হয়, ব্যক্তি দ্বারা বস্তু প্রভাবিত হয়। জ্ঞান চলমান। এ ব্যক্তি ও বস্তু উভয়কেই পরিবর্তন করে। জ্ঞান তত্ত্বগত নয়, ব্যবহারিক। সত্য প্রায়োগিক এবং জ্ঞাতার সাথে সংশ্লিষ্ট। সত্য আপেক্ষিক। যা সর্বহারাদের জন্য সত্য তা পুঁজিবাদীদের জন্য সত্য নয়, আবার যা পুঁজিবাদীদের জন্য সত্য তা সর্বহারাদের জন্য সত্য নয়। সত্য, ন্যায় ইত্যাদির কোনো সার্বজনীন রূপ নেই– এসব সমাজের শাসকশ্রেণীর মতবাদ।

সমাজ বিবর্তন ও মানুষ : হেগেল মনে করেন যে, সমাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপায়। কিন্তু মার্কস মনে করেন যে, ব্যক্তি সমাজ বিবর্তনের উপায়। জীবদেহের ক্ষেত্রে একটি কোষ যেমন অন্য একটি কোষের সাথে সম্পৃক্ত, ব্যক্তি তেমনি সমাজে অন্য ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই ব্যক্তির যুগ্ম ক্রিয়াই সমাজ দেহের বিবর্তনের একমাত্র উপায়।

মার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর মতে, ইতিহাস অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের দ্বারা প্রভাবিত। উৎপাদন প্রক্রিয়া মানব সমাজের বিবর্তন নিয়ন্ত্রিত করে। পুঁজিবাদী সমাজ অর্থনৈতিক তারতম্যের জন্য দায়ী। এই কারণে পুঁজিবাদী ও সর্বহারা শ্রেণীর নিরন্তন সংগ্রাম চলছে। শ্রেণী সংগ্রামের মূলে রয়েছে পুঁজি ও শ্রমের সংঘর্ষ। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি নির্দেশ করে যে, পুঁজিবাদীদের একানায়কত্ব সর্বহারাদের একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত করে থাকে। পুঁজিবাদীকে উৎখাত করলেই শ্রমিকশ্রেণীর হাতে সম্পদের যথার্থ বণ্টন হতে পারে– অন্যভাবে নয়। এ ব্যাপারে মার্কসের অভিমত এই যে, পৃথিবীব্যাপী সর্বহারার দল সংঘবদ্ধ হলে সম্পদ বণ্টনের সমতা আনা যায়। এই জন্য প্রয়োজন রক্তাক্ত বিপ্লবের। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা হলো সদর্থক ধারণা (thesis)। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস হলো নঞর্থক, ধারণা (Anti-thesis) এবং শ্রেণীবিহীন সমাজ ব্যবস্থা হলো সমন্বয় (Synthesis)। অবশ্য এই জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইঙ্গিত দিয়েছেন কার্ল মার্কস। এই পথে রয়েছে অনেক দুঃখ-দুর্দশা, অনেক ক্ষয়-ক্ষতি ও রক্তপাত। এই পথও দীর্ঘ কণ্টকপূর্ণ।

তাঁর মতে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকেই নৈতিক ধারণা বা আদর্শের জন্ম হয়। সমাজে মানুষের স্থান বা পদমর্যাদাই তার নীতিবোধের জন্ম দেয়। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করে। মার্কস ও তাঁর অনুসারীদের মতে, যে দিন সমাজ জীবন শোষণমুক্ত হবে, যেদিন সমাজ জীবন থেকে ধর্ম বিদায় গ্রহণ করবে, সে দিন ধর্মের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রও থাকবে না। রাষ্ট্র আসলে অপসারিত হয় না, এ ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সমালোচনা

Criticism

প্রথমত, জড়ের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অনুসরণ কৌতুকপ্রদ। জড়বাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ সাধারণভাবে আরোপিত হয়ে থাকে দ্বান্দ্বিক জড়বাদের বিরুদ্ধেও সেই সকল অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে। বিশ্বপরিকল্পনায় ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের ছাপ বিদ্যমান। জড় ও গতি জগতের শৃঙ্খলা, নিয়মতান্ত্রিক ও সৌন্দর্যের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না। প্রাণ, নিষ্প্রাণ জড় থেকে উদ্ভূত বলে স্বীকার করা যায় না, কেননা প্রাণের কতগুলি নির্দেশক বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবং এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য জড়ের মধ্যে নেই। আর, চৈতন্য বা মনকে মস্তিষ্কের উপবস্তু বলে মনে করা চলে না। আমরা জানি যে মনই দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে। মনকে আমরা জড়ের রূপান্তর বলে স্বীকার করতে পারি না। জড় আত্মসচেতন, আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম নয়। জড় চৈতন্যের দ্বারা চালিত। হেগেল দ্বান্দ্বিক বিবর্তনকে ধারণার ক্ষেত্রে সীমিত করে গেছেন। কিন্তু মার্কস অচেতন জড়ের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের ওকালতি করেছেন। অচেতন জড়ের ক্ষেত্রে সদর্থক ধারণা, নঞর্থক ধারণা ও সমন্বয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয়ত, বিপ্লব ও বিবর্তন এক কথা নয়। মার্কস ব্যক্তিকে সমাজের উপায় হিসেবে নির্দেশ করেছেন এবং ব্যক্তির গৌরব ক্ষুণ্ন করেছেন। তিনি মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা স্বীকার করলেও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক শক্তিই সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসের গতি ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনি মানুষকে অর্থনৈতিক অবস্থার দাসত্বে পরিণত করেছেন। মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্তনে অর্থনৈতিক শক্তির প্রভাব থাকলেও রাজনৈতিক, ধর্মীয়, কৃষ্টিগত, বাহুশক্তি মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি মনে করেন যে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আবার তিনিই সশস্ত্র বিপ্লবের সপক্ষে ওকালতি করেছেন। তিনি জগতের সকল বঞ্চিত সর্বহারা মানুষকে সম্মিলিত হয়ে রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমেই বিশ্বকে পুঁজিবাদীদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বিপ্লবকে বিবর্তন বলা চলে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে তিনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে বর্জন করেছেন।

তৃতীয়ত, দৈহিক অভাব নিরসনই মানুষের সব সমস্যার সমাধান নয়। মানুষ অর্থনৈতিক সত্তা নয় যে শুধু পেটের অভাব নিরসিত হলেই সে পূর্ণ সুখী হবে না পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকশিত হবে। মানুষ ভাত, কাপড় ও বাসস্থান পেলেই যে পরম পরিতুষ্ট– এমন নয়। মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন সত্তা, তার বুদ্ধিগত, নৈতিক ধর্মীয় ও সৌন্দর্যবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। পার্থিব প্রয়োজন চরিতার্থ হলেই সে পরিতৃপ্ত হয় না. মানুষের জীবনের আদর্শের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। মানুষের আদর্শ বাস্তব থেকে জাত নয়। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের জন্য মানুষের আকুলতার অন্ত নেই। ধর্ম মানুষকে এই কল্যাণের সাধনায় উৎসর্গ করে। ধর্ম মানবপ্রীতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বপ্রেম, অনন্তের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করে। ধর্ম মানুষের ঐশী প্রবণতার নিদেশ দেয়। জগতের বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক মানবসমাজকে কলুষমুক্ত করতে আবির্ভূত হয়েছেন। জগৎ যখন পঙ্কিলতার চরম সীমায় উপস্থিত তখন জগতে নবী বা রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। পৃথিবীর কোনো ধর্ম প্রচারক নিজের সুবিধার জন্য কোনো কাজ করেন নি। মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণের উদ্বোধনের জন্যই নবী, রাসূল এসেছেন। বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন সময়ে

মানব সভ্যতাকে উন্নত করার জন্যই নিয়োজিত হয়েছেন। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মানবসভ্যতার বিভিন্নমুখী প্রবণতা বিচার করলে একথা জোরালো ভাষায় বলা যায় যে, মানুষ দেহসর্বস্ব নয়, দৈহিক প্রয়োজনের বাইরে মনের বিভিন্ন চাহিদা মানুষকে নতুন সৃষ্টির পথে নিয়ে যায়। মানুষের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন প্রবণতাই সভ্যতার অগ্রগতির উৎস।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদের জ্ঞানের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ সত্য ব্যক্তিগত নয়– ব্যক্তিনিরপেক্ষ। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ জ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না। মার্কস জ্ঞানের সমস্যাকে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছেন– ব্যবহারিক ব্যাপারে রূপান্তরিত করেছেন।

শ্রেণীবিহীন সমাজব্যবস্থা বিবর্তনের শেষ নয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিবর্তনের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করলে শ্রেণীবিহীন সমাজ-ব্যবস্থাকে বিবর্তনের শেষ স্তর বলে গ্রহণ করা চলে না। শ্রেণীবিহীন সমাজ ব্যবস্থা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সদর্থক ধারণা (Thesis) ও তার বিপরীত ধারণা নঞর্থক ধারণা (Anti-thesis) মিলে এক সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হবে, এমনিভাবে বিবর্তন প্রক্রিয়া এগিয়ে চলবে। বিবর্তন পথিমধ্যে থামিয়ে যাওয়ার কোনো কথা নয়। বিবর্তন প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন, বিরামহীন। কাজেই শ্রেণীবিহীন সমাজ ব্যবস্থা বিবর্তন প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ স্তর থেকে পারে না।

এ ছাড়া দ্বান্দ্বিক জড়বাদ সমাজ বিবর্তনে যে ধারণা করে তা কল্যাণপ্রসূ নয় এবং তা একটি প্রকল্প মাত্র। সমাজ-জীবনের বৈষম্য ও তারতম্য দূরীকরণে এই মতবাদ আপাত-মধুর মনে হলে স্থায়ী ফলপ্রদ মনে করার যথার্থ কারণ নেই। সর্বহারাদের একনায়কত্ব মানুষের স্বাধীনতা অস্বীকার করে, চিন্তা ও প্রকাশের অধিকার ছিনিয়ে নেয়, আত্মিক শক্তিকে শৃঙ্খলিত করে তাকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে। মার্কসের দ্বান্দ্বিক জড়বাদের গুরুত্ব এই যে, তিনি সমাজ-জীবনের এক বড় অমঙ্গলকে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, তবে তিনি তার সমাধানের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা সুস্থ মস্তিষ্কে গ্রহণ করা চলে না।

মানুষ আদর্শের পূজারী। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শ মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রেরণা খোদা বা স্রষ্টা ছাড়া মানুষের জীবনের মহত্তর দিকের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। কাজেই দ্বান্দ্বিক জড়বাদ স্রষ্টা, ধর্ম, নীতিবোধ ও আদর্শকে উড়িয়ে দিয়ে মানবজীবনকে জটিলতামুক্ত পশুর জীবনে রূপান্তরিত করে। মানুষ ও পশুতে কোনো পার্থক্য স্বীকার না করলে মার্কসের মতবাদ পুরাপুরি গ্রহণ করায় কোনো আপত্তি নেই।

৩। অদ্বৈতবাদ

Monism

বহুবাদ জগৎ-সত্তার মধ্যে কোনো ঐক্যের সন্ধান দিতে পারে না, তাই এই মতবাদ জগতের বৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে। অপরপক্ষে দ্বৈতবাদ জড় ও মনের মধ্যে বিরোধ প্রতিষ্ঠিত করে দার্শনিক চিন্তাকে বিষায়িত করে তোলে। অদ্বৈতবাদ এই সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে পরমসত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারে এবং তার প্রকৃতির যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে। অদ্বৈতবাদ অনুসারে, জগতে অনন্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে

একমাত্র এক পরমসত্তা বিরাজিত। সকল বৈচিত্র্য, সকল বহুত্ব একই শক্তি থেকে উৎসারিত হয়েছে। অল্পকথায়, বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ একই পরমসত্তার বাহ্য প্রকাশ। বিশ্বজগৎ পরমসত্তার অবভাসিক দিক, পরমসত্তার মূর্ত প্রকাশ। অদ্বৈতবাদের দ্বিবিধ রূপ আছে : (১) অমূর্ত অদ্বৈতবাদ (Abstract Monism) এবং (২) মূর্ত অদ্বৈতবাদ (Concrete Monism)।

৩.১। অমূর্ত অদ্বৈতবাদ (Abstract Monism) : এই মতবাদ অনুসারে পরমসত্তা একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। এই জগতের বহুত্ব ভ্রম, এ অবভাস মাত্র। এর কোনো পারমার্থিক সত্যতা নেই। কেবল বিশেষ প্রণালি, বিশেষ আত্মসচেতন জীবের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। একমাত্র পরমসত্তাই সত্য আর সব মিথ্যা। অমূর্ত অদ্বৈতবাদ বহুকে একের বেদিমূলে কোরবানি দিয়ে থাকে। দার্শনিক স্পিনোজা (Spionza) এইমতবাদের বিশিষ্ট সমর্থক ও প্রচারক। তাঁর মতে, পরমসত্তা একমাত্র সত্তা- এই এক অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অসীম। তিনি পরমসত্তাকে একমাত্র দ্রব্য বলে মনে করেন। এই দ্রব্যের অসংখ্য গুণ রয়েছে– এগুলির মধ্যে আমরা দুটি গুণকে জানতে পারি। এই দুটি গুণ হলো বিস্তৃতি ও চেতনা। জগতের বিভিন্ন বস্তু এই দুটি গুণের সীমিত প্রকাশ। গুণ ও চেতনার কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। একমাত্র দ্রব্যের সত্তা আছে– কারণ দ্রব্য স্ব-নির্ভর। এই দ্রব্য হলো খোদা। স্পিনোজার এই অমূর্ত অদ্বৈতবাদ সর্বখোদাবাদ (Pantheism) নামে পরিচিত।

সমালোচনা

Criticism

এই মতবাদ ত্রুটিমুক্ত নয়। এই মতবাদ এককে বহু থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অথচ বহুর মধ্যে দিয়েই একের প্রকাশ ঘটে থাকে। বৈচিত্র্য ছাড়া ঐক্য অনুধাবনযোগ্য নয়। বৈচিত্র্য ও ঐক্য, এক ও বহু পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, এ ছাড়া এই মতবাদের অনিবার্য পরিণতি সর্বখোদাবাদ বাস্তবকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়।

৩.২. মূর্ত অদ্বৈতবাদ (Concrete Monism) : এই মতবাদ অনুসারে জগতের মূলে এক পরমসত্তা বিদ্যমান। এই পরমসত্তাই বহুর মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করছেন, এই প্রকাশের মধ্য দিয়েই নিজেকে উপলব্ধি করছেন। জার্মান দার্শনিক হেগেল এই মতবাদের প্রবর্তক ও প্রচারক। তাঁর মতে, পরম ধীশক্তি (Abstract Monism) বা খোদা একমাত্র সত্তা। পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগৎ এই শক্তিরই মূর্ত প্রকাশ। জগৎ মিথ্যা নয়, বস্তু অলীক নয়। এই বিচিত্র বিশ্বজগৎ পরম ধীশক্তির প্রকাশ বলে মিথ্যা নয়। পরম ধীশক্তি বহুর মধ্যে দিয়ে মূর্ত হচ্ছে, আর বহু বিচিত্র বিশ্বজগৎ একের মাধ্যমে অস্তিত্বশীল হচ্ছে। একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে এক– এক অপূর্ব ঐক্যে সংহত।

বিজ্ঞান ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম পরমসত্তায় বিশ্বাসী : সাম্প্রতিক দর্শনে ব্রাডলি, বোসানকে, ক্রোচে ও জেনটিলে আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদের সমর্থক। তাঁদের সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও বহুবাদের তুলনায় উত্তম মতবাদ। পরমসত্তা একাধিক হতে পারে না। পরমসত্তা একাধিক হলে তাঁদের মধ্যে অনিবার্য সংঘাত সৃষ্টি হওয়া বা দ্বন্দ্ব-কলহ বাধা স্বাভাবিক। এই অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। বিজ্ঞান অদ্বৈতবাদের কথাই তার স্বরে ঘোষণা করছে। আধুনিক পদার্থবিদ্যা একই শক্তি লীলা-নিকেতন হিসেবেই

জগৎকে ব্যাখ্যা করছে। ইসায়ী ও ধর্ম ও ইসলাম তৌহিদকে বড় করে দেখেছে, মানুষকে এক আল্লাহর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের প্রয়াস পেয়েছে, কোরআন মজীদের ছত্রে ছত্রে তৌহিদেরই উদাত্ত ঘোষণা :আল্লাহু আহাদ আল্লাহু আহাদ–আল্লাহ এক– আল্লাহ এক।

৪। দ্বৈতবাদ

Dualism

দ্বৈতবাদ অনুসারে সত্তার সংজ্ঞা এক নয়– দুই। 'দ্বৈতবাদ' শব্দটি দর্শনে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রথমত, দ্বৈতবাদ ভালো ও মন্দ সকল জাগতিক বস্তুর মূলীভূত উপাদান– দুটি নীতিতে বিশ্বাস বুঝায়। পারস্যের প্রাচীন ধর্মে 'আহরিমান' ও 'আহুরা মাজদা' যথাক্রমে অকল্যাণ ও কল্যাণের নীতি বা শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। এদেরকে চিরন্তন নীতি বা শক্তি বলে মনে করা হতো। এই ধরনের দ্বৈতবাদের মাধ্যমে জগতের অকল্যাণের অবস্থিতি সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। কিন্তু দর্শনের ইতিহাসে এই ধরনের লৌকিক, অগভীর ও নির্বিচারমূলক ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়।

আধুনিক দর্শনে দ্বৈতবাদ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী জগতে দুটি মৌলিক উপাদান একটি জড় ও অপরটি মন। এরা পরস্পর নিরপেক্ষ সত্তা, এদের একটিকে অপরটিতে পরিণত করা যায় না। এই জগতের অস্তিত্বশীল বস্তুকে জড়াত্মক ও মানসিক– এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

গ্রিক দার্শনিক ও দেকার্তে : গ্রিক দার্শনিক অ্যানাক্সিগোরাস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শনে দ্বৈতবাদ আভাসিক হলেও আধুনিক দর্শনেও দেকার্টের মাধ্যমেই আমরা যথার্থ দ্বৈতবাদের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকি। দুটি বিপরীত ধর্মীয় সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসই দেকার্টের দ্বৈতবাদের মূল নীতি। তাঁর মতে, জড় ও মন দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র দ্রব্য। জড় বিস্তৃত, মন চেতন। জড়ের কোনো চেতনা নেই, মনেরও কোনো বিস্তৃতি নেই। কাজেই জড় ও মন দুটি পরস্পরবিরোধী সত্তা। জড় যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা চালিত আর মন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দ্বৈতবাদের দ্বিবিধ রূপ রয়েছে। যথা– শর্তসাপেক্ষ দ্বৈতবাদ (Conditional Dualism) এবং পরম দ্বৈতবাদ (Absolute Dualism)। শর্তসাপেক্ষ দ্বৈতবাদ অনুসারে, খোদা জগতের একমাত্র পরমসত্তা এবং বিপরীত ধর্ম জড় ও মনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা তাঁর কাজ। জড় ও মন মূলত একই পরমসত্তা খোদার ওপর নির্ভরশীল। দেকার্টের মতবাদই নিয়ন্ত্রিত দ্বৈতবাদ। পক্ষান্তরে, পরম দ্বৈতবাদ অনুসারে জগতের মূলে অবস্থিত দুটি পরম বাস্তব সত্তার স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীনতা একটি কল্যাণকর শক্তি শুভ ও মঙ্গলের প্রবর্তক, এই শক্তি জগতের কল্যাণ আনয়ন করতে চেষ্টা করে; কিন্তু অকল্যাণকর শক্তি অশুভ, অমঙ্গলের উদ্ভোবনের জন্য সতত সচেষ্ট। কাজেই প্রত্যেক মুহূর্তে শুভ ও অশুভ শক্তির মধ্যে সংঘাত লেগেই আছে। এই নিরন্তন দ্বন্দ্বের সদর ফটক দিয়ে মঙ্গল ও অমঙ্গল শুভ ও অশুভ উভয়ই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সমালোচনা

Criticism

দ্বৈতবাদ লৌকিক মতবাদের শামিল– এই মতবাদ অনেকটা সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণার প্রতিনিধি স্থানীয়। পরম দ্বৈতবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা সন্তোষজনক। কেননা,

কল্যাণকর সত্তা যদি অকল্যাণকর শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে শুভ বা মঙ্গলের উদ্বোধন করে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তবে সে শক্তিকে পরম শক্তি বলা যায় না এবং এমন শক্তি পরমসত্তা পদবাচ্য নয়। এই দুই সংঘর্ষরত শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এক উচ্চতর শক্তির প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং এমন একটি শক্তির অস্তিত্ব যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক।

দ্বিতীয়ত, নিয়ন্ত্রিত দ্বৈতবাদের ক্ষেত্রেও যে পরমসত্তার ধারণা আমরা করি, তাকে প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। এ ছাড়া দেকার্টের মতবাদ আধুনিক দর্শনের যুগান্তর আনয়ন করলেও পরমসত্তার ব্যাখ্যা হিসেবে এই মতবাদ বিভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

তৃতীয়ত, সাধারণভাবে দ্বৈতবাদ দার্শনিক মতবাদ হিসেবে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয়। কারণ বিশ্ব-পরিকল্পনায় যে ঐক্য ও সংহতি বিদ্যমান, এই মতবাদ তা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৫। বহুবাদ
Pluralism

এই মতবাদ অনুসারে এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে এক বা দুই পরমসত্তার অস্তিত্ব যুক্তিযুক্ত নয়। এই বিচিত্র জগতের মূলে রয়েছে অগণিত পরমসত্তা। এই অগণিত সত্তাই পরিদৃশ্যমান জগতের বহুমুখী, বিচিত্র লীলা-চাঞ্চল্যের জন্য দায়ী। এই মতবাদ অনুসারে জগৎ অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার লীলা-নিকেতন। বহুবাদের নিম্ন রূপ রয়েছে : (১) জড়াত্মক বহুবাদ (Materialistic Pluralism/Atomism), (২) আধ্যাত্মিক বহুবাদ (Spiritualistic Pluralism/Monadism) ও (৩) প্রয়োগবাদী বহুবাদ (Pragmatic Pluralism)।

৫.১. জড়াত্মক বহুবাদ (Materialistic Pluralism/Atomism) : জড়াত্মক বহুবাদের নাম হলো পরমাণুবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, বিশ্বজগতের মূলে রয়েছে অসংখ্য জড়াত্মক সত্তা বা পরমাণু। পরমাণু হলো আদিম ও অবিভাজ্য জড়, এ আত্মনির্ভর ও স্বতন্ত্র। অসংখ্য পরমাণু সমন্বয়ে এই জগৎ গঠিত। পরমাণুবাদীদের মধ্যে আবার মতভেদ বর্তমান। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এম্পিডক্লসের মতে, জগতের মূলীভূত উপাদান বা পরমসত্তা সংখ্যায় চারটি : অগ্নি, বায়ু, পানি ও মৃত্তিকা। সাধারণভাবে গ্রিক পরমাণুবাদীরা বহুবাদের সমর্থক কারণ হিসেবে মনে করেন, জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য বর্তমান তা স্বীকার করেন নি। সচল জড়বাদীদের পূর্ববর্তী পরমাণুবাদীরাও বহুবাদী। কারণ তাঁরা জগতের মূলীভূত কারণ ১০৪টি উপাদানের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন, যেগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর মূল।

সমালোচনা
Criticism

এই মতবাদ বিভিন্ন কারণে সন্তোষজনক নয় ঃ

প্রথমত, এই মতবাদ সচল জড়বাদ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ জীবন ও চৈতন্যের উদ্ভবের কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে না এবং তাদের স্বরূপও ব্যাখ্যা করতে পারে না।

তৃতীয়ত, এই মতবাদ জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতে কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই জগৎ এক বিরাট অন্ধ যান্ত্রিক শক্তির পরিণতি, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না।

৫.২ আধ্যাত্মিক বহুবাদ (Spiritualistic Pluralism/Monadism) :

চিৎপরমাণু : এই মতবাদ চিৎপরমাণুবাদ (Monadism) নামেও অভিহিত। জার্মান দার্শনিক লিবজিন এই মতবাদের সমর্থক ও প্রচারক। তাঁর মতে জগতের আদিম উপাদান হলো চিৎপরমাণু (Monad)। চিৎপরমাণু আত্মনির্ভর সক্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক চিৎপরমাণু গবাক্ষশূন্য (windowless)। এইগুলি পরস্পর ক্রিয়া করতে পারে না। এখন প্রশ্ন ওঠে : এইগুলি যদি পরস্পর ক্রিয়া না করতে পারে তবে কি করে তাদের মাধ্যমে জগতের বিভিন্ন সত্তা উদ্ভূত হয়? চিৎপরমাণু বিভিন্ন। জীবাত্মার চিৎপরমাণু আত্মসচেতন, প্রাণির চিৎপরমাণু চেতন, উদ্ভিদের চিৎপরমাণু অবচেতন। জড় নির্জ্ঞান চিৎপরমাণু।

লিবনিজ বলেন গবাক্ষহীন হলেও চিৎপরমাণুর মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। তাঁর মতে বিশ্বজগৎ চিৎপরমাণুর সমবায়ে গঠিত। চিৎপরমাণু সংখ্যায় অগণিত। খোদা শ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু (The monad of the monads)। তিনি চিৎপরমাণুসমূহ সৃষ্টি করেছেন। গবাক্ষহীন আত্মনির্ভর চিৎপরমাণুসমূহের মধ্যে তিনি পূর্বেই শৃঙ্খলা বা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এই মতবাদের মাধ্যমেই লিবনিজ বিভিন্ন বস্তুর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন।

সমালোচনা

Criticism

আধ্যাত্মিক বহুবাদও সন্তোষজনক মতবাদ নয়। কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু অন্যান্য গবাক্ষহীন চিৎপরমাণুর মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে কিংবা শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করে তা বুঝে ওঠা সুকঠিন। এ ছাড়া এই মতবাদ জগতের ঐক্য, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৫.৩. প্রয়োগবাদী বহুবাদ (Pragmatic Pluralism)

প্রয়োগবাদের বিখ্যাত প্রবর্তক উইলিয়ম জেমস অদ্বৈতবাদের নির্মম সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, অদ্বৈতবাদীরা জগতের বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেন না। এই জগৎ পরমসত্তার প্রকাশ– জেমস হেগেলের এই মত অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, হেগেলের এই মত স্বীকার করলে জগতের স্বাধীনতা ও অভিনবত্ব অস্বীকার করতে হয়। এই জগৎ খোদানির্ভর জগৎ নয়। এই জগৎ বহু বস্তুর সমষ্টি। এইসব বস্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এই জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বস্তুর বৈচিত্র্য স্বাতন্ত্র্য ও বিশৃঙ্খলা আমাদের চোখে পড়ে। এই জগৎ আসলে এ জগৎ (Universe)নয়– অজস্র জগৎ (Multiverse)এই জগত খোদা নিয়ন্ত্রিত আবদ্ধ জগৎ নয়। এখানে নতুনত্বের অবকাশ রয়েছে, বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। প্যাট্রিকের উক্তি এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। জেসম একটিতে নয়, বহুতে আগ্রহী ছিলেন। বস্তুসমূহের সার্বিক রূপ অপেক্ষা তাদের পৃথক রূপ, তাদের স্বাতন্ত্র্য, বিচ্ছন্নতা, তাদের স্ব-নির্ভরতা, তাদের অভিনবত্ব, তাদের স্বাধীনতা, তাদের অনিশ্চয়তা, তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা, তাদের

বহুত্ব– এমন কি তাদের বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি তাকে মুগ্ধ করেছিল। পূর্ণ ঐক্য সমন্বিত কোনো আবদ্ধ জগতের সন্ধান তিনি পান নি।"[১]

সমালোচনা

Criticism

এই মতবাদ জগতের ঐক্য ও সংহতি ব্যাখ্যা করতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে জগৎ বহু বস্তুর সমষ্টি বলে মনে হয় কিন্তু আসলে এই জগৎ নিয়মের রাজত্ব। জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে বাহ্য সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি একটা আন্তর সম্পর্কও রয়েছে। এই জগৎ বিভেদের মধ্যে ঐক্য– বহুর মধ্যে এক।

---

[১] James was interested not in the one but in the many, it is the each form rather than all form of thing that impressed him-their discreteness, their separateness, their independence, their novelty, their freedom, their contingency, their spontencity, their manifold even, their chaotic character. He did not find any 'block universe' with a through and through unity. – Patrick : *Introduction to Philosophy.*

চতুর্থ অধ্যায়
আত্মা/মন
SOUL/MIND/SELF

"That characterises man as man, is precisely the presence in him of abstract ideas, of moral idea, of spiritual ideas and its is only of these that he can be proud. They are as real as his body and confer to this body a value and importacne which it would be far from without them. – **Lecomte Du Nouy – Human Destiny**

- ❑ **মন কাকে বলে**
- ❑ **মন ও চেতনা**
- ❑ **আত্মা/মন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ**
- ❑ **দেহ-মনের সম্পর্ক**

১। মন কাকে বলে?

What is soul/Mind/Self ?

'আত্মা', 'মন' ইত্যাদি শব্দ আমাদের কাছে পরিচিত। 'আত্মা' শব্দটি ধর্মশাস্ত্রে, প্রাচীন দর্শনে, মরমি সাহিত্যে সমধিক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানে, সাধারণ কথা বর্তায় 'মন' কথাটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণভাবে আত্মা মনের চেয়ে উচ্চতর স্তরে সত্তা হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে আত্মা বা মন (Soul/Mind/Self) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চৈতন্য মনের ধর্ম। মনের সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করা সম্ভব নয়। মন বলতে আমরা আত্মসচেতন সত্তা বুঝে থাকি। চৈতন্যের দ্বারাই মনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় যেখানে মন আছে সেখানে চৈতন্য আছে, যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে মন আছে। মন ও চৈতন্য অবিচ্ছেদ্য। কাজেই মনকে আত্মসচেতন সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করলে মনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।

দর্শনে 'মন' কথাটি তিনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে :

প্রথমত, 'মন' বলতে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত স্থায়ী পরিবর্তিত আধ্যাত্মিক সত্তা বুঝায়।

দ্বিতীয়ত, 'মন' বলতে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি বুঝায়, কোনো স্থায়ী সত্তা বুঝায় না।

তৃতীয়ত, 'মন' বলতে এক মূর্ত আধ্যাত্মিক ঐক্য (concrete spiritual unity) বুঝায়, যা বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করে তুলছে এবং স্বতন্ত্র রক্ষা করে চলেছে। মনের এই ত্রিবিধ অর্থ থেকে মন সম্পর্কে তিনটি মতবাদ উৎসারিত হয়েছে। যথা : আধ্যাত্মিক সত্তা মতবাদ, অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ ও ভাববাদী মতবাদ।

২। মন ও চেতনা

Mind and Consciousness

মন ও চেতনাকে অনেক সময় সমার্থক বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে মন ও চেতনা এক জিনিস নয়। চেতনার যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারিত না হলেও চেতনার বিশিষ্ট আলোচনার মাধ্যমে চেতনাকে চিনতে কষ্ট হয় না। চেতনা মূলত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়, উপলব্ধির বিষয়।

চেতনার বিভিন্ন অর্থ : প্রথমত, চেতনা হলো মনের নিজের অবস্থা সম্পর্কে বোধ।

দ্বিতীয়ত, চেতনা হলো চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সাধারণ লক্ষণ।

তৃতীয়ত, চেতনা হলো মনের ধর্ম।

চতুর্থত, চেতনা হলো জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র সম্পর্ক নির্দেশক।

আমরা উপরোক্ত বিভিন্ন অর্থে চেতনার ব্যাখ্যা দিতে পারি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে চেতনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা চেতনাকে দেহযন্ত্রের ক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে, চেতনা বলে কোনো মানসিক অবস্থার সাথে আমরা পরিচিত নই।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড ও তাঁর সমর্থকদের মতে, চেতনা জীবনীশক্তির অচেতন উপাদান থেকে মনের ধারণা ও মানসিক অবস্থান। আধুনিককালে চেতনার প্রাচীন ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানকালে চেতনা বলতে আন্তর অভিজ্ঞতা বুঝায়। এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তির কাছে সীমিত, অভিজ্ঞতার অধিকারী ছাড়া অন্য ব্যক্তি জানতে পারে না। অধ্যাপক হরিমোহন ভট্টাচার্য বলেন, "যাকে আমরা বাহ্যত মন বলি তাই অবগত হওয়ার রূপ যে অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া, তাই হলো চেতনা।"[১] জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র মধ্যে সম্বন্ধ মানসজীবনের বাহ্য ক্রিয়াসমূহের যোগসূত্র।

৩। আত্মা/মন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

Theories of Soul/Mind/Self

আত্মা বা মন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। একে একে সেগুলি আলোচিত হচ্ছে :

৩.১. আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদ (Theory of Soul Substance) : এই মতবাদ অনুসারে আত্মা আমাদের মানসিক অবস্থা ও প্রক্রিয়ার মূলীভূত দেহাতিরিক্ত এক অপরিবর্তনীয় আধ্যাত্মিক দ্রব্য। আমাদের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া ও অবস্থার মূলীভূত অন্তরালবর্তী এক সত্তা সমগ্র মানসজীবনের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করছে, এই সত্তা হলো আত্মা। মানসজীবন নিয়ত পরিবর্তনশীল। চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন চলছে। এ নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে কোনো স্থায়িত্ব না থাকলে মানসজীবনের কোনো অর্থ হয় না। কাজেই মানস প্রক্রিয়াও অবস্থার মূলে স্থায়ী আত্মার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই অপরিবর্তিত সত্তার প্রয়োজনীয়তা থেকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদের উদ্ভব হয়েছে।

দর্শনের ইতিহাসে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, দেকার্তে, লক, বার্কলি প্রমুখ দার্শনিক এই মতবাদ সমর্থন করেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁদের মতবাদ প্রদত্ত হলো।

---

[১] Consciousness is the inner function of awareness on the part of that which are externally called Mind. – H. M. Bhattacharyya.

প্লেটো (Plato) : গ্রিক দার্শনিক প্লেটো আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদের অন্যতম বিখ্যাত প্রবর্তক। তাঁর মতে, আত্মা হলো আধ্যাত্মিক দ্রব্য। এই আধ্যাত্মিক দ্রব্য চিন্তা, আবেগ ও ইচ্ছার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। প্লেটো 'চিন্তা' কথাটি প্রজ্ঞা (Reason) অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রজ্ঞা বা চিন্তা আত্মার বিশুদ্ধ ক্রিয়া; আবেগ ও ইচ্ছা আত্মার নিকৃষ্ট ক্রিয়া, কারণ আবেগ ও ইচ্ছার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক রয়েছে। প্রজ্ঞা সনাতন; ইচ্ছা অনুভূতি সনাতন নয়; কেননা এরা দেহনির্ভর।

প্লেটোর মতে, আত্মা অমর, অবিনশ্বর। এক শাশ্বত অমর জগতে আত্মার অধিষ্ঠান। জন্মের সময় আত্মা দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়, আবার মৃত্যুর পর আত্মা দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় ও আপন জগতে ফিরে যায়। এই জগেত আত্মা বন্দির জীবনযাপন করে। আত্মা স্বরূপত বিশুদ্ধ দেহের সংস্পর্শে আসার জন্য আত্মার কামনা-বাসনা জন্মে, সুখ-দুঃখ ভোগ ঘটে।

অ্যারিস্টটল (Aristotile) : প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল। গুরুর মতো অ্যারিস্টটলও আত্মার আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদ স্বীকার করেন। তাঁর মতে, আত্মা দেহের অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক দ্রব্য। বুদ্ধি আত্মার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। বুদ্ধির দুটি দিক আছে : সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। মৃত্যুর সঙ্গে আত্মার নিষ্ক্রিয় দিকটি শেষ হয়ে যায় এবং সক্রিয় দিকটি অবশিষ্ট থাকে। তিনি আত্মাকে অতীন্দ্রিয় জগতের অধিবাসী হিসেবে মনে করেন না। তাঁর মতে, দেহই আত্মার অধিষ্ঠান।

অ্যারিস্টটল দেহ ও আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। তাঁর মতে, আত্মা দেহের আকার, দেহ আত্মার উপাদান। আত্মা দেহকে পরিচালিত করে, আত্মা দেহের সংগঠন (Organisation)। তবে এ দৈহিক সংগঠন নয়, আত্মিক সংগঠন।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতবাদ সে যুগের অনেক দার্শনিক ও চিন্তাবিদ গ্রহণ করেছিলেন।

দেকার্তে (Descrates) : আধুনিক দর্শনে দেকার্তে, লক ও বার্কলি প্লেটোর আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদের পুনরুজ্জীবন দান করেন। দেকার্তের মতে, আত্মা আধ্যাত্মিক এবং চিন্তন বা চেতনা আত্মার বিশুদ্ধ ক্রিয়া। অবশ্য আত্মা ও চেতনা অভিন্ন নয়, তবে আত্মা আধ্যাত্মিক দ্রব্য, চেতনা আত্মার ধর্ম। আত্মা ও জড় পরস্পরবিরোধী দ্রব্য– আত্মার গুণ চেতনা, আর জড়ের গুণ বিস্তৃতি। প্রত্যক্ষ অনুভবের সাহায্যে আত্মাকে জানা যায়। আত্মার অস্তিত্ব সন্দেহের অতীত। আমি চিন্তা করি, কাজেই 'আমি অস্তিত্বশীল' এই যুক্তি অবলম্বনে দেকার্তে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আমরা পৃথিবীর সবকিছুই সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু সন্দেহকারী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারি না। সন্দেহ করা মানে চিন্তা করা; চিন্তা করা মানে চিন্তার একজন কর্তা আছে তা স্বীকার করা। সুতরাং চিন্তাকারীর অস্তিত্ব নিশ্চিত হলো।

আত্মাকে দেহাতিরিক্ত সচেতন দ্রব্য মনে করা হয় এই জন্য যে মানসিক প্রক্রিয়ারসমূহের আধার হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কাজেই দেকার্তের মতে, মানবসত্তার অস্তিত্ব বর্তমান এবং বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করে।

জন লক (John Locke) : দার্শনিক জন লকের মতে, আত্মা আধ্যাত্মিক দ্রব্য। চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্নভাবে টিকতে পারে না। এদের একটা আশ্রয় প্রয়োজন। মানসিক প্রক্রিয়ার এই আশ্রয়ের নাম আত্মা। আত্মা

প্রত্যক্ষীভূত না হলেও অনুভবের সাহায্যে জটিল ধারণা গঠন করতে পারে। আত্মা ও জড় পরস্পর পৃথক। আত্মার চৈতন্য আছে, জড়ের তা নেই।

আত্মা বিবিধ উৎস থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে– সংবেদন এবং অন্তর্দর্শন। আত্মা কোনো সহজাত ধারণার অধিকারী নয়। অভিজ্ঞতাই সব জ্ঞানের উৎস। যদিও আত্মা বহির্জগৎ থেকে ধারণা আহরণ করতে পারে না তথাপি বিভিন্ন ধারণার মধ্যে তুলনা ও সংযোগের সাহায্যে জটিল ধারণা গঠন করতে পারে।

জর্জ বার্কলি (Gerorge Berkeley) : বার্কলিও আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আত্মা ধারণা সম্পর্কে অবহিত এবং ধারণার ওপর ক্রিয়া করে। ধারণা নিষ্ক্রিয় এবং আত্মা সক্রিয়। আত্মা প্রত্যক্ষ করে, ধারণা এই প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু। আত্মাকে বাহ্যত প্রত্যক্ষ করা না গেলেও আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অনুভবের সাহায্যে জানা যায়। ধারণা নিজে নিজের সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না; সুখ নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে না; ইচ্ছা নিজেকে ইচ্ছা করতে পারে না। এই সকল মানসিক প্রক্রিয়ার অধিকর্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। আত্মা সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মাতে পারে না, কেননা আত্মা জ্ঞেয় বস্তু নয়, আত্মা সব সময়ই জ্ঞাতা। আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস জন্মে, বুদ্ধির সাহায্যে আত্মাকে সরাসরি জানা যায়।

বার্কলির মতে, ধারণার অতিরিক্ত এমন সত্তা আছে যা চিন্তা করে, ইচ্ছা করে ও অনুভব করে। বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাই হলো আত্মা। আত্মা বলতে বার্কলি এমন আধ্যাত্মিক দ্রব্য বুঝেন যার চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছার শক্তির আছে। তিনি আত্মার দুটি ক্রিয়ার ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেছেন : প্রত্যক্ষণ ও ইচ্ছা (Perceiving and willing)।[১] আত্মা সরল ও অবিভাজ্য দ্রব। আত্মা সক্রিয় দ্রব্য। আত্মা বা মন ধারণা প্রত্যক্ষ করে এবং ধারণার ওপর ক্রিয়া করে।

বার্কলি জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। জড় মনের ধারণা ছাড়া কিছু নয়। পক্ষান্তরে, আত্মা অবিনশ্বর অধ্যাত্ম দ্রব্য-ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। আত্মা ধারণা প্রত্যক্ষ করে, ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করে, ইচ্ছা করে ও বিচার করে।

সমালোচনা
Criticism

আধুনিক যুগে আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদ তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিউম ও কান্ট এই মতবাদকে নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন।

হিউম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে, যা আমার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাই না, তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি না। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা আত্মাকে স্থায়ী আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে জানতে পারি না। সুতরং আত্মা যে আধ্যাত্মিক দ্রব্য তার কোনো বাস্তব প্রমাণ নেই। অন্তর্দর্শনে আমরা কতগুলি পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ পাই। এই পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থাই আসলে আত্মা বা মন। এই ক্ষণস্থায়ী মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ/অবস্থাসমূহের পশ্চাতে অপরিবর্তিত স্থায়ী আত্মা নেই।

---

[১] A spirit is one simple, undivided active being; as perceives ideas it is called the understanding and as it produces or otherwise operates about them it is called the will. – Berkely.

দার্শনিক কান্ট এক নতুন দিক থেকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই মতবাদ স্ব-বিরোধী। আমরা বলি, আত্মা আধ্যাত্মিক দ্রব্য, অবিনশ্বর ও দেহ থেকে স্বতন্ত্র সত্তা, ফলে আত্মা জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে পর্যবসিত হয়, যেমনভাবে অন্যান্য বস্তু আমাদের জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে পর্যবসিত হয়। কান্ট মনে করেন যে, আত্মা সব সময়েই জ্ঞাত। এ জ্ঞানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। অতীন্দ্রিয় হলো জ্ঞাতা, এ কখনও জ্ঞেয় হতে পারে না। আমরা যা জানি তা আমাদের ব্যবহারিক আত্মা (Empirical self), অর্থাৎ আমাদের পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা। সুতরাং আমরা জানি 'আমাকে' (me) 'আমিকে' (I) নয়। এছাড়া এই মতবাদের বিরুদ্ধে অপর একটি যুক্তি প্রদান করা হয়। যদি নিষ্ক্রিয় আত্মা নিষ্ক্রিয় অপরিবর্তিত দ্রব্য হয় তবে পরিবর্তনশীল পরস্পর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে ঐক্যবদ্ধ করাও সম্ভব নয়। আত্মা মানসিক অবস্থানসমূহের আধার রূপে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় তা বোধগম্য নয়। আর নিষ্ক্রিয় আত্মার পক্ষে সক্রিয় অভিজ্ঞতাকে বেঁধে রাখা সম্ভব কীভাবে তা বুঝা যায় না।

আরও একটি কথা এই যে, আধ্যাত্মিক দ্রব্য রূপে আত্মা নৈর্ব্যক্তিক, অমূর্ত (Abstract) ধারণা। কেননা গুণ ছাড়া দ্রব্যের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নয়। গুণের মধ্য দিয়েই দ্রব্যের প্রকাশ। কাজেই নির্গুণ কোনো সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

সুতরাং আত্মা সম্পর্কীয় আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়।

৩.২. অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ (The Empirical Theory of Mind) : হিউম মিল প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক মনে করেন যে, আত্মা এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য এমন কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে জানতে পারি না। অভিজ্ঞতায় আমরা যা পাই তা হলো অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি।

ডেভিড হিউম একজন বিখ্যাত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতা আমাদের জ্ঞানের সাফাই; অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায় না তার অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না। অভিজ্ঞতায় আমরা কোনো অপরিবর্তনীয় আত্মার সাক্ষাৎ পাই না। কাজেই হিউম মনে করেন যে, মন মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আত্মা বা মন এই বিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া বা অবস্থাসমূহের মধ্যে ঐক্যসমূহ নয়। আত্মা কোনো নয় যার চিন্তা অনুভূতির ও ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া আছে। এই সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া অনুষঙ্গের নিয়মাবলির (Law of Association) দ্বারা যুক্ত। এ জন্য মনের ঐক্যবিধায়ক শক্তির প্রয়োজন হয় না।

হিউম বার্কলির 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মন-আত্মার ক্ষেত্রে এই মতবাদ প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার মূলীভূত স্থায়ী সত্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে হিউম বলেন, "কোনো কোনো দার্শনিক এই ধরনের কল্পনা করে থাকেন যে আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে অন্তরঙ্গভাবে আমাদের আত্মা সম্পর্কে সচেতন, আমরা আত্মার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব অনুভব করি এবং অভেদাত্মতা ও সরলতা সম্পর্ক স্থির নিশ্চিত। আমার দিক থেকে যখনই আমি অন্তরঙ্গভাবে আমার নিজের মধ্যে প্রবেশ করি তখনই আমার কোনো না কোনো বিশেষ সংবেদনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে আর তা হচ্ছে উষ্ণ অথবা শীতল, আলো

অথবা ছায়া অনুরাগ অথবা বিরাগ, সুখ অথবা দুঃখের সংবেদন। কোনো সময়েই সংবেদন ছাড়া অন্যকিছু আমার নাগালে আসে না এবং সংবেদন ছাড়া অন্য কিছুই আমি প্রত্যক্ষ করি না।"[১] সুষুপ্তির মধ্যে আমাদের কোনো আত্মা-জ্ঞান থাকে না। আমরা আছি কি-না আছি তা বুঝতে পারি না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত দৈহিক সংবেদন তিরোহিত হয়, তখন আমাদের মন সম্পর্কে কোনো জাগৃতি থাকে না। বিভিন্ন সংবেদন আবির্ভূত হচ্ছে, মঞ্চের উপর চলাফেরা করছে এবং বিচিত্র ভঙ্গি ও অবস্থার মধ্যে মিলিত হচ্ছে। সংবেদনের যাতায়াতের মধ্যে সরলতা বা অভিন্নতা নেই। মঞ্চের তুলনা যেন আমাদের বিভ্রান্ত না করে। মন বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমষ্টি মাত্র।"[২]

এখন প্রশ্ন ওঠে : কোনো স্থায়ী সত্তা না থাকলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সংবেদন কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে? হিউম মনে করেন যে অনুষঙ্গের নিয়মই (Law of association) বিচ্ছিন্ন সংবেদনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। অনুষঙ্গের নিয়ম তিনটি যথা– সাদৃশ্য নিয়ম (Law of similarity), সান্নিধ্য নিয়ম (Law of contiguity) ও পারম্পর্য নিয়ম (Law of succession)। পরস্পর সাদৃশ্য সন্নিকটবর্তী ও অনুবর্তী অভিজ্ঞতাসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়।

জে. এস. মিলও মনের অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদের পরিপোষক। তাঁর মতে, মন বিভিন্ন সংবেদন ও অনুভূতির সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়, মন এগুলির সম্ভাবনা মাত্র। মন মানসিক অবস্থাসমূহের পারম্পর্য এবং পারম্পর্যের চেতনা। আবার উইলিয়াম জেমস চৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন ধারাকেই আত্মা বলেছেন। কর্তা বা জ্ঞাতারূপে আত্মার অস্তিত্ব নেই। চেতনা বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমষ্টি নয়। চেতনা অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। "চলমান চিন্তাই হলো একমাত্র চিন্তাকারী"।[৩]

সমালোচনা
Criticism

হিউম ও অন্য অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মন সম্পর্কীয় ধারণার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত যুক্তিসমূহ উত্থাপিত হয়ে থাকে।

---

[১] There are some Philosopher who imagine we are every moment intimately conscious of what we call self, that we feel its existence and its continuance in existence and so are certain, beyond the evidence of a demonstration, both of its perfect identity and simplicity... for my part when I enter most intimately into what I call my self I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe anything but the perception. – Hume

[২] The mind is a kind of theatre, where several perceptions successively make their appearnce, pass, repass, gilde away and mingle in an infinite variety of postures and situations. There is properly no simplicity in it at one time, not indentity in different. The comparison of the theatre must not mislead us. They are successive perceptions only, that constitute mind. – Hume.

[৩] The passing thought is the only thinker. – Willam James

প্রথমত, আত্মা বা মন অভিজ্ঞতাপূর্ব সত্তা। মনের অস্তিত্ব আছে বলেই মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ অস্তিত্বশীল। এ প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। হিউম বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার মাধ্যমে আমরা আত্মা বা মনের অস্তিত্ব লাভ করি। আত্মা আছে বলেই আমরা এই সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারি। আত্মসচেতনতার অভিজ্ঞতাই আমাদের আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। কাজেই হিউমের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ মনের আত্মসচেতনতা ধর্মের ব্যাখ্যা করতে অপারগ। মন মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি হলে মনের পক্ষে জানা অসম্ভব যে এ মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি। মন বা আত্মাকে একমাত্র আত্মিক ঐক্য হিসেবে গ্রহণ করলেই মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের পারস্পরিক ঐক্য বা সংহতি বুঝতে পারা যায়। জেমস ও মিলের মতবাদ সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা গতিমান চিন্তা কীভাবে নিজের সম্পর্কে অবহিত হতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

তৃতীয়ত, এই মতবাদ জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণের মাধ্যমেই জ্ঞান জন্মে। মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের মূলীভূত এক ঐক্যনীতি বা মন ছাড়া জ্ঞান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কাজেই হিউমের "মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের সমষ্টি" যে মন তা বিশ্লেষণের ও সংশ্লেষণের কাজ করতে পারে না। এই দিক দিয়েও হিউমের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা থেকে জ্ঞান জন্মে, আর এই ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞতাসমূহের ঐক্যবিধায়ক শক্তি হিসেবে অপরিবর্তিত আত্মার অস্তিত্ব অপরিহার্য।

চতুর্থত, হিউমের মতবাদ স্মৃতি, প্রত্যাশা ও প্রত্যাভিজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারে না। যে মন এক সময়ে কোনো বস্তু প্রত্যক্ষ করে এবং অন্য সময়ে তাঁকে স্মরণ করে না সে মন অবশ্যই এক ও অভিন্ন হবে। মন ধারণা ও অনুভূতির সমষ্টি হলে একটা ধারণা বা অনুভূতি একটা পূর্বলব্ধ ধারণা বা অনুভূতিকে স্মরণ করতে পারে না। কাজেই মনকে সংশ্লেষণমূলক ঐক্য বিধায়ক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করলেই স্মৃতি, প্রত্যাশা ও প্রত্যাভিজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করা যায়।

পঞ্চমত, হিউম মনের প্রকৃতিগত ঐক্য স্বীকার করেন নি বলে তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগত অভিন্নতা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আমরা বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করলেও আমাদের ব্যক্তিগত অভিন্নতা লোপ পায় না। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের শত পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত সত্তা লোপ পায় না, ব্যক্তি ব্যক্তিই থেকে যায়।

ষষ্ঠত, হিউম অনুষঙ্গের নিয়মের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন সংবেদনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হয়েছেন। এই প্রয়াসও ত্রুটিপূর্ণ। মনের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে হিউমের অনুষঙ্গ নীতির ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। দুটি সাদৃশ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু স্মৃতি ছাড়া দুইয়ের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা হতে পারে না, আর মন ছাড়া স্মৃতির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এইভাবে প্রত্যাভিজ্ঞতাও মনের ঐক্যবিধায়ক শক্তি ছাড়া ব্যাখ্যা হতে পারে না। তাই এই প্রসঙ্গে কান্ট বলেন যে, বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মনের ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার অনুমান অবশ্যম্ভাবী।

সপ্তমত, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অভিজ্ঞতাবাদীরা জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। কেননা মন ছাড়া শুধু অভিজ্ঞতা জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। মন যখন সংবেদন বা অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করে তখনই জ্ঞান হয়। কাজেই মনকে অস্বীকার করলে জ্ঞানকে অস্বীকার করতে হয়। কাজেই মনের অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

৩.৩. কান্টের অতীন্দ্রিয় আত্মাবাদ (Kant's Transcendental Self) : মন সংশ্লেষণমূলক ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া। দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট আত্মা সম্পর্কীয় 'আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী মতবাদ' উভয় মতবাদেরই তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে বিচ্ছিন্ন সংবেদন ঐক্যবদ্ধ না হলে জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। মন বা আত্মাই বিচ্ছিন্ন সংবেদনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। তবে মন কোনো আধ্যাত্মিক দ্রব্য নয়। মন বা আত্মা, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত এক সংশ্লেষণমূলক ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া (Synthetic unity of apperception)। এ বিচ্ছিন্ন সংবেদনকে ঐক্যবদ্ধ করে অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে।

অতীন্দ্রিয় আত্মা বা জ্ঞাতা মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত : কান্টের এই মতবাদ অতীন্দ্রিয় আত্মাবাদ হিসেবে পরিচিত। অতীন্দ্রিয় আত্মা (Noumenal) বলতে কান্ট জ্ঞাতাকে বুঝিয়েছেন। এই জ্ঞাতা বা কর্তা মানসিক ঘটনাবলির পশ্চাতে রয়েছে ও ঘটনাবলিকে অতিক্রম করছে। অর্থাৎ এ মানসিক প্রক্রিয়ার অতিবর্তী। মন, চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতির অতিবর্তী নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণাত্মক ঐক্য, মানসিক ঘটনাবলির মূলীভূত স্থায়ী আধার, মানসিক অবস্থাবলি বা প্রক্রিয়াসমূহ আত্মার প্রকৃত প্রকাশ নয়, আত্মার অবভাস মাত্র। কান্টের মতে, দ্রব্য আমাদের জ্ঞানের একটি মাত্র আকার (Category)। দ্রব্যের সাহায্যে মন ঘটনাবলির ব্যাখ্যা প্রদান করে। দ্রব্যের ধারণার সাহায্যে মন বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ঐক্যবদ্ধ করে। মন মৌলিক ধারণা বা বুদ্ধির আকারসমূহের উৎস। বুদ্ধির আকারসমূহ সংশ্লেষণাত্মক; বিভিন্ন ও অসংলগ্ন সংবেদনের মধ্যে সংহতি আনয়ন করাই বুদ্ধির আকারসমূহের কাজ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মন জ্ঞানের ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া, জ্ঞাতা হিসেবে মন অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, নির্বাচন বিন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে জ্ঞান সম্ভব করে তোলে। কান্টের মতে, জ্ঞানের ঐক্যবিধায়ক ক্রিয়া হিসেবে মন জ্ঞাতা জ্ঞেয় নয়। মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ এই অতীন্দ্রিয় আত্মার অবভাসিক প্রকাশ মাত্র। আত্মা আসলে কি তা আমরা জানতে পারি না। আত্মা যেভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় কেবল সেভাবেই আমরা আত্মাকে জানতে পারি। আমরা আত্মার পরিবর্তনশীল দিকই জানি। অর্থাৎ মানসিক প্রক্রিয়াকেই জানা যায়, জ্ঞাতা মনকে জানা যায় না। জ্ঞাতা কখনও জ্ঞেয় হতে পারে না। জ্ঞাতা জ্ঞেয় থেকে গেলেই আত্মবিরোধের সৃষ্টি হয়।

দার্শনিক কান্টের মতে, দ্রব্য জ্ঞানের এক মৌলিক অপরিহার্য ধারণা। দ্রব্যের ধারণা নিজের কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংবেদনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে মন জ্ঞানকে সম্ভব করে তোলো। কাজেই মন থেকে প্রাপ্ত অধ্যাত্ম 'দ্রব্য' রূপে আমরা দ্রব্যের কোনো সন্ধান পাই না।

ডেভিড হিউম অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন সংবেদনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য অনুসঙ্গের নিয়মের প্রতি নির্দেশ করেছেন। কান্ট বলেন যে, অনুষঙ্গের নিয়মের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন সংবেদনকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করা যায় না। এক অতীন্দ্রিয় ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া হিসেবে মন বিচ্ছিন্ন সংবেদনকে ঐক্যবদ্ধ করে, ফলে ধারণার অনুষঙ্গ সম্ভব হয়। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতবাদের সাথে কান্টের মতবাদের এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে যে, আত্মা বা মন অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত এক আধ্যাত্মিক ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া, কিন্তু কান্ট আত্মাকে আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে স্বীকার করেন নি। আবার হিউমের

মতবাদের সাথে কান্টের মতবাদের সাদৃশ্য আছে। হিউম অভিজ্ঞতায় শুধু মানসিক প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং মন ও মানসিক প্রক্রিয়াকে অভিন্ন করে দেখেছেন। কিন্তু কান্ট মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত এক ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া হিসেবে মনকে স্বীকার করেছেন।

সমালোচনা
Criticism

কান্টের অতীন্দ্রিয় আত্মাবাদ দর্শনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ। এই মতবাদ নিম্নলিখিত **ত্রুটির** অধীন।

প্রথমত, মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কোনো ঐক্যবিধায়ক শক্তি স্বীকার করা চলে না। মন যদি মানসিক প্রক্রিয়ার ঐক্যবিধায়ক কোনো শক্তি হয় তবে সেই ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে।

দ্বিতীয়ত, কান্ট অতীন্দ্রিয় আত্মা ও অবভাসিক আত্মার মধ্যে দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছেন। কান্ট অতীন্দ্রিয় আত্মাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেছেন। তাঁর মতে, আমরা শুধু অবভাসিক আত্মা বা মনকে জানতে পারি, অতীন্দ্রিয় আত্মাকে জানতে পারি না।

কান্ট অহেতুক এই দ্বৈতবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। আত্মা আসলে মানসিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কোনো ঐক্যবিধায়ক শক্তি নয়, আবার বিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াও নয়– মন হলো ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া এবং বিচ্ছিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার সম্মিলিত রূপ।

৩.৪. ভাববাদী মতবাদ
Idealistic Theory of Mind

কান্টের অতীন্দ্রিয় আত্মাবাদের সমালোচনার মাধ্যমে জার্মান দার্শনিক হেগেল মন সম্পর্কে পুরুষবাদ বা মূর্ত আত্মাবাদে (Personalistic/Concrete Theory of Self) উত্তীর্ণ হন। তাঁর মতে, আত্মা কোনো আধ্যাত্মিক দ্রব্য নয়, পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়াও নয়, কিংবা এইসব প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কোনো ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়াও নয়। ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া অর্থহীন, আবার অভিজ্ঞতার সমষ্টির অতিরিক্ত কোনো ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করাও অযৌক্তিক। কাজেই হেগেলের মতে, আত্মা বা মন ঐক্যবিধায়ক অতীন্দ্রিয় সত্তা নয়, ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার কল্যাণে সৃষ্টি অভিজ্ঞতার সমষ্টি। অর্থাৎ ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সংহতি রচনার মাধ্যমে যে আঙ্গিক ঐক্য সৃষ্টি করে তারই নাম মন।

পুরুষবাদ : মূর্ত আত্মাবাদ : অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পুরুষ বা মন স্পষ্ট হয় বলে হেগেলের এই মতবাদকে পুরুষবাদ (Personalistic Theory) বলা হয়। হেগেল বলেন যে, ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের মনের অমূর্ত ধারণা। ঐক্যবিধায়ক প্রক্রিয়ার কাজের ফলে মানসিক প্রক্রিয়ার সংহতির মাধ্যমে যে পুরুষ সৃষ্টি হয় তা হলো আমাদের মনের একটি মূর্ত ধারণা। এই দিক দিয়ে দেখলে হেগেলের মন সম্পর্কীয় মতবাদকে যথার্থই মূর্ত আত্মাবাদ (Concrete Theory of Self) বলা যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মূর্ত আত্মাবাদ বা পুরুষবাদ অনুসারে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংহতির মাধ্যমেই পুরুষ বা মনের আবির্ভাব ঘটে। আত্মা হলো এক পুরুষ যা বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং এই সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আত্মসচেতন ও আত্মনিয়ামক শক্তি রূপে উপলব্ধি করছে। আত্মসচেতন ও

আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই আত্মার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আত্মা বহুর মধ্যে এক, বিভেদের মধ্যে ঐক্য। মানুষের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংহত হয়ে ঐক্য সৃষ্টি করে– এই ঐক্য আত্মা বা পুরুষের প্রকাশ।

পরম পুরুষের ব্যক্তি পূর্ণ মানুষের ব্যক্তিত্ব খণ্ড। হেগেলের অনুসারী মার্কিন দার্শনিক রয়িসও (Royce) মনে করেন যে, অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্বের উপাদান। আমাদের অভিজ্ঞতা যতই ব্যাপক ও সুসংবদ্ধ হয়, মানুষের ব্যক্তিত্ব ততই সুদৃঢ় হয়, পুরুষ হিসেবে সে ততই উন্নত হয়। পরম পুরুষের মধ্যে ঐক্য, ব্যাপকতা, সুসংবদ্ধতা পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ত্রুটিহীন, অভিজ্ঞতা সর্বব্যাপক। মানুষ এই পরম পুরুষের খণ্ড প্রকাশ, অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি, কাজেই মানুষের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ নয়।

মতবাদের উৎকর্ষ : নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করলে হেগেলের মূর্ত আত্মবাদকেই সন্তোষজনক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করা যায়, কেননা এই মতবাদ আত্মার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ।

৩.৫. জড়াবাদী মতবাদ
Meterialistic Theory of Mind

জড় সব কিছুর মূল জড়বাদ অনুসারে জড় বিশ্বজগতের আদিম ও মৌলিক উপাদান। সব কিছুই জড়েরমধ্যে সম্ভাবনা হিসেবে বিরাজ করছে। জড় সত্য, জড় ছাড়া কোনো কিছু সত্য নয়। জড় ও যান্ত্রিক পদ্ধতি বিশ্বজগতের সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে। জড় ও গতিই সব।

জড়বাদ জড় ও গতির সাহায্যে মনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। গ্রিক পরমাণুবিদ ডেমোক্রিটাসের মতে, আত্মা সূক্ষ্ম ও মসৃণ পরমাণু দ্বারা গঠিত। জার্মান জড়বাদী হেগেলের মতে, মন মস্তিষ্কের ক্রিয়া, পরমাণু মানসিক গুণসংবলিত। হাক্সলির মতে, মন মস্তিষ্কের উপবস্তু। মানসিক প্রক্রিয়া মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার উপসৃষ্টি।

জড়বাদীদের কেউ কেউ মনে করেন যে, জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের পার্থক্য মাত্রাগত। জড় ও মন মূলত এক। কেউ কেউ জড়কে চৈতন্যের কারণ বলে মনে করেন, আবার কেউ কেউ চৈতন্যকে জড়ের গুণ হিসেবে বিবেচনা করেন।

সমালোচনা
Criticism

চেতনা জড় থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এই মতবাদ স্বীকার করা চলে না। কারণ জড় ও চেতনা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। আমরা মন বা চেতনার সাহায্যে জড় সম্পর্কে অবহিত হই। চেতনা না থাকলে কোনো বিষয় জানা সম্ভব নয়। কাজেই চেতনা জ্ঞানের মূল।

দ্বিতীয়ত, জড়বাদীদের মতে, জড় মস্তিষ্কের উপবস্তু। মনকে জড়ের উপবস্তু মনে করলে মনের পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। আমরা আত্মসচেতনতার মাধ্যমে জানতে পারি যে, মন দেহকে নিয়ন্ত্রিত করে, মন ইচ্ছাশক্তিকে চালিত করে।

তৃতীয়ত, মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়; তাই বলে এ কথা বলা চলে না যে, মন মস্তিষ্কের উপবস্তু অথবা মন মস্তিষ্কের ক্রিয়া।

চতুর্থত, জড়বাদীরা মানসিক ক্রিয়ার ঐক্য ও ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। স্মৃতি, প্রত্যাশা, প্রত্যাভিজ্ঞতা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রমাণ করা জড়বাদীদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩.৬. মন সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক-জড়বাদ

Dialectic Materialistic Theory of Mind

মার্কস ব্যক্তি মানুষ ও তার আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি যান্ত্রিক জড়বাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, বিবর্তন সদর্থক ধারণা, নঞর্থক ধারণা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে অগ্রসর হয়। জীবন বা প্রাণ জড় ও গতি থেকে উদ্ভূত হয়। মন বা চেতনা উদ্ভূত হয় প্রাণ থেকে। ব্যক্তির আচরণ তার জাগতিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই পরিবেশ মানুষ নিজে পরিবর্তন করে এবং পরিবেশেরসঙ্গে সে নিজেও পরিবর্তিত হয়।

মানুষ এসেছে পশু থেকে, পশু উদ্ভিদ থেকে, উদ্ভিদ অজৈব উপাদান থেকে। আবার সরল বস্তু থেকে উদ্ভূত হয়েছে জটিল বস্তু। শ্রেণীর অপরিবর্তনীয়তা মনের কল্পনা মাত্র। আসলে ইতর প্রাণির আচরণ ও মানুষের আচরণের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। মানুষ ও ইতর প্রাণি উভয়ই পরিবেশের প্রভাবিত এবং উভয় পরিবেশকে প্রভাবিত করে। মানুষ ও ইতর প্রাণির মধ্যে কতগুলি মৌলিক বিষয়ে সাদৃশ্য বর্তমান। ইতর প্রাণি ও মানুষ উভয়ই খাদ্য, আশ্রয়, যৌন প্রয়োজন প্রভৃতির দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। উভয়ই এই সমস্ত প্রয়োজন তাড়িত। মৌলিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে ইতর প্রাণি ও মানুষের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। অভাব পূরণের পদ্ধতি মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ পূর্ব পরিকল্পিত উপায়ে বা সুনির্দিষ্ট নিয়মে তার অভাব চরিতার্থ করতে পারে। মানুষ ইতর প্রাণি থেকে পৃথক এই ব্যাপারে যে, মানুষ নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের মাধ্যমে তার প্রয়োজন মিটাতে পারে। কারিগরি বিদ্যা মানুষের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করে, ইতর প্রাণির অভাব পূরণের কোনো পরিকল্পিত উপায় নেই। কাজেই ইতর প্রাণি তাঁর পরিবেশের ওপর নিজ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, নিজের কোনো স্থায়ী চিহ্ন আঁকতে পারে না।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদ অনুসারে পরিবর্তন বিরোধের পরিণতি। মানুষের আচরণের পরিবর্তন অভাব পূরণের পদ্ধতি বা উপাদান প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। পুঁজিপতিরা উৎপাদনের পদ্ধতি তাদের কুক্ষিগত করে। শ্রমিকদের বাঁচার জন্য সামান্য পারিশ্রমিক প্রদান করে এবং নিজেদের হাতে সম্পদ জমা করে। ফলে পুঁজিপতির ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে, শ্রেণী সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যতদিন না পুঁজিপতিদের ধ্বংস সাধিত হচ্ছে, ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

সমালোচনা

Criticism

মনের উৎস ও বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে মার্কসের মত বিতর্কমূলক। প্রাণ থেকে মন বা জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে কি-না সে সম্পর্কে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ ছাড়া সমর্থক ধারণা, নঞর্থক ধারণা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বিবর্তন পদ্ধতি অগ্রসর হয় কি-না তা বিতর্কমূলক। মানুষ স্বাধীন, আত্মসচেতন সত্তা। মানুষ তার আদর্শ ও প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশকে রূপ দিয়ে থাকে। মানুষ সামাজিক সম্পর্কের প্রতিভূ নয়। মানুষের মধ্যে ,রয়েছে অসীমের প্রতি আকর্ষণ। মানুষ আধারকে ধরার জন্য ছুটে চলেছে পঙ্গপালের মতো অনিশ্চিতের পানে। মানুষ শুধু দৈহিক প্রয়োজনের দ্বারা সীমিত নয়, মানুষের সভ্যতা মানুষের আচরণের, মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কামনা-বাসনার,

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। মানুষ দেহসর্বস্ব নয়। দেহের চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত থাকলে মানুষের জন্য এত ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হতো না। মানুষ সত্য সুন্দর কল্যাণের নৈর্ব্যক্তিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য অবিশ্রাম সংগ্রাম করে চলেছেন, তাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ অর্থনৈতিক সংঘাতের পরিণতি নয়, কিংবা মানুষ দেহসর্বস্ব নয়। অর্থনীতি মানুষের জীবনের মনুসংহিতা নয়। মানুষ নৈতিক ধর্মীয়, সৌন্দর্যবিষয়ক আদর্শকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াসে নিবেদিতপ্রাণ। কাজেই মানুষের আচরণ সম্পর্কে মার্কসের ধারণা সংকীর্ণ ও একদেশদর্শী। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ব্যাখ্যায় তাঁর মতবাদের মধ্যে সত্য আছে, কিন্তু মানুষের আচরণ সম্পর্কে মার্কসের মতবাদ ভ্রমাত্মক।

৩.৭. সাম্প্রতিক বস্তুবাদের দৃষ্টিতে মন
Mind is Recent Realism

বস্তুবাদীরা সাধারণত বিশ্বপরিকল্পনায় মনের কোনো বিশেষ স্থান স্বীকার করে না। জগতের অন্যান্য বস্তুর মতো মনও একটি বস্তু। হল্ট, মারভিন, মন্টেগু, পেরি পিটকিন, স্পলডিং প্রমুখ আমেরিকান নব্যবস্তুবাদীরা সংবেদন ও প্রতিরূপকে মানসিক ঘটনা বলে স্বীকার করেন নি। তাঁরা এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আচরণবাদীদের সঙ্গে একমত হয়ে চেতনাকে দৈহিক প্রক্রিয়া বলে ঘোষণা করেছেন। নব্যবস্তুবাদের অন্যতম প্রবর্তক পেরি (Perey) মনের তিনটি অংশের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। যথা– (১) অভাব, (২) স্নায়ুতন্ত্র যা দৈহিক অভাব চরিতার্থ করার জন্য পরিবেশের প্রতিক্রিয়া করে, (৩) পরিবেশের যে অংশগুলির প্রতি স্নায়ুতন্ত্র বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়া করে। এই সব ব্যতিরেকে অন্য কোনো মানসিক প্রক্রিয়ায় তিনি বিশ্বাস করেন না। হাল্ট (Holt) এর মতে, চৈতন্য জীবের পার্থিব পরিবেশে বিশেষ প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। অন্য কথায় মন বা চৈতন্য স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত জগতের অংশবিশেষ কোনো বস্তু স্নায়ুমণ্ডলীর সংস্পর্শে আশা মাত্র তা অন্য সব বস্তু থেকে পৃথক হয়ে চৈতন্যের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। স্ট্রং (Strong) বলেন যে, জ্ঞান সত্তার সাথে কোনো সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া বৈ অন্য কিছুই নয় এবং এই সম্পর্ক বাহ্য সম্পর্ক। মন্টেগু (Montague)-এর মতে, চৈতন্য একটি সম্পর্ক। যদি চৈতন্য একটি সম্পর্ক হয় তবে চৈতন্যের বিষয়বস্তুর সেই সম্পর্কে নিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকবে। বিপরীতক্রমে যদি বস্তু চৈতন্য-নিরপেক্ষ হয়, তবে, চৈতন্য বা জ্ঞান বস্তুসমূহের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সান্তায়ানা (Santayna), স্ট্রং (Strong), রোজার্স (Rogers), লাভ্‌জয় (Lovejoy), সেলার্স (Sellers), প্রেট (Prate), ড্রেক (Drake), প্রমুখ বস্তুবাদীরা বিচারবাদী বস্তুবাদী হিসেবে খ্যাত। এই সমুদয় চিন্তাবিদ সম্পর্কে বস্তুবাদী ও ভাববাদী উভয় মতবাদেরই বিচার-বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। ভাববাদ সমর্থিত ধারণা– মন মৌলিক সত্তা– তাঁরা এই মতবাদ স্বীকার করেন না। আবার নব্যবস্তুবাদীরা মনকে অন্যান্য বস্তুর সমপর্যায়ভুক্ত বলে প্রচার করেন, এই মতবাদও তাঁরা অস্বীকার করেন। বিচারবাদী বস্তুবাদীরা এক ধরনের দ্বৈতবাদের প্রচার করেন। তাঁদের মতে, জগৎ জড়বস্তু ও মানসিক ধারণার দ্বারা গঠিত। মানসিক ধারণাকে আমরা সরাসরি জানি। আমাদের জড়বস্তু সম্পর্কীয় জ্ঞান পরোক্ষ। ধারণার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হিসেবেই আমরা জড়বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করি।

বার্ট্রান্ড রাসেল দ্বৈতবাদের নিরসন ঘটাতে তৎপর হন। তিনি জড়বস্তু ও মনের ব্যবধান ঘুচাতে উভয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে এক অভিনব মতবাদের প্রচার করেন। তাঁর মতে, জড়বস্তুও মন একই নিরপেক্ষ সত্তা (Neutral staff)। যখন বস্তুকে আমরা মনের প্রেক্ষিতে দেখি তখন তা মানসিক, আবার যখন বস্তুকে আমরা জড়ের প্রেক্ষিতে দেখি তখন তা জড়বস্তু। কাজেই জড়বস্তু ও মনের পার্থক্য সত্তার পার্থক্য নয়, পার্থক্য দৃষ্টিকোণের বা সমাবেশের (Arrangement)।

ব্রড (Broad), মুর (Moore), ডিউজ (Dewes), হিকস (Hicks), লেয়ার্ড (Laird) ও আলেকজান্ডার প্রমুখ ব্রিটিশ দার্শনিক মানসিক ক্রিয়াকে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন যে, চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য এমনি যে তা অন্তর্দর্শন বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই জ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রিটিশ বস্তুবাদীরা চৈতন্যকে পার্থিব বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে আনেন নি। তাঁরা মনের সক্রিয়তাকে স্বীকার করেন। তাঁরা জড়বস্তুর সাথে মনের গোল পাকান নি। অধ্যাপক আলেকজান্ডার চৈতন্য ও ইচ্ছাকে অভেদাত্মক বা অভিন্ন বলেছেন এবং মনের সক্রিয় স্বভাবের কথা স্বীকার করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ দার্শনিকরা (বস্তুবাদীরা) মনের আচরণবাদী মতবাদ ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ও গতিশীল স্বভাবের কথা স্বীকার করেন।

সমালোচনা
Criticism

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ বস্তুবাদীদের কেউ কেউ মনের মূল বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছেন।

৩.৮ মন সম্পর্কে প্রায়োগিক মতবাদ
The Pragmatic Theory of Mind

প্রায়োগবাদী চিন্তাবিদরা অন্যান্য সমস্যার মতো মন সম্পর্কেও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন। পরিণতির আলোকেই তাঁরা মনের আলোচনা করে থাকেন। তাঁদের মতে, নৈয়ায়িক বা বাস্তব ফলই সবকিছু নির্ধারণ করে থাকে। প্রয়োগবাদকে হাতিয়ারবাদও (Instrumentalism) বলা হয়, কেননা প্রয়োগবাদীরা মনকে দৈহিক হাতিয়ার বলে মনে করেন।

প্রয়োগবাদীরা মন সম্পর্কীয় আধ্যাত্মিক দ্রব্য মতবাদের নির্মম সমালোচনা করেন। তাঁরা মনে করেন যে, আমাদের জটিল জীবন সমস্যার সমাধানকল্পে যে শক্তির প্রয়োজন তারই নাম মানসিক শক্তি। মানুষের কতিপয় মৌল চাহিদা আছে। যথা– খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে দিবানিশি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হয়। এই ব্যাপারে মানুষ পরিবেশকে কাজে লাগায়। পরিবেশের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য মানুষকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। প্রথমে আমাদের জীবনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন জটিল সমস্যার দ্বারা প্রপীড়িত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অবস্থা মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এখানেই উঠে নতুন করে পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধান করার কথা। মানুষের এই সংবিধায়ক শক্তিকে মন বলা হয়। অর্থাৎ, যে শক্তি মানুষকে জটিল সমস্যার কুহক থেকে মুক্ত করে সহজভাবে জীবনের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে তাই হলো মন।

সমালোচনা
Criticism

প্রয়োগবাদী দার্শনিকরা দর্শনে একটি অভিনব দৃষ্টিকোণের আমদানি করেছেন। মন সম্পর্কে বাস্তবধর্মী, পরিবেশকেন্দ্রিক আলোচনা করেছেন। তাঁরা মনের ক্ষেত্রে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করেছেন, মনকে বিরাট অপার্থিব সমস্যার বেড়াজাল ছিন্ন করে বাস্তব জীবনের অঙ্গনে স্থাপন করেছেন। সুতরাং প্রয়োগবাদীরা পার্থিব জীবনের ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করে ধ্যানসর্বস্ব চিন্তাধারার অবসান করেছেন।

প্রয়োগবাদীরা মন সম্পর্কে আচরণবাদীদের একই পর্যায়ভুক্ত। তাঁরা মন সম্পর্কে বস্তুগত মতবাদ পোষণ করেন, মনকে এক জটিল প্রাণশক্তি বলে অভিহিত করেন, কিন্তু এ জীবনীশক্তির জটিল রূপ নয় কিংবা দৈহিক শক্তির স্ফুরণও নয়।

আর সমস্ত আদর্শ বা মানদণ্ডকে নির্বাসন দিয়ে শুধু উপযোগিতার মাধ্যমে মানবজীবনের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। মানুষের মন পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া করে থাকে সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে মানুষের মন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার যন্ত্র নয়। মনে কতগুলি মূল্যবোধ রয়েছে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে মন সেই মূল্যবোধকেই অনুসরণ করে থাকে। কাজেই মন সম্পর্কে প্রায়োগিক মতবাদ সন্তোষজনক নয়।

৩.৯ মন সম্পর্কে আচরণবাদী মতবাদ
The behaviouristic Theory of mind

আচরণবাদীদের প্রবর্তক, জে.বি. ওয়াটসনের মতে, মনোবিজ্ঞান আচরণ সম্পর্কীয় মতবাদ। তিনি মনের অঙ্গন থেকে আত্মা, মন, চৈতন্য মানসিক প্রক্রিয়াকে নির্বাসন দিয়েছেন, মনোবিজ্ঞানকে জীববিজ্ঞানে পরিণত করেছেন। মনোবিজ্ঞানের একান্ত নিজস্ব পদ্ধতি অন্তর্দর্শনকে আচরণবাদীরা নির্বাসন দিয়েছেন, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণকে মনোবিজ্ঞানের ফলপ্রসূ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসনের মতে, জীবদেহ ও তার আচরণের অতিরিক্ত আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। আধ্যাত্মিক দ্রব্য হিসেবে মন বা আত্মার ধারণা আমাদের কল্পনা মাত্র। বাইরের পরিবেশের প্রভাবে জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি হলো মন। মানসিক প্রক্রিয়া ও দৈহিক প্রক্রিয়া আলাদা নয়, এক ও অভিন্ন। জীবদেহ একটি যন্ত্রবিশেষ। উদ্দীপক ক্রিয়া করার জন্য জীবদেহে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার নাম আচরণ। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটার ফলে জীবদেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আচরণবাদীদের মতে, মনোবিজ্ঞান হলো উদ্দীপক প্রক্রিয়া (Stimulus-response) সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। প্রতিবর্ত ক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে অমূর্ত চিন্তা পর্যন্ত মানুষের সব আচরণই প্রতিক্রিয়া পদবাচ্য এবং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের সব আচরণ ব্যাখ্যা হতে পারে। ওয়াটসনের মতে, সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ জীবদেহের প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছুই নয়। সে জন্য তিনি সংবেদন কথাটির পরিবর্তে 'দর্শনগত প্রতিক্রিয়া', 'শ্রবণগত প্রতিক্রিয়া' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেছেন। স্মৃতি স্নায়ুর অভ্যাস, চিন্তন অভ্যন্তরীণ বাচন প্রক্রিয়া, অনুভূতি অন্তরযন্ত্রীয় ও গ্রন্থী সম্বন্ধীয় প্রতিক্রিয়া। ওয়াটসনের মতে, শিক্ষণ প্রক্রিয়া একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি, কোনো উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

সমালোচনা
Criticism

আচরণবাদীরা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। অন্তর্দর্শনকে নির্বাসন দিয়ে আচরণবাদীরা মনোবিজ্ঞানের মূল ভিত্তিকে উদ্ঘাটন করতে বদ্ধপরিকর। অন্ত র্দর্শন, চৈতন্য, মন, চিন্তন ইত্যাদিকে বাদ দিলে মনোবিজ্ঞানে মনুষ্য আচরণ ব্যাখার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। চৈতন্য মনের নির্দেশক লক্ষণ, এই শক্তিকে বর্জন করলে নিরীক্ষণের ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা দেহ দৈহিক ক্রিয়া নিরীক্ষণ করে এ কথা হাস্যকর বলে মনে হয়। অন্তর্দর্শন ও নিরীক্ষণের সাহায্যে আমরা মানুষের আচরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করি। অর্থাৎ অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হই এবং সংশ্লিষ্ট বাহ্য আচরণ লক্ষ করি। পরে অপরের আচরণ নিরীক্ষণ করে সেই আচরণের ভিত্তিতে তাদের মানসিক অবস্থা অনুমান করি।

আচরণবাদীরা বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা সংবেদনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, প্রত্যক্ষণের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আচরণবাদীরা চিন্তনকে অভ্যন্তরীণ বাচন-প্রক্রিয়ার সাথে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু বাচন ছাড়াও যে চিন্তা সম্ভব সে বিষয়ে তাঁরা খেয়াল করেন নি।

মানুষের সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ামূলক নয়। আচরণবাদীরা আচরণের সাহায্যে ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে চান। তাঁদের মতে, ব্যক্তি পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। পরিবেশ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করলেও ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাই তার কর্ম ও পরিবেশকে আচরণবাদীরা মানুষের সব আচরণকে প্রতিক্রিয়ামূলক বলে ঘোষণা করেছেন, মানুষ যন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। আচরণবাদীরা মানুষের আচরণের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের সকল মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। মনোবিজ্ঞান শারীরবৃত্তিতে (Physiology) পর্যবসিত হয়েছে।

টীকা : ইকবালের খুদি
The Khudi of Iqbal

প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক কবি ইকবাল 'খুদি' সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত মতবাদ প্রচার করেন। ইকবালের দর্শনের মূল সুর হলো খুদি (self)। খুদি বাস্তব সত্তা– নিজের জোরেই এই সত্তা অস্তিত্বশীল। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আমরা এই সত্তার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। খুদির স্বজ্ঞানিত জ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতার বাস্তবতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও অবিচল আস্থা সৃষ্টি করে। স্বজ্ঞার মাধ্যমে শুধু খুদির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায় না, এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানা যায়। স্বজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞাত খুদি মূলত নিয়ামক, স্বাধীন ও অমর।

ইকবালের মতে, অভিজ্ঞতার সসীম কেন্দ্র খুদি বাস্তব সত্তা। এটা মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের ঐক্য হিসেবে ব্যক্ত হয়। এটি দেশ-কালের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত নয়। খুদি দৈশিক নয় এবং খুদির কালও সাধারণকালের ধারণা থেকে পৃথক।

দ্বিতীয়ত, খুদি মূলত ব্যক্তিসত্তা, একান্ত ব্যক্তিগত সত্তা হিসেবে খুদি অন্যান্য কোনো ব্যক্তির কামনা মুখ্যত সেই ব্যক্তিরই, অন্য কেউ ঐ ব্যক্তির মতো তা উপলব্ধি পারে না।

তৃতীয়ত, খুদির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো এর স্বতঃস্ফূর্ততা। ইকবালের খুদি অযৌক্তিক, অভিভাজ্য ও অপরিবর্তনীয় এবং সময়ের বাঁধনে বাঁধা নয়। ইকবাল

দার্শনিক ব্রাডলির সঙ্গে একমত যে খুদি বাস্তব সত্তা, সংশয়াতীত সত্তা। আমাদের মানবজীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা খুদির ঐক্যনিধায়ক শক্তি অনুভব করি। ইকবালের মতে, খুদি আল্লাহর হুকুম (রুহই আমর)। তিনি কোরআন শরিফ থেকে খুদির মৌল স্বভাব সম্পর্কে সমর্থন প্রদান করেন। "আর তারা আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, আপনি বলুন আত্মা আমার প্রভুর আদেশ এবং সে সম্পর্কে খুব কমই তোমাদের জ্ঞাত করানো হয়েছে।"[১] খুদি স্বভাবত লক্ষ্যাভিসারী এবং এটি খোদার নিয়ামক শক্তি থেকে আসে। খুদি অমর, কিন্তু ব্যক্তিগত অমরতা আমাদের জন্মগত অধিকার নয় অর্জন সাপেক্ষ।

৪। দেহ-মনের সম্পর্ক

Mind-Body Relationship

মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্ন নয়, উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা সচরাচর দেখতে পাই যে, দেহে গুরুতর আঘাত লাগলে আমরা চৈতন্য হেরে ফেলি আবার মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হলে আমাদের দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। মন খারাপ হলে দেহ ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। দেহ খারাপ হলে মনের ধৈর্য রক্ষা অসম্ভব হয়ে যায়। দেহ ও মনের সম্পর্ক এতই নিবিড় যে, কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী (আচরণবাদীরা) দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়াকে অভিন্ন মনে করেন। দেহ ও মন দৈহিক প্রক্রিয়া ও মানসিক প্রক্রিয়া এক ও অভিন্ন না হলেও উভয়ের মধ্যে যে গভীর ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান, নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি থেকে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।[২]

প্রথমত, বহির্জগতের বস্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই ক্রিয়া করে ও মনের সংবেদন উৎপন্ন করে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা বস্তুর গুণ প্রত্যক্ষ করি। আমরা চক্ষুর সাহায্যে আলোক ও বর্ণের সংবেদন পাই, কর্ণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শব্দ সংবেদন, নাসিকার সাহায্যে ঘ্রাণ সংবেদন, জিহ্বার সাহায্যে স্বাদ সংবেদন এবং স্পর্শের মাধ্যমে শৈত্য, তাপ ও চাপের সংবেদন লক্ষ করি। ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমেই মন বাহ্য বস্তুর গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোনো ইন্দ্রিয়ের অভাব ঘটলে আমরা সেই ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদন থেকে বঞ্চিত হই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাহ্যবস্তুর দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ উদ্দীপিত হলেই মনে সংবেদন উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত, বহির্জগৎ যেমন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের ওপর ক্রিয়া করে, মনও তেমনি মাংসপেশির সহায়তায় বহির্জগতের ওপর ক্রিয়া করে। আমাদের ইচ্ছাসমূহ পেশিগত সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রথমে ভ্রমণের ইচ্ছা আমাদের মনে জাগরিত হয়, পরে আমরা ভ্রমণ আরম্ভ করি ও ইচ্ছাটিকে বাস্তবায়িত করি। আমাদের পেশিসমূহ সক্রিয় না থাকলে ইচ্ছাকে আমরা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারি না। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মাংসপেশি মনের হাতিয়ার। বহির্জগৎ ইন্দ্রিয়নিচের মাধ্যমে মনের ওপর ক্রিয়া করে, মন মাংসপেশির সাহায্যে বহির্জগতের ওপর ক্রিয়া করে।

---

[১] ওয়া ইয়াছয়ালুনাকা আনের রুহো- কোল্লের রুহো মিন্ আমরে রব্বি ওয়ামাঈতিতুম মেনাল্ইল্‌মে ইল্লা কালিলা। [১৭-৮৭]

[২] মৎপ্রণীত "সহজ মনোবিজ্ঞান পরিচয়" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়ত, মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতের ফলে অনেকের চেতনা লুপ্ত হতে দেখা যায়। সুরাসার ও কোনো কোনো ওষুধ সেবনের ফলে মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সুরাসার সেবনে মনের মধ্যে উল্লাস জন্মে, আবার আফিং সেবনে উদ্যামহীনতা আসে। এমন কি চা, কফি ধূমপানও মনের মধ্যে উদ্দীপন সৃষ্টি করে। সুতরাং গুরুতর আঘাত ও ওষুধ সেবনের মনের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

চতুর্থত, বিভিন্ন শারীরিক রোগ মনের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। যারা পাকাশয়িক গোলযোগে ভোগে বা নিদ্রাহীনতায় কষ্ট পায় তারা প্রায়ই বদমেজাজী হয়; যারা হৃদরোগের রোগী তারা প্রায় সন্ত্রস্ত ও ভীত প্রকৃতির হয়; যারা চর্মরোগে ভোগে তারা সদা সন্দিগ্ধ প্রকৃতির হয়। আবার মানসিক প্রফুল্লতা অনেক শারীরিক ব্যাধি নিরাময়ে সাহায্য করে থাকে। এই সব দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, দেহ ও মনের গভীর ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বর্তমান।

পঞ্চমত, রোগের নিদানতত্ত্ব (Pathology) নির্দেশ করে যে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সাথে বিভিন্ন ধরনের চেতনা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের অসুস্থতার ফলে বিভিন্ন ধরনের চেতনার অবলুপ্তি বা হ্রাস পেতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সংবেদনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। মস্তিষ্কের কোনো বিশেষ অংশের তন্তু বিনষ্ট হলে দর্শন সংবেদন উৎপন্ন হতে পারে না, আবার মস্তিষ্কের জন্য কোনো অংশের তন্তু বিনষ্ট হলে শ্রবণ সংবেদন উৎপন্ন হতে পারে না।

ষষ্ঠত, শবব্যচ্ছেদবিদ্যা (Anatomy) নিদানতত্ত্বের সিদ্ধান্তকে সপ্রমাণ করে। এই বিজ্ঞান স্নায়ু ও মস্তিষ্কের অসুস্থ অংশ ইন্দ্রিয়সমূহ ও মাংসপেশির মধ্যে যে আকারগত যোগসূত্র রয়েছে তা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা দেহের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করে।

সপ্তমত, শারীরবৃত্ত (Physiology) দেহের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে। দেখা গেছে যে, প্রাণির মস্তিষ্কের অংশবিশেষ উদ্দীপিত করার ফলে তর নির্দিষ্ট মাংসপেশির সঞ্চালন শুরু হয়, আবার মস্তিষ্কের অংশবিশেষ উৎপাটন করার ফলে নির্দিষ্ট মাংসপেশি লুপ্ত। অনুরূপভাবে, মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ উৎপাটন করে দেখা গেছে যে, নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় ও নির্দিষ্ট সংবেদন লোপ পায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিদানতত্ত্ব, শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা ও শারীরবৃত্ত দেহ ও মনের নিবিড় সম্পর্কের কথাই ঘোষণা করে। বিশেষ ধরনের চেতনার সাথে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশ বিশেষ ইন্দ্রিয় ও মাংসপেশির যে সম্পর্ক আছে এই সমস্ত বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা সে সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অষ্টমত, তুলনামূলক শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা, তুলনামূলক শারীরবৃত্ত ও তুলনামূলক মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, চেতনার বিকাশ ও স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ সমান্তরাল গতিতে অগ্রসর হয়। স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ যতই উন্নত হবে মনের সংগঠনও ততই উন্নত হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন বিজ্ঞান দেহ ও মনের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের কথাই প্রকাশ করে।

দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদ : দেহ ও মনের সম্পর্ক নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত মতবাদসমূহ প্রচলিত আছে। যথা : (১) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (Interactionism), (২) প্রয়োজনবাদ (Occasionalism), (৩) সমান্তরবাদ (Parallelism), (৪) পূর্ব সংস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ

(Pre-established harmony), (৫) উপবস্তুবাদ (Epiphenomenalism), (৬) উন্মেষবাদ (Emergent Evolution), (৭) আত্মগত ভাববাদ (Subjective Idealism), (৮) সর্বাত্মবাদ (Pan-Psychism), (৯) ঐচ্ছিক ভাববাদ (Voluntaristic Idealism) ও (১০) বস্তুগত ভাববাদ (Objective Idealism)। এবার একে একে মতবাদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

৪.১ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ (Interactionism) : ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক একটি দ্বৈত মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। আমরা সাধারণত দেহ ও মনকে পরস্পর প্রতিক্রিয়া করতে দেখি। মন দেহকে পরিচালিত করে, ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করে, দেহের ওপর ক্রিয়া করে। দেহ সুস্থ না থাকলে মনের পক্ষে কাজ পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। গ্রন্থিসমূহের নিয়মিত রসক্ষরণ না হলে মেজাজের নানারূপ বিকৃতি ঘটে। কাজেই দেহ-মনের পারস্পরিক ক্রিয়া, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের মূল ভিত্তি।

আধুনিক দর্শনের জনক দেকার্তে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের প্রবর্তক। তিনি একজন দ্বৈতবাদী দার্শনিক। তিনি মধ্যযুগীয় দর্শনে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছিলেন। সে যুগের দর্শনের আধ্যাত্মিক মূলধনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অবিচল। পক্ষান্তরে সে যুগের বিজ্ঞানেও তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট, বিভিন্ন বিজ্ঞানে তাঁর বিস্ময়কর দখল ছিল। প্লেটোর স্বর্গলোক বিহারী কল্পনার পরিবর্তে বাস্তব জীবনের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। দেকার্তে মধ্যযুগের দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

দেকার্তের মতে, যা স্বীয় শক্তিতে স্বীয় অধিকারবলে অস্তিত্বশীল এমন সত্তার নাম দ্রব্য। দ্রব্যের অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো জিনিসের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এই দিক দিয়ে দেখলে একমাত্র পরমসত্তা বা খোদাই দ্রব্য পদবাচ্য; কিন্তু দেকার্তে বলেন যে, একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে, দেহ ও মন নিজ নিজ এলাকায় দ্রব্য পদবাচ্য, যদিও মূলত পরমসত্তার ওপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। দেহ ও মন পরস্পরনিরপেক্ষ দ্রব্য। দেহ জড়াত্মক বিস্তৃতিধর্মী দ্রব্য এবং মন চৈতন্যধর্মী দ্রব্য। দেহ ও মন পরস্পর নিরপেক্ষ হলেও তারা পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে একে-অপরকে প্রভাবিত করে। এখন কথা হলো দেহ ও মন পরস্পর-নিরপেক্ষ সত্তা হলে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিভাবে সম্ভব। দেকার্তের মতে, মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত শীর্ষক গ্রন্থি (Pineal Gland) দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। মন সমগ্র দেহের সাথে যুক্ত ও মনের প্রধান ক্রিয়াস্থল শীর্ষক গ্রন্থি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন উদ্দীপনা বা প্রবাহ স্নায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে উক্ত শীর্ষক গ্রন্থিতে পৌঁছায় এবং সংবেদন উৎপন্ন হয়। আবার মনও বিভিন্নভাবে শীর্ষক গ্রন্থিকে প্রভাবিত করে ও পেশিকে সক্রিয় করে কাজ উৎপাদন করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সংবেদন, অনুভূতি প্রভৃতি দেহ ও মনের যৌথ সম্পর্কের পরিণতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই গ্রন্থির মাধ্যমেই দেহ মনের ওপর ক্রিয়া করে, মন দেহের ওপর ক্রিয়া করে।

সমালোচনা

Criticism

উৎকর্ষ : দেকার্তের দেহ ও মন সম্পর্কীয় দ্বৈতবাদ আধুনিক জড় বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। জড়বিজ্ঞান ও মানসবিজ্ঞান স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত

হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। জড়বিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে কোনোরূপ সংঘাত উপস্থিত হয় নি, উভয় গোষ্ঠী নিজ নিজ পথে অবাধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে। দেকার্তের দর্শনে ভাববাদ ও যন্ত্রবাদের মধ্যে এক সমন্বয়ের প্রয়াস লক্ষিত হয়।

অপকর্ষ

(ক) দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের শীর্ষক গ্রন্থির ধারণা বোধগম্য নয়। শীর্ষক গ্রন্থি অচেতন পদার্থ। অচেতন পদার্থ কিভাবে জড় ও চেতনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তা বোধের অগম্য। দেহ ও মন পরস্পরনিরপেক্ষ ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী সত্তা। কিভাবে দুটি স্বাতন্ত্র্যধর্মী দ্রব্যের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে পারে তা অনুধাবন করা সুকঠিন। অর্থাৎ দুটি বিপরীতধর্মী সত্তার পারস্পরিক প্রভাবের ব্যাপার কল্পনাতীত।

(খ) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ শক্তির অবিনশ্বরতাবাদের পরিপন্থি। শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ অনুসারে জগতের শক্তির পরিমাণ অবিনশ্বর শক্তির পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই– আছে অবস্থার রূপান্তর। শক্তি একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে, কিন্তু তার পরিমাণের ইতর বিশেষ ঘটে না। জড়শক্তি যে মানসিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না, এটি একটি পরিজ্ঞাত ঘটনা। কাজেই দেকার্তের জড়শক্তির মানসিক শক্তিতে রূপান্তর আর মানসিক শক্তির জড়াত্মক শক্তিতে রূপান্ত শক্তির অবিনশ্বরতা নীতির পরিপন্থি। সুতরাং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ দেহ-মনের সম্পর্ক বিষয়ে সন্তোষজনক মতবাদ নয়।

৪.২ প্রয়োজনবাদ (Occasionalism) : দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের অসঙ্গতি দূর করার জন্য দেকার্তের অনুসারীবৃন্দ বিশেষভাবে গেলিঙ্কস (Geulincx) ও ম্যালব্রাঙ্কে (Malebranche) প্রয়োজনবাদের প্রবর্তন করেন। এই মতবাদ অনুসারে দেহ ও মন পরস্পর বিপরীতধর্মী হলেও তারা পরস্পর ক্রিয়া করে। তবে এই ক্রিয়ার মূলে শীর্ষক গ্রন্থি নয়– খোদা স্বয়ং। খোদার হস্তক্ষেপের ফলেই দেহ ও মনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। যখন মনের মধ্যে পরিবর্তন আসে তখন খোদা দেহের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটনা, আর যখন দেহের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে তখন খোদা মনের মধ্যেও পরিবর্তন আনয়ন করেন। এই মতবাদ প্রয়োজনবাদ হিসেবে পরিবিদিত।

গেলিঙ্কসের মতে, গতির নিয়মাবলি ইচ্ছা ও গতির মধ্যে সঙ্গতি বিধান করে। এই মতবাদের অন্যতম প্রবর্তক গেলিঙ্কস এই মতবাদের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেন।

তিনি বলেন যে, এটা সত্য, আমরা জড়জগতের ওপর ক্রিয়া করতে পারি না, আর জড়জগৎও আমাদের ওপর ক্রিয়া করতে পারে না, তথাপি খোদার ইচ্ছাক্রমে আমাদের ইচ্ছাশক্তি গতি উৎপন্ন করে না, গতিও ধারণা সৃষ্টি করে না। কিংবা খোদা দেহ ও মনের মধ্যে পূর্ব থেকে কোনো শৃঙ্খলা স্থাপন করেন না। খোদা জানেন আমি কি ইচ্ছা করব, যদিও আমার ইচ্ছা স্বাধীন এবং সমগ্র বিশ্ব খোদার জ্ঞানানুযায়ী বিন্যস্ত। খোদা তাঁর অসীম জ্ঞান বলে গতির নিয়মাবলি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে আমার ইচ্ছা ও শক্তি নিরপেক্ষ কোনো গতির সাথে আমার স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গতি স্থাপিত হয়।[১]

ম্যালেব্রাঙ্কের মতে, সব বস্তু মনের ধারণা। ম্যালেব্রাঙ্কে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, যদি চিন্তা গতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়, তবে কিভাবে

---

[১] Frank Thilly, *History of Philosophy.*

গতি সংবেদন উৎপন্ন করবে, মন বাস্তব বিস্তৃতি দর্শন করবে? বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব ব্যাপার। আধ্যাত্মিক দ্রব্য আধ্যাত্মিক উপায়ে সুস্পষ্ট হয় এবং একমাত্র সদৃশই সদৃশকে জানতে পারে। যে জগৎ দেখি সে জগৎ বাস্তব জগৎ কিংবা বিস্তৃত জগৎ নয়, সে জগৎ ধারণার জগৎ, বুদ্ধির জগৎ, আদর্শ জগৎ। ধারণা খোদার মধ্যে অবস্থিত, খোদা আধ্যাত্মিক শক্তি। কোনো বস্তু সৃষ্ট দেহ মনকে প্রভাবিত করতে পারে না। একমাত্র বস্তুর ধারণাই এ কাজ করতে পারে। আমরা সব বস্তু বুদ্ধিময়, চিন্তাশীল খোদার মধ্যে দেখতে পাই, কোনো বিস্তৃতি পরিদৃশ্যমান খোদার মধ্যে দেখতে পাই না। আমরা যে বস্তু দেখি তা মনের ধারণা-বিস্তৃতি সম্পন্ন বস্তু নয়।[২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবাদীদের মতে দেহ ও মনের মধ্যে সম্পর্কের যে অনুরূপতা দৃষ্ট হয় তা খোদা নিয়ন্ত্রিত।

সোয়েগলার বলেন, "যে ক্রিয়া ভিতর ও বাহির, মন ও জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তা আত্মার কিংবা বস্তুজগতের ক্রিয়া নয়, খোদার প্রত্যক্ষ কাজ। যখন আমি আমার ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করি তখন তা আমার ইচ্ছা থেকে নিঃসৃত হয় না, খোদার ইচ্ছা থেকেই দৈহিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। আমার ইচ্ছা সক্রিয় হলে খোদা দেহ সঞ্চালিত করেন, আর আমার দেহ সঞ্চালিত হলে খোদা আমার মনের মধ্যে উদ্দীপিত করেন। একটি অন্যটির উদ্দীপক কারণ।"[৩]

সমালোচনা
Criticism

প্রয়োজনীবাদীরা দেকার্টের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের অসঙ্গতি সম্পর্কে সমালোচনা করে স্পিনোজার অদ্বৈতবাদের পথ প্রশস্ত করেছেন। কিন্তু খোদা কর্তৃক মানুষের দৈহিক ও মানসিক কার্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যেক মানবিক ব্যাপারে খোদাকে টেনে আনা অলৌকিক ব্যাখ্যার সামিল। এর ফলে খোদা অবস্থান দাসে পরিণত হয়। অলৌকিক ব্যাখ্যা যুক্তির বিচারে কম মূল্যবান আর প্রত্যেক মুহূর্তে খোদাকে দেহ-মনের সম্পর্ক স্থাপনে ব্যস্ত রাখা উদ্ভট কল্পনা। কাজেই প্রয়োজনবাদ দেহ ও মনের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার একটা বিচারবিযুক্ত মতবাদ। এই মতবাদ 'নির্বোধ যান্ত্রিক ব্যবহার' (Deusex machine) দোষে দুষ্ট।

৪.৩ সমান্তরবাদ (Parallelism) : দার্শনিক স্পিনোজা সমান্তরবাদের প্রধান প্রবর্তক। দেকার্টের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ও গেলিঙ্কস ও ম্যালেব্রাঙ্কের প্রয়োজনবাদের অসঙ্গতি দূর করার জন্য তিনি সমান্তরবাদের প্রবর্তন করেন। স্পিনোজার মতে, খোদা একমাত্র স্ব-নির্ভর পরমসত্তা। তাঁর অসংখ্য গুণাবলি আছে। এই অগণিত গুণসমূহের

---

[২] Thilly- *History of Philosophy.*

[৩] Every operation that combines the outer and the inner, the soul and the world, is either an effect of the spirit, nor of the material world, but simply and immediate act of God. When I exercise my volition, it is not from will but form the will of God that the proposed bodily motions follow. On occasion of my will God move the body. On occasion of an affection of my body, God excites an ideas in my mind. The one is but the occasional cause of the other. – Schwegler : *History of Philosophy.*

মধ্যে মানুষ মাত্র দুটি গুণ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। চেতনা ও বিস্তৃতি, মন ও জড় এই গুণদ্বয় পরস্পরনিরপেক্ষ– একটি অপরটিকে প্রভাবিত করতে পারে না। মন দেহের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না, দেহও মনের মধ্যেও কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না, যেহেতু দেহ ও মন পরস্পর পৃথক, কাজেই তাদের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকতে পারে না, তবে দেহ ও মন একই চৈতন্যময় সত্তা। স্পিনোজার সমান্তরবাদকে দ্বিভঙ্গিবাদও (The double aspect theory) বলা হয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো, দেহ ও মন একই পরমসত্তা বা আধ্যাত্মিক দ্রব্যের দুটি সমান্তরাল গুণ হলে কিভাবে তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়া সম্ভব? এর উত্তরে সমান্তরবাদের বক্তব্য এই যে, যেহেতু দেহ ও মন একই সত্তার দুই পরিপূরক দিক, কাজেই উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ অনুরূপতা চলতে পারে।

স্পিনোজা বলেন, "ধারণার বিন্যাস ও সংযোগ বস্তুর বিন্যাস ও সংযোগের মতোই। ... চৈতন্যময় দ্রব্য ও বিস্তৃতি সম্পন্ন দ্রব্য, এক ও অভিন্ন দ্রব্য, একবার এই গুণটির একবার ঐ গুণটির মাধ্যমে দেখা হয়ে থাকে।[১]

স্পিনোজার মতবাদ সম্পর্কে জন কেয়ার্ড বলেন যে, স্পিনোজার মতবাদের ক্ষেত্রে দেহ ও মন এবং দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য দেকার্তের নির্বোধ যান্ত্রিক ব্যবহার, গেলিঙ্কসের প্রয়োজন মাফিক কারণ বা লিবনিজের পূর্বে স্থাপিত শৃঙ্খলের কোনো স্থান নেই। কেননা পার্থক্য সম্পর্ক বুঝায় এবং এক্ষেত্রে পার্থক্যের কোনো অবকাশ নেই, একই সত্তা বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয়। আমরা খোদাকে দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকারের ঘটনার কারণ হিসেবে মনে করি।[২]

হার্বার্ট স্পেন্সার স্পিনোজার সমান্তরবাদ গ্রহণ করেন এবং মনে করেন যে, পরম দ্রব্য বা পরমসত্তা, যিনি বিস্তৃতি ও চৈতন্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তাঁর মতে, পরম দ্রব্য জড়াত্মকও নয় আধ্যাত্মিকও নয়। মস্তিষ্ক ও মন এক নয়, মস্তিষ্ক এক বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী চলে, আবার মনও তেমনি এক বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী চলে। আধুনিক দর্শনে সমান্তরবাদ কতিপয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। নিম্নে কয়েকটি রূপের আলোচনা প্রদত্ত হলো :

মানসিক দৈহিক সমান্তরবাদ (Psycho-physical parallelism) : স্টাউট এই মতবাদের প্রবর্তক। তাঁর মতে, মানসিক প্রক্রিয়া ও স্নায়বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, তবে উভয়ের মধ্যে সহ-পরিবর্তনশীলতা (Concomitance) রয়েছে।

মন-উপাদান মতবাদ (The Mind-Stuff Theory) : ক্লিফোর্ডের মতে, প্রত্যেক অণু-পরমাণুর জড়-উপাদানের (Matter stuff) অনুরূপ মন-উপাদান (**Mind-stuff**) আছে। এর ফলে দেহের মধ্যে জড়াত্মক পরমাণুর সংমিশ্রণ ঘটলে মানসিক পরমাণুর সংমিশ্রণ ঘটে মনে।

---

[১] The order and connection of ideas is the same as the order and connection of thing. – Thinking substance and extended substance are one and the same thing comprehended now through this, now through that, attributes. – Spinoza Ethics, P. 11

[২] John Caird – Spinoza.

দ্বিভঙ্গি মতবাদ (The Double Aspect Theory) : ওয়ারেন (Warran) বলেন যে, চেতন প্রক্রিয়া ও স্নায়বিক প্রক্রিয়া একই ঘটনা শ্রেণীর অন্তর্গত। মানসিক প্রক্রিয়া আত্মগত, স্নায়বিক প্রক্রিয়া বস্তুগত। এই মতবাদের নাম দ্বিভঙ্গি মতবাদ।

নিরপেক্ষ অদ্বৈতবাদ (Neutral Monism) : নব্যবস্তুবাদীদের মতে, বিশেষ করে দার্শনিক রাসেলের মতে, এক নিরপেক্ষ সত্তা বা উপাদান আছে। এই সত্তা জড়াত্মক নয়, মানসিকও নয়। জড়জগতের অন্যান্য জিনিসের প্রেক্ষিতে ধরলে এই সত্তাকে জড়াত্মক বলতে হয়, আবার স্নায়ুতন্ত্রের প্রেক্ষিতে ধরলে এই সত্তাকে মানসিক বলতে হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে এ জগতে নিরপেক্ষ সত্তাই (neutral entities) বিভিন্ন প্রেক্ষিতে জড়াত্মক ও মানসিক বলে বিবেচিত হয়।

সমালোচনা
Criticism

মতবাদের উৎকর্ষ : অদ্বৈতবাদের একজন বলিষ্ঠ প্রবর্তক হিসেবে স্পিনোজার নাম দর্শনের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। তিনি প্রথম ভাববাদীচিন্তাবিদ যিনি সঙ্গতভাবে ভাববাদী দর্শনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। দেকার্তে ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কেউই এত বলিষ্ঠভাবে ভাববাদের বর্ণনা প্রদান করেন নি। সমান্তরবাদ সত্যনির্ভর মতবাদ, আজও এই মতবাদ দর্শন ও বিজ্ঞানে সমভাবে আদৃত হয়ে আসছে।

সমান্তরবাদ অবৈজ্ঞানিক : স্পিনোজার সমান্তরবাদ দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদী দর্শনের সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ ভাব হলেও এই মতবাদের মধ্যে কিছু কিছু অসঙ্গতি বর্তমান। এই মতবাদ বস্তুজগৎ ও মানসজগতের মধ্যে কোনো ব্যবধান স্বীকার করে না। এই মতবাদও সর্বাত্মক পর্যবসিত হয়। সর্বাত্মাবাদের মতে, যেখানে বিস্তৃতি সেখানে মন, যেখানে মন সেখানে বিস্তৃতি বর্তমান। কিন্তু এটি অবৈজ্ঞানিক। সুগঠিত স্নায়ুতন্ত্র ব্যতিরেকে অন্য কোথাও চৈতন্যের সাক্ষাৎ মেলে না। কাজেই জড়বস্তুর মধ্যে চেতনার সন্ধান করা বাতুলতা মাত্র।

দেহ ও মন একই পর্যায়ভুক্ত নয় : এই মতবাদ দেহ ও মানকে দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়াকে একই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে। দেহ ও মন এক শ্রেণীর সত্তা নয়। মন দেহ অপেক্ষা উন্নতর সত্তা। মনের স্বাধীনতা আছে, নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে দেহের তা নেই। কাজেই মন ও দেহ একই পর্যায়ভুক্ত নয়।

সমান্তরবাদ চেতনার সাক্ষ্যকে নস্যাৎ করে। আমরা জানি দেহ মনের ওপর ক্রিয়া করে, মন দেহের ওপর ক্রিয়া করে। দেহের কোনো অংশে আঘাত লাগলে মনে যাতনা উপস্থিত হয়। আবার মনে কোনোরূপ দুঃখ উপস্থিত হলে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে মন দেহের প্রভাব অতিক্রম করতে পারে, দেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। জাতীয় সংহতি, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কোনো দেশের নির্ভীক নাগরিক যে কোনো দৈহিক ক্লেশ সহ্য করতে পারে। কোনো দানবীর সর্বস্ব বিলিয়ে নিঃস্ব হতে পারে, কোনো দেশপ্রেমিক দেশের জন্য শহীদ হতে পারে, কোনো সম্বিতহারা ধরণীর মায়া কেটে প্রিয়-পরিজন ও জীবনের আকর্ষণ ছিন্ন করে আত্মহত্যা করতে পারে– সমান্তরবাদ এই ধরনের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

এই মতবাদ মানসিক ও দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সহযোগিতার বিষয় নির্দেশ করে। মন ও দেহের অন্তরঙ্গতা উভয়ের একাত্মতা সপ্রমাণ করতে পারে না। মন ও দেহ

স্বতন্ত্র সত্তা, সমান্তরবাদীরা তা উপলব্ধি করতে পারে না। দেহ ও মনের দ্বৈত সত্তা, কথার জোরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যের পরিপন্থি।

৪.৪ পূর্ব-সংস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ (Theory of pre-established Harmony) : এই মতবাদ অনুসারে, সৃষ্টির সময়ই খোদা দেহ ও মনের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি স্থাপন করেছেন। দেকার্টে, স্পিনোজা প্রমুখ দার্শনিকের মতে, এই মতবাদের প্রবর্তক লিবনিজও দ্রব্যের ধারণার ওপর তাঁর দর্শনের ভিত্তিসৌধ নির্মাণ করেছেন। তাঁদের মতে, দ্রব্য স্ব-নির্ভর ও নিজ স্বতন্ত্রে উজ্জ্বল। এই দ্রব্য একটি বা দুটি নয়– অগণিত। তিনি এই বিশ্বচরাচরের মূলীভূত এই উপাদানের নাম দিয়েছেন মোনাড বা চিৎপরমাণু (Monad)। চিৎপরমাণু স্ব-নির্ভর আধ্যাত্মিক শক্তিকেন্দ্র। কোনো চিৎপরমাণুর পূর্ণ সাদৃশ্য নেই। চিৎপরমাণুর গবাক্ষশূন্য। দুটি চিৎপরমাণুর মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। এদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, বাইরে থেকে কোনো প্রভাব এদের প্রভাবিত করতে পারে না। চিৎপরমাণু স্ব-নির্ভর, স্বতন্ত্র মোনাড বা চিৎপরমাণুসমূহের মধ্যে কোনো পারস্পরিক লেনদেন নেই। প্রত্যেক চিৎপরমাণু স্বীয় স্বভাব অনুসারে ক্রিয়া করে।

চিৎপরমাণুর স্তরসমূহ : লিবনিজ মোনাডের ধারাবাহিক শ্রেণীকরণে বিশ্বাসী। তাঁর মতে, প্রকৃতিতে নিরবচ্ছিন্নতা বর্তমান, প্রকৃতিতে কোনো উল্লম্ফন নেই। নিম্নতম চিৎপরমাণু অচেতন; এই স্তরে চিৎপরমাণু জড়জগতের ভিত্তি। এই স্তরের উপরের স্তরে রয়েছে চেতন চিৎপরমাণু। চেতন চিৎপরমাণু জীবজগতের ভিত্তি। আত্মসচেতন চিৎপরমাণু আর এক স্তর উপরে। এই শ্রেণীর চিৎপরমাণু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সত্তার ভিত্তি। সব চিৎপরমাণুর শ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু হলো খোদা।

এখন প্রশ্ন ওঠে : চিৎপরমাণুসমূহ স্ব-নির্ভর, স্বতন্ত্র, গবাক্ষহীন হলে তাদের মধ্যে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে? লিবনিজ পূর্ব-সংস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ মোনাড খোদা দেহ ও মনের মধ্যে সৃষ্টির প্রারম্ভেই সঙ্গতি স্থাপন করেছেন। খোদা বা শ্রেষ্ঠ চিৎজগৎপরমাণু থেকে সকল চিৎপরমাণু এসেছে। তিনি মোনাডের মধ্যে এমন সঙ্গতি স্থাপন করেছেন যে, একটির মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে অন্যটিতেও পরিবর্তন সাধিত হয়।

সমালোচনা
Criticism

উৎকর্ষ : লিবনিজের পূর্ব-সংস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ জড় ও মনের আধ্যাত্মিক ঐক্য স্বীকার করে। এই মতবাদ আধুনিক সচল জড়বাদের পূর্বসূরি। অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে ফাঁক নেই, লিবনিজ এই সত্য যথার্থই অনুধাবন করেছেন।

অলৌকিকতা দোষে দুষ্ট : লিবনিজের এই মতবাদ একেবারে দোষমুক্ত নয়। প্রয়োজনবাদের মতে পূর্ব-সংস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদও একই দোষের অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজনবাদ অজস্র অলৌকিক ঘটনার অধীন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবাদ যেমন "নির্বোধ যান্ত্রিক ব্যবহার দোষের অধীন" পূর্ব-সংস্থাপিত শৃঙ্খলাবাদও তেমনি এই দোষের অধীন।

এই মতবাদ অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। চিৎপরমাণু গবাক্ষহীন ও স্বতন্ত্র। খোদা নিজে শ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু হয়ে কিভাবে অন্যান্য চিৎপরমাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করেন তা বুঝে ওঠা কঠিন।

৫. উপবস্তুবাদ
Epiphenomenalism
এই মতবাদ অনুসারে সকল মানসিক ঘটনাই দৈহিক ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মতবাদ জড়বাদের প্রকাশ বিশেষ। টমাস হাক্সলি (Thomas Huxley) এই মতবাদের প্রবর্তক। তিনি দেহ-মনের সম্পর্ক জড়বাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। জড়বাদ অনুসারে জড়ই একমাত্র বাস্তব সত্তা– মন বলে কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। মন জড়েরই সৃষ্টি দেহের উপবস্তু মাত্র। উপবস্তুবাদ অনুসারে দেহ ও মনের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। যেহেতু মন দেহেরই সৃষ্টি, কাজেই মন বা মানসিক ঘটনা দেহ বা দৈহিক ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই দেহ মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু মন দেহের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

মানুষ সচেতন যন্ত্র : হাক্সলি বলেন, "ইতর প্রাণির মতো আমাদের চেতনার সকল স্তর মস্তিষ্ক দ্রব্যের অণু পরিবর্তনের সাক্ষাৎ পরিণতি। মানুষ বা ইতর প্রাণির ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ নেই যে, চেতনায় কোনো বিশেষ অবস্থা জীবদেহের গতির কোনো বিশেষ অবস্থার কারণ। ... আমাদের ইচ্ছা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার কারণ নয়, বরং মস্তিষ্কের সেই অবস্থার প্রতীক যা এই কার্যের প্রত্যক্ষ কারণ। আমরা সচেতন যন্ত্র।"[১]

সমালোচনা
Criticism
এই মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ। উপবস্তুবাদ জড়বাদের প্রকাশ বিশেষ, কাজেই এতে জড়বাদের সমস্ত ত্রুটি বিদ্যমান। মন দেহেরই উপসৃষ্টি– এই মতবাদ গ্রহণ করা যায় না। জড়বাদ ও মন প্রকৃতিগতভাবে স্বতন্ত্র, একটিকে অন্যটিতে রূপান্তরিত করা যায় না। অন্য একটি ত্রুটি এই যে, এই মতবাদ অনুসারে মন দেহের দ্বারা প্রভাবিত নয়, কিংবা দেহ মনের দ্বারা প্রভাবিত নয়। কিন্তু এইরূপ ধারণা অসম্ভব, কেননা মন উত্তেজিত হলে দেহ উত্তেজিত হয়ে থাকে। এটি আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। সুতরাং এই মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ।

৬। উন্মেষবাদ
Theory of Emergence
লয়েড মর্গানের মতে, জড়, প্রাণ ও মন একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ। জড়, প্রাণ ও মন– তিনটি স্তর জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে চৈতন্যের উদ্ভব। প্রাণ জড়ের তুলনায় উচ্চতর স্তর, মন প্রাণের তুলনায় উচ্চতর স্তর।

দেহ ও মন পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে না। মন দেহের উপবস্তু নয়, দেহ মনের ধারণাও নয় কিংবা দেহ ও মন পরমসত্তার প্রকাশও নয়। দেহ ও মন পরস্পর সমান্তরও নয়। উন্মেষবাদ অনুসারে মন দেহের উচ্চতর উন্মেষ দেহের পূর্ণতা বা

---

[১] Ali states of consciousness in us, as in them are immediately caused by molecular changes of the brain substance. In men as in brutes, there is no proof that any state of consciousness is the cause of change in the motion of the matter of organism .... Our volition of not the cause of a voluntary act, but the symbol of that state of the brain which is the immediate cause of that act. We are conscious automata. – Thomas Huxley.

বিকাশ। মন দেহের মাধ্যমেই অর্জিত, মন দেহের উপায়। যখন কোনো পরমাণু থেকে অণু উন্মেষিত হয় তখন পরমাণু গৌণ হয়ে যায়। যখন অণু থেকে কোষ উন্মেষিত হয় তখন অণু গৌণ হয়ে যায়। যখন কোষ থেকে দেহ উন্মেষিত হয় তখন কোষ গৌণ হয়ে যায়। এইভাবে যখন দেহ থেকে মনের উন্মেষ ঘটে তখন দেহ গৌণ হয়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, জড়বস্তু, দেহ ও মন অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তর, প্রত্যেক পরবর্তী স্ত র, উচ্চতর স্তর এবং এখানে নতুন গুণ বা গুণাবলির উন্মেষ ঘটে থাকে। জড়বস্তু অপেক্ষা জীবন উচ্চতর স্তর– এই স্তরে এমন কতগুলি গুণ আছে যা জড়বস্তুর মধ্যে নেই, আবার মানসিক স্তরে এমন কতগুলি গুণ রয়েছে যা জীব বা প্রাণির মধ্যে নেই। লয়েড মর্গানের উন্মেষবাদে অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে যে নতুন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেকথা স্বীকৃত হয়েছে।

সমালোচনা
Criticism

এই মতবাদ নতুনত্বের সপক্ষে ওকালতি করলেও সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি। একথা সত্য যে, জড়বস্তু থেকে দেহ উন্নতর অবস্থা, দেহ থেকে মন উন্নততর অবস্থা, কিন্তু কেন দেহ থেকে মনের উন্মেষ ঘটবে, জড়বস্তু থেকে দেহের উন্মেষ ঘটবে, এ সম্পর্কে লয়েড মর্গান সুস্পষ্টভাবে কোনো কিছুই প্রদর্শন করেন নি। তিনি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল শক্তি হিসেবে খোদাকে স্বীকার করলেও কিভাবে এই শক্তি থেকে সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। সুতরাং এই মতবাদ বিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৭। আত্মগত ভাববাদ
Subjective Idealism

বার্কলির মতে, সসীম আত্মা ও খোদার সমবায়ে সমগ্র জগৎ। জড়বস্তু বলে কিছুই নেই। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী খোদা সসীম মনে সংবেদন উৎপন্ন করেন। প্রত্যক্ষকারী মনের অতিরিক্ত কোনো সত্তা নেই। দেহ মনের কতগুলি ধারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এটিই আত্মগত ভাববাদের মূল কথা।

আত্মগত ভাববাদ যথার্থ মতবাদ নয়। বার্কলি দেহ-মনের সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা এড়িয়ে গেছেন এবং দেহকে মনের ধারণায় রূপান্তরিত করেছেন। জড়বাদ যেমন মনের ব্যাখ্যা দিতে না পেরে মনকে দেহের উপবস্তু বলে মনে করে, আত্মগত ভাববাদ তেমনি দেহের ব্যাখ্যা দিতে না পেরে দেহকে মনের ধারণার সামিল করে। দেহ ও মন উভয়ই বাস্তব, পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। জ্ঞানের সমস্যা বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারি যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞান হতে পারে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আত্মগত ভাববাদ দেহ-মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৮। সর্বাত্মাবাদ
Panpsychism

জৈবিক ও মানসিক ক্রিয়া : এই মতবাদ অনুসারে পৃথিবীর সর্বত্র আত্মা বিরাজিত। সর্বাত্মাবাদ স্পিনোজার সমান্তরবাদের সঙ্গত পরিণতি। যদি দেহ ও মন পরস্পর অবিচ্ছিন্ন হয় তবে আমরা সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, যেখানে দৈহিক ক্রিয়া আছে সেখানেই মানসিক ক্রিয়া বা মন আছে। কানিংহাম বলেন যে, স্পিনোজার

মত স্বীকার করলে আমরা এই সিদ্ধান্ত অনুমান করতে বাধ্য হই যে, যেখানে দৈহিক ক্রিয়া আছে সেখানে মন রয়েছে। সেটা জৈবিক আকারেই হোক কিংবা অজৈবিক সংমিশ্রণেই হোক।"[১]

প্রত্যেক জিনিসের আত্মা আছে। সর্বাত্মাবাদ সকল যুগের সকল ভাববাদী দার্শনিকদের সমর্থনপুষ্ট। ফেক্‌নার ও পলস্‌ন এই মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ফেক্‌নারের মতে জগৎ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। জড়-চেতনের একই আত্মিক শক্তির প্রকাশ। জগতের যাবতীয় জড়বস্তু, উদ্ভিদ, ইতর প্রাণি ও মানুষের মধ্যে একই সার্বজনীন আত্মিক চেতনা বর্তমান। জগতের সমুদয় বস্তু ও প্রাণির আত্মা আছে। এই জগৎ খোদার দেহ, তাঁর বাহ্য প্রকাশ। ড. পলসনও মনে করেন যে, জড় ও চেতনার সর্বত্রই মনের অভিব্যক্তি। জড়ে ও চেতনে সর্বত্র মন বিরাজিত। জগতের প্রত্যেকটি পরমাণুর প্রাণ, মন ও স্মৃতি রয়েছে।

সমালোচনা

Criticism

এই মতবাদ অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। মানসিক ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ক্রিয়াকে মানসিক ক্রিয়া মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। জড়শক্তির কেন্দ্র হলেও জড়ীয় শক্তি মানসিক শক্তি নয়। কাজেই এ মতবাদ বৈজ্ঞানিক নয়। ভাববাদী দার্শনিকরা বিশ্বজগৎকে এক পরম ধীশক্তির মূর্ত প্রকাশ বলে স্বীকার করলেও জড়বস্তু ও মনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেছেন।

ঐচ্ছিক ভাববাদ (Volunteeristic Idealism) : জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার ঐচ্ছিক ভাববাদের প্রবর্তক। তাঁর মতে, জগৎ অন্ধ, অচেতন, সার্বজনীন ইচ্ছার প্রকাশ এবং দেহ অচেতন ব্যক্তি ইচ্ছার প্রকাশ বা বাহ্য বিকাশ। দেহ ইচ্ছার পরিণতি। জানার ইচ্ছাই মস্তিষ্কের সংগঠক। সোপেনহাওয়ার বলেন, ইচ্ছার ক্রিয়া ও দেহের গতি বস্তুগতভাবে জ্ঞাত, কার্যকারণ সম্পর্ক সংযোজিত, দুটি স্বতন্ত্র বিষয় নয়; তারা কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। তারা এক অভিন্ন কিন্তু সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের ভিতর তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হয়ে থাকে। দেহের কাজ ইচ্ছার ক্রিয়ার মূর্তরূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। দেহের সকল গতি সম্পর্কে একথা সত্য। সমগ্র দেহ প্রমূর্ত ইচ্ছা ছাড়া অন্য কিছু নয়।"[১]

---

[১] We are logically driven to the conclusion that mind is present whenever there is bodily activity whether this activity be in organic froms or in inorganic compounds. – Cunninghaum.

[১] The act of the will and the movement of the body are not two different things objectively known, which the bond of causality unites; they do not stand in the relation of cause and effect; they are one and the same, but they are given in entirely different ways immediately, and again in perception. The action of the body is nothing but the act of the will objectified. This is true of every movement of the body. The whole body is nothing but objectified will. – Schopenhaur : The Story of Philosophy.

সোপেনহাওয়ারের মতবাদের সত্যতা আছে। আত্মা বা মন দেহের সংগঠক নীতি। এই মানসসত্তা অচেতন হতে পারে না। নৈতিক রসদ অনুসারে দেহ গঠন করে। মনের মূল শক্তি হলো চিন্তা ও ইচ্ছা। দেহ ব্যষ্টি মনের প্রমূর্ত রূপ, কাজেই এটা অচেতন হতে পারে না। বিশ্বজগতের মূলীভূত প্রেরণাও অন্ধ, অচেতন, সার্বজনীন ইচ্ছা হতে পারে না। কাজেই জগৎ-লীলার মূলীভূত ইচ্ছা সচেতন ও জাগ্রত।

১০। বস্তুগত ভাববাদ

Objective Idealism

এক পরম চৈতন্য শক্তি থেকে জড়, জীব ও প্রাণের উদ্ভব। দার্শনিক হেগেলের মতে, পরম ধীশক্তি জড়, প্রাণ ও চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে নিজেকে বিকাশ করছেন। জড়ের মধ্যে পরম ধীশক্তির প্রকাশ অল্প, প্রাণের মধ্যে তাঁর প্রকাশ সর্বাধিক। পরম ধীশক্তি ব্যাকুল বেগে বিবর্তনের পথে ধাবিত হচ্ছে। এই মতবাদ অনুসারে, পরম ধীশক্তি আধ্যাত্মিক শক্তি, তিনি বিশ্বজগতের সকল বস্তু ও সকল সত্তার মধ্য দিয়ে আপনাকে আত্মসচেতন শক্তি হিসেবে প্রকাশ করে চলেছেন। দেহ ও মন একই পরম ধীশক্তির প্রকাশ। এর সাহায্যে প্রমাণ করা যায়, আমাদের মন পরম ধীশক্তির অংশ বলে জড়ের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। পরম ধীশক্তির দিক দিয়ে দেহ ও মন সমান্তর হলেও সসীম জীবের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। দেহ জ্ঞেয়, মন জ্ঞাতা। কাজেই উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাধা নেই। হেগেলীয় ভাববাদে দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্কের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

"That which is an object of interest is... invested with value. Any object', whatever it be, acquires value when any interest whatever it be, is taken in it, jsut as anything whatsoever becomes a target when any one whoseever aims at it". – **R.B. Perry**

- ❑ আভাস
- ❑ মূল্য কাকে বলে
- ❑ তথ্য বিষয়ক অবধারণ ও মূল্যবিষয়ক অবধারণ
- ❑ মূল্যের প্রকৃতি
- ❑ মূল্যের প্রকারভেদ
- ❑ খোদা ও পরমমূল্য

১। আভাস
Introduction

অধুনা দর্শনের ইতিহাসে মূল্য কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বহির্জগৎকে কেন্দ্র করে মানবমনের প্রথম প্রজ্ঞার উদ্ভব হয়। বহির্জগৎ থেকে ক্রমশ মানুষের ধেয়ানী দৃষ্টি অন্তরজগতের আঙিনায় নিবদ্ধ হয়। এখন আবার জীবনজগতের অর্থ খুঁজতে মানুষের মন মরিয়া হয়ে ওঠেছে। বস্তু ও ঘটনা এবং তার মূল্যায়ন পরস্পর অজ্ঞাত নয়– বস্তু ও মূল্য একই জিনিসের দুটি দিক। যে বস্তু বা ঘটনার সাথে মানবমনের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, সেই বস্তু বা ঘটনা মানুষের কাছে মূল্যহীন। গ্রের বিখ্যাত শোকগীতির অতল সমুদ্রবক্ষে লুক্কায়িত 'মণি মানিক্য' 'বিজন গহন বনে প্রস্ফুটিত ফুলদল' মানষের মূল্যবোধের ইতিহাসে অকিঞ্চিৎকর। বস্তু বা ঘটনা যখন মানুষের জীবনের সাথে কোনো না কোনো সম্পর্কে জড়িত হয়, তখন বস্তু দ্রব্যত্বের সীমানা অতিক্রম করে মূল্যের অধিকারী হয়। বস্তু ও মূল্য পরস্পর পৃথক নয়। সত্তা ও মূল্য অবিচ্ছেদ্য– মূল্য ছাড়া সত্তা নেই- সত্তা ছাড়া মূল্য নেই।

পরমসত্তা সম্পূর্ণভাবে মানসিকও নয়, আবার সম্পূর্ণভাবে শরীরীও নয়। এতে চিন্তা ও বস্তু, ঘটনা ও মূল্য, অবিচ্ছেদ্য ও নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরমসত্তার এই সবের কোনো বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নেই। প্রয়োগবাদ, আত্মগত ভাববাদ, বস্তুগত ভাববাদ, এমনকি বস্তুবাদও এটা স্বীকার করে। আজকের ক্রমবর্ধমান মূল্যচেতনা দার্শনিক চেতনার কোনো অভিনব ঘটনা নয়; বর্তমান যুগের বস্তু মূল্যায়নের সার্থক ও অনিবার্য পরিণতি। যেখানে বস্তু আছে সেখানে মূল্যের প্রশ্ন রয়েছে। তবে প্রত্যেক যুগে মূল্যবোধের প্রশ্নটি মানবমনে একইভাবে অনুভূত হয় নি। যুগের পরিবর্তনের সাথে মূল্যবোধের প্রশ্ন উঠানামা করেছে। অধ্যাপক মানস্টারবার্গ বলেন, বস্তুজগতের মাধ্যমেই মূল্যবোধের জগৎ, প্রথমে ক্ষীণভাবে পরে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে।[১] কাজেই মূল্যের

---

[১] ... Through the world of things shimmered first meakly, and than even more clearly the world of values. – Prof. Munsterberg.

ধারণা জীবনজগতের মূল্যায়নের পরিকল্পনায় আমাদের দার্শনিক চেতনা শীর্ষবিন্দু। পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটোই মূল্যদর্শনের প্রথম উদ্যোক্তা, কারণ তাঁর দর্শনেই চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী, বস্তুগত, কল্যাণের ধারণা (Idea of Good) থেকে উদগত ধারণার জগৎ থেকে প্রেরণা লাভ করেছে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে দার্শনিক কান্টই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মূল্যের প্রশ্নকে স্বতন্ত্র প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। সেই থেকে মূল্যের প্রশ্ন আধুনিক প্রতীচ্য দর্শনে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব লাভ করে আসছে।

মুসলিম দর্শনে মূল্যবোধের প্রশ্ন জীবনজগতের অন্যান্য প্রশ্নের সাথে অনুস্যূত হয়ে আছে। মুসলিম দর্শনের মূল উৎস কোরআন ও হাদিস। বিশ্বপরিকল্পনায় মানবজীবনের গুরুত্ব ও ভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জগতের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক অণু ও পরমাণু, প্রত্যেক ঘটনাকে যথাযথ মূল্য প্রদান করে। নৈসর্গিক পরিবর্তন, বস্তু ও জীবদেহের গঠন, সৌরজগতের বিন্যাস, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, বিভিন্ন জাতির উত্থান, পতন, মানবমনের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পরিবর্তন– এই সবের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানের খোরাক রয়েছে। কোরআন মজিদে উক্ত হয়েছে, "ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃজনে, দিন ও রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত নিহিত রয়েছে। (তারা জ্ঞানবান) যারা দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে আল্লাহর স্মরণ ভজন করে এবং পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি-রহস্যের চিন্তা করে (আর বিস্ময়বিমুগ্ধ অন্তরে বলে) হে প্রভু, এই সমুদয় তুমি নিরর্থক সৃষ্টি কর নি।"[২]

হযরত রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "এই জগৎ পরজগতের শস্যক্ষেত্র।"[৩]

২। মূল্য কাকে বলে
What is value

মূল্য কথাটির তাৎপর্য : 'মূল্য' কথাটি আমাদের কাছে অতি পরিচিত হলেও কথাটির প্রকৃত অর্থ কি, এ সম্পর্কে মতানৈক্যের অবকাশ রয়েছে। বিভিন্ন চিন্তাবিদ মূল্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে 'গুণ' 'ভালো', 'উৎকর্ষ', 'পূর্ণতা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করি এবং শব্দগুলিকে মূল্যের সমার্থক বলে গ্রহণ করি। অবশ্য 'পূর্ণতা' শব্দটি সমুদয় মূল্যের পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

বিভিন্ন ভাষায় মূল্য বা ভ্যালু : লাতিন ভ্যালিও (Valeo) শব্দটি মূলত শক্তি বা শক্তির সাথে যুক্ত স্বাস্থ্য বুঝাত, পরে, 'ফলপ্রসূ' ও 'উপযুক্ত' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ফরাসি 'ভ্যালার' (Valeour) শব্দটি 'উৎকর্ষ' বুঝায়। ইতালীয় শব্দ ভ্যালো (Valeur)-এর সম্মানসূচক অর্থ আছে, ভ্যালোটা (Valeuta) শব্দের মানে মূল্য। জার্মান শব্দ 'ওয়ার্ট' (Wert) ইংরেজি 'ভ্যালু' শব্দের অনুরূপ। মেইনং (Meinong)

---

[২] ইন্না ফি খালকিস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আরদে ওয়াখতেলাফিল্ লায়লে ওয়ান্নাহারে লা আইইয়াতেল ল উলেল্ আলবাব। আল্লাজিনা ইয়াজকুরুনাল্লাহা ক্বিয়ামাও ওয়াকুয়ুদাও ওয়া আলা জুনুবিহিম ওয়া ইয়াতাফ কুকারুনা ফি খালসিক সামাওয়াতে ওয়াল আরদে রাব্বানা মা খালাক্তা হাজা বাতেলা। (সূঃ ৩ আঃ ১৯০-১৯১)

[৩] ইন্নামাদ দুনিয়া মাজরায়াতুল আখেরা। – আল্-হাদিস

মর্যাদা বা মহত্ত্ব অর্থে এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই অর্থসমূহ ছাড়াও দর্শনের বিভিন্ন চিন্তাসম্প্রদায়ের হাতে এই শব্দটির অর্থের বহু ইতর বিশেষ ঘটেছে।"[১]

মূল্য নির্ধারণ, গুণাগুণ বিচার : কোনো বস্তু বা ঘটনাকে আমরা দুইভাবে বুঝে থাকি।

প্রথমত, বস্তু যেভাবে পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয় আমরা বস্তুকে ঠিক সেইভাবে ব্যক্ত করি।

দ্বিতীয়ত, আমরা বস্তুর গুণাগুণ বিচার করি। এই গুণাগুণ বিচার করতে গিয়ে আমরা সাধারণত কোনো বিষয়কে ভালো বা মন্দ, সত্য বা মিথ্যা, সুন্দর বা কুৎসিত বলে অভিহিত করি। এইভাবে বস্তুর গুণ বিচার করাকে মূল্য নির্ধারণ বলা হয়।

তথ্য ও মূল্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। যা অস্তিত্বশীল, যা ঘটে, তাকে আমরা তথ্য বলি! 'বাড়ির সামনে একটি বাগান আছে', 'ঘাস সবুজ'– এই সকলই তথ্য। আবার "ফুল সুন্দর' 'মানুষটি চমৎকার'– এই সকলই বিচার। তথ্য ব্যক্তিনির্ভর নয়, সম্পূর্ণ বিষয়নির্ভর। কিন্তু মূল্য বিষয়নির্ভর হলেও ব্যক্তিনির্ভর।

তথ্যের সাথে ঘটনার এবং মূল্যের সাথে আদর্শের সম্পর্ক : তথ্য হিসেবে বিচার করতে গেলে এই জগৎ বিভিন্ন ঘটনার সমষ্টি। আর মূল্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে আদর্শের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই আদর্শ ব্যক্তির কল্পনার ওপর নির্ভর করে না, এই আদর্শ যেন বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে। আমাদের মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান বস্তুর প্রকৃতি বা ঘটনার বিশ্লেষণ করে। কোনো কোনো বস্তুবাদী দার্শনিক বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে রাজি, তাঁরা বস্তু বা ঘটনার ক্ষেত্রে কোনোরূপ মূল্য আরোপ করতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু দর্শনের ভূমিকা এ ব্যাপারে অনেকটা স্বতন্ত্র। দর্শনের বৃহত্তম পটভূমিকায় বস্তুর পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গেলে বস্তুর সাথে আদর্শের আলোচনা নিতান্ত অপরিহার্য। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নির্দেশ করে যে, বস্তুর গঠন বা ঘটনার কার্যকারণ কাঠামো অতিরিক্ত একটি আদর্শগত কাঠামো রয়েছে। এই আদর্শগত কাঠামো ছাড়া যান্ত্রিক কাঠামোর যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। দর্শন জীবনজগতের সার্বিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে দৃশ্যমান জগতের অতিরিক্ত একটি আদর্শ অনুমান করে পারে না। এডিংটন, হোয়াইটহেড, লয়েড, মর্গান প্রমুখ বৈজ্ঞানিকও জড়, শক্তি, দেশ, কাল, কার্যকারণের অতিরিক্ত একটি আদর্শগত কাঠামো আছে বলে মনে করেন।

৩। তথ্যবিষয়ক অবধারণ মূল্যবিষয়ক অবধারণ

Judgment of Fact and Judgment of Value

যে অবধারণে কোনো বস্তু বা বিষয়ের বর্ণনা করা হয় তাকে তথ্যবিষয়ক অবধারণ বলে। যেমন– 'আমি একটি লাল ঘোড়া দেখেছি', 'আকাশে রংধনু উঠেছে, 'বৃষ্টি হচ্ছে', 'আমি দর্শনের ভূমিকা গ্রন্থটি লিখিতেছি'– এই অবধারণসমূহে বক্তার মনের কোনো ভাব, মূল্যবোধ বা মূল্যায়ন বিষয়ক কোনো ব্যাপার বিবৃতি হচ্ছে না, নিছক ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত হচ্ছে। অপরপক্ষে, যে অবধারণে কোনো বিষয়ের অনুমোদন বা অননুমোদনের ব্যাপারটি বিবৃত হয় তাকে মূল্যবিষয়ক অবধারণ বলে। যথা– 'গোলাপ

---

[১] H.M. Bhattacharryya, *Principles of Philosophy.*

ফুলটি সুন্দর', 'সরোবর কি মনোহর', 'দৃশ্যটা কি রমণীয়', 'কি অপূর্ব নারীমূর্তি'– এই অবধারণগুলিতে ঘটনার পরিবর্তে বিচারকের অনুমোদন প্রকাশ পাচ্ছে।

এবার তথ্যবিষয়ক অবধারণ ও মূল্যবিষয়ক অবধারণের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করা যাক :

প্রথমত, তথ্য বিষয়ক অবধারণে আলোচ্য বিষয়ের নিছক বর্ণনা প্রদত্ত হয়ে থাকে, আর মূল্যবিষয়ক অবধারণে বিবেচিত বিষয়ের গুণাগুণ বিচার করা হয়।

দ্বিতীয়ত, তথ্যবিষয়ক অবধারণের বিবৃত বিষয়ের অনুমোদন বা অননুমোদনের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু মূল্যবিষয়ক অবধারণের কোনো বিষয়ক সন্তোষজনক বা অসন্তোষজনক তাই বর্ণনা কর হয়। যে বিষয়, অনুমোদিত হয় সেই বিষয় সন্তোষজনক হয়, আর যে বিষয় অনুমোদিত হয় নি, সেই বিষয় অসন্তোষজনক হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেতিবাচক হলে তখন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

তৃতীয়ত, তথ্যমূলক অবধারণ বিষয়নিষ্ঠ আর মূল্যবিষয়ক অবধারণ আদর্শনিষ্ঠ। তথ্যমূলক অবধারণের আলোচ্য বিষয়কে কোনো আদর্শের সাথে তুলনা করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু মূল্যবিষয়ক অবধারণে আলোচ্য বিষয়কে আদর্শের সাথে তুলনা করা হয়। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ– এই পরম আদর্শের প্রেক্ষিতে কোনো বিষয় ভালো বা মন্দ, সুন্দর বা অসুন্দর, ন্যায় বা অন্যায় বিবেচিত হয়।

চতুর্থত, তথ্যমূলক অবধারণ বিষয়ের বর্ণনা। কাজেই এই জাতীয় অবধারণের বস্তুগত সত্য পওয়া যায় কিন্তু মূল্যবিষয়ক অবধারণে বস্তুগত ও আত্মগত উভয় ধরনের সত্যই পাওয়া যায়; মূল্যবিষয়ক অবধারণই বিষয়েরই মূল্যায়ন। কাজেই এতে সত্যের দ্বিবিধ উপাদানই রয়েছে।

৪। মূল্যের প্রকৃতি
Nature of Value

বিভিন্ন মতবাদ : মূল্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। এই সম্পর্কে চারটি মতবাদ প্রচলিত আছে। যথা– (১) মনস্তত্ত্বমূলক বা আত্মনিষ্ঠ মতবাদ (Psychological or Subjective View), (২) বস্তুনিষ্ঠ মতবাদ (Objective View), (৩) প্রায়োগিক মতবাদ (Pragmatic View) ও (৪) ভাববাদী মতবাদ (Idealistic View)। একবার এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

৪.১ মনস্তত্ত্বমূলক বা আত্মনিষ্ঠ মতবাদ (The Psychological or Subjective View of Value)

এই মতবাদ অনুসারে বস্তুর গুণ যা মানুষের প্রয়োজন মেটায় বা আনন্দ দান করে তাই হলো মূল্য। মূল্যের ধারণা ও অবধারণের উৎপত্তি ও বিকাশ নিহিত রয়েছে মানুষের কামনা, বাসনা অনুভূতি ও ইচ্ছায়। এর মূল্য মানুষের আবেগ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতায়। অন্যকথায়, মূল্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হলেও সকল আদর্শ বা মূল্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা; বিচার-বুদ্ধি ছাড়া বস্তুর গুণাগুণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যে বস্তু বা গুণ আমাদের মনে সন্তোষ আনয়ন করে তাই মূল্য। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মূল্য আত্মগত (Subjective)। ব্যক্তি মনের ওপর নির্ভর না করলেও বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে, ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু বস্তুর মূল্য ব্যক্তি-মনের ওপর

নির্ভরশীল। দার্শনিক লোটজার মনে করেন যে, সন্তোষের অনুভূতি হলো মূল্য। উল্লেখযোগ্য যে, বস্তুই মানুষের মনে আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। সুতরাং মূল্য সম্পূর্ণভাবে আত্মগত।

দেশ-কাল পাত্রভেদে মূল্য বিভিন্নভাবে অনুভূত হয় : এই মতবাদের সমর্থকরা মূল্যের আত্মগত প্রকৃতি সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিও প্রদান করেন। ব্যক্তিভেদে মূল্য স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করে। প্রত্যেক জিনিসের মূল্য সকলের কাছে সমান নয়। কোনো বিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়। আবার একই বিষয় একই ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে অনুভূত হতে পারে। তাই দেখা যায়, ব্যক্তিভেদে, জাতিভেদে, রাষ্ট্রভেদে, দেশ-কালভেদে মূল্য নিরূপণের মানদণ্ড পরিবর্তিত হয়। এইসব অবস্থা ও যুক্তির ভিত্তিতে এই মতবাদের অনুসারীরা মনে করেন যে, মূল্য আত্মগত, ব্যক্তি মনের ওপরই মূল্যের সৌধ প্রতিষ্ঠিত।

সমালোচনা
Criticism

সত্য বিচ্ছিন্ন নয় : প্রথমত, মূল্যের আত্মগত বা মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের অসুবিধা এই যে, এখানে সমগ্র সত্তা থেকে মানসিক উপাদানকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, ফলে আমরা পূর্ণ সত্তা পাই না। সত্তা একটি সমগ্র।

মুখ্য ও গৌণ মূল্য : দ্বিতীয়ত, এই মতবাদ ক্রটিপূর্ণ মনস্তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মিল তাঁর উপযোগবাদে বলেছেন যে, যে বস্তুর নিজস্ব মূল্য আছে, সেই বস্তুই কাম্য, আর এ হলো সুখ এবং দুঃখ থেকে মুক্তি। কাজেই মিলের মতে, সুখ বা দুঃখের অনুপস্থিতিই মৌলিক মূল্য এবং অন্যান্য মূল্য মৌলিক থেকে উৎসারিত। সুখ ও দুঃখের অনুপস্থিতি মৌলিক মূল্য, অন্যান্য মূল্য গৌণ। গৌণ মূল্য প্রাথমিক বা মুখ্য বা মৌলিক মূল্য লাভের উপায়স্বরূপ। সুখবাদের বিশ্লেষণে[1] আমরা দেখতে পাই যে বস্তু নয়, ব্যক্তিগত সুখকর অনুভূতিই মুখ্য মূল্য হিসেবে বিবেচিত হয়, কিন্তু এই মতবাদ অমনোবৈজ্ঞানিক। কারণ সুখ নয়, বস্তুই মানুষের কাম্য। সুখবাদের ছাত্রদের একথা অজানা নেই যে, মানুষ সুখের অন্বেষণ করে না– অন্বেষণ করে কাম্য বস্তুর।

মেনিং আরেনফেলের মতো পেরির মতবাদ মূল্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন : মেইনং-এর মনোবিজ্ঞানিক মূল্যবোধ আরেনফেলের (Ehrenfel) মূল্যবোধের উৎসের মতোই ভ্রমাত্মক। মেইনং ভুলে গেছেন যে, অনুভূতির আবরণে বস্তুর চেতনা বর্তমান, আরেনফেল কামনা-বাসনাকে মূল্যের উৎস হিসেবে মনে করে ভুল করেছেন, বরং কামনা-বাসনা মূল্যবোধেরই ফলশ্রুতি। অনুভূতি ও আবেগ মূল্যবোধের সাথে জড়িত মানসিক প্রক্রিয়ার সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু মূল্যের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারে না। পেরির 'দৈহিক আগ্রহ' (Biological interest) মূল্যের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করতে পারে না।

তৃতীয়ত, এই মতবাদ মূল্যবোধের বাহককে জীবে পরিণত করে, তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বকে উপেক্ষা করে থাকে। মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি যে, মানুষকে উচ্চতর মূল্যবোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এই মতবাদের সমর্থকরা সে কথা হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ।

---

[1] মদীয় 'নীতিশাস্ত্র গ্রন্থে'র একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪.২ বস্তুনিষ্ঠ মতবাদ (The Realistic View of Value) : মূল্য সম্পর্কীয় বস্তুনিষ্ঠ মতবাদ মূল্য সম্পর্কীয় মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদের বিপরীত। বস্তুবাদীরা বলেন মূল্য ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। বিষয় বা বস্তুর মধ্যেই মূল্য নিহিত থাকে। যখন আমরা বলি, 'ফুলটি সুন্দর' তখনই এই মূল্যায়ন আমাদের মনের ওপর নির্ভরশীল নয়। ফুলের মধ্যে এমন গুণ নিহিত আছে, যা ফুলকে সুন্দর বলতে বাধ্য করে। আবার 'করিমের আচরণ সন্তোষজনক' এই অবধারণের ক্ষেত্রেও বস্তুবাদীরা মনে করেন যে, করিমের মধ্যে এমন গুণ আছে যা তার আচরণকে সন্তোষজনক বলে সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য করে। কাজেই এই মতবাদ অনুযায়ী মূল্য ব্যক্তিনির্ভর নয়।

দেশকালের বিবর্তন মূল্যবোধের দিকে অগ্রসরমান : বিভিন্ন বস্তুবাদী দার্শনিকরা মূল্য সম্পর্কে যে মতবাদসমূহ উপস্থাপিত করেন সেগুলির মধ্যে একটি বিষয়ে মিল রয়েছে যে, মূল্যাবধারণের পূর্বশর্ত হিসেবে বিশ্বজগতের আধ্যাত্মিক সংগঠন সম্পর্কে কোনো প্রকল্প অনুমান করার প্রয়োজন নেই। আলেকজান্ডারের মতে, মূল্যের কোনো নিজস্ব সত্তা নেই। এটা আত্মগত নয়, বিষয়গতও নয়; বস্তু ও মনের মিলন থেকে উৎপন্ন তৃতীয় শ্রেণীর গুণ (Tertium quid) হিসেবে উদ্ভূত। বিশ্বজগতের দৈশিক-কালিক সংগঠন মূলত নিরপেক্ষ হলেও মূল্যের বিবর্তনের দিকে তার প্রবণতা লক্ষণীয়। দেশ-কাল (Space/Time) আদিম উপাদান থেকে বিশ্বজগৎ বিবর্তিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর অবস্থার সৃষ্টি করছে, উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ের উদ্ভবকে সম্ভব করে তুলছে। আদিম উপাদান থেকে জড়, জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে চৈতন্যের উন্মেষ ঘটছে। চৈতন্যের পর যে নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটবে আলেকজান্ডার তার নাম দিয়েছেন দেবসত্তা (Deity)। সমগ্র বিশ্ব এই দেবসত্তার আগমন প্রতীক্ষা করছে। দেবসত্তা পরিবর্তনশীল ধর্ম, জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে এই সত্তারও পরিবর্তন সাধিত হয়। অস্তিত্বের প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য দেবসত্তা রয়েছে। এই দেবসত্তা, প্রাণের স্তরে মনই দেবসত্তা। আলেকজান্ডারের মতে, মনও "মন নয়, এমন জিনিসের সমবায় যে সত্তা তার উদাহরণ হলো 'ব্যক্তি' যার মধ্যে দেহ ও মন সমন্বিত-ব্যক্তি জ্ঞাতা সত্তা নয়, জ্ঞেয় সত্তাও নয়– এই দুয়ের মিলন।"[১] যদিও দেহ মনের মিলন থেকে তৃতীয় গুণ হিসেবে মূল্যের উদ্ভব, তথাপি মানসিক ও অমানসিক কোনো অবস্থারই মূল্য সংগঠন নেই। দেহ মনের শুধু সম্পর্ক বিষয়ক সত্তা আছে।

অধ্যাপক লেয়ার্ডের (Prof. Laird) মতে, ঘটনা ও মূল্যের মধ্যে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে নিছক সত্তা ও মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজন নেই। সমুদয় ঘটনাই মূল্য। লেয়ার্ড বলেন, "আমার কাছে এটি স্বতঃসিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয় যে, যদি দুটি বস্তু পরস্পরনিরপেক্ষ হয়, তবে পারস্পরিক সম্পর্কের দিক দিয়ে তাদের কোনো মূল্য নেই। পক্ষান্তরে, যদি দুটি বস্তুর পরস্পর নিরপেক্ষ না হয়, তবে সংশয়াতীতরূপে না হলেও হিসেবে হয় একটির না হয় অন্যটির অথবা উভয়ের

---

[১] The simplest example of a reality which is compound of mind and a non-mental thing is the person itself in which the mind and body are connected together and the person is neither the subject-self alone, nor the object-self alone, but the union of the two. – Alexander : *Space, Time and Deity.*

অন্তর সাপেক্ষ মূল্য রয়েছে।"[১] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব মূল্য আছে। জি. ই. ম্যুরের (G. E. Moor) মতে, সকল বস্তুরই স্বতঃমূল্য (Intrinsic Value) আছে। বস্তুর অপরিহার্য গুণাবলি স্বতঃমূল্যের ভিত্তি। এই মূল্যের প্রকৃতি এই যে, যে বস্তুর স্বতঃমূল্য আছে, সেই বস্তুর সকল অবস্থার সকল সময়ে এই মূল্য ধারণা করতে থাকবে, এর মধ্যে কোনোরূপ ইতর বিশেষ ঘটবে না। ম্যুরের এই আবশ্যিক গুণ কারণগত বা নৈয়ায়িক নয়। এই আবশ্যিকতা এই ধরনের যে, একই জাতীয় বস্তু একই জাতীয় গুণের অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে চলবে। মূল বস্তুবাদী হলেও জীবন ও মনকে মূল্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারে কোনোরূপ বিরোধিতা করেন নি, আবার একথাও বলেন নি যে, শুধু পার্থিব বিষয়ই মূল্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, আর এসব বিষয় মূল্যের এলাকা বহির্ভূত হবে। পরবর্তীকালে 'প্রিন্সিপিয়া এথিকায়' (Principia Ethica) মূল সৌন্দর্যবিষয়ক মূল্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চেতনার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছেন।

সমালোচনা
Criticism

মূল্যের বস্তুগত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বস্তু বা ঘটনার নিজস্ব মূল্য থাকলেও' সে মূল্য মনের আওতাভুক্ত না হলে অর্থহীন। মানুষের চেতনার বাইরে অবস্থিত বা ঘটনার কি মূল্য আছে, তা অননুমেয়। চেতনার মানদণ্ড ব্যতিরেকে বস্তুর মূল্যবোধের কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত সর্বকালীন আদর্শবোধ মানুষের চিন্তায়, ভাবনায় ও কার্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মূল্যের একটা সার্বজনীন বস্তুগত দিকও আছে। কাজেই মূল্য আত্মগত ও বস্তুগত উভয়ই।

৪.৩ প্রায়োগিক মতবাদ (The Pragmatic View of Value) : প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্য বস্তুর প্রকৃতিগত কোনো স্বতঃমান নয় কিংবা বস্তুর নিরপেক্ষ কোনো সত্তাও নয়; মূল্য হলো ব্যক্তিসত্তা বা সমাজসত্তার কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তির ফল। মূল্যের চারিদিকে অস্পষ্টতার কোনো আভাস নেই। এটা পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়াজাত পরিতৃপ্তি হলো মূল্য।

প্রয়োগবাদীরা দর্শনের ইতিহাসে অভিনবত্ব আমদানি করেছেন। তাঁরা যুক্তি ও চিন্তার নীরস নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে দর্শনকে পরিত্রাণ দিয়েছেন এবং কার্যকারিতা ও মানবীয় কামনা-বাসনার আলোকে দর্শনের পঠন-পাঠন উৎসারিত করেছেন। দর্শন যে একটা গুরুগম্ভীর, অসাধারণ, অবাস্তব অনুশীলন নয়, প্রয়োগবাদ সেই কথাই বলবার প্রয়াস পায়। বাস্তব জীবনের বাস্তব আলোচনাকে দর্শনের চত্বরে পৌঁছিয়ে দেওয়াই প্রয়োগবাদের বড় কৃতিত্ব। তবে প্রয়োগবাদ কুসংস্কার ও বস্তুর নিশ্চয়াত্মক তাৎপর্যের

---

[১] I take it to be evident that if two things in nature are utterly indifferent to one another, neither, in relation to the other, has any value at all. If on the other hand, they are not indifferent to one another, it is likely, if not absolutely certain, that a value exists for one of the other for both of them at last of a relative kind. – Laird : *The Idea of Value.*

মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করতে পারে না। মনোবৈজ্ঞানিক বিবেচনার সমভিব্যহারে দৈহিক কুসংস্কার প্রয়োগবাদী মূল্যায়নকে আত্মগত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে। উপযোগিতাকে মূল্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করলে উপযোগিতা ব্যক্তিগত ব্যাপারে পর্যবসিত হয়। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, নৈতিক ও সৌন্দর্য বিষয়ক মূল্যের বস্তুগত ভিত্তি রয়েছে এবং এই ভিত্তির প্রেক্ষিতে জে. এইচ. টাফট (J.H. Tuft), এম.সি. অটো (M.C. Otto) প্রমুখ প্রয়োগবাদী দার্শনিক উপযোগিতাবাদের আত্মগত ধারণা বিদূরিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। 'সে ভালো লোক', 'এটা ভালো কাজ', 'ছবিটি সুন্দর' ইত্যাদি অবধারণে নৈতিক ও সৌন্দর্যবিষয়ক মূল্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু প্রয়োগবাদ সুখের বা পরিতৃপ্তির ইঙ্গিত দেয় এবং সুখী ব্যক্তির নির্দেশ দেয়। উপযোগিতাবাদের একটি বড় অসুবিধা হলো ব্যক্তি সুখ থেকে সমাজ সুখে উত্তরণ। যদিও প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের কেউ কেউ নৈতিক ও সৌন্দর্যবিষয়ক মূল্যের প্রেক্ষিতে মূল্যের আত্মগত ত্রুটি নিরসন করার প্রয়াস পেয়েছেন, তথাপি সে ত্রুটি বিদূরিত হয় নি।[১]

নৈর্ব্যক্তিক মূল্যসমূহের প্রভাব : এছাড়া নৈতিক ও সৌন্দর্যবিষয়ক মূল্য স্বতঃ ও নিরপেক্ষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়। নৈতিক ও সৌন্দর্যবিষয়ক মূল্য-সত্য, সুন্দর কল্যাণের আদর্শ ব্যক্তি বা সমাজের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই নৈর্ব্যক্তিক মূল্যসমূহ আদর্শ হিসেবে অনুস্যূত হয়ে থাকে।

৪.৪ ভাববাদী মতবাদ (The Idealistic View of Value) : মূল্যের ভাববাদী মতবাদ অনুসারে মূল্য সত্তা ও জ্ঞানের আকার : ভাববাদী দার্শনিকরা মূল্য সম্পর্কীয় আত্মগত, বিষয়গত ও প্রায়োগিক মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র একটি মতবাদ প্রচার করেছেন। তাঁদের মূল্য বিষয়ের অতিরিক্ত আত্মগত কোনো শক্তি নয়, বিষয় বা সত্তার গুণ বা গুণাবলিও নয়, কিংবা বস্তুর উপযোগিতাও নয়। ভাববাদী দার্শনিকরা মূল্যের স্বরূপ সম্পর্কীয় মতবাদ অতিক্রম করে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। তাঁদের মতে, মূল্য সত্তা ও জ্ঞানের শর্ত, জীবন ও জগতের আকার। মূল্য প্রত্যেক বস্তু বা জিনিসের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। মূল্য সমগ্র জগতের অর্থ নির্ধারণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক কাজের অর্থ নিরূপণ করে। ভাববাদী দার্শনিকদের মূল্যবিষয়ক মতবাদ অধুনা প্রবর্তিত আদর্শবিদ্যার (Axiology) সাথে একাত্ম বা সমার্থক। আদর্শবিদ্যা ব্যাপক অর্থে মূল্যবিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের আলোচনাকে বুঝায়। আবার সংকীর্ণ অর্থে আদর্শবিদ্যা মূল্যের মূল্য সত্তা সম্পর্কীয় আলোচনাকেও বুঝিয়ে থাকে।[২]

এই মতবাদ অনুসারে মূল্যের সংজ্ঞা সম্ভব নয় : মূল্য উপরের ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কারণ জগতের কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনা বা কোনো বস্তু মূল্য বিবর্জিত নয়। মূল্যের সংজ্ঞা নিরূপণ সম্ভব নয়। যুক্তিবিদ্যার আঙ্গিকে মূল্যের বিশ্লেষণ অসম্ভব সংজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই মূল্যের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে জানা যায় যে, মূল্য পরমসত্তা। অ্যারিস্টটলের প্রধান চালকের (Prime Mover) ন্যায় জীব বস্তুকে এক বিশেষ পরিণতির দিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। যারা মূল্যের বস্তুগত মতবাদ গ্রহণ করেন তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত হন।

---

[১] H. M. Bhattacharyya, *Principles of Philosophy*

[২] Lossky and Marshall – *Value and Existence* P. 47.

সিলার মূল্য বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা : সিলার (Schiler) মনে করেন যে, মূল্য সম্পর্কে নয়, বস্তুর গুণাবলি যা সম্পর্ক ও শ্রেণীবিন্যাস সহকারে বস্তুর মণ্ডল গঠন করে। কাজেই মূল্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্তা। এটা মানুষের আবিষ্কার বা উপলব্ধির সৃষ্টি নয়।

নিকোলাই-মূল্য সার : নিকোলাই হার্টম্যান (Nicolai Hartman) মূল্যের বস্তুগত স্বরূপ সম্পর্কে সিলারের সাথে একমত। নিকোলাই বলেন যে, মূল্য, বস্তু, সত্তা, মূল্য বস্তুর নির্দিষ্ট গুণ, সম্পর্ক ইত্যাদি বোঝায়। মূল্য শূন্যগর্ভ বা সারশূন্য নয়। নিকোলাই মূল্য বলতে সার (Essence) বুঝিয়েছেন। এই 'সার' 'প্লেটোর' 'ধারণা'র (Ideas) সমতুল্য। তিনি মূল্যকে 'শক্তি' (Power) অর্থেও বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অ্যারিস্টটলীয় অর্থে মূল্য সত্যিকার প্রধান চালক। এটা থেকে গঠনমূলক শক্তি উৎপন্নকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন উৎসারিত হয়ে থাকে। মূল্য 'হওয়া উচিত' উক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি।"[১] কিন্তু হার্টম্যানের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে একমত হওয়া যায় না; কেননা মূল্য শুধু নৈতিক নয়, জ্ঞানমূলক এবং ধর্মীয়ও বটে।

অধ্যাপক সোরলের (Prof. Sorley) মতে, খোদা নৈতিক মূল্যের উৎস এবং সত্তার পূর্ণ নৈতিক সংগঠন লক্ষণীয়। তিনি জ্ঞানমূলক, সৌন্দর্য বিষয়ক ও ধর্মীয় মূল্যসমূহকে নৈতিক মূল্যে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি নৈতিক মূল্যের গুরুত্ব খর্ব করেছেন। তাঁর মতে, যখন কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় মূল্য অর্জন করে, খোদার অতীন্দ্রিয় দর্শন লাভ করে, তখন সে যে বড় কিছু লাভ করে এমন নয়। সোরলের এই মতবাদের প্রেক্ষিতে আমরা এই কথা বলতে চাই যে, ধর্মীয় জীবনে খোদার সাথে যোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সৌম্য লাভ করি যেখানে নৈতিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনুপস্থিত। ধর্মীয় জীবনের সর্বোচ্চ পরিণতি পরিপূর্ণতা লাভ, যে পরিপূর্ণতার মধ্যে সমুদয় মূল্যবোধের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। খোদার মধ্যে সমাহিত হওয়া ঐশী চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়া ধর্মীয় জীবনের পরম পাওয়া। এখানে ভালো-মন্দের কোনো দ্বন্দ্ব নেই– এখানে সব দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি। মহাগ্রন্থ কোরআনে উক্ত হয়েছে, "হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তোষপ্রাপ্ত অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করো। অতঃপর আমার সেবকগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করো।"[১]

বোসানকে মূল্য ও পরমসত্তাকে অভিন্ন বলে মনে করেন। তাঁর মতে, মূল্য পরমসত্তা যিনি সব বস্তু, সব ঘটনা, সব আত্মার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছে। বিশ্বজগৎ বিভিন্ন বস্তু ও উপাদানের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন মূল্য ব্যক্ত করে চলেছে। বোসানকে (Bosanquet) মনে করেন যে, মানুষের সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের মূল্যবোধের চৌহদ্দি নিরন্তর ব্যাপ্তি লাভ করছে। কিন্তু এই চৌহদ্দি যতই প্রসারিত হোক না কেন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধে মানুষের জীবনে চরম পরিতৃপ্তি আনতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঐশী চেতনায় ও উপলব্ধিতে সমুজ্জ্বল

---

[১] Values are genuine first movers' in the Aristotelian sense, from them proceed creative energy, productivity, fashioning actualisation. Value is the power which stands behind the energy of the ought to Be. – Nicolai Hartman, Ethics

[১] ইয়া আইয়্যাতোহান্‌ নাফসোল্‌ মোতমায়েন্না তোরজি'ই ইলা রাব্বিকা রাদিয়াতাম মারদিয়া; ফাদ্‌খুলি ফি এবাদি ওয়াদ্‌খুলি জান্নাতি। – (সুঃ ৮৯ আ–২৭-৩০)

না হয়, আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিমল আভায় উদ্ভাসিত না হয়। আত্মার পরিতৃপ্তি সেই পরমসত্তার আত্মনিবেদনে। কোরআনের উক্তি এ বিষয় সস্পষ্ট। "আমরা উপাসনা, আরাধনা, উৎসব অনুষ্ঠান, আমার জীবন-মরণ, সমস্তই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহর জন্য।"[২] কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, খোদার আত্মনির্ভরতা ও আত্মনিবেদন মানবজীবনের পরম পরিতৃপ্তি। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সকল মূল্যবোধের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা।

৫। মূল্যের প্রকারভেদ

Types of value

এই জগতে বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ। এই সমুদয় বস্তু সর্বদা আমাদের চেতনাকে সক্রিয় করছে এবং মূল্যায়নের জন্য চাপ দিচ্ছে। কাজেই বস্তুর গুণের প্রেক্ষিতে মূল্যকে নিম্নবর্ণিতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে। যথা–

১. পার্থিব মূল্য (Psychical Values), ২. অর্থনৈতিক মূল্য (Economic Values), ৩. মনস্তাত্ত্বিক মূল্য (Psychical Values), ৪. স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য (Extrinsic and Intrinsic Values), আত্মগত মূল্য ও বস্তুগত মূল্য (Subjective and Objective Values) এবং ৬. আপেক্ষিক মূল্য ও পরমমূল্য (Relative and Absolute Values)।

৫.১ পার্থিব মূল্য (Physical Values) : প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক ঘটনা, আমাদের দেহ– প্রত্যেকেরই একটা মূল্য আছে। এই সবই জড়জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

দেহ ও মূল্যার্জনের সহায়ক : এই সকল বস্তু, ঘটনা বা জীবদেহ যদি পরমসত্তার অভিব্যক্তি হয়, তবে এসব মূল্যহীন হতে পারে না। আর বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা হিসেবে আমাদের পক্ষে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জড়জগৎ ও আমাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব অতিক্রম করতে হচ্ছে। কাজেই জড়জগৎ ও আমাদের এই দ্বন্দ্ব অতিক্রমের ব্যাপারে উচ্চতর সফলতা লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হচ্ছে। নৈতিক প্রচেষ্টায় আমাদের দেহ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। দেহ পরমমূল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ হলেও এটা অস্বীকার করা চলে না যে, দৈহিক শক্তির মূল্য অর্জনের জগতে উঠতে আমাদের সাহায্য করে থাকে।

৫.২ অর্থনৈতিক মূল্য (Economic Values) : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের বহু জিনিসের প্রয়োজন, যে জিনিসগুলি আমরা নিজেরা এককভাবে তৈয়ার করতে পারি না। সমাজের একদল লোক যা উৎপন্ন করে, অপর দল তা করে না, এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক নিজেদের উৎপাদনের বিনিময় করে স্ব-স্ব অভাব পূরণ করে। শিক্ষকরা ব্যবসায়ীর কাছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করেন, আবার ব্যবসায়ীরা ছেলের পঠন-পাঠনের ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেন। এইভাবে সমাজের এক শ্রেণীর অন্য শ্রেণীকে সাহায্য করেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ জীবন উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এক সময়ে টাকা ছিল না। দেশে দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। আধুনিককালে সে প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা সহজেই টাকার বদলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা-

---

[২] ইন্না ছালাতি ওয়া নছুখি ওয়া মাহ্‌ ইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।

সহযোগিতা লাভ করতে পারি। অর্থ যে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, সে বিষয়ে বলবার কোনো অবকাশ নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক মূল্য পরতঃমূল্য (Extrinsic Values)।

৫.৩ মনস্তাত্ত্বিক মূল্য (Psychical Values) : সত্য সুন্দর ও কল্যাণ : পার্থিব মূল্য ও অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়াও অন্য এক শ্রেণীর মূল্য আছে– মনস্তাত্ত্বিক মূল্য। অবশ্য পার্থিব বা অর্থনৈতিক মূল্যের পশ্চাতে মনস্তাত্ত্বিক মূল্য সক্রিয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। যে কোনো দৈহিক ক্রিয়ার মূলে মন ক্রিয়াশীল। মনের ত্রিবিধ প্রক্রিয়া রয়েছে, চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছা। এই তিনটি মানসিক প্রক্রিয়ার সাথে মানুষের তিনটি আদর্শ জড়িত রয়েছে। যথা– সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল। চিন্তার সাথে সত্যের, অনুভূতির সাথে সুন্দরের ও ইচ্ছার সাথে মঙ্গলের আদর্শ জড়িত। কাজেই মনস্তাত্ত্বিক মূল্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা– (১) বুদ্ধিগত মূল্য বা সত্তা (Intellectual Value of Truth), (২) সৌন্দর্য বিষয়ক মূল্য বা সুন্দর (Aesthetic Value of Beauty) এবং (৩) নৈতিক মূল্য বা মঙ্গল (Ethical Value or Goodness)। এবার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক।

৫.৩.১ বুদ্ধিগত মূল্য বা সত্তা
Intellectual Value or Truth

সত্য-ধারণার মধ্যে সঙ্গতি ও ধারণার সাথে বাস্তবের অনুরূপতা : মানুষের মানসিক জীবনের অগ্রগতির একটি লক্ষণ সত্য লাভের প্রয়াস। সত্য কি, সত্যের স্বরূপ কি, এ সম্পর্কে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ থাকলেও মানুষ সত্য সম্পর্কে কোনো না কোনো ধারণা গঠন করে। সত্য ধারণার মধ্যে সঙ্গতি ও ধারণার সাথে বাস্তবের অনুরূপতা, সত্য মানুষের আদর্শ। কারণ সত্যের বলেই মানুষ নিজেকে আত্মসচেতন সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করে। সত্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মানুষ অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে নিজেকে ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, জগৎ পরিকল্পনায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য, স্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে এবং পরমসত্তার সাথে মানুষ জীবনের সম্পর্ক স্থাপন করে।

৫.৩.২ সৌন্দর্য বিষয়ক মূল্য বা সুন্দর
Aesthetic Value of Beauty

বস্তুগত ও আত্মগত : মানবমনের অনুভূতির দিকে মনোযোগ দিলে দেখা যায় যে, নিম্নস্তরের অনুভূতি বিশিষ্ট বস্তুও বর্তমানের প্রতি নিবদ্ধ এবং স্থানীয় ও ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী। অনুভূতির ক্ষেত্রে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হতে হলে শিক্ষা ও অনুশীলন প্রয়োজন। এই কথার মাধ্যমে আমাদের ধারণা জন্মাতে পারে যে, অনুভূতি অর্জন প্রয়োজন। অনুভূতি অর্জনসাপেক্ষ, অনুভূতি অর্জন করতে হয়। কিন্তু আদিম অসভ্য মানুষের মধ্যেও সৌন্দর্যের অনুভূতি পরিদৃষ্ট হয়। বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে এখনও অসভ্য, অশিক্ষিত পাহাড়ি জাতি তাদের আদিম সৌন্দর্য অনুভূতির পরিচয় দান করে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো : সৌন্দর্য কি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষণসাপেক্ষ, না সৌন্দর্য বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান? এই সমস্যা চিন্তাবিদদের দুটি দলে বিভক্ত করেছে। আবার অন্য এক দল মনে করেন যে, বস্তুর গুণ বা গুণাবলি সৌন্দর্যের ভিত্তি। প্রথম দলের চিন্তাবিদের মতে, সৌন্দর্য আত্মগত (Subjective)। দ্বিতীয় দলের চিন্তাবিদের মতে, সৌন্দর্য বস্তুগত (Objective)। অপর একদল চিন্তাবিদ এই দুটি

মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেয়েছেন। এই তৃতীয় দলের চিন্তাবিদের মতে, সৌন্দর্য অংশত আত্মগত, অংশত বস্তুগত। কোনো বস্তুর মধ্যে এমন কতগুলি গুণ আছ যা আমাদের সৌন্দর্যানুভূতি জাগ্রত করে আর আমাদের মনের এমন ক্ষমতা রয়েছে যা বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পায়। যদি সৌন্দর্য বস্তুগত সত্য হতো তবে কোনো সৌন্দর্যের মূল্যায়নের ব্যাপারে চিন্তাবিদদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যেত না। যা কিছু পার্থক্য দেখা যেত সেই সব গৌণ পার্থক্য হিসেবে বিবেচিত হতো। এ ছাড়া আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যক্ষজাত অবধারণ সৌন্দর্যের আত্মগত ও বস্তুগত স্বরূপকেই সমর্থন করে থাকে।

সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য : সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা সৌন্দর্যের এই প্রকৃতিরই আভাস পেয়ে থাকি।

প্রথমত, সুন্দর বিভিন্ন অংশের পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য বর্তমান।
দ্বিতীয়ত, সুন্দর বস্তুর মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান।
তৃতীয়ত, সুন্দর বস্তুর মধ্যে সার্বজনীনতা রয়েছে।
চতুর্থত, সুন্দর বস্তুর মধ্যে আসক্তি শূন্যতা আছে। বিশিষ্ট বস্তুকে ছাড়াইয়া যাবার শক্তি আছে। সুন্দর বস্তুর বা সৌন্দর্যের গুণগুলি বস্তুকে অতিক্রম করে বিরাজিত।

৫.৩.৩ নৈতিক মূল্য বা মঙ্গল
Ethical Value or Goodness

বিভিন্ন নৈতিক আদর্শ : মানুষ দেখতে পায় যে, অন্যান্য ব্যক্তির সাথে তার ইচ্ছার দ্বন্দ্ব রয়েছে। সে যা করতে চায় অন্যের কামনার সাথে তার সংঘাত উপস্থিত। এমন কি অনেক সময় নিজের কামনা-বাসনার সাথে তার ইচ্ছার বিরোধ বেধে যায়। মানুষ যতই চিন্তা করতে থাকে জীবনের চরম লক্ষ্য সম্পর্কে সে ততই হতবুদ্ধি হয়ে যায়; নিজের সুখ সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ, না সমষ্টিগত সুখই সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ, সে সম্পর্কে দ্বিধাহীন হতে থাকে। আবার বিবেকের নির্দেশ অনুসারে চলা উচিত, না প্রকৃতির নির্দেশ মানা উচিত, এ বিষয়ে মানুষ দিশেহারা হয়। কিন্তু অস্পষ্টতা বা সংশয়ের একটা শেষ আছে। অবশেষে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, কোনো কিছুকে অস্বীকার করে নয়, সব কিছুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেই মানুষের পূর্ণতা আসতে পারে। প্রকৃতি ও বুদ্ধি, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও সমষ্টিগত ইচ্ছা, সুখানুভূতি ও বিচার-বুদ্ধির সমন্বয় মানুষের সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে দিয়েই চরম শান্তি ও পরম পরিতৃপ্তি আসতে পারে– অন্য কোনো পথে নয়।

৫.৩.৪ স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য (Extrinsic and Intrinsic Values) : সাধারণত বস্তুর মূল্য দুই ভাবে নির্ণীত হয়ে থাকে। যে মূল্য অন্য কোনো মূল্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় পরতঃমূল্য। টাকার মূল্য পরতঃমূল্য, কেননা টাকা আমদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। টাকা-পয়সার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। পক্ষান্তরে, যে মূল্য নিজ গুণে মূল্যবান সে মূল্য স্বতঃমূল্য। যেমন– সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর– এই তিনটি আদর্শ মানবজীবনের পরমমূল্য। সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর মানবজীবনের মহৎ আদর্শ। এইগুলি নিজগুণে মানবজীবনের পরম আদর্শ হবার যোগ্য। সত্য আমাদের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

৫.৪.৫ আত্মগত মূল্য ও বস্তুগত মূল্য (Subjective and Objective Values)

মূল্য ব্যক্তিনির্ভর, মূল্য আত্মগত : মূল্যের প্রকৃতি সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোনো কোনো চিন্তাবিদের মতে, মূল্য ব্যক্তিনির্ভর আত্মগত। ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার জগতেই মূল্যের স্থান আছে। সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয় বলে মূল্য আছে, নতুবা মূল্যের কোনো ধারণা আমরা গঠন করতে পারি না। আবার কোনো কোনো দার্শনিকের মতে, মূল্য বস্তুগত। তাঁদের মতে, বিষয়ের মধ্যেই মূল্য নিহিত থাকে, মূল্যায়ন বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যখন কোনো ফলকে আমরা সুন্দর বলি তখন তার কতগুলি গুণ আছে বলেই আমরা তা বলে থাকি। মূল্য ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। মূল্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় বলেই মনে হয় 'মহৎ' শব্দটি মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। মহৎ শিল্প সকলের কাছে মহৎ বলেই মনে হয়। তার কারণ মনে হয় মূল্য বস্তুগত বলে। বস্তুগত না হলে কোনো সৃষ্টি সকলের কাছে এইরূপ মনে হবার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। উচ্চ মূল্যবোধের জন্য দীর্ঘদিনের সাধনা প্রয়োজন।

মূল্য আত্মগত ও বস্তুগত : তবে একটা কথা স্মরণযোগ্য যে, কোনো কিছু অনুশীলনের জন্য চাই শিক্ষার্থীর ঐ বিষয়ের প্রতি অনুরাগ। এই অনুরাগ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং মূল্য আত্মগত ও বস্তুগত উভয়ই।

৫.৪.৬ আপেক্ষিক মূল্য ও পরমমূল্য (Relative and Absolute Values) :

আপেক্ষিক মূল্য হলো সেই সমস্ত মূল্য যে মূল্য আত্মিক রূপায়ণের অভাবব্যঞ্জক। সকল পার্থিব মূল্য, অর্থনৈতিক মূল্য, পরতঃমূল্য ও আত্মগত মূল্য আপেক্ষিক মূল্যের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত মূল্য অন্য কোনো মূল্যের ওপর নির্ভর করে না সেই মূল্যকে বলা হয় পরমমূল্য। পরমমূল্য পরমসত্তার অন্তর্নিহিত শক্তি। সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর হলো পরমমূল্য।

আপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ মূল্য : এই মূল্য আত্মগত প্রবণতা বা বস্তুগত সমাহারের ওপর নির্ভরশীল নয়। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের মধ্য দিয়ে পরমসত্তা প্রকাশমান। আপেক্ষিক মূল্য ও পরমমূল্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আপেক্ষিক মূল্য পরমসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে উৎসারিত হয়, পরমমূল্য অর্জনের পথের বিভিন্ন স্তরের অন্তর্ভুক্ত। পরমমূল্য বস্তুগত এই অর্থে যে, তা আত্মগত মূল্যায়নের অধীন নয়, এবং আত্মগত মূল্যায়নকে নিয়ন্ত্রিত করে। এটি ছাড়া আমরা দেখি যে, স্বতঃমূল্য পরম অর্থে পরমমূল্য এবং পরমসত্তা পরম মূল্যের সহিত সমার্থক।

৬। খোদা ও পরমমূল্য

God and Absolute Values

খোদা সকল মূল্যের আধার : খোদা সকল মূল্যের ঐক্য। পরমসত্তার মধ্যে সকল মূল্যবোধ পরিণতি লাভ করে। মূল্যসমূহের সংরক্ষক হিসেবে পরমসত্তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। হফডিং তাঁর 'ধর্মের দর্শন' (Philosophy of Religion) গ্রন্থে বলেছেন যে, ধর্ম মূল্যসমূহের সংরক্ষণে বিশ্বাসী। এই কথার তাৎপর্য এই যে, তাঁর মতে, মূল্যসমূহ খোদার মধ্যে সংরক্ষিত। কেননা খোদা সকল মূল্যের আধার, পরমমূল্য– সব স্বতঃমূল্য সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের অধিকারী। কাজেই হফডিং-এর উক্তিতে বুঝা যাচ্ছে যে, মূল্যসমূহ খোদার মধ্যে সংরক্ষিত ও লালিত হয় এবং গুণ ও তীব্রতার দিক দিয়ে

মূল্যের কোনোরূপ বর্ধন সম্ভব নয়। এখানে হফডিং-এর মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। খোদাকে সকল মূল্যের আধার হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি না থাকলেও খোদা মূল্যের অপরিবর্তিত আধার, একথা গ্রহণ করা চলে না। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, মূল্যবোধ গতিশীল ও বর্ধিষ্ণু। মানবজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, মানুষ ক্রমশ উচ্চতর ও নবতর মূল্যবোধ অর্জন করে চলেছে, আবার এই সব.মূল্যবোধ নব নব মূল্যার্জনের পথে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। হফডিং শক্তির অবিনশ্বরতা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মনে করেছেন যে, মূল্যও অপরিবর্তনীয়, সকল পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু জড়জগতে যা সত্য, মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবনে অবশ্যম্ভাবীরূপে তা সত্য হবে– এমন কোনো কথা হতে পারে না। মানুষের মূল্যবোধ অপরিবর্তিত থাকলে মানুষের নবতর ও উচ্চতর মূল্যবোধ তাৎপর্যহীন। কোনো কোনো সময় হফডিং চিন্তা করেছেন যে, মূল্য গতিশীল।

মূল্যের জগতে বর্ধন ও সংরক্ষণ বেমানান নয় : বস্তুত মূল্য নব নবসৃষ্টির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। আর মানুষের অগ্রগতি নির্দেশ করে যে, মূল্যবোধ নব নব মনজিল অতিক্রম করে নব নব রূপ পরিগ্রহ করে। সেই কারণে অধ্যাপক সোরলে মনে করেন, মূল্যের জগতে বর্ধন ও সংরক্ষণ বেমানান নয়। আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনায় নব নব মূল্যের উদ্ভব ও সংরক্ষণ অপরিহার্য এবং মূল্যের উদ্ভব ও তার সংরক্ষণ খোদা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা গঠনের সহায়ক। মূল্যসমূহের খোদা চলমান নীতি হিসেবে মূল্যের পরিপূর্ণতা। শুধু মূল্যসমূহের সংরক্ষক হিসেবে ধরলে খোদা নিশ্চল আধারে পর্যবসিত হন। জগতের দুর্গম পথে মানুষের অবিরাম যাত্রা ও নব নব মূল্যবোধের দ্যোতক, আশাবাদ নৈরাশ্যের অমানিশায় ঢেকে যায়। মানুষের সভ্যতার ক্রমগতি মানবচেতনার নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবাতীত সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শকে অলীক বলে উড়িয়ে দিতে হয়, হাজার ধ্বংসের আয়োজনের মধ্যে মানবাত্মার অকুতোভয় নবসৃষ্টির উল্লাসকে উপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু মানবসভ্যতার বর্তমান লগ্নে মানবাত্মার গৌরবদীপ্ত সাফল্য সার্থকতাকে অবহেলা করা সত্যের অপলাপ মাত্র। কাজেই বলতে হয় যে, মানুষের মূল্য বোধের প্রবাহ আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার মহাসাগর খোদায় মিলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে।"[১]

---

[১] ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন (সূ. ২ আঃ ১৫৬) (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করব।)

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইচ্ছার স্বাধীনতা
FREEDOM OF WILL

"To be free means that one determined by nothing but one self." – **Mackenzie**

- ❑ ইচ্ছার স্বাধীনতা
- ❑ নিয়ন্ত্রণবাদ
- ❑ অনিয়ন্ত্রণবাদ
- ❑ স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ
- ❑ আত্মার অমরতা

১। ইচ্ছার স্বাধীনতা
Freedom of Will

ইচ্ছার স্বাধীনতার গুরুত্ব : মানুষের চিন্তার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় প্রশ্নটি সভ্যতার উন্মেষকাল থেকেই মানুষকে পীড়া দিয়ে আসছে। দার্শনিক, কবি, ধর্মতত্ত্ববিদ, সমাজ সংস্কারক, মনোবিজ্ঞানী, নীতিবিদ সকলকে এই প্রশ্ন কমবেশি নাড়া দিয়েছে। বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই প্রশ্ন জাগ্রত করে তুলছে। জীবনের চলার পথে মানুষ চলেছে অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত। পথ চলার ফাঁকে ফাঁকে তার মনে প্রশ্ন জাগে : আমি আমার ভাগ্য-বিধাতা, না অদৃষ্ট শক্তির পীড়ন আমার জীবন নিয়ন্ত্রিত, না আমি সামাজিক বলির শিকার। জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত মানুষের মনে এক সীমাহীন জিজ্ঞাসা : মেহনতী মানুষের জীবন কি সামাজিক রথচক্রে পিষ্ট হবার জন্য? জীবনের পদমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা-জীবনের সুযোগ-সুবিধাভেদে মানুষের মনে এই ধরনের প্রশ্নের জবাব ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য বা অভাব বিবর্জিত অবস্থায় যারা জীবনযাপন করেন তাঁরা হয় নিজেকে নিজের সৌভাগ্যের নিয়ামক বলে মনে করেন নতুবা পরম শক্তিমান ভাগ্যবিধাতাকে সকল সৌভাগ্যের উৎস্য মূল বলে পরম নির্ভয়ে নির্ভরতার মধ্যে দিন যাপন করেন। আবার জীবন যুদ্ধে ম্রিয়মাণ অসহায়, বিত্তহীন মানুষ ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে নির্ভেজাল নৈরাশ্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়।

মানব মন বিচিত্র : মানুষের মনের জগৎ বিচিত্র ভাব ও অনুভূতির রঙ্গমঞ্চ। সর্বহারামানুষের কাফেলার শক্তিমান মানুষ বেদুইন, চেঙ্গিসের মতো জীবনের উন্মাদনায়, প্রাণের প্রবল তাড়নায় মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়িয়া, চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ-তারা ছেড়ে ঐশীলোকে উত্তীর্ণ হয়। আবার আজন্ম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালিত হয়ে ঐশ্বর্যের বরপুত্র ও রাজকীয় বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করে পরমাত্মার পরমানন্দে বিশ্বের পথে বের হয়ে পড়েন, বিশ্বপতির চরণধুলার তলে নিজ শির নোয়াইয়া দেন। মানুষের মনের জগৎ সত্যই বিচিত্র।

বিভিন্ন মতবাদ : দার্শনিক ও নীতিবিদ অভিজ্ঞতার আলোকে ও যুক্তির জরিপে ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। যথা (১) নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism/Necessitarianism/Theory of Predestination), (২) অনিয়ন্ত্রণবাদ (Indeterminism/Libertarianism/Theory of Free will) এবং (৩) স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ (Self-determinism)।

২। নিয়ন্ত্রণবাদ

Determinism/Necessitarianism/Theory of Predestination

নিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে, আমাদের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই। জগতের অন্যান্য বস্তুর মতো, মানুষের ইচ্ছাও চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় জাগতিক নিয়মের অধীন। "নিয়ন্ত্রণবাদীরা তাঁদের মতের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহের অবতারণা করেছেন।"[১]

(১) মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি

Psychological Argument

আমাদের ঐচ্ছিক ক্রিয়া উদ্দেশ্য ও কামনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে ক্ষেত্রে আমাদের কামনা মাত্র একটি থাকে, সেখানে সেই কামনাই আমাদের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে ক্ষেত্রে একাধিক কামনা বর্তমান থাকে, সেখানে কামনার বিরোধ উপস্থিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কামনাই জয়ী হয় ও কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। কামনার শক্তি আংশিকভাবে পরিবেশের ওপর নির্ভর করে এবং আংশিককভাবে নির্ভর করে ব্যক্তির চরিত্রের ওপর। ব্যক্তির পরিবেশ ও চরিত্র সম্পর্কে জানা থাকলে তার কাজ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। সুতরাং ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই– এটা কতগুলি পূর্বগামী অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সমালোচনা

Criticism

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কামনাই যে কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, এতে আপত্তির তেমন কিছুই নেই। কামনার বিরোধিতার ক্ষেত্রে শক্তিশালী কামনাই জয়যুক্ত হয়ে থাকে। তবে কোনো কামনা বুদ্ধির সমর্থিত না হলে তা শক্তিশালী হতে পারে না। মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব থাকলেও ইচ্ছা ব্যক্তির মনেরই সৃষ্টি। কাজেই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে– ইচ্ছা আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বনিয়ন্ত্রণ।

(২) তত্ত্বমূলক যুক্তি

Theory of Argument

প্রথমত, কার্যকারণ নিয়ম ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করে দেয়। এই নিয়মানুসারে প্রত্যেক কাজের কারণ আছে। কারণ ও কাজের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান। পার্থিব ও অপার্থিব, জাগতিক ও মানসিক উভয় প্রকার ক্রিয়াই কার্যকারণ নিয়মের অধীন। কাজেই ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই।

---

[১] মদীয় 'নীতিশাস্ত্র পরিচয়' দ্রষ্টব্য।

সমালোচনা

Criticism

এই যুক্তি অযৌক্তিক। ইচ্ছার স্বাধীনতা কার্যকারণ নিয়মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। ইচ্ছার স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, ইচ্ছা কারণবিহীন। ব্যক্তি নিজেই তার ইচ্ছার কারণ এবং বাইরের অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ (Theory of Conservation Energy) : ইচ্ছা স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা স্বাধীনতা মনে নতুন শক্তি উৎপন্ন করে এবং বাহ্য জগতে পরিবর্তন আনয়ন করে। কিন্তু শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ অনুসারে জগতের সমষ্টিগত শক্তির কোনো বৃদ্ধি বা হ্রাস নেই। কাজেই যদি শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ মেনে নেওয়া যায় তবে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সমর্থন করা যায় না।

সমালোচনা

Criticism

ইচ্ছার স্বাধীনতা শক্তির অবিনশ্বরতাবাদের বিরোধী নয়। কারণ ইচ্ছার স্বাধীনতা কোনো নতুন শক্তি উৎপন্ন করে না। এটি দৈহিক শক্তির গতিপথকে পরিবর্তিত করে মাত্র।

তৃতীয়ত, জড়বাদ ও নিসর্গবাদ (Meterialism and Naturalism) অনুসারে জড় ও গতির নিয়ম অনুসারে পরমাণুর আকস্মিক পরিবর্তনের ফলেই জগতের বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জড়বাদ অনুসারে মন দেহেরই উপবস্তু (By-product)। কাজেই মনের ইচ্ছার কোনো স্বাধীনতা নেই। জড়, পরমাণু ও জাগতিক নিয়মের সাহায্যেই জগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সমালোচনা

Criticism

জড়বাদ ও নিসর্গবাদের সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা আত্মসচেতনতায় আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা আমাদের কাযের নিয়ামক।

চতুর্থত, সর্বখোদাবাদ (Pantheism) অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রণবাদে পর্যবসিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে খোদা একমাত্র সত্তা। এই মত স্বীকার করলে জগৎ ও মন মায়ায় পরিণত হয়। আধুনিক দর্শনে স্পিনোজা এই মতের প্রবর্তক। তাঁর মতে, অসীম মন খোদার অবগতির পথ। খোদা ব্যতিরেকে এই মনের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কাজেই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই।

সমালোচনা

Criticism

এই যুক্তিও অযৌক্তিক। কেননা আত্মসচেতনতা ও নৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে অবহিত হই। আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরাই আমাদের কাজের নিয়ামক। এটি ছাড়া, আমাদের নৈতিক চেতনার মূলেও একই উপলব্ধি সক্রিয়।

(৩) ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি

Gheological Argument

খোদার পূর্বজ্ঞান (Fore-knowledge of God) ইচ্ছার স্বাধীনতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। খোদা সর্বজ্ঞাতা ও সর্বশক্তিমান। তিনি জানেন ভবিষ্যতে মানুষ কি করবে, কিন্তু মানুষ তার ভবিষ্যৎ জানে না। খোদা পূর্ব মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও পরিণতি স্থির করে রাখেন এবং সেই মোতাবেক তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কাজেই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই।

সমালোচনা

Criticism

এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়; কেননা খোদা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত আছেন, এই কথার অর্থ এই যে, ভবিষ্যৎ ফল হিসেবে কারণ থেকে কাজ অনুমিত হয়। তিনি সর্বজ্ঞ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে এক চিরন্তন মুহূর্তেই গোচরীভূত হয়। কাজেই ইচ্ছার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি তেমন জোরালো নয়।

৩। অনিয়ন্ত্রণবাদ

Indeterminism/Libertarianism/Theory of Free will

এই মতবাদ অনুসারে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। পূর্বগামী অবস্থার দ্বারা মানুষের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করা হয় না। মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারে। অনিন্ত্রণবাদীরা তাদের মতের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত করেন। যথা :

(১) মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি (Psychological Argument)

যখন আমরা কোনো কায করতে ইচ্ছা করি তখন আমরা সচেতন থাকি যে, কোনো বাইরের অবস্থার দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত নই। আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করি যে, আমরাই আমাদের কাযের কর্তা। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা আত্মসচেতনতা প্রমাণ করে যে, আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। লিলি বলেন, "একটি কাজ সম্পাদন করার পর আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, আমরা যা করেছি, ইচ্ছা করলে অন্যরকম করতে পারতাম।"[১]

(২) নৈতিক যুক্তি

Moral Argument

কান্ট বলেন যে, ইচচার স্বাধীনতা নৈতিক বিচারের স্বীকার্য সত্য। নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে ঔচিত্যবোধ বা বাধ্যতাবোধ আছে। যে কাজকে আমরা যথোচিত বা ন্যায়ানুমোদিত বলে মনে করি সেই কাজটি সম্পাদন করার একটা তাগিদও আমরা অনুভব করি। যে কাজটি নৈতিক বিচারে মন্দ বা অন্যায় বলে সাব্যস্ত হয় তা পরিত্যাগের একটা তাগিদও আমরা অনুভব করি। তাই কান্ট বলেন, "তোমার করা

---

[১] We all know directly after we have done and action that could have acted differently from what we have actually done. – Lillie : *Introduction of Ethics* – P. 52.

উচিত মানে তুমি করতে পারো" (Thou oughtest means thou canst)। আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে কর্তব্য, দায়িত্ব, নীতি, বিচার, দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য, উৎকর্ষ-অপকর্ষ– সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ প্রমাণ করে যে, আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন।

(৩) বস্তুগত ভাববাদে মানুষের স্বাধীনতা
Human Freedom in realistic idealism

বস্তুগত ভাববাদ অনুসারে মানুষের আত্মা খোদার সসীম অভিব্যক্তি। খোদা স্বাধীনভাবে ব্যক্তি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নিজেকে উপলব্ধি করেছেন। মানুষ তাঁরই অভিব্যক্তি হিসেবে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী তবে মানুষ সসীম সত্য হিসেবে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী নয়।

সমালোচনা
Criticism

অনিন্ত্রয়ণবাদের প্রকৃতির বিচার করলে দেখা যায় যে, অনিয়ন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রণবিহীন শক্তি হিসেবে ইচ্ছার স্বাধীনতা আমাদের প্রকৃতির সাথে বেমানান। যদি আমরা আমাদের ইচ্ছাকে সচেতনভাবে নিয়ন্ত্রিত না করি তবে আমর আমাদের কাজের জন্য দায়ী নই। অনিয়ন্ত্রণবাদ নৈতিক দায়িত্ব ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি কার্যকারণতত্ত্বের পরিপন্থি।

দ্বিতীয়ত, ইচ্ছার স্বাধীনতা হলো আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। ব্যক্তি একটি বিশেষ কর্মপন্থা নির্বাচন করে, ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সার্থক করার প্রয়াস পায়। কাজেই ইচ্ছার বাইরের কোনো অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীনতা মানে স্বনিয়ন্ত্রণ।

তৃতীয়ত, কর্তার ইচ্ছা বাহ্য অবস্থার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। নিয়ন্ত্রণবাদীদের এই মত গ্রহণ করা চলে না। ইচ্ছা কর্তা বা ব্যক্তির উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছা কারণবিহীন নয়, তবে সে কারণ কর্তা নিজেই– বাইরের কোনো শক্তি নয়।

৪। স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ
Self-determinism

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, নিয়ন্ত্রণবাদ ও অনিয়ন্ত্রণবাদ উভয়ই ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে চরম মতবাদ। নিয়ন্ত্রণবাদ কার্যকারণতত্ত্বের সাহায্যে যুক্তি প্রদান করে যে, ইচ্ছা কতগুলি পূর্বগামী অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই মতবাদটি জাগতিক ঘটনা ও নৈতিক ঘটনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে। পক্ষান্তরে, অনিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে আমাদের মন পারিপার্শ্বিক ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে নিজেই নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে। ইচ্ছার স্বাধীনতা মানে স্বাধীনভাবে মনের যে কোনো কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। এই মতবাদও সমর্থনযোগ্য নয়।

স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ নিয়ন্ত্রণবাদ ও অনিয়ন্ত্রণবাদের সমন্বয় সাধন করে। স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ নিয়ন্ত্রণবাদ ও অনিয়ন্ত্রণবাদ উভয় মাতবাদেরই আতিশয্য দূর করে। এই মতবাদ অনুসারে স্বাধীনতা ও ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ উভয় সমর্থিত সত্য। ঐচ্ছিক ক্রিয়া হলো নির্বাচনমূলক বা মনোনয়নমূলক। এই নির্বাচন বা মনোনয়ন নৈতিকতার মূল।

আমাদের আচরণের ভালো বা মন্দ, ঔচিত্য বা অনৌচিত্য নির্ভর করে এই মনোনয়ন ক্রিয়ার উপর। আচরণ বক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ক্রিয়া বলে নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তির ইচ্ছা ব্যক্তির চরিত্র থেকে উদ্ভূত : এই মতবাদ অনুসারে ব্যক্তির ইচ্ছা বাইরের কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে ব্যক্তির প্রবণতা, আবেগ ও উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর সবই তার চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ইচ্ছার স্বাধীনতা কার্যকারণ সম্পর্কের বিরোধী নয়। প্রত্যেক মানুষ তার কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যক্তির চরিত্রই তার কাজের কারণ। অর্থাৎ ব্যক্তির ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ তার আত্মশক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হয়, বহির্জগতের কোনো পূর্বগামী ঘটনার দ্বারা নয়। অধ্যাপক ম্যাকেনজি সত্যই বলেন, "স্বাধীন হওয়ার অর্থ হলো নিজের ছাড়া অন্য কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়া।"[১]

৫. আত্মার অমরতা
Immortality of the soul

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।
এই সূর্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যে স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়–
মানুষের সুখে দুঃখে গাহিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরই মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই।"

এ কথা কবির কল্পনাবিলাস বা ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা নয়। এটি মানবমনের এক চিরন্তন আর্তি, চিরব্যাকুল কামনা।

মানুষের অমর হওয়ার অভিলাষ : আত্মার অমরতা প্রমাণ : জীবন মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ধন। এই রূপ-রস শব্দ-গন্ধভরা দুনিয়ায় মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। প্রিয়-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সে চিরকাল সুখে-দুঃখে কালাতিপাত করতে চায়। কিন্তু মৃত্যু জীবনের মতোই অবশ্যম্ভাবী। মানুষ মৃত্যুকে অবিশ্বাস করতে পারে না, হেসেও উড়িয়ে দিতে পারে না। সে বিশ্বাস করে মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, মৃত্যুর পরও জীবন এগিয়ে চলবে মহাজীবনের সাধনায়। এক অখণ্ড সীমাহীন জীবনই মানুষ কামনা করে এসেছে। বস্তুত আত্মার অমরতা স্বীকার না করলে মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন অর্থহীন। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ সকলেই মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে নিয়োজিত, আত্মার অমরতা প্রমাণ করতে উদগ্রীব।

আত্মার অমরতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যথা– (১) শারীরবৃত্তীয়, (২) তাত্ত্বিক ও (৩) নৈতিক।

---

[১] To be free means that one is determined by nothing but one self. – Mackenzie : *A Manual of Ethics*

৫.১ শারীরবৃত্তীয় যুক্তি (Physiological Argument) : এই যুক্তি অনুযায়ী মৃত্যু শক্তির রূপান্তর মাত্র। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহ বিভিন্ন উপাদানে মিলিয়ে যায়, জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হয়। কিন্তু শক্তির অবিনশ্বরতা নিয়মানুসারে এ জগতে শক্তির ধ্বংস নেই, শক্তির রূপান্তর আছে। যদি এই নীতি শুধু দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তবে দেহাতীত আত্মা ধ্বংসের উর্ধ্বে। কাজেই দেহের বিনাশ ঘটলেও আত্মার বিনাশ নেই। এ ছাড়া, এই নীতি দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার শক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এটা যুক্তিসম্মত যে, দৈহিক শক্তির মতোই মানসিক শক্তিরও ধ্বংস নেই। মৃত্যুর পরও আত্মা বিরাজ করবে। কাজেই আত্মা অমর।

সমালোচনা

Criticism

শারীরবৃত্তীয় যুক্তির মাধ্যমে আত্মার অমরতা প্রমাণ করা গেলেও মৃত্যুর পর আত্মা কিভাবে অবস্থান করবে, স্বতন্ত্রভাবে না একত্রে, সে সম্পর্কে শারীরবৃত্তীয় যুক্তি নিরুত্তর।

৫.২ তাত্ত্বিক যুক্তি (Metaphysical Argument) : প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সকল ভাববাদী দার্শনিক আত্মার অমরতার তাত্ত্বিক প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটো আত্মার অমরতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত **যুক্তির** অবতারণা করেছেন। যথা :

প্রথমত, আত্মার অমরতা দ্রব্যের সারল্য (Simplicity) থেকে নিঃসৃত। প্লেটোর মতে, আত্মা আধ্যাত্মিক দ্রব্য, এটি অযৌগিক অবিমিশ্র। যেসব দ্রব্য বিভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত সেই সকল দ্রব্য বিনষ্ট হতে পারে। কিন্তু অযৌগিক দ্রব্যের ধ্বংস নেই। কাজেই আত্মা অমর।

দ্বিতীয়ত, আত্মার অমরতা খোদার কল্যাণময়তা হতে নিঃসৃত। খোদা কল্যাণময়, কাজেই তিনি আত্মাকে তাঁর অর্জিত ফললাভ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

তৃতীয়ত, আত্মা জীবনের নীতি, কাজেই তা সত্তা থেকে অসত্তায় পর্যবসিত হতে পারে না।

চতুর্থত, প্রজ্ঞা আত্মার সার। অমরতা প্রজ্ঞার বিশেষ অধিকার, ইচ্ছা ও অনুভূতি আত্মার নশ্বর দিক, কেননা দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রজ্ঞা আত্মার ঐশী দিক, কাজেই আত্মা অবিনশ্বর।

পঞ্চমত, আত্মার অমরতা আত্মার দেহ ধারণের পূর্বাবস্থা (pre-existence) থেকে নিঃসৃত। দেহ অস্তিত্বে আসার পূর্বেও আত্মা ছিল, কাজেই দেহের অবস্থানের পরও আত্মা অবস্থান করবে।

ষষ্ঠত, প্লেটোর পূর্ব-স্মৃতি মতবাদ (Theory of Reminiscence) আত্মার অমরতা সপ্রমাণ করে। আত্মা ধারণার চিরন্তন জগতে অবস্থান করত। আত্মা দেহে প্রবিষ্ট হলেও সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা ভুলতে পারে না, আবার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও আত্মা সেই চিরন্তন ধারণার জগতে চলে যায়।

অ্যারিস্টটলের মতে, জীববৃত্তি ধ্বংসের অধীন, এমন কি নিষ্ক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি ও অমরতার দাবিদার নয়। কিন্তু সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি অমর। তিনি মনে করেন একমাত্র খোদাই বিশুদ্ধ ক্রিয়া, মানবাত্মা খোদার সাথে অভিন্ন।

ভাববাদী দার্শনিক দেকার্ত আত্মার অমরতার সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ করেন। তাঁর মতে, আত্মা হলো আধ্যাত্মিক দ্রব্য, এই আধ্যাত্মিক দ্রব্যের ধর্ম হলো চৈতন্য। চৈতন্যের কোনো ধ্বংস বা বিনাশ নেই। কেননা চৈতন্য আধ্যাত্মিক দ্রব্য আত্মার ধর্ম এবং কোনো দ্রব্যের ধ্বংস নেই।

লিবনিজ আত্মার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি থেকে আত্মার অমরতা প্রমাণ করেন। তাঁর মতে, চিৎপরমাণু (Monad) অবিনশ্বর। এটা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা বিনষ্ট হবার নয়। চিৎপরমাণুর অগ্রগতির মধ্যে কোনো বিরতি নেই। এটা ক্রমগতিতে উপলব্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।

স্পিনোজার মতে, মানুষ যে পরিমাণে বিশুদ্ধ বুদ্ধিময় জীবনযাপন করে সেই পরিমাণে সে অমরতার অধিকারী হতে পারে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, একমাত্র দার্শনিকরা অমরতার অধিকারী।

হেগেল ও নব্য হেগেলীয় দার্শনিকদের মতে, এই বিশ্ব পরিকল্পনায় প্রত্যেক আত্মার নির্দিষ্ট স্থান ও কার্যকারিতা রয়েছে। আত্মা দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ অবস্থায় তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত করতে পারে না। কাজেই মৃত্যুর পরও আত্মা স্বীয় লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সংগ্রাম করতে থাকবে।

৫.৩ নৈতিক যুক্তি (Moral Argument)

দার্শনিক কান্টের মতে, তাত্ত্বিক প্রমাণের মাধ্যমে আত্মার অমরতা প্রতিপাদন করা যায় না। কেননা আত্মা হলো সংশ্লেষণাত্মক ঐক্যবিধায়ক নীতি যা সংবেদনকে সংহত করে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ বা অস্তিত্ব জানা যায় না।

আত্মার অমরতা নৈতিক জীবনের ভিত্তি কান্টের মতে, আত্মার অমরতা নীতিবোধ বা নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য। প্রবৃত্তি ও কর্তব্যের বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনই নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য– নৈতিক আদর্শ এই জীবনে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। কারণ মানুষের জীবন সীমিত। এই জীবনের প্রবৃত্তি ও কর্তব্যের বিরোধের পূর্ণ সঙ্গতি বিধান অসম্ভব। কাজেই আত্মার জীবন অবিরাম চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত প্রবৃত্তি ও কর্তব্যের অবসান না ঘটে। কান্ট আরও বলেন যে, সততার সঙ্গে পুরস্কার এবং অসদাচারের সঙ্গে শাস্তি লাভ নীতিবোধের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু বাস্তব জীবনে অনেক সময় অসৎ ব্যক্তিকে পুরস্কার পেতে দেখা যায়, আবার সৎ ব্যক্তি অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে থাকে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে এ ধরনের ব্যতিক্রমের অবসান ঘটবে এবং পুণ্যবান পুরস্কার লাভ করবে, পাপী পাপের সমুচিত শাস্তি পাবে। কাজেই মানুষের আত্মা অমর। আত্মার অমরতায় বিশ্বাস না করলে নীতিবোধ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নীতি মানুষের মহত্ত্বজ্ঞাপক। নীতির মূল্য না থাকলে মানুষের মহত্ত্বও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নীতিবোধই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করে থাকে। কাজেই মানুষের মহত্ত্ব স্বীকার করলে আত্মার অমরতা না মেনে উপায় নেই।

আত্মার অমরতা অসীম আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য : জেমস সেথ (James Seth) আত্মার অমরতার নৈতিক যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন তা কান্টের মতবাদ থেকে একটু আলাদা। তাঁর মতে, নৈতিক আদর্শ অসীম। সীমিত সময়ে অসীম আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর আত্মার পক্ষে অসীম আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য সীমাহীন সময়ের আবশ্যক। কাজেই আত্মা অমর। সেথ বলেন যে, অগ্রগতি

মানবজীবনের বিশিষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ। মানবজীবনের সম্মুখে যে আদর্শ রয়েছে তা অর্জনের জন্য অনন্তকালের প্রয়োজন। এই জীবন সেই সীমাহীন জীবনের প্রস্তুতিকাল। মানুষের বৌদ্ধিক, সৌন্দর্যবিষয়ক ও নৈতিক শক্তি অফুরন্ত; এই ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে এসব গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। এই গুণাবলি বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যষ্টি আত্মার অমরতার আবশ্যক। সুতরাং আত্মা অমর।

অর্জিত নৈতিক মূল্য অমর : হফডিং (Hoffding) মূল্যবোধের অবিনশ্বরতা মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, যে মূল্যবোধ আমরা জীবনে অর্জন করি তা নৈতিক জগতে সুরক্ষিত হয়। এই মূল্যবোধ অমর। এই মূল্যবোধের বাহক হিসেবে মানুষের আত্মা অনন্ত জীবনের অধিকারী।

মানুষের বুদ্ধি সংবেদনের সীমা অতিক্রম করে : মার্টিন্যু (Martineau) আত্মার অমরতার আর একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। বুদ্ধি দেশ-কালের দ্বারা সীমিত। কিন্তু বুদ্ধি বিবর্তন বা অগ্রগতি নিহিত রয়েছে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করার মধ্যে। বুদ্ধির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অতীতের স্মৃতি সংরক্ষণের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক সংস্থাপনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। মানুষের বুদ্ধি সংবেদনের সীমা অতিক্রম করে, দেশ-কালের জগৎ পার হয়ে যায়। কাজেই আমরা সঙ্গতভাবেই আশা করতে পারি যে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বুদ্ধি দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করবে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তিগত অমরতাই নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য। নৈতিক জীবন মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। ব্যক্তিগতভাবেই মানুষ নীতিবান হতে পারে। অসীম শক্তির সাথে বিলীন হলে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা থাকে না। এক্ষেত্রে নীতিবোধ বলে কিছুই থাকতে পারে না।

সমকালীন দর্শনের আত্মার পরিবর্তে ব্যক্তিত্বের ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রিংগল পেটিসনের মতে, মৃত্যুতে ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয় না। ব্রাডলি ও বোসাঙ্কের মতে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়, কিন্তু ব্যক্তির অর্জিত মূল্য বিনষ্ট হয় না।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আত্মার অমরতার প্রশ্নটি আসলে দর্শনের বিষয়বস্তু নয়। যুক্তির সাহায্যে এই প্রশ্নের যথার্থ সমাধান সম্ভব নয়, তবে বিশ্বাসের গভীরতায়, উপলব্ধির আন্তরিকতায় আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। আত্মার অমরতার প্রশ্নটি সমাধান মিলে ধর্মতত্ত্বে। বিভিন্ন ধর্ম আত্মার অমরতায় বিশ্বাস করে আর এই বিশ্বাস মানবজীবনের মহত্ত্ব ও মূল্য বৃদ্ধি করে। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবতগীতায় বলা হয়েছে :

'অস্ত্র দিয়ে এটাকে (এই আত্মাকে) কাটা যায় না, আগুন একে পোড়াতে পারে না, জল একে ভিজাতে পারে না এবং বাতাস একে শুকিয়ে ফেলতে পারে না। এই আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ান যায় না, ভিজান যায় না, শুকিয়ে ফেলাও যায় না; তিনি চিরকাল একই রূপে আছেন, তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, তাঁর কোনো পরিবর্তন নেই, তিনি স্থির এবং সর্বদাই তিনি আছেন।"[১]

---

[১] নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।

গীতার এই উক্তি আত্মার অমরতাকেই বুঝাচ্ছে। মৃত্যুতে এই আত্মার কোনোরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় না। মৃত্যু একটা অবস্থান্তর মাত্র, যেন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে।"[১]

মহাগ্রন্থ বাইবেলেও আত্মার অমরতা ঘোষিত হয়েছে :

'Dust thou art to dust returneth
Was not spoken of the soul'

কোরআনের ভাষ্য : কোরআন শরিফেও আত্মার ঐশী উৎসবের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, "আর তারা আপনাকে আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, আপনি বলুন, আত্মা আমার প্রভুর আদেশ এবং সে সম্পর্কে খুব কমই তোমাদের জ্ঞাত করানো হয়েছে।' (১৭-৮৭) সেদিন আত্মা ও ফেরেশতাগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে তখন করুণাময় যাকে অনুমতি দান করবেন এবং সে সুসঙ্গত কথা বলবে– তদ্ব্যতীত কেউই বাক্য-স্ফুরণ করতে পারবে না।"[২]

হাদিস : কোরআন শরীফের বহু স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আত্মার অমরতার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। হযরত এই দুনিয়াকে পরকালের শস্যক্ষেত্র বলে অভিহিত করেছেন। (ইন্নামাদ্ দুনিয়া মাজারায়াতোল্ আখেরা)। এখানে আত্মার সুকৃতি-দুষ্কৃতি তথা মানবজীবনের সীমাহীনতার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। প্রাচ্যের বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি ইকবাল খুদির সীমাহীন সম্ভাবনার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, খুদি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে অমরতা অর্জন করেন।

অচ্ছেদ্যোহয়ম দাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃসর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ শ্লোক– (২৩-২৪)

[১] বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়ন বানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যা নিসংযাতি নবানি দেহী।। শ্লোক– (২২)

[২] ইয়াওমা ইয়াকুমোর রুহো ওয়াল মালায়েকাতে ছাফফালা ইয়াতা কাল্লামুনা ইল্লা মান আযেনা লাহুর রহমানো ওয়া কানা ছাওয়াবা। (আল্ কোরান (৭৭-৭৮)

সপ্তম অধ্যায়
খোদার/ঈশ্বরের ধারণা
CONCEPTION OF GOD

"God is the soul of the world, an indwelling spiritual presence, a creative, organising and perfecting power, the source of our moral, religious and aesthetic ideas." – **Patrick** – ***Introduction to Philosophy***

- ❑ দর্শনে খোদার ধারণা
- ❑ খোদার প্রকৃতি
- ❑ খোদা ও পরমসত্তা
- ❑ খোদার সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা
- ❑ খোদা ও জগতের সম্পর্ক
- ❑ খোদা ও মানুষের সম্পর্ক
- ❑ খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ
- ❑ অকল্যাণ

১। দর্শনে খোদার ধারণা
Idea of God in Philosophy

মানুষ তার চিন্তার শ্রেষ্ঠ ফসল দিয়ে সাজাতে চায় তার পরম পুরুষকে। তাই সে তার স্রষ্টাকে বিশেষ বিশ্লেষণে বিভূষিত করে। দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন দার্শনিক স্রষ্টা সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচার করেছেন। নিম্নে কয়েকজন দার্শনিকের ধারণা আলোচিত হলো :

গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মতে, খোদা হলো মঙ্গলের ধারণা (Idea of Good)। প্লেটো দুটি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অতীন্দ্রিয় জগৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। অতীন্দ্রিয় জগৎ ধারণার জগৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অতীন্দ্রিয় জগতের ছায়ামাত্র। ধারণার জগৎ, সত্তার জগৎ আর অতীন্দ্রিয় জগতের ধারণাসমূহ ক্রমানুসারে সাজালে সর্বোচ্চ ধারণা হিসেবে আমরা মঙ্গলের ধারণাকে পাই। এই মঙ্গলের ধারণাই (Idea of Good) খোদা। তবে প্লেটো কখনও মঙ্গলের ধারণা ও খোদার ধারণাকে অভিন্ন মনে করেছেন, আবার কখনও খোদার ধারণাকে মঙ্গলের ধারণার অধীন বলে মনে করেছেন, কারণ মঙ্গলের ধারণা অনুযায়ী খোদা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

অ্যারিস্টটলের মতে, খোদা জগতের প্রধান প্রবর্তক (Prime Mover)। খোদা সব পরিবর্তনের অপরিবর্তিত প্রবর্তক। তাঁর মতে, জাগতিক বস্তুর দুটি দিক : **আকার** (Form) ও **উপাদান** (Matter)। জড় জাগতিক বস্তুর উপাদান খোদা তার শুদ্ধ আকার। নিষ্ক্রিয় জড়জগতের উপাদান কারণ, খোদা জগতের নিমিত্ত কারণ আকার কারণ ও উদ্দেশ্য কারণ। খোদাই এই জগতের মূল, নিয়ামক ও আদর্শ।

স্টোয়িক দার্শনিকরা খোদাকে বিধাতা (Providence) হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে, খোদা সার্বজনীন প্রজ্ঞা (Universal Reason) ও মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা। জাগতিক নিয়ম ও নৈতিক নিয়ম এক ও অভিন্ন। জগতের সর্বত্র নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি বিরাজিত।

প্লটিনাসের মতে, খোদা অনির্বচনীয় সত্তা (Eneffable)। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অসীম। তিনি নির্গুণ। খোদা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমেই তাঁকে জানা যায়।

মধ্যযুগের বিখ্যাত খ্রিস্টান দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিনের মতে, খোদা জগতের সব কিছুর আদি, মধ্য ও অন্ত। খোদার বাইরে কিছুই নেই। কল্যাণ, ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞান খোদার মূল গুণ। তিনি সর্বভূতে বিরাজিত নিত্য ও মঙ্গলময়। প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাঁকে জানা যায় না।

দেকার্তের মতে, খোদা অসীম, অনন্ত অপরিবর্তনীয় দ্রব্য (Substance)। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। তিনি জড়জগৎ ও মনোজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

স্পিনোজার মতে, খোদা এক পরম দ্রব্য। খোদার অসংখ্য গুণের মধ্যে আমরা শুধু বিস্তৃতি ও চেতনাকে জানতে পারি। খোদার স্বরূপ নির্ধারণ করা যায় না। খোদার স্বরূপ নির্ধারণ করার অর্থ হলো খোদাকে সীমিত করা। জীবাত্মা ও জড়বস্তু খোদার প্রত্যংশ, কিন্তু এদের কোনো সত্তা নেই, খোদারই একমাত্র সত্তা আছে। স্পিনোজার মতে, খোদার প্রতি বুদ্ধিসঞ্জাত ভালোবাসাই (Intellectual love) মানুষের একমাত্র লক্ষ্য।

লিবনিজের মতে, খোদা সর্বশ্রেষ্ঠ চিৎরমাণু (Monad of the monads)। তিনি অসংখ্য চিৎপরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। খোদা থেকে অন্যান্য চিৎপরমাণুর উদ্ভব হয়েছে। কান্টের মতে, খোদা নিয়ামক শক্তি, ব্যবহারিক বুদ্ধি (Practical Reason)। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার পথে কান্ট খোদার অস্তিত্ব পান নি, তিনি পেয়েছিলেন ব্যবহারিক বুদ্ধির পথে নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য হিসেবে।

ফিকটের (Ficthe) মতে, খোদা পরমাত্মা (Absolute self)। এই পরমাত্মা অসংখ্য জীবাত্মা ও বস্তুর সৃষ্টি করে। জীবাত্মা ও বস্তুর প্রকৃত সত্তা নেই। পরমাত্মাই নৈতিক শৃঙ্খলা। পরমাত্মা নিজের নৈতিক স্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

শেলিং-এর (Schelling) **মতে,** খোদা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের উর্ধ্বে এক নিরপেক্ষ পরমসত্তা (Neutrum)। মনেও বিশ্বপ্রকৃতি এই পরমসত্তারই প্রকাশ। খোদা মনও নন, বিশ্বপ্রকৃতিও নন, উভয়ের অভিন্নতা ও উৎসস্থল। মন ও প্রকৃতি স্বরূপত অভিন্ন, উভয়ের মধ্যে কেবল অবস্থানগত পার্থক্য বর্তমান।

হেগেলের মতে, খোদা পরম ধীশক্তি। এই পরমসত্তা প্রকৃতি, মন ও সমাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মাত্রায় নিজেকে প্রকাশ করছেন। এই পরমাত্মা বহুর মধ্যে এক, বিভেদের মধ্যে ঐক্য। এই পরমাত্মা জগতের মধ্যে ও জগতের বাইরে আছেন। হেগেলের পরম ধীশক্তি ফিকটের পরমাত্মার মতো নির্গুণ নন, আবার শেলিং-এর পরমসত্তার মতো নিরপেক্ষ নন। এই পরম ধীশক্তি আত্মসচেতন শক্তি যা জড়, জীব ও চৈতন্যের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছেন।

হ্যামিলটন (Hamilton) **ও ম্যানসেল** (Mansel)-**এর মতে,** খোদা অনিয়ন্ত্রিত শর্তহীন (Unconditioned)। সমস্ত সম্পর্ক সমস্ত শর্তের উর্ধ্বে। পরমসত্তা চিন্তার অগম্য। পরমসত্তাকে চিন্তা করার অর্থ তাঁকে নিয়ন্ত্রিত করা, সীমিত করা। তাঁদের মতে, পরমসত্তা অচিন্তনীয়।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, খোদা বা পরমসত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (Unknown and Unknownable)।

ব্রাডলির (Bradely) মতে, পরমসত্তা বা খোদা পরম অভিজ্ঞতা (Absolute Experience)। পরমসত্তার মধ্যে সকল অভিজ্ঞতা, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য ঘটেছে। তিনি পরম অভিজ্ঞতা খোদার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে, পরম অভিজ্ঞতা নৈর্ব্যক্তিক আর খোদা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। পরম অভিজ্ঞতা সব সম্পর্কের অতীত; সব বিরোধ, সব দ্বন্দ্ব সেখানে তিরোহিত। আর খোদার ক্ষেত্রে উপাস্য ও উপাসকের পার্থক্য বর্তমান। খোদা পরমসত্তার অবভাস মাত্র।

জেমসের মতে, খোদা সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞাতা। তিনি পরম পুরুষ; পুণ্যবানকে পুরস্কার দেওয়া এবং পাপীকে শাস্তি দেওয়া তাঁর প্রধান কাজ। এই দৃশ্যমান জগৎ এক আধ্যাত্মিক জগতের অংশ এবং আধ্যাত্মিক জগতের নাম খোদা।

রয়েসের (Royce) মতে, খোদা পরম আত্মচৈতন্য (Absolute self consciousness) তাঁর মতে, খোদা ও পরমসত্তার মধ্যে পার্থক্য নেই– খোদা ও পরমসত্তা এক ও অভিন্ন। তিনি অসীম। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে এক মুহূর্ত হিসেবেই জানেন।

লোটজারের (Lotzer) মতে, খোদা এক অসীম ব্যক্তিত্ব। তাঁর ভালোবাসাই সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। খোদার অসীম জ্ঞান এবং অফুরন্ত করুণা ও ভালোবাসা রয়েছে। তিনি মানবাত্মাকে স্বাধীন সত্তা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর অপরিসীম আশীর্বাদ ঢেলে দিয়েছেন।

২। খোদার প্রকৃতি
Nature of God

সাধারণ লোক খোদা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তা আবেগ জড়িত। খোদা অসীম, অনন্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা ও সর্বব্যাপী। তিনি অদ্বিতীয় ও তুলনাবিহীন। তাঁর অংশ নেই। বিশ্বভুবনে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি কাকেও জন্ম দেন নি এবং তিনি জাত নন। তিনি আদি ও অনন্ত, প্রকাশ্য ও গুপ্ত। তিনি সকল বস্তুর উৎস, সকল বস্তুর মূল। সকল সত্তা, সকল বৈচিত্র্যের আধার। এই ধরণীর তিনি অফুরন্ত প্রস্রবণ। পৃথিবীর যাবতীয় সত্তা খোদার কাছ থেকে আসে ও তাঁর সন্নিকটে প্রত্যাবর্তন করে। অনন্ত শক্তির অধিকারী খোদা বিশ্ব ভুবনের নিয়ন্তা। তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়, তিনি সর্বভূতে বিরাজমান। তিনি সকল সত্তায় অনুস্যূত আবার সবকিছুর উর্ধ্বে। তিনি পরম শক্তিমান।

খোদা সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত থাকলেও মানুষের চেতনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঐশী চেতনা অদ্বৈতবাদের দিক এগিয়ে চলেছে। খোদার ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত **বিষয়গুলি** লক্ষ করি।

২.১ খোদা অনন্ত, নিত্য ও স্বয়ম্ভু (God is an Infinite, Eternal and Self-existent being)

খোদা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভু তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, কারও ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি আত্মনির্ভর শক্তি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই; তিনি অনন্ত, অসীম। এই বিশ্বজগৎ তাঁর অনন্ত শক্তির আংশিক প্রকাশ মাত্র। তিনি দেশ-কালের মধ্যে অভিব্যক্ত হলেও দেশ-কালের দ্বারা সীমিত নন। তিনি বিশ্বজগতের সব কিছুর মধ্যে বিরাজিত, আবার তিনি জগতের সবকিছুর উর্ধ্বে অবস্থিত। খোদা অতিবর্তী হয়েও অন্তর্ব্যাপী, অন্তর্ব্যাপী হয়েও অতিবর্তী। খোদা স্বয়ম্ভু। তিনি জাত নন এবং তিনি কাকেও জন্ম দেন নি। এই জগৎ খোদার সৃষ্টি, এই জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়ে খোদার ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি ঘটছে।

২.২ খোদা অনিয়ন্ত্রিত ও পরমসত্তা (God is Unconditioned and Absolute)

খোদা বাইরের কোনো কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। তিনি স্ব-নিয়ন্ত্রিত, তাঁর প্রকৃতি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন। খোদা পরমসত্তা। সসীম সত্তা তাঁর সম্বন্ধ বিশিষ্ট; পরমসত্তা থেকেই বস্তুর সৃষ্টি, পরমসত্তা বহুর সংহতি বা ঐক্য। পরমসত্তা মূর্ত।

২.৩ খোদা জগতের স্রষ্টা ও পরম প্রজ্ঞা (God is the Creator and the Ultimate Reason of the world)

খোদা এই জগতের স্রষ্টা। বিশ্বজগৎ খোদার প্রকাশ। খোদা ছাড়া এই জগৎ শূন্যগর্ভ বা অলীক। জগতের উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ, আকার কারণ ও পরিণতি কারণ হিসেবে খোদা এই জগতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত ও পরিব্যক্ত হচ্ছেন। খোদা ও জগৎ পরস্পর নির্ভর। একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা চলে না। জগৎ এক পরম চৈতন্যের প্রকাশ; জগতের সব বস্তু, সব জীবনের মধ্য দিয়ে এই পরম চৈতন্য আত্মপ্রকাশ করছেন। জগতের সব কিছুর মূল কারণ রয়েছে ও সব কিছু এক ঐক্যসূত্রে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। জগৎ পরম ধীশক্তির প্রকাশ।

২.৪ খোদা পরমাত্মা বা পরম পুরুষ (God is the Absolute Self of personality) :

খোদা বিশ্বের আত্মা, পরম আত্মচৈতন্য। তিনি তাঁর চেতনার প্রকাশ হিসেবে নিজ সত্তা থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই জগৎ খোদার ইচ্ছা ও চিন্তার মূর্ত প্রকাশ। সসীম আত্মা অসীম চৈতন্যের সীমিত প্রকাশ, সসীম আত্মার মধ্য দিয়ে অসীম চৈতন্য আপন পূর্ণতার উপলব্ধি করছেন। তিনি মূর্ত সত্তা, আত্মসচেতন পরম পুরুষ। তিনি সর্বব্যাপী সত্তা, জগতের সব কিছুই পরমসত্তায় পরিব্যাপ্ত। তিনি অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী। তিনি পরমপুরুষ হিসেবে সকলের মনের খবর রাখেন, ভক্তের আহ্বানে সাড়া দেন। খোদা ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

২.৫. খোদা জগতের নৈতিক বিধাতা (God is the Moral Governor)

খোদা পূর্ণ ও পবিত্র। তিনি মানুষের নৈতিক আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তিনি আমাদের পাপ ও পুণ্যের বিচারক। তিনি বিশ্বতাত্ত্বিক বিবর্তন ও মানব ইতিহাসের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করছেন। ঐশী পরিকল্পনায় সসীম আত্মা সীমিত স্বাধীনতার ভিতর নিজ নিজ বিকাশ সাধনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, উত্থান-পতন, ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং নিজেদের লক্ষ্যে উপনীত হচ্ছে। তিনি মৃত্যুর যাতনার মাধ্যমে অনন্ত জীবনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে তিনি কোনো জাতিকে শান্তির সন্ধান দান করেন।

২.৬ খোদা সকল আদর্শের উৎস (God is the Source of Ideals)

খোদা সকল আদর্শের আধার; সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের উৎস। পূর্বে খোদার প্রবল পরাক্রমের দিকটি মানুষের নজরে পড়ত। মানুষ খোদাকে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী শক্তি হিসেবে মনে করত, খোদাকে প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতি হিসেবে বিবেচনা করত। কিন্তু বর্তমানে খোদাকে বিভিন্ন মূল্যবোধের মূল হিসেবে মনে করা হয়। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের উৎস হিসেবে খোদা বিশ্বজগৎকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, মূল্যবোধের মধ্যে দিয়ে খোদা নিজেকে উপলব্ধি করছেন, আর বিশ্বলোক পরমমূল্যবোধের দিকে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উপরের

আলোচনার প্রতি মনোনিবেশ করলে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, খোদার সম্পর্কে দার্শনিক ধারণা বুদ্ধি ও বিবেচনাপ্রসূত– আর লৌকিক ধারণা আবেগধর্মী।

৩। খোদা ও পরমসত্তা

God and the Absolute

নব্য হেগেলীয় চিন্তাবিদ ব্রাডলি খোদা ও পরমসত্তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। সসীম বস্তু ও জীব অবভাস মাত্র। সসীম আত্মাও অবভাস। কিন্তু পরমসত্তার মধ্যে সব বিরোধ, সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। পরমসত্তার সম্পর্কশূন্য, পার্থক্য বিবর্জিত সংহতি। পরমসত্তা পরম অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত নয়, নৈর্ব্যক্তিক। পরমসত্তা আত্মসচেতন আত্মাও নন আবার অসীম আত্মা কিংবা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বও নন। আত্মা, ব্যক্তিত্ব, আত্মচৈতন্য প্রভৃতি শব্দ আত্মা বা না-আত্মার পার্থক্য, সীমাবদ্ধতা ও অভাব জ্ঞাপন করে। ব্রাডলি বলেন, "পরমসত্তা শুধু ব্যক্তিগত নন। তিনি ব্যক্তিগত নন, কেননা তিনি ব্যক্তিগত ও অতিব্যক্তিগত, এককথায়, তিনি অতিব্যক্তিগত (Super-personal)।"[১]

পরমসত্তা ও খোদার মধ্যে পার্থক্য আছে। পরমসত্তা খোদা নন। খোদা বলতে এমন সত্তা বুঝায়, যে সত্তার সাথে মানুষের পার্থক্য রয়েছে। ধর্মীয় চেতনা উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে পার্থক্যের নির্দেশ করে। উপাসনা খোদা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন বুঝায়। খোদা মানুষ থেকে স্বতন্ত্র এক অসীম শক্তি। ব্রাডলির মতে, পরমসত্তা সর্বব্যাপী সত্তা, খোদা এই সর্বব্যাপী সত্তার একটি দিক মাত্র– এই পরমসত্তার অবভাস মাত্র। খোদা পরমসত্তা নন। ব্রাডলি বলেন, "পরমসত্তাকে খোদা মনে করলে, ধর্মের খোদাকে পাওয়া যাবে না। আবার উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করলে খোদা সত্তার একটি সসীম দিকে পর্যবসিত হন।"[২]

পরমসত্তা ও খোদার পার্থক্য সম্পর্কে ব্রাডলির মত গ্রহণযোগ্য নয়। পরমসত্তা সর্বব্যাপী আত্মসচেতন সত্তা। পরমসত্তা সসীম সত্তাসমূহের ঐক্য বিধান করে। পরমসত্তা বহুর মধ্যে এক (Unity in plurality) বিভেদের মধ্যে ঐক্য (Identity in difference)। জগৎ, সসীম আত্মা ও খোদার অবভাস নয়। জগৎ খোদার অভিব্যক্তি। সসীম আত্মা খোদার খণ্ড প্রকাশ। খোদা অনন্ত শক্তির আধার, সব সৌন্দর্য, সব সত্য, সব কল্যাণের উৎস। খোদা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, খোদামানুষের প্রেম কামনা করেন, মানুষ খোদার প্রেম কামনা করে, খোদা ও মানুষের সম্পর্ক প্রীতির, প্রেমের। কোরআনে উক্ত হয়েছে, "যদি তুমি আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাকে স্মরণ করব।"[৩]

---

[১] The Absolute is not merely personal. It is not personal because it is personal and more. It is in a word, Super-personal. – Bradely, *Appearance and Reality*.

[২] If you identify the Absolute with God, that is not the God or religion. If again you separate them, God becomes a finite factor in whole. – Bradely : *Appearance and Realit.*

[৩] ফাজকুরুনি আযকুরকুম।

৪। খোদার সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা

Different Conceptions of God

খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে সেগুলি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা– নাস্তিকতাবাদ (Atheism) ও আস্তিকতাবাদ (Theism)।

নাস্তিকতাবাদ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যথা– গোড়া নাস্তিকতাবাদ, সন্দেহমূলক নাস্তিকতাবাদ, বিচারমূলক নাস্তিকতাবাদ ও ব্যবহারিক নাস্তিকতাবাদ।

আবার আস্তিকতাবাদও তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–বহু-খোদাবাদ, দ্বি-খোদাবাদ ও তৌহিদ বা একত্ববাদ।

তৌহিদ বা একত্ববাদ পুনরায় চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা– অতিবর্তী খোদাবাদ, সর্ব-খোদাবাদ, খোদাবাদ ও সর্বধরখোদাবাদ।

এবার আমরা একে একে বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করব।

৪.১ নাস্তিকতাবাদ (Atheism) : নাস্তিকতাবাদ বা না-খোদাবাদ অনুসারে জড় ও গতি থেকে বিশ্বজগৎ উদ্ভূত হয়েছে। এই জগৎলীলার পশ্চাতে কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি নেই। না-খোদাবাদ খোদার অস্তিত্ব বিষয়ক মতাবদসমূহের পরিপন্থি। ধর্মবিষয়ক নাস্তিকতাবাদ বা না-খোদাবাদ জড়বাদের নৈয়ায়িক পরিণতি। না-খোদাবাদী চিন্তাবিদরা নাস্তিকতাবাদের সপক্ষে দুটি যুক্তি উপস্থাপিত করেন :

প্রথমত, এই জগৎ জড় শক্তির লীলা, এই জগৎ পরিকল্পনার পশ্চাতে কোনো আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা নেই। পুরোহিত ও স্বার্থবাদী বুদ্ধিমান লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য খোদা প্রকল্পের প্রচার করেন ও বিভিন্ন ধর্মমত প্রবর্তন করে সকল সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চিত করেন। কাজেই খোদা কোনো আধ্যাত্মিক সত্তা নন, স্বার্থবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার।

দ্বিতীয়ত, খোদার অস্তিত্ব বিশ্বাসনির্ভর। খোদ এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় সত্তা। এমনি সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন কল্পনা বিলাস মাত্র। এটি প্রতারক অধ্যাত্মবাদী ও ভণ্ড পুরোহিতদের কাল্পনিক সৃষ্টি।

নাস্তিকতাবাদ বা না- খোদাবাদ নিম্নলিখিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। যথা :
১. বিচারবিযুক্ত না-খোদাবাদ (Dogmatic atheism), ২. সন্দেহমূলক না-খোদাবাদ (Sceptical atheism), ৩. বিচারমূলক না-খোদাবাদ (Critical atheism) এবং ৪. ব্যবহারিক না-খোদাবাদ (Practical atheism)।

৪.১.১ গোঁড়া বা বিচারবিযুক্ত না-খোদাবাদ (Dogmatic Atheism) : এই মতবাদ অনুসারে খোদার কোনো অস্তিত্ব নেই। জড় ও গতি বিশ্বজগতের মূলীভূত উপাদান। জড় ও গতি থেকে জগতের বিভিন্ন বস্তু ও জীব সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বজগতের মূলে কোনো বুদ্ধিময় শক্তি বা খোদা নেই।

৪.১.২ সন্দেহমূলক না-খোদাবাদ (Sceptical Atheism) : এই মতবাদ অনুসারে খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না, তবে খোদাকে জানার ক্ষমতা মানুষের চাই। অর্থাৎ খোদা আছেন কিংবা নেই, মানুষ সে সম্পর্কে কোনো কিছুই জানতে পারে না।

৪.১.৩ বিচারমূলক না-খোদাবাদ (Critical Atheism) : এই মতবাদ অনুসারে খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না কিংবা মানুষের পক্ষে খোদার অস্তিত্বকে জানার ক্ষমতাকেও অস্বীকার করা হয় না, শুধু বলা হয় যে খোদার অস্তিত্বের সপক্ষে কোনো জৈব প্রমাণ নেই।

৪.১.৪ ব্যবহারিক না-খোদাবাদ (Practical Atheism) : এই মতবাদ অনুসারে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে খোদার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের কোনো আন্তরিক সম্পর্ক নেই। খোদার প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করলেও জীবন সুন্দরভাবে নির্বাহিত হতে পারে।

সমালোচনা

Criticism

(ক) না-খোদাবাদ ভিত্তিহীন : না-খোদাবাদ খোদার অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। এই মতবাদের মূল কথা হলো খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারা যায় না। না-খোদাবাদীরা অবিশ্বাসের সপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অবিশ্বাসের কোনো ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন নি।

(খ) জড়বাদের দোষ এতে বর্তমান। এই মতবাদ জড়বাদের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই জড়বাদের সকল অসুবিধাই এই মতবাদের মধ্যে বর্তমান। এই জগতের পরিকল্পনায় যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে, না-খোদাবাদ তার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এই মতবাদ জড় ও গতির সাহায্যে জগতের সব কিছুর ব্যাখ্যা প্রদান করে, কিন্তু জীবন ও মনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারে না। এই মতবাদ সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে মানবজীবনের বলিষ্ঠ জীবনাদর্শনকে বিকৃত করে। এই মতবাদ বুদ্ধি ও অনুভূতিকে পরিতুষ্ট করতে পারে না।

৫. আস্তিকতাবাদ

Theism

আস্তিকতাবাদ নাস্তিকতাবাদের বিপরীত মতবাদ। ব্যাপক অর্থে আস্তিকতাবাদ বলতে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস বুঝায়। নাস্তিকতাবাদ যেমন খোদার অনস্তিত্বে অবিশ্বাস করে, আস্তিকতাবাদ তেমনি খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আস্তিকতাবাদ জগৎ পরিকল্পনায় খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তবে আস্তিকতাবাদ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আস্তিকতাবাদের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, আস্তি কতাবাদ নিম্নলিখিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

যথা : ১. বহু-খোদাবাদ (Poly-theism), ২. দ্বি-খোদাবাদ (Di-theism), ৩. একত্ববাদ বা তৌহিদবাদ (Monotheism)।

৫.১ বহু-খোদাবাদ (Poly-theism) : এই মতবাদ বহু খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এই মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগ শাসন করার অনেক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অতিমানুষ বা আধ্যাত্মিক পুরুষ আছেন। তাঁদেরকে দেবতা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেবতা বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনা করেন। মিসর, গ্রিস, রোম, স্কান্দিনেভিয়া ও হিন্দুস্থানের প্রাচীন ধর্মসমূহে বহু দেবতারই বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছিল। এই মতবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে, এই জগতের বিভিন্ন বিভাগ শাসন করার জন্য অগণিত দেবদেবী আছেন। অতি মানবীয় শক্তির অধিকারী হলেও তাঁরা মানুষের মতো ঝগড়া-ফ্যাসাদ করতে অভ্যস্ত। তাঁরা বিদ্বেষ বিষে বিষায়িত। তাঁরা রূপের মোহে দেবত্ব ক্ষুণ্ন করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। দেবীরা সাধারণত নারীদের মতোই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিতা– নারী হৃদয়ের চিরন্তন আকিঞ্চন দেবীদের মধ্যেও মূর্তমান। দেবদেবীরা চির-যৌবনের অধিকারী। তাঁদের অনেকের জনক-জননী আছেন, আবার কেউ কেউ নৈর্ব্যক্তিক উপাদান সম্ভূত।

সমালোচনা
Criticism

(ক) বহু-দেববাদ দার্শনিক মতবাদ হিসেবে বিবেচ্য নয়। এটা একটি অতিপ্রচারিত পৌরাণিক মতবাদ। প্রকৃতিতে মানবীয় শক্তি আরোপ ও মনুষ্যোচিত গুণাবলির দ্বারা অভিষিক্তকরণ দেববাদের আবির্ভাবের মূল কারণ। আধুনিক বিজ্ঞান প্রভাবিত যুক্তিবিচার সমৃদ্ধ মানবমনে এই ধরনের মতবাদের কোনো আবেদন নেই।

(খ) তাত্ত্বিক বহুবাদের মতো দেববাদও জগতের ঐক্য ও সংহতির কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জগতের মূলে যে এক অখণ্ড শক্তি সব কিছুর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে চলছে এবং সব কিছুকে অস্তিত্ব দান করছে বহু-দেববাদের মধ্যে তার ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই।

৫.২ দ্বি-খোদাবাদ (Di-theism) : দ্বি-খোদাবাদ অনুসারে বিশ্বজগতের দুইজন অধীশ্বর আছেন। তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন কল্যাণময়– তিনি জগতের কল্যাণ করেন, একজন অকল্যাণময়– তিনি জগতের অকল্যাণ করেন। জগতের যা কিছু ভালো, যা কিছু কল্যাণকর তা প্রথমোক্ত শক্তি থেকে এসে থাকে; আর সব অকল্যাণ, যা সব অনিষ্ট, সব অশুভ এই শেষোক্ত শক্তি থেকে এসে থাকে। কল্যাণের অধীশ্বর জগৎটাকে আপনার ইচ্ছামত সুন্দর করে সাজাতে চান, কিন্তু অকল্যাণের অধীশ্বর সর্বদা তাঁকে এই কাজে বাধা প্রদান করেন। নিরবচ্ছিন্ন সংঘাতের মধ্য দিয়ে কল্যাণের অধীশ্বরকে পথ কেটে অগ্রসর হতে হয়।
প্রাচীনকালের কোনো কোনো ধর্মে ভালো-মন্দ দুই শক্তিরই উপাসনা করার রীতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন পাহলবিদের মধ্যে দ্বি-খোদাবাদ প্রচলিত ছিল। তাঁরা দুই মহাশক্তিতে বিশ্বাস করতেন– তাঁদের মধ্যে একটি শক্তি হলো কল্যাণের– আহুরা মাজদা, অন্য শক্তি হলো অকল্যাণের– আহ্‌রিমান। আহুরা মাজদা কল্যাণময়, তিনি চান নিজের পরিকল্পনানুযায়ী জগৎকে গড়ে তুলতে, আর আহ্‌রিমান অকল্যাণময়, তিনি চান কল্যাণের সব আয়োজন ব্যর্থ করে দিতে। এই দুই শক্তির বিরোধের ফলে জগতে অশান্তি-অনাসৃষ্টি চলছে।

সমালোচনা
Criticism

(ক) দ্বি-খোদাবাদ একটি পৌরাণিক মতবাদ। এই মতবাদ জগতের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দে যুগপৎ অবস্থিতির কারণ নির্দেশ করে। একত্ববাদ ভালো ও মন্দ দুটি নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করেও জগতের বিরোধী শক্তি ও অশুভ-অমঙ্গলের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে।

(খ) দ্বিখোদাবাদ জগতের বিভিন্ন বস্তুর ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সংহতির ব্যাখ্যা করতে পারে না। যদি দুইজন বিরোধী খোদা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য কলহ-বিবাদে লিপ্ত থাকেন, তবে জগতের ঐক্য, সংহতি, শৃঙ্খলার কোনোরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

(গ) দুই বিরোধী নীতির দ্বন্দ্ব এক উচ্চতর সমন্বয়ের নির্দেশ করে যে, শক্তির কাছে এই দুই দেবতাই নতি স্বীকার করেন। কাজেই দ্বি-খোদাবাদ একত্ববাদ বা তৌহিদের দিকেই সংকেত দেয়।

৫.৩ একত্ববাদ বা তৌহিদবাদ (Monotheism) : ধর্মীয় চেতনার সর্বোচ্চ পরিণতি একত্ববাদ। আরবিতে একে তৌহিদ বলা হয়ে থাকে। এই মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় তাঁর ন্যায় আর কোনো শক্তি নেই। তিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সকল প্রধান সেমীয় ধর্মই তৌহিদ। আর্যদের মধ্যেও 'একমেবাদ্বিতীয়ম' এর উৎসারণ লক্ষ করা যায়। ঋকবেদের মধ্যে একত্ববাদের উল্লেখ দেখা যায়। ইছায়ি ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, ইসলাম ধর্ম– সবই খোদার একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোরআনে বজ্রকণ্ঠে খোদার একত্ববাদের আপোষবিহীন ঘোষণা উৎসারিত হয়েছে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু– আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।

মানবজাতির চিন্তার ইতিহাসে একত্ববাদের বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যথা– (১) অতিবর্তী খোদাবাদ (Deism), (২) সর্বখোদাবাদ (Pantheism), (৩) খোদাবাদ (Theism) এবং (৪) সর্বধরখোদাবাদ (Panentheism)।

৫.৩.১ অতিবর্তী খোদাবাদ (Deism) : খোদা জগতের বাইরে অবস্থিত। এই মতবাদ অনুসারে খোদা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করার পূর্বে অনন্তকাল ধরে ছিলেন, কিন্তু জগৎ ছিল না। পরে এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি জগৎ সৃষ্টি করার প্রেরণা লাভ করলেন এবং শূন্যতা থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির পর তিনি জগৎকে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করলেন, জগৎকে প্রয়োজনীয় নিয়মের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবার জন্য ছেড়ে দিলেন এবং নিজে জগৎ থেকে সরে রইলেন। জগৎ ঠিকমত চললে খোদাকে কিছুই করতে হয় না, কিন্তু জগতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি জগতের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে বিশৃঙ্খলা দূর করেন এবং পুনরায় জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সৃষ্টির পূর্বে খোদা জগৎ ছাড়াই ছিলেন এবং সৃষ্টির পরও জগৎ ছাড়াই থাকবেন।

মার্টিন্যু অতিবর্তী খোদাবাদের নিম্নলিখিত **বৈশিষ্ট্য** বর্ণনা করেন :

(১) এক বিশেষ মুহূর্তে সৃষ্টি (Creation in time) : এক সময়ে খোদা জগৎ ছাড়াই ছিলেন। তিনি অনাদিকাল থেকে বিরাজমান ছিলেন, কিন্তু জগৎ ছিল না। এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি জগৎ সৃষ্টি করার প্রেরণা লাভ করলেন এবং জগৎ সৃষ্টি করলেন।

(২) মুখ্য ও গৌণ কারণের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between first cause and second cause) : খোদা বিশ্বজগাতের মুখ্য কারণ। খোদা জগৎ সৃষ্টির পর তার নিয়ন্ত্রণের জন্য কতগুলি নিয়ম করে দিলেন। এই নিয়মগুলি জগতের গৌণ কারণ; সৃষ্টির পর এই নিয়মগুলির দ্বারা জগৎ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

(৩) সাময়িক ঐশী হস্তক্ষেপ (Occasional divine transcendence) : জগৎ সৃষ্টির পর খোদা জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং জগৎকে আপনা থেকে নিয়ন্ত্রিত থেকে ছেড়ে দিলেন। কোনো জরুরি অবস্থা সৃষ্টি হলে তিনি জগতে প্রত্যাবর্তন করে তা সংশোধন করেন।

(৪) সম্পূর্ণ ঐশী অতিবর্তিতা (Complete divine transcendence) : জগৎ সৃষ্টির পর খোদা জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। প্রয়োজনে পৃথিবীতে এসে বিশৃঙ্খলা সংশোধন করে আবার পৃথিবী থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এইভাবে খোদা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ অতিবর্তী, সৃষ্টির পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায়ই তিনি জগতের বাইরে বিরাজমান।

সমালোচনা

Criticism

(অ) অতিবর্তী খোদাবাদে জগৎ এক বিশেষ মুহূর্তে সৃষ্ট হয়েছে বলে মনে করা হয়। খোদা কোন এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ সৃষ্টি করলেন? এটি কি তাঁর অপূর্ণতা ভরাট করার জন্য? যদি তাই হয় তবে তিনি কেন পূর্বে তা অনুভব করতে পারলেন না? যুক্তির দিক দিয়ে এই সব প্রশ্নের বিষয় উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, বিশেষ মুহূর্তিক সৃষ্টির পরিবর্তে নিরন্তর নব নবসৃষ্টিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

(আ) এই মতবাদ অনুসারে খোদা মুখ্য কারণ এবং প্রাকৃতিক শক্তি গৌণ কারণ। প্রাকৃতিক শক্তি অনুযায়ী জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রাকৃতিক শক্তি চেতনাহীন- এই চেতনাহীন শক্তি জগৎকে চালিত করে, এ কথার মূলে যৌক্তিকতা নেই। কারণ নিয়ন্ত্রণ একটি বুদ্ধিসাপেক্ষ ব্যাপার। আর প্রাকৃতিক শক্তি খোদা থেকে বিযুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে না। কারণ প্রাকৃতিক শক্তি খোদারই শক্তি। খোদা অনন্ত শক্তির অধিকারী, খোদার পক্ষে কিছুকাল সক্রিয় এবং কিছুকাল নিষ্ক্রিয় থাকা একটা উদ্ভট ব্যাপার। এই মতবাদ গ্রহণ করা যায় না। মার্টিন্যু বলেন, "অনন্ত সত্তার পক্ষে অনন্ত জীবন বা অনন্ত সক্রিয়তাই পরিপূর্ণতার অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। মহাজাগিতক সকল শক্তি হলো ইচ্ছা, আর সকল মহাজাগতিক ইচ্ছা খোদারই। প্রকৃতিতে বহুভাবে সক্রিয় শক্তির কারণ তিনিই।"[১]

(ই) সাময়িক ঐশী হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক। অতিবর্তী খোদাবাদে প্রয়োজন মাফিক ঐশী হস্তক্ষেপের অবকাশ রয়েছে। জাগতিক ব্যাপারে ঐশী হস্তক্ষেপ অলৌকিক ও অতিলৌকিক ব্যাপার। এই মত খোদাকে যন্ত্রী হিসেবে মনে করে। যন্ত্রী যেমন বিকল যন্ত্র মেরামত করে, খোদা তেমনি বিপর্যস্ত জগতের মেরামত করেন। খোদাকে সাধারণ যন্ত্রীয় পর্যায়ে টেনে আনা হয়। এটি অসমীচীন অযৌক্তিক।

(ঈ) এই মতবাদ অনুসারে খোদা সম্পূর্ণরূপে অতিবর্তী। তিনি জগতের সম্পূর্ণ বাইরে আছেন। খোদার অতিবর্তিতা তাঁর অনন্ত শক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। খোদা জগতের অতিবর্তী হলে তিনি সসীম শক্তি হিসেবে পরিগণিত হন।

(উ) এই মতবাদ স্ববিরোধী। এই মতবাদ অনুসারে সৃষ্টির পূর্বেও খোদা অনন্তকাল ধরে আত্মসচেতন সত্তা হিসেবে ছিলেন। কিন্তু চিন্তার বস্তু ছাড়া চৈতন্য বা চিন্ত নক্রিয়া অচিন্তনীয়। প্রকাশ ছাড়া কোনো অমূর্ত শক্তি অর্থহীন।

৫.৩.২ সর্বখোদাবাদ (Pantheism) : ইংরেজি প্যানথিজম (Pantheism) শব্দটি গ্রিক শব্দ 'pan' (সকল) এবং 'Theos' (খোদা) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই মতবাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'সবই খোদা', বা 'খোদাই সব'। সর্বখোদাবাদ অনুসারে, খোদাই একমাত্র সত্তা- ব্যক্তি ও বস্তু তাঁরই আকার। কাজেই ব্যক্তি বা বস্তুর খোদা-নিরপেক্ষ সত্তা নেই। খোদা সর্বব্যাপী শাশ্বত। সসীম জীব বা বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

---

[১] To an eternal being, eternal life is eternal action must be an essential element of perfection : all cosmic power is Will and all cosmic Will is His... He is the one cause in nature acting in various modes. – Martineau : *Study of Religion*

একদিকে বহু খোদাবাদ ও বহুবাদ এবং অন্যদিকে অতিবর্তী খোদাবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সর্বখোদাবাদের উৎপত্তি। বহু খোদাবাদ অনুসারে এই পৃথিবী বিভিন্ন দেবদেবী কর্তৃক শাসিত। সর্বখোদাবাদ এক খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং খোদা ও জগৎকে অভিন্ন মনে করে। বহুবাদ জগতের ঐক্য সংহতি উপেক্ষা করে, বহু সসীম বস্তুতে সত্তা আরোপ করে। সর্বখোদাবাদ বহুর অস্তিত্বকে একেরবেদিমূলে বলি দেয়। অতিবর্তী খোদাবাদ অনুসারে খোদা জগতের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত। তিনি জগতের সসীম সত্তাকে স্ব-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এই মতবাদ অনুযায়ী খোদা সম্পূর্ণরূপে জগতের অতিবর্তী। কিন্তু সর্বখোদাবাদ অতিবর্তী খোদাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ। সর্বখোদাবাদ জগৎ ও খোদাকে মূলত অভিন্ন বলে মনে করে।

দার্শনিক স্পিনোজা সর্বখোদাবাদের একজন বিখ্যাত ও প্রধান সমর্থক। তিনি খোদাকে একমাত্র পরমসত্তা বলে মনে করেন। খোদা একমাত্র পরমসত্তা; তাঁর অসংখ্য গুণরাজি রয়েছে। এই অসংখ্য গুণরাজির মধ্যে মানুষ মাত্র দুটি গুণ সম্পর্কে অবহিত– বিস্তৃতি ও চৈতন্য (Extension & Consciousness)। এই গুণগুলির কোনো বস্তুগত সত্তা নেই। তাদের সাহায্যে মানুষ খোদার সাথে জগতের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারে। বস্তুজগৎ, জীবজগৎ ও সচেতন সত্তাসমূহের কোনো নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই– সবই অস্তিত্ববিহীন। মানসিক, দৈহিক, নৈসর্গিক– সব ধরনের ঘটনাই মায়া-এই জগৎ মায়া। একমাত্র পরমদ্রব্য সত্য– আর সব মিথ্যা।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অতিবর্তী খোদাবাদ যেখানে খোদাকে জগতের বাইরের শক্তি হিসেবে মনে করে এবং জগতের সাথে তার সকল অন্তর সম্পর্ক ছিন্ন করে, সর্বখোদাবাদও তেমনিভাবে খোদা ও জগৎকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করে। অতিবর্তী খোদাবাদ খোদার অতিবর্তিতায় এবং সর্বখোদাবাদ খোদার অন্ত র্ব্যাপিতায় বিশ্বাস স্থাপন করে। উভয় মতবাদই খোদা সম্পর্কে চরম মতবাদ। আসল কথা হলো খোদা জগতের ভিতরে ও বাইরে। খোদা জগতের অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী উভয় অবস্থায় বিরাজিত। উভয় মতবাদ ক্রুটিপূণ। অতিবর্তী খোদাবাদে খোদার সাথে মানুষের আন্তরিক সম্পর্কের কোনো অবকাশ রাখে না। আবার, সর্বখোদাবাদ খোদাকে জগতের সাথে অভিন্ন করে, মানুষ ও খোদার মধ্যে কোনো প্রভেদ স্বীকার না করে মানুষের নৈতিক চেতনা, ধর্মীয় অধিকার, এককথায়, মানুষের ব্যক্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে।

সমালোচনা

Criticism

(১) সর্বখোদাবাদ বহু উপেক্ষিত। সর্বখোদাবাদ খোদাকে একমাত্র সত্তা মনে করায় খোদা এক অমূর্ত শক্তিতে পর্যবসিত হন। এই মতবাদ 'বহু'কে উপেক্ষা করে ঐক্যকে বড় করে তোলে, ফলে একের ধারণা শূন্যগর্ভ ধারণায় পরিণত হয়। 'বহুর' মধ্যে 'এক' যদি ব্যক্ত না হয় তবে সে, 'একের' কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকে না। এক্ষেত্রে খোদা বা পরমসত্তা নিছক কাল্পনিক ধারণা হয়ে দাঁড়ায়।

(২) সর্বখোদাবাদ আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎকে অলীক বলে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, কেননা অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা জগৎকে ব্যাখ্যা করি। জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া অযৌক্তিক ও অবাস্তব চিন্তা।

(৩) সর্বখোদাবাদ আমাদের আত্মসচেতনতার সাথে বিরোধপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকে এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিজ্ঞাত হই। আমরা ব্যক্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম সত্তা, আমাদের আত্মচৈতন্যের মাধ্যমে সে বিষয়ে আমরা জানতে পারি। কিন্তু সর্বখোদাবাদ স্বীকার করলে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দাবি করতে পারি না, একমাত্র খোদাকে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু খোদা আছেন, আমরাও আছি।

(৪) সর্বখোদাবাদ মানুষের ধর্মীয় চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করে। ধর্ম খোদার সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক ঘোষণা করে। ধর্ম মানুষের কর্ম স্বাধীনতা স্বীকার করে, উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য আন্তরিক সম্পর্কের নির্দেশ করে। সর্বখোদাবাদ মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে ধূলিসাৎ করে। এই মতবাদ অনুসারে খোদাই সব, সবই খোদা। এই মতানুসারে পৃথিবীর সবই খোদা, কারণ খোদাই সব, মানুষ, জীব, বস্তু সবাই খোদা হয়ে যায়। মানুষ খোদা হলে আর যা কিছু ঘটুক না কেন, উপাসনার কোনো প্রয়োজন থাকে না। কাজেই ধর্মের বুনিয়াদ, প্রধান ভিত্তি উপাসনা এক ধাক্কাতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম মানুষের মনে যে সম্ভ্রম, প্রীতি ও সার্বজনীন চেতনা জাগ্রত করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এক গভীর প্রীতি ও হৃদয় বিনিময় করে সর্বখোদাবাদ তা ছিনিয়ে নিতে পারে না।

(৫) সর্বখোদাবাদ মানুষের ধর্মীয় চেতনার মূলে যেমন কুঠারাঘাত করে, তার নৈতিক চেতনার মূলেও তেমনি কুঠারাঘাত করে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে আমরা সচেতন। আমরা ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ইষ্ট-অনিষ্টের মধ্যে তফাৎ করতে পারি। এই ভালো-মন্দের জ্ঞান আমাদের মধ্যে ভালো কাজ করার বাধ্যতাবোধ জাগ্রত করে, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার তাগিদ সৃষ্টি করে। ভালো কাজ করার জন্য মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, মন্দ কাজ করার জন্য অন্তরে অনুতাপ আসে। আমাদের মনের এই বিষয়গুলি অত্যন্ত দৃঢ় এবং এইগুলি দূরীভূত করা অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সর্বখোদাবাদ শুধু আমাদের আত্মসচেতনতার সঙ্গেই অসঙ্গতিপূর্ণ নয়; আমাদের নৈতিক চেতনার মূলেও এই মতবাদ কুঠারাঘাত করে। মানুষের ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-দায়িত্ব, ভালো-মন্দ সম্পর্কে চৈতন্য তার নৈতিক জীবনের মূলমন্ত্র। সর্বখোদাবাদ মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অপহরণ করে তাকে খোদার হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করে।

৫.৩.৩ খোদাবাদ (Theism) : ইংরাজি Theism শব্দটিকে খোদাবাদ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। খোদাবাদ অনুসারে খোদা আধ্যাত্মিক সত্তা। তাঁর সাথে আমরা প্রীতির সুরে আবদ্ধ হই। খোদা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তিনি মানুষের আহ্বানে সাড়া দেন, তাঁর অন্তরের অজস্র আকিঞ্চন চরিতার্থ করে থাকেন। খোদাবাদ খোদার সাথে মানুষের আন্তরিক প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার বিষয় নির্দেশ করে থাকে। এই মতানুসারে খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক হৃদয়ের।

সর্বখোদাবাদ যেমন অতিবর্তী খোদাবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উদ্ভূত হয়, খোদাবাদও তেমনি সর্বখোদাবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উদ্ভূত। অতিবর্তী খোদাবাদ খোদাকে জগতের সম্পূর্ণ বহির্ভূত বলে বিবেচনা করে। সর্বখোদাবাদ এই মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মতবাদ অনুযায়ী খোদা জগতের সম্পূর্ণ অন্তর্ব্যাপী। কাজেই অতিবর্তী খোদাবাদ ও সর্বখোদাবাদের মধ্যে বিরোধ খোদার অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতা নিয়ে। খোদাবাদী চিন্তাবিদরা খোদা ও জগতের সম্পর্কে এই দুই মতবাদের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন

করেন। খোদাবাদ অতিবর্তী খোদাবাদ ও সর্বখোদাবাদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়াস। খোদা অন্তত অসীম, তিনি জগতের ভিতরেও আছেন, বাইরেও আছেন। দার্শনিক মার্টিন্যু ও হেগেল বিভিন্নভাবে খোদা ও জগতের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন।

মার্টিন্যু (Martineau) খোদাবাদের সর্বপ্রধান প্রবর্তক ও প্রচারক। তাঁর মতে, খোদা অন্তর্বর্তী ও অন্তব্যাপী উভয়ই– তিনি জগতের ভিতরেও আছেন, জগতের বাইরেও আছেন। তাঁর মতে, খোদা জগতের মধ্যে অনুস্যূত সত্তা হলেও তিনি মানুষের আত্মার বাইরে অবস্থিত। খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক অতিবর্তী। জীবাত্মা বা মানুষ সৃষ্টি করার পর তিনি তাদেরকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে : খোদার সাথে মানুষের বা জীবাত্মার অতিবর্তী সম্পর্কের কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাবে মার্টিন্যু বলেন যে, খোদা অতিবর্তী না হলেও মানুষের পাপ বা দুষ্কার্য খোদাকে কলুষিত করত– খোদা মানবীয় দুর্বলতার অংশীদার হয়ে পড়তেন। তাই তিনি অতিবর্তী।

মার্টিন্যু ও হেগেলের মধ্যে পার্থক্য : হেগেল বলেন যে, বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে খোদার শক্তি নিঃশেষ হয় নি। খোদা তাই একাধারে অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী সত্তা। মার্টিন্যু ও হেগেলের মধ্যে এ ব্যাপারে এক বিষয়ে মিল রয়েছে। তাঁদের উভয়ের মতে, খোদা জগতের অন্তর্ব্যাপী হলেও জীবাত্মার অতিবর্তী। কিন্তু হেগেলের মতে, খোদা জগতের অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী উভয়ই– তিনি একাধারে বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত।

সর্বখোদাবাদ অনুসারে খোদা জগতের সম্পূর্ণ অন্তর্ব্যাপী। খোদাই সব কিছু, আর সব কিছুই খোদা (Everything is God and God is everything)। জগৎ ও খোদা সম্পূর্ণ অভিন্ন। খোদাবাদ সর্বখোদাবাদের সাথে এক বিষয়ে সঙ্গতিপূর্ণ। উভয় মতবাদ অনুযায়ী খোদা অন্তর্ব্যাপী। কিন্তু সর্বখোদাবাদ অনুসারে বস্তু ও জীবের কোনো সত্তা নেই– একমাত্র খোদাই পরমসত্তা– একমাত্র তাঁরই অস্তিত্ব আছে। প্রাকৃতিক শক্তি ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা খোদার প্রত্যাংশ (modes) মাত্র। প্রাকৃতিক শক্তি ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা অলীক। মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই। জগতের সব কিন্তু খোদাবাদ সর্বখোদাবাদের ও নৈতিক চেতনাকে অস্বীকার করে। কিন্তু খোদাবাদ সর্বখোদাবাদের আতিশয্য দূর করে এক সমন্বয়মূলক মতবাদ গড়ে তুলেছেন। খোদাবাদ অনুযায়ী খোদ অন্তর্ব্যাপী এতদ্ব্যতীত খোদাবাদ মানবজাতির খোদা সম্পর্কীয় ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সমালোচনা

Criticism

(১) মতবাদটির উৎকর্ষ : খোদাবাদ অনুসারে ঐশী ইচ্ছা থেকে খোদা জগৎ উদ্ভব করেছেন এবং অনন্তশক্তি বলে সব সীমা অতিক্রম করেছেন। খোদা আপন ইচ্ছা অনুসারে ও অনন্ত শক্তিবলে এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি জগৎ দ্বারা সীমিত নন। এ পর্যন্ত খোদাবাদ ত্রুটিমুক্ত।

(২) খোদা জীবের বাইরে অবস্থিত হলে জীবের সত্তা খোদার সত্তাকে সীমিত করবে। খোদা অসীম, অনন্ত, খোদা কোনো কিছুর দ্বারা সীমিত হতে পারেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জীবের স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে আত্মবিরোধ রয়েছে।

(৩) জীব খোদা থেকে উদ্ভূত হলেও জীবন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন– মার্টিন্যু এই মত পোষণ করেন। কিন্তু জীবের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন। জীবের ইচ্ছা খোদার উদ্দেশ্য

অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জীবের কার্যাবলি আংশিকভাবে নির্ধারিত। মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী, কেননা সাধারণভাবে খোদা মানুষের কার্যাবলির ধারা নির্ধারণ করলেও বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন নি।

(৪) মার্টিন্যু মনে করেন যে, নৈতিক আদর্শ বাইরে থেকে মানুষের ওপর আরোপিত হয়, একথা গ্রহণ করা সম্ভব নয়, নৈতিক আদর্শ মানুষের বৃহত্তর সত্তা বা বিবেক কর্তৃক আরোপিত। অর্থাৎ নৈতিক আদর্শ স্ব-আরোপিত।

৫.৩.৪ সর্বধরখোদাবাদ (Panentheism) : ইংরেজি 'প্যানেন্থিজম' মানে "সবকিছু খোদার মধ্যে (pan- সবকিছুই, en-মধ্যে, Theos-খোদা) অবস্থিত" মতবাদ। এই মতবাদ বাংলায় সর্বধরখোদাবাদ হিসেবে অনূদিত হয়েছে। এই মতবাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো সবকিছুই খোদার মধ্যে বিরাজিত হয়েছে। অর্থাৎ খোদা সবকিছুই ধারণ করে আছেন। সর্বধরখোদাবাদ অতিবর্তী খোদাবাদ ও সর্বধরখোদাবাদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়াস। উভয় মতবাদের দোষ-ত্রুটি নিরসন করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এই মতবাদ চেষ্টিত। অতিবর্তী খোদাবাদ অনুসারে খোদা জীব ও জগতের বাইরে অবস্থিত খোদার সঙ্গে জীব ও জগতের কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। আবার সর্বখোদাবাদ অনুসারে খোদা জীব ও জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত হন নি। আবার সর্বখোদাবাদ অনুসারে খোদা জীবন ও জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সবই খোদা, খোদই সব (Everything is God and God is everything)। অতিবর্তী খোদাবাদে খোদা সম্পূর্ণ অতিবর্তী, সর্বখোদাবাদে খোদ সম্পূর্ণ অন্তর্ব্যাপী। সর্বখোদাবাদ এই বিরুদ্ধ মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। এই মতবাদ অনুসারে খোদা জীবনজগতের মধ্যেও অবস্থিত, আবার বাইরে অবস্থিত। অর্থাৎ খোদা অন্তর্ব্যাপী (Immanent) ও অতিবর্তী (Transcendent) দুই-ই। বহুর মধ্যে একের প্রকাশ সর্বধরখোদাবাদ খোদার সঙ্গে জগতের ও জীবের, একের সঙ্গে বহুর, অসীমের সঙ্গে সসীমের, অন্তরের সঙ্গে সান্তের অনিবার্য ও আঙ্গিক সম্পর্ক নির্দেশ করে। এক ছাড়া বহু অর্থহীন, একের মধ্যেই বহুর পূর্ণতা আবার বহুর মধ্যে দিয়েই একের প্রকাশ। জগৎ ছাড়া খোদা শূন্যগর্ভ অমূর্ত শক্তি।

মতবাদটির গুরুত্ব : সর্বধরখোদাবাদ একটি সন্তোষজনক মতবাদ। জীব ও জগতের সঙ্গে খোদার সম্পর্ক বিষয়ক যতগুলি মতবাদ আছে সর্বধরখোদাবাদ সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্তিগ্রাহ্য মতবাদ। সর্বধরখোদাবাদ অতিবর্তী খোদাবাদ ও সর্বখোদাবাদের ত্রুটিমুক্ত এবং উভয় মতবাদের সমন্বয় বিধায়ক। অতিবর্তী খোদাবাদ জীব ও জগতের সঙ্গে অনিবার্য সম্পর্ক অস্বীকার করে খোদাকে একমাত্র সত্তা বলে ঘোষণা করে খোদার বাইরে অবিস্থিত জীবজগৎ জড়জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। ফলে সর্বখোদাবাদ শূন্যগর্ভ অদ্বৈতবাদে পর্যবসিত হয়। সর্বধরখোদাবাদ উভয় মতবাদের ত্রুটি বিদূরিত করে এক ও বহুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, অসীম ও সসীমের মধ্যে মিলন ঘটে দেয়।

দ্বিতীয়ত, সর্বধরখোদাবাদ অসীম ও সসীমের মধ্যে, অনন্ত সান্তের মধ্যে কল্পিত দ্বৈতবাদের সমাধান করে। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ, "নানা বর্ণে, নানা গানে, নানা ছন্দে" অরূপ রূপের মধ্যে প্রমূর্ত। মানুষের চৈতন্যের মধ্যে এই মহাশক্তি বিচিত্র রূপে অভিব্যক্ত। কাজেই এই মতবাদ খোদা ও মানুষের মধ্যে নিবিড় ঐক্য স্থাপন করে।

তৃতীয়ত, এই মতবাদ মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় অনুভূতির যথার্থ ব্যাখা দিতে পারে। খোদা মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত হলেও তিনি সব নিয়ন্ত্রিত করেন না। জীবনের অস্তিত্ব বর্তমান জীবের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কাজেই জীবন নিজ কৃতকর্মের জন্য

দায়ী। আর জীবনের স্বতন্ত্র সত্তা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা তার ধর্মীয় অনুভূতির নির্দেশক ধর্মে উপাস্য ও উপাসক– দুইয়ের মধ্যে অনিবার্য যোগাযোগ বর্তমান। সর্বধরখোদাবাদের খোদা ও জীবনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, উভয়ের ব্যক্তিত্ব রয়েছে, কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগ বা সম্পর্ক সহজেই স্থাপিত হয়। এই মতবাদ সন্তোষজনক।

৬। খোদা ও জগতের সম্পর্ক

Relation Between God and the Good

খোদা ও জগতের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রশ্নটির অর্থ এই যে, খোদা জগতের ভিতরে না বাইরে। এই সম্পর্কে চারটি মতবাদ প্রচলিত আছে। (১) অতিবর্তী খোদাবাদ (Deism), (২) সর্বখোদাবাদ (Pantheism), (৩) খোদাবাদ (Theism) এবং (৪) সর্বধরখোদাবাদ (Panentheism)। পূর্বেই এই মতবাদসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে প্রশ্নের আলোকে যৎকিঞ্চিত আলেচিত হলো।

৬.১ অতিবর্তী খোদাবাদ (Deism) : এই মতবাদ অনুসারে খোদা বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্তা– তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। কাজেই খোদা অতিবর্তী (Transcendental)। খোদা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান। তিনি জগৎ ছাড়াই এক সময়ে ছিলেন, এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি জগৎ সৃষ্টি করার প্রেরণা লাভ করেন এবং জগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎ সৃষ্টি করার পর খোদা বস্তু ও জীবকে স্বাধীনতা প্রদান করলেন। বিশ্বজগৎ আপনা-আপনি চলতে লাগিল। বিশ্বজগৎ কতগুলি গৌণ কারণের ওপর নির্ভর করে চলে আসছে। যদি কোনো সময় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, খোদা নিজে শৃঙ্খলা আনয়ন করে জগৎকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। জগৎ সৃষ্টি করার পর খোদা জগতের বাইরে চলে যান। প্রয়োজনে তিনি জগতের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সমাপন করে আবার স্ব-স্থানে ফিরে যান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই মতবাদ অনুসারে খোদা জগতের বাইরে।

সমালোচনা

ত্রুটি : অতিবর্তী খোদাবাদ সৃষ্টিবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। খোদা এক বিশেষ মুহূর্তে কেন জগৎ সৃষ্টি করলেন এবং তার পূর্বে নয়, এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। খোদার শক্তি ছাড়া সৃষ্টি কিভাবে প্রবহমান আছে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এটি ছাড়া মাঝে মাঝে জগতে খোদার উপস্থিত এবং তদারক শেষে আবার প্রত্যাবর্তন খোদাকে অনিপুণ স্রষ্টায় পরিণত করে। খোদার সঙ্গে জীবন ও জগতের বাহ্য সম্পর্ক– এই মতবাদ গ্রহণীয় নয়।

৬.২ সর্বখোদাবাদ (Pantheism) : এই মতবাদ অনুসা'র, খোদা জগৎ ও জীবের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন। এই মতবাদ অনুযায়ী খোদই সব, সবই খোদা (Everything is God and God is everything)। খোদাই একমাত্র পরমসত্তা। বস্তুজগৎ ও জীবজগতে খোদানিরপেক্ষ কোনো সত্তা নেই। খোদা ব্যতিরেকে কোনো সত্তা নেই, যেমন– সিন্ধু ছাড়া কোনো তরঙ্গের অস্তিত্ব নেই। জীবজগৎ ও বস্তুজগৎ খোদার গুণাবলিরই প্রকাশ, জগৎ ও খোদা অভিন্ন।

সমালোচনা

ত্রুটি : সর্বখোদাবাদ বহুকে একের মধ্যে বিসর্জন দেয়, বৈচিত্র্যকে ঐক্যের কবরগাহে সমাধি প্রদান করে। কিন্তু বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা যায় না। এই মতবাদ জগতের সব কিছুকেই অলীক বলে উড়িয়ে দেয়।

এ ছাড়া, মতবাদের গুরুতর প্রলয়ংকারী প্রভাব হলো, এই মতবাদও মানবজাতির ধর্মীয় ও নৈতিকবোধের মূলে কুঠারাঘাত করে। এই মতবাদও নীতিকে ধূলিসাৎ করে।

৬.৩ খোদাবাদ (Theism) : খোদাবাদ অতিবর্তী খোদাবাদ ও সর্বখোদাবাদ– এই দুই মতবাদের মধ্যবর্তী মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে খোদা অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী। খোদা জগতের ভিতরে ও বাইরে সর্বত্র বিরাজমান। খোদাবাদ সর্বখোদাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ। সর্বখোদাবাদ মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনাকে অলীক বলে প্রতিপন্ন করে। কিন্তু কোনো পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক মতবাদ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। খোদাবাদ খোদা ও মানুষকে, উভয়ের যথাযথ অধিকারকে স্বীকার করে থাকে।

মার্টিন্যু খোদাবাদের একজন আদর্শ প্রচারক। তাঁর মতে, খোদা জগতের বাইরে ও ভিতরে আছেন– জগতের সঙ্গে সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনি অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী দুই-ই। কিন্তু খোদা সসীম আত্মার বাইরে। তিনি সসীম আত্মা সৃষ্টি করে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, মানুষকে স্বেচ্ছায় চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। মার্টিনের মতে, সর্বখোদাবাদ ও খোদাবাদের মধ্যে প্রভেদ হলো 'সর্বঅন্তর্ব্যাপিতা' (all immaneney) এবং কিছু 'অতিবর্তিতা'র (so transcendency) মধ্যে বিরোধ।

সমালোচনা

মার্টিনের মতবাদ অযৌক্তিক, কেননা খোদা জীবের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করলে খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব। কিন্তু আমরা জানি খোদা মানুষের বাইরে মন– ভক্তের অন্তরে, বিশ্বাসীর হৃদয়ে তাঁর স্থান। আর তিনি (মার্টিন্যু) জীবকে খোদা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে গ্রহণ করেছেন– এই অবাধ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর।

৬.৪ সর্বধরখোদাবাদ (Panentheism) : এই মতবাদ অনুসারে, খোদা জগৎ ও মানুষের সম্পর্কের দিক দিয়ে অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপী উভয়ই। অতিবর্তী খোদাবাদ ও সর্বখোদাবাদের সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে সর্বধরখোদাবাদ খোদাবাদের অপূর্ণতার শূন্যতা ভরে দিয়েছে। এই মতবাদ উক্ত দুই মতবাদের বিরোধের সমন্বয় সাধন করে। বিশ্বজগতের সবকিছুই খোদা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিশ্বজগতের বিভিন্ন সত্তার মধ্য দিয়ে খোদা নিজেকে প্রকাশ করছেন ও নিজের সীমাহীন শক্তি উপলব্ধি করছেন। কাজেই খোদা ও জগতের মধ্যে আন্তর সম্পর্ক বিদ্যমান। খোদা ও জগতের সম্বন্ধ নিশ্চয়াত্মক। খোদা অন্তর্ব্যাপী, কারণ জগতের মধ্য দিয়ে তিনি আত্মসচেতন জীবন হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করছেন। খোদা সবকিছুই ধারণ করে আছেন বলে তিনি সর্বধর; সেই কারণে এই মতবাদের নাম সর্বধরখোদাবাদ। তিনি জগতের মধ্যে নিঃশেষ হন নি, তাই অতিবর্তী।

উপরোক্ত মতবাদসমূহের মধ্যে সর্বধরখোদাবাদ খোদা ও জগতের সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দান করে।

৭। খোদা ও মানুষের সম্পর্ক

Relation between God nad Man

খোদার সাথে মানুষের তিনটি দিক আছে : দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক। মানুষের সাথে খোদার সম্পর্ক বিবৃতি করতে হলে মানুষের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক তিনটি দিকের প্রতি নজর দিতে হবে।

৭.১ মানুষের দৈহিক দিকের সাথে খোদার সম্বন্ধ

Relation between God and man in physical aspect

জগতের অন্যান্য বস্তু ও জীবদেহের সঙ্গে মানুষের দেহের সম্পর্ক রয়েছে। জগাতের পার্থিব বৃস্তু ওমানুষর দেহ একই স্তরে অবস্থিত। মানুষের দেহ অন্যান্য পার্থিব বস্তুর মতোই খোদার আত্মসচেতন শক্তির নিষ্ক্রিয় অভিব্যক্তি। মানুষের দেহ বা পার্থিব বস্তু খোদার আত্মবিকাশের একটি পর্যায় বিশেষ– সসীম আত্মসচেতন সত্তা হিসেবে আত্মবিকাশ করতে সসীম দেহকে বিকাশের উপায় ও উপাদান হিসেবে বিচেনা করা হয়, ফলে প্রত্যেক কাজ খোদার অন্তর্ব্যাপী ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭.২ খোদার সঙ্গে মানুষের বুদ্ধির সম্পর্ক

Relation between God and man's rational aspect

মানবদহে ও অন্যান্য পার্থিব দ্রব্য যেমন খোদার আত্মোপলব্ধির একটি স্তর, মানুষের মন বা আত্মাও তেমনি তাঁর আত্মোপলব্ধির একটি স্তর– অবশ্যই উচ্চতর স্তর, মানবাত্মাও খোদার আত্মোপলব্ধির উপায় ও উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষের শরীর, মনে, দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য আছে। শরীর নিষ্ক্রিয় অভিব্যক্তি, এ লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়, নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ। মানুষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জীবন– আত্মনিয়ন্ত্রিত ও আত্মসচেতন সত্তা। কাজেই পৃথিবীর অন্যান্য বস্তু থেকে মানুষের মন পৃথক– বস্তু ও মন একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত নয়। মানুষের নিজের লক্ষ্য আছে, সে আপন লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত। আত্মসচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সক্ষম সত্তা হিসেবে মানুষ পরমসত্তার সার্বজনীন জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মানুষ বুদ্ধিদীপ্ত জীব হিসেবে খোদার এক বিশেষ অভিব্যক্তি এবং মানুষের মধ্য দিয়ে খোদার স্বরূপ আংশিকভাবে প্রকাশমান। মানুষের সাথে অন্যান্য সত্তার সম্পর্ক রয়েছে। আবার খোদার সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য সত্তার সাথে তার দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক, আর খোদার সাথে তার সম্পর্ক এই যে, খোদা থেকে সে উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের আত্মা পরমাত্মা বা খোদার খণ্ড অভিব্যক্তি।

৭.৩ মানুষের নৈতিক দিকের সঙ্গে খোদার সম্পর্ক

Relation of God to the moral aspect of man

বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা হিসেবে মানুষ কেবল আত্মসচেতন নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষমও বটে। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে নিজেকে সুগঠিত করে, নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নেয়। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ও খোদার স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্ক কি– সে বিষয়ে মতভেদ আছে। অতিবর্তী খোদাবাদ ও খোদাবাদ অনুসারে খোদা মানুষ ও জগতের বাইরে, খোদার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বর্তমান, আবার সর্বখোদাবাদীরা খোদাকে মানবাত্মা ও জগতের সাথে অভিন্ন করে দেখেন। জটিল বিতর্কে না গিয়ে আমরা বলতে পারি, অসীম শক্তির অভিব্যক্তি হিসেবে

মানবাত্মা স্বাধীন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের দেহ পরম আত্মার এক বিশেষ ধরনের প্রকাশ, মানুষের মন খোদার চৈতন্যের অংশবিশেষ এবং মানুষের ইচ্ছা খোদার ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত হলেও এটি কিছুটা স্বতন্ত্র।

টীকা ১। নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ

Absolute and Relative

জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমেই আমরা সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ ধারণায় উপনীত হই। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা যে জগতের জ্ঞান লাভ করি তা সাপেক্ষ বা শর্তাধীন জগৎ। এখানকার সব কিছুই পরস্পর নির্ভর। এই সব আমাদেরকে অন্যনির্ভরতার জ্ঞান প্রদান করে। কিন্তু সাপেক্ষ ও শর্তাধীন সত্তাসমূহের পথ বেয়ে আমরা একনিরপেক্ষ ও শর্তহীন পরমসত্তার ধারণায় উপনীত হই। দ্বান্দ্বিক যুক্তিপদ্ধতির বলেই আমরা শর্তাধীনের ধারণা থেকে শর্তহীন ধারণায়, সাপেক্ষের ধারণা থেকে নিরপেক্ষের ধারণায় উপনীত হই।

হ্যামিল্টন ও তাঁর অনুসারীদের মতে, পরমসত্তাকে আমরা জানতে পারি না। পরমসত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কারণ তাঁদের মতে, কোনো কিছু চিন্তা করা মানে তাঁকে শর্তাধীন করা বা সীমিত করা, কিন্তু পরমসত্তা কোনো শর্তের অধীন নন। শর্তাধীন করলে পরমসত্তা আর 'পরম' থাকে না– সাপেক্ষ ও শর্তাধীন হয়ে যান। কাজেই পরমসত্তা আমাদের জ্ঞানের অতীত।

এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়। পরমসত্তাকে আমরা সসীম জীবন বা বস্তুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ভিত্তিতে বুঝে থাকি বা বুঝতে পারি। সসীমের মাধ্যমেই অসীমের প্রকাশ ঘটে থাকে। সসীম ও অসীমের মধ্যে আসলে কোনো বিরোধ নেই। একের মাধ্যমেই অন্যের প্রকাশ হয়ে থাকে।

সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন যে, জগতের সাপেক্ষ সত্তানিচয় পরমসত্তার ধারণায় উপনীত হতে বাধ্য করে। জগতের মূলীভূত কারণ হিসেবে পরমসত্তার ধারণা না করে আমরা পারি না। কিন্তু আমরা পরমসত্তার স্বরূপ কিছুই জানতে পারি না। এই মতবাদও সমর্থনযোগ্য নয়।

দার্শনিক মার্টিন্যু (Martineau) বলেন যে, কোনো জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তার কোনো গুণ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব। কারণ এটা যুক্তির দিক দিয়ে পরস্পরবিরোধী। যদি স্বীকার করা হয় যে, এই জগৎ পরমসত্তার প্রকাশ, তবে তাকে জানা যায় না– এমন মন্তব্য অচল।

হেগেল যথার্থ বলেছেন যে, সাপেক্ষের ধারণাই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে আমাদেরকে নিরপেক্ষ বা পরমসত্তার ধারণা প্রদান করে। কারণ সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ সসীম ও অসীম, সীমিত ও সীমাহীন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য– এক ছাড়া অন্যকে বুঝা যায় না। পরমসত্তা এক শর্তহীন, আত্মনির্ভর ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি।

টীকা ২। অসীম ও সসীম (Infinite and Finite)

সসীম অসীমের ধারণা দেয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা সসীম জীব ও বস্তু সম্পর্কে অবহিত হই। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমরা সীমাবদ্ধ জগৎ ও তার বিভিন্ন জীবন সম্পর্কে জানতে পারি বা জেনে থাকি। সসীম সর্বদা দেশ ও কালের দ্বারা সীমায়িত। সসীমের ধারণা আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে সসীম থেকে অসীমের রাজ্যে পরিচালিত করে থাকে। আমরা অন্যরূপ ভাবতে পারি না। সসীম অনিবার্যভাবে অসীমের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।]

অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন যে, অভিজ্ঞতার মাধ্যম ব্যতিরেকে আমরা অন্য কোনো উপায়ে জ্ঞান লাভ করতে পারি না। কাজেই অভিজ্ঞতা আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়, কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা পরমসত্তাকে জানতে পারি না। অসীমের ধারণা নঞর্থক। কিন্তু স্পেন্সার বলেন যে, অসীমের ধারণা অস্তিত্ববাচক। কিন্তু তার স্বরূপ সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারি না। অভিজ্ঞতাবাদীদের এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা সসীমের ধারণা অনিবার্যভাবে অসীমের ধারণা জাগিয়ে দেয়। সসীমের মাধ্যমেই অসীমের প্রকাশ হয়ে থাকে। কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে, কত ছন্দে অরূপের রূপের লীলা ব্যক্ত হয়ে থাকে। অসীমের প্রকাশ-কামনা সসীমের মধ্য দিয়েই পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে। অন্য কোনো পথে সসীমের প্রকাশের কথা চিন্তা করা যায় না।

টীকা ৩। সত্তা ও অবভাস (Noumena and phenomena)

বস্তু বা সত্তার ব্যক্ত রূপকে বলা হয় অবভাস। কোনো বস্তু আসলে কি আমরা জানতে পারি না। বস্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় যেভাবে প্রতীয়মান হয় আমরা বস্তুকে সেইভাবে জেনে থাকি। অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা বস্তুর রূপ সম্পর্কে অবহিত হই। মন সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। মন আসলে কেমন আমরা জানতে পারি না, তবে মনের প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে আমরা মন সম্পর্কে ধারণা করে থাকি। জড় সংবেদনের মাধ্যমে এবং মন অনুভূতির মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশমান হয়ে থাকে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে, সত্তা ছাড়া অবভাস কি করে সম্ভব? বস্তু ছাড়া অভিব্যক্তি কিভাবে হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে, সত্তা ও অবভাস পরস্পর নির্ভর, একের ধারণা ছাড়া অন্যের ধারণা করা সম্ভব নয়। বস্তুর অন্তরালবর্তী শাশ্বত যে রূপ তার নাম সত্তা।

অবভাস ও সত্তার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন– পুরাতন ব্যাপার, দর্শনশাস্ত্রের মতোই পুরাতন ব্যাপার। গ্রিক দার্শনিক পারমেনিডিস সত্তা ও অ-সত্তা (Being and Not Being), মূল ও সত্তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ধারণাকেই (Idea) পরমসত্তা বলে গ্রহণ করেছেন এবং বস্তুজগৎকে অবভাস বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, অবভাসিক জগৎ মিথ্যা; ধারণার জগৎ শাশ্বত, সনাতন। দেকার্ত ও স্পিনোজা বস্তুর আসল আকারের ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। জার্মান দার্শনিক কান্টও অবভাস ও সত্তার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তিনি অবভাসিক জগৎ ও চিরন্তন জগতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে, জ্ঞানের আকার অবভাসিক জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অতীন্দ্রিয় সত্তা সম্পর্কে খাটে না।

সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়তাবাদী এবং অবভাসিক ভাববাদী দার্শনিকরা পরিদৃশ্যমান জগতের জ্ঞানকে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, পরমসত্তার জ্ঞান আমরা পাই না, কেননা পরমসত্তার ক্ষেত্রে জ্ঞানের আকারসমূহের প্রযোজ্য নয়। অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের যুক্ত প্রক্রিয়ায় আমাদের জ্ঞান হয়ে থাকে। কিন্তু এই অবস্থা গ্রহণীয় নয়, কেননা সত্তা ছাড়া অভিব্যক্তি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অবভাসের মাধ্যমেই সত্তা প্রমূর্ত হয়ে থাকে।

৮। খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ
Proofs for the Existences of God

খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। এই যুক্তিগুলি চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা : (১) বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি (Cosmological Argument), (২) উদ্দেশ্যবিষয়ক যুক্তি (Teleological Argument), (৩) তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি (Ontological Argument) ও (৪) নৈতিক যুক্তি (Moral Argument)। এবার এ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা সন্নিবেশিত হলো :

৮.১ বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি (Cosmological Argument) : বিশ্বতত্ত্বের বিশ্লেষণের মাধ্যমে খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করার যুক্তি হলো তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি। অ্যারিস্টটল, সেন্ট টমাস (St. Thomas), দেকার্ত, লক প্রমুখ দার্শনিক এই যুক্তির সমর্থক। এই যুক্তির তিনটি রূপ আছে। যথা– (১) খোদাকে আদি কারণ ও জগৎকে তাঁর পরিণতি হিসেবে মনে করা (Argument from the world viewed as an effect to a first cause), (২) জগৎকে পরিদৃশ্যমান রূপ ও খোদাকে পরিদৃশ্যমান রূপের অন্তর্বর্তী অতীন্দ্রিয় সত্তা মনে করা (Argument from the world viewed as Phenomenal to one ultimate substance) ও (৩) জগৎকে সসীম ও সাপেক্ষ সত্তা এবং খোদাকে অসীম নিরপেক্ষ সত্তা হিসেবে মনে করা (Argument from the world viewed as finite and relative to an infinite and absolute being on whom it rests)।

(১) খোদাকে আদি কারণ ও জগৎকে তাঁর পরিণতি হিসেবে মনে করা (Argument from the world viewed as an effect to a first cause)

জগৎ কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ। কার্যকারণ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ঘটনারই কারণ আছে, বিনা কারণে কোনো কাজ সংঘটিত হয় না। আবার সেই কারণকে কাজ হিসেবে গ্রহণ করলে তারও একটি কারণ অনুমান করতে হয়। এইভাবে দ্বিতীয় কারণকে কাজ ধরলে তার আবার একটি তৃতীয় কারণ স্বীকার করতে হয়। এইভাবে কার্যকারণ পরম্পরায় বিরামহীন পিছনের দিকে চলে যেতে হয়। কিন্তু মানুষের মন এইভাবে চলতে চায় না, সে আদি কারণের (Uncaused cause) অনুমান করে। আদি কারণের অন্য কোনো*কারণ নেই। এই পরম কারণই খোদা।

(২) জগৎকে পরিদৃশ্যমান রূপ ও খোদাকে পরিদৃশ্যমান রূপের অন্তবর্তী অতীন্দ্রিয় সত্তা মনে করা (Argument from the world viewed as Phenomenal to one ultimate substance)

জগতের পরিদৃশ্যমান রূপের নিয়ত পরিবর্তন চলছে। এই পরিবর্তন মানুষের মনে অপরিবর্তনীয়ের চিরন্তন সত্তার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। এই সত্তাই হলো খোদা। এ সম্পর্কে জন কেয়ার্ডের উক্তি, "আমাদের সীমাবদ্ধতার চেতনা নির্দেশ করে যে, আমরা

সীমা অতিক্রম করেছি। আমরা মনে করি যে, জগৎ দৃশ্যমান ও ক্ষণস্থায়ী, এটা আমাদের মনে প্রচ্ছন্নভাবে অদৃশ্য ও চিরন্তন জীবনের ধারণা জাগিয়ে দেয়, যেখানে পরিবর্তনের কোনো ছায়া পড়ে না।"[১]

(৩) জগৎকে সসীম ও সাপেক্ষ সত্তা এবং খোদাকে অসীম নিরপেক্ষ সত্তা হিসেবে মনে করা (Argument from the world viewed as finite and relative to an infinite and absolute being on whom it rests)

ড. মার্টিনের বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তিতে নতুন ধারার সন্নিবেশিত যুক্তিটি করেছেন। কার্যকারণ তত্ত্বের ধারণা বিশ্লেষণের ওপর তাঁর যুক্তিটি নির্ভরশীল। তাঁর মতে, কারণের ধারণা শক্তি, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের ধারণা প্রদান করে। এইসব ধারণা বা নীতির বলেই বিশেষ কারণ বিশেষ ঘটনা ঘটাতে পারে। শক্তি, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ধারণা আমরা মনের কার্যাবলির অন্তর্দর্শনমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হই। আমাদের অধিকাংশ কাজের মধ্যে মানসিক শক্তি সক্রিয় সে বিষয়ে আমরা সচেতন। অর্থাৎ আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে সচেতন। আত্মচৈতন্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইচ্ছাশক্তি ধারণাকে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে আমরা প্রকৃতিতে আরোপ করি। প্রকৃতিতে যে শক্তি বিরাজিত সে শক্তি অন্ধ যান্ত্রিক শক্তি নয়– মানসিক শক্তি। এই মানসিক শক্তি অসীম মনের শক্তি, খোদার শক্তি। সুতরাং জাগতিক শক্তি ঐশীশক্তি ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

সমালোচনা

Criticism

প্রথমত, বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তি ত্রুটিমুক্ত নয়। এটি অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আদি কারণে অনুমান কল্পনাসঞ্জাত। আদি কারণ ধরে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় : কিরূপে আদি কারণ সৃষ্ট হলো অর্থাৎ আদি কারণের কারণ কি? বিজ্ঞানের চূড়ান্ত শিক্ষা এই যে নিছক শূন্য থেকে কোনো কিছুই উদ্ভূত হতে পারে না। কাজেই জগতের আদি কারণ হিসেবে খোদার অস্তিত্ব একটি অপ্রমাণিত অনুমান।

দ্বিতীয়ত, কারণ সচেতন নিয়ামক শক্তি, মার্টিনের এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, অনেক সময় বিনা পরিচালনায় কারণ থেকে কার্য সংঘটি হয়। কোনো কাজের কারণ অবশ্যম্ভাবীরূপে সচেতন হবে, এমন কোনো যুক্তি নেই। কারণ অসচেতন হতে পারে।

তৃতীয়ত, কান্টের মতে, কার্যকারণতত্ত্ব অতীন্দ্রিয় সত্তা বা খোদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কাজেই কান্ট বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক যুক্তির নির্মম সমালোচনা করেছেন।

৮.২ উদ্দেশ্যবিষয়ক যুক্তি (Teleological Argument) : সমগ্র জগতের মধ্যে যে উদ্দেশ্যমুখীনতা দৃষ্ট হয় তা থেকে খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করার যুক্তিকে বলা হয় উদ্দেশ্যবিষয়ক যুক্তি, খোদাবাদী চিন্তাবিদদের সকল প্রমাণের সেরা প্রমাণ। এই

---

[১] They very consciousness of our finitude... indicates that we have already transcended it... that we regard the world only as the domain of the things seen and temporal, implies at least a latent, reference to the idea of an invisible and eternal life, an existence in which is no variableness or shadow of turning. – John Caird.

ভাববাদী দার্শনিকদের হাতে এই প্রমাণটি খোদার অস্তিত্বের সপক্ষে একটি শক্তিশালী প্রমাণ। প্রখ্যাত সংশয়বাদী হিউমও জগতের বুদ্ধির সক্রিয়তা ও উদ্দেশ্যমুখীনতা অবলোকন করেছেন। তিনি, "একটা উদ্দেশ্য, একটা অভিপ্রায়, একটা পরিকল্পনা সর্বদা সবচেয়ে উদাসীন, সবেচেয়ে নির্বোধ ভাবুককেও সচকিত করে এবং কোনো অসঙ্গত চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ কোনো ব্যক্তিই চিরকাল একে পরিহার করতে পারে না।[১]

জগতের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার মধ্যে যে শৃঙ্খলা, সংহিত ও নিয়মানুবর্তিতার নিদর্শন রয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উপায় উদ্দেশ্যের উপযোগিতা পরিস্ফুট তা থেকে চিন্তাশীল মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, এই বিশ্ব-পরিকল্পনার পশ্চাতে এক পরম বুদ্ধি বা পরম ধীশক্তি রয়েছে। তিনি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর পরিচালনা ও পরিকল্পনার অধীনে এই সুবিশাল ধরিত্রী সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছে। এই পরম ধীশক্তি হলেন খোদা। এই সম্পর্কে হোয়াইটলে বলেন, "আমরা জীবন্ত জিনিসের গঠন পরীক্ষা করলে দেখতে পাই যে, তার প্রত্যেক অংশই বেঁচে থাকার কাজে নিয়োজিত। চক্ষু দর্শন করে, দাঁত চর্বণ করে, মূত্রগ্রন্থি পরিশ্রুত করে, মস্তিষ্ক চিন্তা করে। "পাখির ডানা, স্তন্যপায়ী জন্তুর পা, মাছের ডানা এমনভাবে গঠিত যে উড্ডয়ন, পলায়ন ও সন্তরণের জন্য সর্বতোভাবে উপযোগী"।[১] প্রকৃতিতে নির্বাচন উপযোজন ও শ্রেনীবিন্যাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে কোনো ব্যক্তিই জগৎলীলাকে অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে মেনে নিতে পারে না। এই সম্পর্কে সেন্ট একুইনাস বলেন, "সুতরাং নিশ্চয়ই একজন বুদ্ধিমান সত্তা আছেন, যিনি সকল প্রাকৃতিক বস্তুকে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে চালিত করেন। তাঁকে আমরা খোদা বলি।"[২]

বহু ভাববাদী দার্শনিক এই মতের সমর্থক। প্রাচীনকালে গ্রিক দার্শনিকরা উদ্দেশ্যবাদ সমর্থন করেছিলেন। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের নাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁরা জগতের পরিণতিমূলক মতবাদকেই সমর্থন করেছিলেন, জগৎলীলার পশ্চাতে উদ্দেশ্যমুখীনতার সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন। আধুনিক দর্শনেও বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিকরা এই মতবাদের শক্ত সমর্থক। ফিকটে, হেগেল, ফেকনার, পলসন, ইকবাল, রাধাকৃষ্ণ প্রমুখ দার্শনিকের নাম এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

৮.৩ তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি (Ontological Argument) : এই যুক্তির মাধ্যমে খোদার

---

[১] A purpose, an intention, a design, strikes everywhere that most careless, the most stupid thinker; and no man can be so hardened in absound systes and at all times to reject it. – Hume : *Dialogues on Nature Religion.*

[১] If we examine the structure of a living thing, we find that, every part of it contributes to the business of keeping alive ...The eyes see, the teeth chew, the kidneys drain, the brain thinks. The bird's wing, the mammal's leg, the fish's fan, differ in just those ways which make the first adapted for flight, the second for running, and the third for swimming.
– Whiteley, *Introduction to Metaphysics*

[২] There must therefore be such an intelligent being who driects all natural things to their end, and Him we call God.
– St. Aquinas, Summa Theological

ধারণা থেকে খোদার অস্তিত্বকে প্রমাণ করা হয়। সেন্ট আনসেম (St. Anseim), দেকার্ত, হেগেল ও প্রিঙ্গল পেটিসন প্রমুখ দার্শনিক খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সেন্ট আনসেম এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার ধারণা থেকে খোদার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, খোদার ধারণা এক পূর্ণ সত্তার ধারণা। এই পূর্ণ সত্তা নিশ্চয়ই অস্তিত্বশীল হবে। অস্তিত্ববিহীন সত্তাকে পূর্ণ সত্তা বলা যায় না। সুতরাং স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদা নিশ্চয়ই অস্তিত্বশীল।

দেকার্তে আনসেমের যুক্তি স্বীকার করলেও তিনি অন্যভাবে যুক্তিটি পরিবেশন করেছেন। তাঁর মতে, আমাদের মনে এক অসীমের ধারণা রয়েছে। এর কারণ কি? কোনো সসীম সত্তা অসীমের ধারণার কারণ হতে পারে না। কেননা কার্য কারণের চেয়ে বৃহত্তর হতে পারে না, কিন্তু কারণ কার্যের চেয়ে বৃহত্তর হতে পারে। সকল সসীম সত্তা মিলেও অসীমের ধারণা উৎপন্ন করতে পারে না। কারণ সসীমের সমষ্টি সসীম-অসীম নয়। কাজেই সসীম মন অসীমের ধারণার উৎস নয়। অসীমের জন্যই অসীম সত্তার অস্তিত্ব অপরিহার্য। এই অসীম সত্তাই খোদা।

হেগেল তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটিকে অন্যভাবে অবতারণা করেছেন। চিন্তা ও সত্তা এক ও অভিন্ন। হেগেল খোদার ধারণা থেকে খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন নি। একটি ধারণা অনিবার্যভাবে তার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদান করে না। তিনি বলেন যে, আমাদের চিন্ত াধারা এমন একটি পর্যায় আছে যেখানে চিন্তা ও সত্তা এক ও অভিন্ন। আমাদের চিন্ত াধারা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌছে যেখানে সব বিভেদ, সব ব্যবধান, সব অসঙ্গতি সমন্বিত হয় বিশ্বচৈতন্যের ধারণায়। এই বিশ্বচৈতন্যই হলো খোদা।

প্রিঙ্গল পেটিসন (Pringle Pettison) তত্ত্ববিষয়ক যুক্তি অন্যভাবে পেশ করেছেন। তাঁর মতে, সীমাবদ্ধ জীবনে ধারণা বাস্তবকে অতিক্রম করে এবং সম্পূর্ণভাবে বাস্ত বায়িত হতে পারে না। তবে আদর্শ ও বাস্তব চিরকাল পরস্পর অপরিচিত থাকতে পারে না। খোদার মধ্যেই আমাদের সকল আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ ঘটে।

৮.৪ নৈতিক যুক্তি (Moral Argument) : নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য খোদার অস্তিত্বের স্বীকৃতি অপরিহার্য। এই শ্রেণীর যুক্তির সরল রূপ হলো এই যে, সৎ ব্যক্তি এই জগতে যথাযথভাবে পুরস্কৃত হয় না কিংবা অসৎ ব্যক্তিও পরিপূর্ণভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হয় না। কাজেই মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে খোদা পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করবেন, অপরাধীকে শাস্তি দিবেন। তিনি নৈতিক শাসনকর্তা খোদাকে না স্বীকার করলে নৈতিক চেতনার কোনো অর্থ হয় না।

কান্টের মতে, খোদার অস্তিত্ব নীতিবোধের স্বীকার্য সত্য। ধর্ম বা সত্যতা সর্বোচ্চ কল্যাণ, শান্তির সাথে সত্যতার সঙ্গতিপূর্ণ কল্যাণ। আমাদের নৈতিক চেতনা অনুসারে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে পুণ্যবানকে সুখী হতে এবং পাপীকে শাস্তি পেতে প্রায়শই দেখা যায় না, বরং এর বিপরীত ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। আমাদের নীতিবোধ এই অবস্থা মেনে নিতে রাজি নয়, নীতিবোধ পুণ্যের সাথে শান্তি ও পাপের সাথে শাস্তির পূর্ণ সঙ্গতি স্বীকার করে। কাজেই পরমসত্তার অস্তি ত্ব অপরিহার্য; পরমসত্তা বা খোদা পরবর্তী জীবনে পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করবেন এবং পাপীকে শাস্তি প্রদান করে নৈতিক শাসন কায়েম করবেন।

মার্টিন্যু নৈতিক বাধ্যতাবোধ ও নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তিনি নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহের অবতারণা করেছেন।

প্রথমত, নৈতিক নিয়ম আমাদের পক্ষে অবশ্যপালনীয়। এই নিয়ম নৈর্ব্যক্তিক নয়। এই নিয়ম বিবেকের মাধ্যমে খোদার কাছ থেকে প্রাপ্ত– এটি আমাদের মধ্যে খোদার বাণী। প্রখ্যাত নীতিবিদ রাশডালও এই যুক্তি সমর্থন করেছেন। নৈতিক নিয়ম আমাদের সৃষ্টি নয়– এই নিয়ম সমাজ বা রাষ্ট্র আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় না। এই নিয়ম জড়জগতের ব্যাপার নয়। সুতরাং এটি খোদার আইন।

দ্বিতীয়ত, মার্টিন্যু নৈতিক বাধ্যতাবোধ থেকে খোদার অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি প্রদান করেছেন। খোদা ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা সসীম ও অসীমের সম্পর্ক। মানুষ নৈতিক বাধ্যতাবোধের অধীন, এই বাধ্যতাবোধের উৎস মানুষ নিজে নয়– উৎস খোদা। মানুষ নিজে বাধ্যতাবোধের উৎস হলে সে তা উড়িয়ে দিতে পারত, কিন্তু মানুষ তা পারে না। এটি ছাড়া সমাজ বা রাষ্ট্র এই বাধ্যতাবোধের উৎস নয়, কেননা সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বাধ্যতাবোধ দৈহিক, নৈতিক নয়। সুতরাং বাধ্যতাবোধের উৎস খোদা।

তৃতীয়ত, নৈতিক পুণ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চ-নিচ রয়েছে। সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন আর একজনের চেয়ে উচ্চ বা নিচ। সততায় যাঁরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন তাঁরা সততার শিক্ষানবিশদের আদর্শ। এইভাবে সততার দৃষ্টিকোণ থেকে সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারে এবং সৎব্যক্তি হিসেবে খোদাকে পাওয়া যাবে।

খোদার সততার চূড়ান্ত পরিণতি।

জেমস সেথ (James Seth) নৈতিক আদর্শ থেকে খোদার অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। তাঁর মতে, নৈতিক আদর্শ অসীম, মানুষ তার সীমিত শক্তিতে সম্পূর্ণভাবে এই আদর্শ বাস্তবায়িত করতে পারে না। খোদা নৈতিক আদর্শের পূর্ণ প্রকাশ। মানুষের কাছে যা আদর্শ খোদার কাছে তা বাস্তব মানুষের নৈতিক আদর্শের ধারণা খোদার নৈতিক পরিপূর্ণতার অসম্পূর্ণ প্রকাশ।

সিদ্ধান্ত : উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, খোদার অস্তিত্বের সপক্ষে যে প্রমাণগুলি রয়েছে সেগুলি সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির আদি কারণ অবৈজ্ঞানিক; উদ্দেশ্যবিষয়ক যুক্তিতে প্রাকৃতিক ও নৈতিক অনিষ্টের ব্যাখ্যা অনুপস্থিত; তত্ত্ববিষয়ক যুক্তির চিন্তা থেকে সত্তার উল্লম্ফন সমর্থনের অযোগ্য এবং নৈতিক যুক্তির সার্বজনীন ও নিশ্চয়াত্মক নৈতিক চেতনা সর্বৈব সমর্থিত নয়। সকল যুক্তির সপক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট বলবার অবকাশ রয়েছে, তবে যুক্তগুলি মূল্যহীন নয়। এই সম্পর্কে জন কেয়ার্ড বলেন, সাধারণ অর্থে খোদার সপক্ষে "প্রদত্ত প্রমাণগুলি প্রায়ই উত্থাপিত আপত্তিগুলির অধীন, কিন্তু ধর্মের প্রচ্ছন্ন যৌক্তিকতার বিশ্লেষণ হিসেবে মানবাত্মার খোদা সম্পর্কীয় জ্ঞানের ও তার সর্বোচ্চ প্রকৃতির বাস্তব রূপায়ণের স্তর হিসেবে এই প্রমাণগুলির মূল্য অনেক।"[১]

---

[১] Considered as proofs in the ordinary sense of the word, theory are open to the objections which have been frequently urged against them; but viewed

৮. অকল্যাণ

Evil

প্রাকৃতিক অনিষ্ট বা অমঙ্গল : খেয়ালী দৃষ্টিতে খাদার মখলুকাতের দিকে মনোনিবেশ করলে দেখা যায় যে, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ, ইষ্ট-অনিষ্ট বিশ্বচরাচরে হাত ধরাধরি করে চলছে। চিন্তাশীল মনের কাছে এই জগৎ সত্যই বিচিত্র। খোদা সর্বশক্তিমান। সর্বজ্ঞাতা, পরম করুণাময় ও ন্যায়বিচারক। তিনি বিশ্বের নৈতিক শাসক ও নিয়ন্তা। তিনি পরম করুণাময় ও সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের নিয়ামক। খোদার সম্পর্কে মানুষের এমন ধারণার সঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন দুর্নিবার হয়ে দেখা দেয়। অমঙ্গল কোথা থেকে আসে? জগতের দিকে তাকালে অনেকগুলি নৈসর্গিক দুর্দৈব আমাদের নজরে পড়ে। যেমন– ভূমিকম্প, প্লাবন, ঝটিকা, ঘূর্ণিবার্তা, মহামারী ইত্যাদি। মানবসমাজেও অনিষ্টের প্রবল জোয়ার প্রবাহিত থেকে দেখা যায়। যেমন– অনাচার, জুলুম, ব্যভিচার, শোষণ ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীবনে এমন হাজার অকল্যাণ যুগ যুগ ধরে মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে।

অকল্যাণ বা অমঙ্গল দ্বিবিধ–প্রাকৃতিক অকল্যাণ (Natural Evil) ও নৈতিক অকল্যাণ (Moral Evil) : প্রাকৃতিক নিয়মে যে সমস্ত অকল্যাণ মানুষ ও অন্যান্য জীবের ওপর নিপতিত হয় ও সেগুলি বিভিন্ন ক্লেশ ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির ভিতর টেনে নিয়ে যায়, এইগুলি প্রাকৃতিক অকল্যাণ। ঝটিকা, প্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, ঘূর্ণিবার্তা– এই সকল প্রাকৃতিক অকল্যাণের ব্যাখ্যা প্রদান সত্যই সুকঠিন। মানুষ ও অন্যান্য জীব এই সকল অস্বীকার করতে পারে না। এই সকলের মধ্যে দিয়েই মানুষের পথচলা। এইগুলিকে খোদার মঙ্গল হস্তের দান কিংবা মানুষের অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া বলে বাস্তববাদী দার্শনিকের পক্ষে ব্যাখ্যা সুকঠিন। নৈতিক অকল্যাণ মানুষের অর্জিত। এইগুলি মানুষের ঐচ্ছিক নিয়ম লঙ্ঘনের পরিণতি। মানব-মনের প্রলয়ংকরী প্রবৃত্তির উদ্দাম গতিবেগ থেকে উদ্ভূত হয় এই ধরনের অকল্যাণ বা অনিষ্ট। রাজনৈতিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক, ব্যক্তিগত বিভিন্ন ধরনের দুঃখ-দুর্দশা নৈতিক নিয়মভঙ্গ থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে। এই সেদিনের ভিয়েতনামের সকরুণ নরহত্যা, লেবানন ইসরাইল সীমান্তে মহামূল্য মানবজীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, পোল্যান্ডের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত গণজীবনের অনিশ্চয়তার বেদনা, আমেরিকার রাজনৈতিক গগনের প্রতিশ্রুতিশীল রাজনীতিবিদ বা মানবহিতৈষীদের জীবন দীপের অকাল নির্বাপণ, সামাজিক জীবনের ও ব্যক্তিগত জীবনের হাজার দুঃখের মূলে খোঁজ করলে নৈতিক নিয়মের পদদলন বা অবমাননাকে আমরা দেখতে পাই। এই ধরনের নিত্য অনুষ্ঠিত বহু ব্যাপার মানুষের স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি। মানুষ দায়ী। মানুষ ন্যায়-নীতি, মানব-প্রীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে এই সকল নৈতিক দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

এবার আমরা প্রাকৃতিক ও নৈতিক অনিষ্ট বা অকল্যাণ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করব।

---

as an analysis of the unconscious or implicit logic of religion as tracing the steps of the process by which the human spirit rises to the knowledge of God, and finds there in the fulfilments of its won highest nature these proofs possess great value.– Johan Carid, Philosophy of Religion.

(১) দ্বৈত খোদাবাদ (Dualistic Theism)
এই মতবাদ অনুযায়ী প্রাকৃতিক ও নৈতিক অনষ্টি বা অকল্যাণের মূলে খোদা নন। বিশ্বজগতের মূলীভূত কারণ পরস্পরবিরোধী দুটি সত্তা– একটি মঙ্গলের অপরটি অমঙ্গলের– একটিকে বলা যায় কল্যাণময় স্রষ্টা, অন্যটি অকল্যাণের সংগঠক– একটি হলো খোদা এবং অন্যটি হলো জড়। স্রষ্টা বা খোদা যখন তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বিশ্বচরাচরকে রূপ দিতে চান, তখন জড়শক্তি বা অন্ধশক্তি তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করে, স্রষ্টাকে এই বাধার সাথে মোকাবেলা করতে হয়। কাজেই তিনি তাঁর ইচ্ছামত সুন্দর করতে পারেন না। সৃষ্টির মধ্যে খুঁত থেকে যায়– অমঙ্গলের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ক্ষণে ক্ষণে। সুতরাং জড়ই সকল অকল্যাণ বা অনিষ্টের মূল। এই মতবাদ অন্যায়ের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এই মতবাদ খোদার শক্তিকে সীমিত করে এবং অকল্যাণকর বা অশুভ শক্তিকে খোদা বা পরমসত্তার সাথে চিরন্তন বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা পায়।

(২) অন্তিবর্তী খোদাবাদ (Deism)
এই মতবাদ অনুযায়ী খোদা এক বিশেষ ক্ষণে এই জগৎ সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্টি শেষে জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান। জগৎ সৃষ্টি করে স্রষ্টা বা খোদা জগৎকে কতগুলি সৃষ্ট নিয়মের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এখন জগৎ খোদার সৃষ্ট নিয়মের অধীনেই পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই জগতের অকল্যাণ বা অমঙ্গলের সঙ্গে খোদার সৃষ্ট নিয়মাবলির কোনো সম্পর্ক নেই। জগতে অনিষ্টের অস্তিত্বের জন্য খোদা দায়ী নন, তবে জগতের মধ্যে সৃষ্ট অমঙ্গল কোথা থেকে আসে? এই অমঙ্গলের মূলীভূত কারণ হলো জগতের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ শক্তি। জগতের মধ্যে যে স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ প্রবৃত্তি রয়েছে তা থেকে অমঙ্গল উৎসারিত হয়ে থাকে। অমঙ্গল বা অকল্যাণে যখন বিশ্বজগৎ নিমজ্জমান হয়ে পড়ে তখন পাপীর শাস্তি বিধানের মাধ্যমে স্রষ্ট জগৎকে পরিশোধিত করেন, পরিশ্রুত করেন। এই মতবাদও কল্যাণ বা অনিষ্ট সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। কেননা এই ধরনের মতবাদ মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক চেনতাকে তৃপ্ত করতে পারে না।

(৩) সর্বখোদাবাদ (Pantheism)
এই মতবাদ অনুযায়ী, একমাত্র পরমসত্তা অস্তিত্বশীল– আর সব মিথ্যা। এক সত্য আর সবই অলীক। একমাত্র আধ্যাত্মিক সত্তা খোদা আছেন আর কিছুই নেই। খোদাই সব কিছু, আর সব কিছুই খোদা (Everything is God and God is everything)। দার্শনিক স্পিনোজা বলেন যে, ভালো-মন্দ, ইষ্ট-অনিষ্টের কোনো অস্তিবাচক নেই। তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে এমন জিনিস আছে যা ভালো-মন্দ কিংবা ভালো নয় মন্দও নয় এই মতবাদ গ্রহণ করা অসম্ভব। কেননা জীবন ও জগতের দিকে খোলা চোখ দিয়ে তাকালে হাজার হাজার অকল্যাণ দেখতে পাওয়া যায়, এইগুলিকে অস্তিত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এ ছাড়া, এই মতবাদ গ্রহণ করলে এই মতের আনুষঙ্গিক পরিণতি ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ এবং চেতনাকে অস্বীকার করতে হয়। এই মতবাদ ধর্ম, নীতি সব কিছুর মূলেই কুঠারাঘাত করে।

(৪) খোদাবাদ (Theism)
এই মতবাদ অনুসারে জগৎ সসীম এবং জগতের প্রত্যেকটি বস্তুই সীমিত। সসীমতার অর্থ সীমাবদ্ধতা; সীমাবদ্ধতার অর্থ অসম্পূর্ণতা; অসম্পূর্ণতার অর্থই অনিষ্ট বা

অকল্যাণ। কাজেই সসীমতাই হলো অনিষ্টের মূল কারণ বা অনিষ্ট হলো সসীমতারই অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু অনিষ্ট বা অকল্যাণ মানুষকে নিম্নস্তরে টেনে নামায় না– এটা মানুষকে নৈতিক শিক্ষার অবকাশ দিয়ে থাকে। দার্শনিক লিবনিজ বলেন যে, এই জগৎ সম্ভাব্য সুন্দরতম জগৎ হলেও এর সব কিছুই অকল্যাণকর নয়।

(৫) সর্বধরখোদাবাদ (Panentheism)

এই মতবাদ অনুসারে অকল্যাণ বা অনিষ্ট হলো কল্যাণের এক অপরিহার্য স্তর। জগতের কোনো কিছুই সম্পূর্ণভাবে অকল্যাণকর নয়। ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাছে যা অকল্যাণকর মনে হয় তা কল্যাণের বিকাশেরই এক অনিবার্য স্তর– এক অপরিহার্য উপায়। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নজর করলে প্রত্যেক জিনিসই কল্যাণকর বলে প্রতীয়মান হয়, প্রত্যেক জিনিসই তার নিজের পরিবেশে সর্বাপেক্ষা সুন্দর সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। "যা বাস্তব তাই বৌদ্ধিক, যা বৌদ্ধিক তাই বাস্তব"।[১] উপলব্ধির অসম্পূর্ণতাই আমাদের অনিষ্টের ধারণা প্রদান করে। দার্শনিক হেগেল সর্বধরখোদাবাদ (Panentheism)-এর সমর্থক ও প্রচারক।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সর্বধরখোদাবাদ মতবাদটি সন্তোষজনক। মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জগতের সব কিছুই সৃষ্ট হয়েছে। সব দৃষ্ট বস্তুরই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

---

[১] What is real is rational, what is rational is real. – Hegel

অষ্টম অধ্যায়

মঙ্গল ও অমঙ্গল

GOOD AND EVIL

All are but parts of stupendous whole
Whose body Nature is, and God the soul

– **Alexander Pope**

- ❑ আভাস
- ❑ অমঙ্গল সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদ
- ❑ মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

১. আভাস

Introduction

বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগের ওপরই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভরশীল। মানুষ বস্তু ও ঘটনার বিশ্লেষণে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে। মানুষ এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো বস্তু বা কোনো ঘটনা তার জন্য কল্যাণকর কি কল্যাণকর নয় তা নির্ধারণ করে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে টিকে থাকতে হয়। এই সংগ্রামের ফল সর্বদা তার অনুকূলে আসে না, কোনো কোনো সময় তার প্রতিকূলেও যায়। ঝড়ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণী, জলোচ্ছ্বাস, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদি মানুষের জীবনের অমঙ্গল বা অকল্যাণ নিয়ে আসে, এ সবের সঙ্গে মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়। এগুলি প্রাকৃতিক অমঙ্গল প্রকৃতির কর্মপন্থা বেয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। এছাড়া, আমাদের কৃতকর্ম বা কার্যকলাপও আমাদের অমঙ্গল সৃষ্টি করে। উদাহারণস্বরূপ যুদ্ধ মানবজীবনে সমূহ অমঙ্গলের জন্ম দেয়। এটি মানবসভ্যতাবিরোধী অমানবিক তৎপরতা। যুদ্ধের ফলে মানুষের জীবনে চরম অশান্তি নেমে আসে। মানুষের ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবনে যুদ্ধ অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। এটি মানব সৃষ্টির অমঙ্গল।

মানুষের অগ্রযাত্রার দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানুষের জীবন নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং তার চিন্তায় মঙ্গল ও অমঙ্গলের ধারণাও পরিবর্তিত হচ্ছে। সভ্যতার অগ্রগতি মানবজীবন থেকে জটিলতর হচ্ছে। নতুন নতুন মঙ্গল ও অমঙ্গলও সেই সঙ্গে সংযোজিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে সামাজিক অবনতি, মূল্যবোধের অভাব, অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক দুর্নীতি, ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক জীবনে নিরাপত্তার অভাব উত্তরোত্তর ভয়-ভয়াল থাবা বিস্তার করছে। মানুষের লোভ-লালসা, অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাস, ভীতি, বিচ্ছিন্নতা, সত্যপ্রীতির প্রতি অবহেলা অ-প্রাকৃতিক অমঙ্গলের মূলীভূত কারণ বলে মনে হয়।

মানুষের বাস্তবে জীবন ভালোমন্দ-অমঙ্গলের সংমিশ্রণ। ভালোমন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল, উভয়ই পারস্পরিক তারতম্যের মাধ্যমে সুস্পষ্ট– একের অনুপস্থিতিতে অন্যকে বুঝা যায় না। অন্ধকার ছাড়া আলোককে যখন অনুধাবন করা যায় না, তেমনি অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলকেও অনুধাবন করা যায় না। তাই বলা যায়, উভয়ের উপস্থিতি অনিবার্য।

অমঙ্গল এক ধরনের অসামঞ্জস্যতা। এটি প্রাকৃতিক, সামাজিক বা নৈতিক হতে পারে। যে কোনো ধরনের অমঙ্গল এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে আসে। এটি আসলে অসামঞ্জস্যতা। মানুষ নীতিবোধসম্পন্ন জীবন। তাকে উন্নয়নকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। তার লক্ষ্য উচ্চ মূল্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাই তার চলার পথে অমঙ্গল ক্লান্তিকর নয়। জীবনের অন্যান্য উপাদানের মতোই স্বাভাবিক। প্রয়োজন শুধু সঙ্গতি বিধান করে অগ্রসর হওয়া ও বিবর্তনের পথে চলা।

২. অমঙ্গল সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদ

Ancient view regarding Evil

আধুনিক যুগে অমঙ্গল বিষয়ক মতবাদ ঐশী পরিণামদর্শিতার সঙ্গে যুক্ত। অতীতে ধর্মতত্ত্ববিদরা যাবতীয় জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে সৃষ্টিকর্তার ওপর আরোপিত বিধানসমূহকে খণ্ডন করে অমঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করার জন্য সচেষ্ট হতেন। প্রাচীন যুগের বিচার-বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। এ মতানুসারে পৃথিবীর সৃষ্টি ও পরিচালনা করেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমান। কেউ কেউ এই অভিযোগ তোলেন যে, সৃষ্টিকর্তা যদি মঙ্গলময় ও সর্বশক্তিমানই হন তাহলে তাঁর সৃষ্টিতে অমঙ্গল কেন? মানুষের জীবনে দুঃখ-দুর্দশা কেন? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা বিশেষ নিয়মে তাঁর সৃষ্টি পত্তন করেছেন এবং বিশেষ নিয়মের উপর জগৎ পরিচালনা করছেন। যেসব ঘটনা প্রকৃতিতে সংঘটিত হচ্ছে তা নিয়মানুসারেই ঘটছে। ভূমিকম্প, ঝড়ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই সংঘটিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়মই এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। কিছু কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে মানুষ কর্তৃক, প্রকৃতিকে কিছুটা বিপর্যস্ত করছে। প্রকৃতির ওপর বোমা, বিস্ফোরণ, যন্ত্রের বা কলকারখানার বর্জ্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের ক্রিয়াকলাপ প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। এ সকলকে সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলময়তার ব্যতিক্রম বলে মনে করা কি যুক্তিযুক্ত? এছাড়া মানবজগতে বা মানব পরিমণ্ডলে নীতিবিগর্হিত কাজের দরুন সমাজ জীবনে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে যেসব দুর্যোগ নেমে এসেছে তা তো মানুষের স্বোপার্জিত নৈতিক ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনজনিত ও রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করার কুফল, এর সঙ্গে তো সৃষ্টিকর্তার মঙ্গলময়তার অভাবে কোনো সম্পর্ক দেখি না। কেউ কেউ আবার বলতে চান যে সৃষ্টিকর্তাই অমঙ্গলের জন্মদাতা, অন্ততপক্ষে অমঙ্গল প্রতিহত করার ক্ষমতা তার সীমিত। এর উত্তরে বলা যায় যে, এই ধরনের ধারণা উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত। প্রাকৃতিক অমঙ্গল ছাড়া মানব পরিমণ্ডলে অমঙ্গল যে মনুষ্যসৃষ্ট, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সবই কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এমনকি প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলি কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কাজেই সৃষ্টিতে অমঙ্গল থাকবে না, থাকলে স্রষ্টার মঙ্গলময়তা বা অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে, কিংবা তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে, এটা তো যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। মানুষ দায়িত্বহীন হয়ে অপকর্ম করবে তার ফল তাকে

ভোগ করতে হবে না, এমন কথা তো চিন্তা করা যায় না। মানুষের জীবন তো আগাগোড়া সংগ্রামময়, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত হয়ে তো তার দিন চলে না। নিয়মলঙ্ঘনজনিত ফল তাকে ভোগ করতেই হয়। এছাড়া জীবনের বিভিন্ন চত্বরে মানবসৃষ্ট যে সমুদয় বৈষম্য রয়েছে তাও মানুষের জন্য কম গ্লানি বহন করে আনে নি। সে সকলের দায়ভারও তো আমাদের বহন করতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষকে কম পোহাতে হচ্ছে না। সুতরাং মানব পরিমণ্ডলকে সর্বদূষণ ও সব অপকর্ম থেকে মুক্ত রাখতে পারলেই সে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা যায়, সে দিকেই মানবতাবাদী চিন্তাবিদের লক্ষ্য। যে কারণে মানববাদী দার্শনিকরা মানুষকে সমুদয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু বলে অভিহিত করেন এবং স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন।

বিষয়টি অন্যদিক থেকেও বিচার করা যায়। যেমন, জগৎ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে এবং ক্রমশ মূল্যের প্রকাশ ঘটিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের জীবনের গতি পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, মানুষের জীবন বিকশিত হয়ে ওঠার জীবন– সাধনার জীবন– সে নিয়ত জীবনের বিকাশ সাধন করে চলেছে– পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

জার্মান দার্শনিক লিবনিজের মতে, এই জগৎ সম্ভাব্য সমুদয় জগতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। জগৎ সৃষ্টিকর্তার স্বর্গীয় ইচ্ছার পূর্ণতা। কাজেই পৃথিবীর সঙ্গে অমঙ্গলের কোনো যোগাযোগ নেই। তার পূর্ণতার ইচ্ছা ছাড়া জগৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ধারাবাহিকভাবে গড়ে উঠতে পারত না। ভালো ও মন্দ, মঙ্গল ও অমঙ্গল পাশাপাশি অবস্থান করায় তিনি এ জগৎকে সর্বোৎকৃষ্ট জগৎ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দার্শনিক হেগেলও প্রায় অনুরূপ মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। হেগেলের মতে, জগৎটা বুদ্ধিসম্পন্ন ও অমঙ্গল বিবেকবর্জিত, সুতরাং অমঙ্গল বাহ্য, বাস্তব নয়। বাহ্য অমঙ্গল পূর্ণতায় অপেক্ষমাণ। কাজেই জাগতিক অমঙ্গল আপেক্ষিক, ভবিষ্যতে তা মঙ্গল রূপে প্রতিভাত হবে। দার্শনিক লোটজে হেগেলের সঙ্গে একমত নন। তিনি মনে করেন যে, জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই বর্তমান। তাঁর মতে, মানবমনের সংগঠন এমন যে, সৃষ্টিকর্তার কল্পনায় সৃষ্ট নিয়মাবলি মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়। কাজেই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। সৃষ্টিকর্তার স্বর্গীয় বুদ্ধিমত্তা, মঙ্গলকামিতা ও শক্তিকে ক্ষতিকারক বলে বিবেচনা করাকে তিনি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। বরং একে সৃষ্টিকর্তার সৃজনশীল কল্পনার খেলার শক্তি বলে গ্রহণ করাকে তিনি শ্রেয় মনে করেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, জগতের যাবতীয় ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গলের দায়দায়িত্ব একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ওপর বর্তায় না। দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের কেউ কেউ জগতে অমঙ্গল সংঘটিত হওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তাকে অভিযুক্ত করেছেন, কেউ কেউ তাঁকে ক্ষতিকারক বলে প্রতিপন্ন করেছেন। আবার কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত তার জগৎ পরিকল্পনাকে মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয় ও দুরধিগম্য বলে বিবেচনা করেছেন। এ বিষয়ে ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যেও যথেষ্ট বাকবিতণ্ডা সংঘটিত হয়েছে, মতানৈক্য হয়েছে। এই সকলের মধ্য দিয়ে আবার সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধানের ইঙ্গিতও মিলেছে।

বর্তমানে সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে বরং জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যুষিত মানুষকেই এই সমস্যার কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে। কিছু কিছু চিন্তাবিদ অভিমত পোষণ করেন, নিত্যনতুন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে বস্তু বা ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নতুন অমঙ্গলের সম্মুখীন হচ্ছেন, কিন্তু যে বিষয় তার

চেতনার অমঙ্গল বলে মনে হচ্ছে তা চূড়ান্তভাবে অমঙ্গল নয়। এক সময়ে যা মানুষের কাছে অকল্যাণকর বলে মনে হয়েছে পরবর্তীকালে তা কল্যাণকর হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছে। সুতরাং অমঙ্গলের বিচার-বিবেচনা পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে।

৩। মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্পর্কে আধুনিক ধারণা

Modern veiews reegarding Good and Evil

আধুনিক চিন্তাবিদরা এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে মঙ্গল ও অমঙ্গলের ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। এই চিন্তায় তিনটি দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। যথা- (১) দৈহিক বিবর্তন ও নৈতিক বিবর্তন (Bodily and Moral evolution), (২) দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা (Adveaturous life) এবং (৩) ব্যক্তি হিসেবে মানুষর সম্ভাবনা (possibilities of Man as an individual)। এবার এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

(১) দৈহিক বিবর্তন ও নৈতিক বিবর্তন (Bodily and Moral Evolution)

উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের বিশ্লেষণ মানুষের অভিজ্ঞতায় নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। জীবজন্তু, উদ্ভিদসহ এ জগৎ যে একদিনে আকস্মিকভাবে সৃষ্ট হয় নি, বরং ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে– এই সত্যই বিবর্তনবাদের ফলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

বিবর্তনবাদীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মানুষের মনে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করলেও মানুষ বিবর্তনবাদের মূল সত্যটিকে গ্রহণ করেছে। প্রকৃতি নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন। প্রকৃতিতে বস্তুজগৎ ও প্রাণিজগৎ নিম্নস্তর থেকে ক্রমিক গতিতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে, জটিল থেকে জটিলতর স্তরে পর্যবসিত হয়েছে। এই নিয়ম অনুসরণ করেই জড়বস্তু থেকে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধিত হয়েছে, অন্তত যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীরা এই অভিমত পোষণ করেন। বিবর্তনবাদীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এইটুকু অন্তত সুস্পষ্ট যে, প্রাকৃতিক জগতের আকার, আকৃতি, গঠন ইত্যাদি সুদীর্ঘকালের বিবর্তনের ফলে বর্তমান উন্নততর রূপপ্রাপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতে অধিকতর উন্নতরূপে জগৎ আমাদের কাছে আবির্ভূত হতে পারে। এ থেকে এ কথাও স্পষ্ট যে প্রাকৃতিক জগৎ ও নৈতিক জগৎ একসঙ্গে সম্পর্কিত নয়। প্রাকৃতিক জগতের নিজস্ব নিয়ম আছে; প্রকৃতি সেই নিয়মানুসারেই কাজ করে যায়। ঝড়ঝটিকা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের কাছে এমনি অমঙ্গলজনক বলে মনে হয় যখন সে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি অনুধাবন করতে 'অসমর্থ হয়। প্রাকৃতিক নিয়মাবলি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অসামর্থ্যই অমঙ্গল বলে বিবেচিত হয়।

নৈতিক অমঙ্গলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। কোনো ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক সংগঠনের ইচ্ছা অপরের একই স্তরের নৈতিক বিবর্তনের মানসিক ইচ্ছার পার্থক্যের জন্য নৈতিক অমঙ্গল অনুভূত হয়। তাই সৃষ্টিকর্তাকে নৈতিক অমঙ্গলের দৃশ্যপটে টানাহেঁচড়া করে হাজির করার কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক দার্শনিক মনে করেন যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষের নৈতিক অমঙ্গলের জন্য দায়ী নয়। কারণ বিবর্তনের নিয়মে একটি স্বতন্ত্র ইচ্ছার অসামঞ্জস্যতার সঙ্গে অপর একটি স্বতন্ত্র ইচ্ছার অসামঞ্জস্যতার কারণে নৈতিক অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। সামাজিক অমঙ্গল আসে ব্যক্তি ও সমাজের অসমাঞ্জস্যতার কারণে।

আধুনিক যুগের মানুষ জীবনের সার্থকতার অন্বেষার সংগ্রামকে বেছে নিয়েছে। জীবনকে বাজি করে আপাত অসম্ভব প্রচেষ্টাতেও ঝাঁপিয়ে পড়ছে। প্রকৃত সুখ নিরলস কর্মে, অলসতা কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার মধ্যে নয়। এই সংগ্রামী চেতনাই আজ মানুষকে ঘর-ছাড়া করেছে। "থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে। কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরে ঘূর্ণীপাকে।" আধুনিক যুগের মানুষ মরণকে তুচ্ছ করে জ্বরামৃত্যুর ভ্রূকুটি করে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার শক্তি অর্জন করেছে।

বিজ্ঞানীরা সকল ব্যাধি ও বিপদকে অগ্রাহ্য করে বিপজ্জনক পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা চালান, এই আশায় যে, এই কাজের মাধ্যমে নতুন সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যেখানে সত্যের আলোক প্রতিভাত হবে। মানুষ আবিষ্কারের নেশায় তুহীন মেরু পার হয়ে অজানা অচেনা জগতে পাড়ি জমাচ্ছে, যেখান থেকে সে আর কোনোদিন আত্মীয়-স্বজনের কাছ ফিরে আসতে পারবে না। সৃষ্টির নেশায় মানুষ দুস্তর মরুতে, নিঃসীম নীলিমায় ও অতল সমুদ্র গর্ভে অভিযান পরিচালনা করছে। এসব অসমসাহসিক দুর্জয়চিত্ত মানুষের গান গাহিয়াছে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম :

"গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান!
সেদিন নিশীত বেলা
দুস্তর পারবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালে ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি,
আখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীতে জাগি
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে,
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে
নব জগতের শরসন্ধানী অসীমের পথ-চারী।
যার ভয়ে জাগে সদাসতর্ক মৃত্যু দুয়ারে দ্বারী!
সাগর গর্ভে নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে
জীবনোদ্বেগে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি আনে যারা খুঁড়ি পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা থেকে মণি চুরি!
হানিয়া বজ্র পানির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি'
যাহরা চপলা মেঘ কন্যারে করেছে কিঙ্করী।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাদের গান গাহি।"
(আমি গাহি তারি গান, সন্ধ্যা)

তিনি তাঁর 'জীবন-বন্দনা' কবিতাতে এই অসমসাহসী, অকুতোভয় দুঃসাহসিক বীরদের কথা উচ্চারণ করেছেন :

নবীন-আবেগ রুধিতে না পারি' যারা উদ্ধত শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর।

নবী জগৎ সন্ধানে যারা ছোটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চলেছে যাহারা উর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে
চলেছে চন্দ্র-মঙ্গল গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে।
আমি মরু-কবি– গাহি সেই বেদে বেদূঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
(জীবন-বন্দনা, সন্ধ্যা)

কাজেই বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মচাঞ্চল্য, সাহসিকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন অমঙ্গলের প্রাচীন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মানুষ মনে করে যে, দুঃখ-কষ্ট আর অমঙ্গল নয়, বৃহত্তর, মহত্তর জীবন লাভের জন্য এসব অপরিহার্য। কাজেই দুঃখ-দুর্দশাকে হজম করে মানুষ ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হয়ে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

(২) দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা (Adventurous life)

এখন মানুষ আগের চেয়ে অনেক সাহসী, অনেক দুরন্ত, অনেক সংগ্রামী। ফলে আগেকার জীবনোপলব্ধির তুলনায় আজকার জীবনোপলব্ধি অনেক, অনেক তফাৎ। এই কথার অর্থ এই নয় যে, মানুষ তার সমগ্র বিরোধী পরিবেশকে আয়ত্তে আনতে সমর্থ হয়েছে। তবে এই ব্যাপারে সে যে অনেকটা সার্থকতা অর্জন করেছে, এতে সন্দেহের কোনো লেশ নেই। অনেক কিছুই মানুষের হাতের মুঠোর মধ্যে পৌঁছে গেছে। পৃথিবীটা অনেক ছোট পরিসরের মধ্যে এসেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফসল ভালো ও মন্দ, দুই রকমেরই হয়েছে।

উন্নত দেশসমূহের আণবিক শক্তি বিশ্বে একচেটিয়া সুফল বেয়ে আনে নি। আধুনিক মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ভয়ানক নিরাপত্তার অভাব সূচিত করেছে। দ্রুত যানবাহনের সুযোগ-সুবিধা দুর্ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলছে। নাগরিক জীবনের পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিষাক্ত আবহাওয়া ও অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম হয়েছে। এর সঙ্গে জগদ্ব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক মন্দা এসেছে, ফলে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হয়েছে। কাজেই বর্তমানে সবকিছু মিলে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে অকল্যাণ যে নির্বাসিত হয়ে গেছে, একথা বলবার অধিকার আমাদের নেই।

মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচার এই একবিংশ শতাব্দীতে বন্ধ হয় নি। ভিয়েতনামে নৃশংস মাইলাই হত্যা, কম্বোডিয়ার ধ্বংসলীলা, মধ্যপ্রাচ্যের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনী নিধন, আফগানিস্তানের ওপর আমেরিকার নির্যাতন, বাংলাদেশে পাকহানাদারদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ, ইরাকে মার্কিন হামলা– এই সকলই জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্বের পাকাপোক্ত দলিল। কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অমঙ্গলের সমস্যা অতীব বাস্তব ও ভয়ানক জটিল।

অবশ্য হেগেল ও স্পিনোজা অমঙ্গলের ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্যভাবে। হেগেলের মতে, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় তাই অমঙ্গল। কিন্তু যা বুদ্ধিসম্পন্ন তা বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়ার পথে।

এখন যা অমঙ্গল পরে তা মঙ্গলে পর্যবসিত হবে। স্পিনোজা মনে করেন যে, আমরা যখন আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বস্তু বা ঘটনাকে অবলোকন করি তখন তা অমঙ্গল হিসেবে দেখা দেয়। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে তা আর অমঙ্গল থাকে না, তা মঙ্গল হিসেবে প্রতীয়মান হয়। হেগেল ও স্পিনোজা উভয়েই অমঙ্গলকে অবাস্তব ও বিভ্রান্তিকর বলে প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতায় অমঙ্গলের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভূত হয়। সুতরাং অমঙ্গল ও মঙ্গল উভয়েরই অস্তিত্ব জগতে বাস্তব সত্য। বিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক জীবনে উন্নয়নের জন্য অমঙ্গল ও মঙ্গল পাশাপাশি কাজ করে।

(৩) ব্যক্তি হিসেবে মানুষের সম্ভাবনা (Possibilities of Man as an individual)

জগতে অমঙ্গল ও মঙ্গলের অস্তিত্বের স্বীকৃতির কারণে জীবন সম্পর্কে দুই ধরনের মতবাদ গড়ে ওঠেছে– নৈরাশ্যবাদও আশাবাদ। কিছু কিছু দার্শনিক কবি, সাহিত্যিক জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করেছেন, আবার কিছু কিছু চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক জীবনজগত সম্পর্কে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছেন। জীবন ও জগতের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করায় মতামতের এই তারতম্য দেখা দিয়েছে। আসলে এই দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায়ই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এবার আমরা নৈরাশ্যবাদ এবং আশাবাদ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব।

নৈরাশ্যবাদ (Pessimism) : নৈরাশ্যবাদ অনুসারে জীবন অনিবার্যরূপে অমঙ্গলজনক। এই জগতে আনন্দের চেয়ে দুঃখ-বেদনাই অধিক, মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক। জগতে জীবনের সার্থকতা নেই, জগতে বাস্তবিক কোনো আনন্দ নেই। জগতে হতাশা, ব্যর্থতা ও অপূর্ণতার সুখ মূর্ত হয়ে ওঠে। এই মতের সমর্থক কবিদের মধ্যে রয়েছে হেসিয়ড, ওমর খৈয়াম, বায়রন, লিওপাডি, জেমস থমসন, আর দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন বুদ্ধ, সোফেন হাওয়ার, হার্টম্যান, স্পেনসার প্রমুখ।

উনিশ শতকীয় দার্শনিক সোপেন হওয়ার নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁকে নৈরাশ্যবাদের যুবরাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি তাঁর The world as will and Idea গ্রন্থে নৈরাশ্যবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই জগৎকে তিনি নিকৃষ্ট জগৎ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে ইচ্ছা প্রাধান্য বিস্তার করে। এই ইচ্ছার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অভাববোধ। এই অভাববোধ থেকে জন্ম নেয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু সমুদয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিমর্ষ করে তোলে এবং তাকে হতাশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। এমনিভাবে মানুষের জীবন অতৃপ্তি, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যে ভরে উঠে।

সোপেনহাওয়ারের এই অভিমতের ভিন্ন ব্যাখ্যাও সম্ভব। প্রকৃত জীবন কর্মমুখর। জীবনের সার্থকতা কর্মে, কর্মবিমুখতায় নয়। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, এ কথাই সবার জানা। অর্থনীতিতে আছে Want is unlimited but every particular want is limited. অভাব সীমাহীন হলেও গুরুত্ব অনুসারেই অভাব চরিতার্থ করা হয়। কাজেই কোনো অভাব পূরণ না হলেই যে মানুষ নৈরাশ্যের নিম্নপঙ্কে নিমজ্জিত হয়, এমন দেখা

যায় না। সভ্যতার ইতিহাস তারস্বরে ঘোষণা করছে যে, মানুষ ব্যর্থতাকে জয় করতে করতে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

সুতরাং জীবন নিছক জয়ের গৌরবগাথা নয়, আবার নিছক বিফলতার শোকগীতিও নয়। জীবন সংগ্রামময়। প্রতি পদক্ষেপে জীবন নব নব পথ রচনা করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের জীবনের সার্থকতা পথ চলার। প্রগতি বা সামনে চলাই মানবজীবনের বিশেষত্ব। এখানে নৈরাশ্য, হতাশা, বিষাদ, মোটেই কাম্য নয়। এসব জয় করাতেই মানুষের মহিমা।

এবার নৈরাশ্যবাদকে কিছুটা বিশ্লেষণ করা যাক। কেন নৈরাশ্য আসে? দৈহিক ও মানসিক উভয় কারণেই নৈরাশ্য, আসতে পারে। যকৃতের গোলযোগে যারা ভোগেন তারা স্বভাবত নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা, খিটখিটে মেজাজের অধিকারী হয়ে থাকেন। বর্তমানে এনডফরিন গ্লান্ডস-এর কার্যকারিতার ব্যর্থতাকে নৈরাশ্যের কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। ব্যাধিটি দীর্ঘস্থায়ী এবং চিকিৎসা কষ্টসাধ্য। বিষণ্ণতা নৈরাশ্যের পরিণত রূপ। এই স্নায়বিক ব্যাধিতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্যেও বিষণ্ণতা অনুভব করে। মানুষ দেহের মাধ্যমে বাহ্য পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। এই রোগী উত্তেজনাপ্রবণ হওয়ায় দৈহিক প্রতিক্রিয়ায় গোলযোগ উপস্থিত হলে তা অনিবার্যভাবে মানসিক অবস্থার ওপর নিপতিত হয়। পরিণতি স্বরূপ অনুভূতিতেও মারাত্মক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। নৈরাশ্য অবশ্যই জন্মগত নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশেরও বিভিন্ন ঘটনাবলি ব্যক্তি মানুষকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চরম নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে দেয়। কোনো ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাপিতপাত করছিল, পর পর পুত্রগুলির বিয়োগে তার সম্মুখের পৃথিবীর রঙিন আবরণ অপসৃত হয়ে এক শোকের কালো পর্দা সব দিক ঢেকে ফেলে। একজন ব্যবসায়ী খুব জাঁকালোভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। আর্থিক সচ্ছলতা, সঙ্গে মানসিক পরিতৃপ্তি। তার কাছে তখন পৃথিবী ছিল অপূর্ব সুন্দর। ব্যবসা হঠাৎ লাটে উঠল কিছু অনুধাবন করার পূর্বেই। সর্বশক্তি নিয়োগ করে ব্যবসায়ী চেষ্টা করল অবস্থার পরিবর্তন করতে, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। যেখানে হাত দেয় সেখানেই লোকসান হয়। অবস্থা তাকে একেবারে পথে টেনে নামাল। জীবনের সামনের সকল আলো তার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। এ ধরনের অবস্থায় ব্যক্তির পূর্ববর্তী জীবনজগৎ সম্পর্কীয় দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হয় এবং প্রতিকূল অবস্থার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

আশাবাদ (Optimism) : এই পৃথিবীর অনেক কিছু অনিশ্চিত। আশাই মানুষকে এই অনিশ্চিত পথে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আশাকে কুহকিনী, মায়াবী বললেও এই আশাই মানুষকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, নিয়ত কর্মে উদ্বুদ্ধ করছে। কবির ভাষায় :

> ধন্য আশা কুহকিনী, তোমার মায়ায়
> অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি;
> দাঁড়াইত স্থিরভাবে চলিত না হায়
> মায়া বলে তুমি চক্র না ঘোরাতে যদি। ....
> কি কথা কহিলা তুমি অভাগার পানে
> অভাগা চলিল পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

অভাগা জীবনের প্রতিকূল অবস্থার একটা কল্যাণকর প্রভাব আমাদের ওপরে পতিত হয়। বিশ্বকবি যথার্থই বলেছেন :

দুঃখ আছে, আঘাত আছে
তাইতো আমার বক্ষে পরাণ নাচে।

কাজেই আঘাত এলেই যে মুষড়ে পড়তে হবে, বিফলতা এলেই যে নৈরাশ্যের অন্ধকূপে নিপতিত হয়ে নিষ্কর্মার জীবনযাপন করতে হবে, এ ধরনের কোনো যৌক্তিকতায় অবস্থান গ্রহণ করা পৌরুষ নয়। প্রতিকূল অবস্থায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া নিখাদ হতে হবে। এইভাবে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে করতে আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন ঘটবে। আশাবাদীদের মতে, জীবনের প্রকৃত মূল্য ও মোহিনী ক্ষমতা রয়েছে। তারা মনে করেন যে, জাগতিক পদ্ধতি মঙ্গল দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। জীবনের আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে মানুষ যেসব কাজ করেছে তার মূলে প্রেরণা যুগিয়েছে আশাবাদ। যখনি মানুষ কোনো মহৎ কাজ করেছে তখনি তার বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে কোনো মহৎ প্রেরণা তার মূলে কাজ করেছে। আশাবাদ শুধু বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেই সীমিত নয়, তা অনাগত ভবিষ্যতের মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক ও সৃষ্টিধর্মী শিল্পীদের মনেও আশাবাদ তাদের অমরতার পথ প্রশস্ত করেছে।

দর্শন ও সাহিত্যে আশাবাদই সক্রিয়, নৈরাশ্যবাদ এখানে ব্যতিক্রম হিসেবেই এসেছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে হুইটম্যান, রুশো, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, আলেকজান্ডার পোপ প্রমুখের নাম আশাবাদী চিন্তার জন্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

নজরুল ইসলাম বলেছেন :

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি, খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নবসৃষ্টি শ্রম-মহান
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল।
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর কদম চল-রে চল। * অগ্রপথিক

দার্শনিকদের মধ্যে লিবনিজ, বার্কলি প্রমুখ আশাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। লিবনিজ এই জগৎকে সম্ভাব্য সকল সৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন। বৈপরীতের অস্তিত্বকে তিনি মেনে নিয়েছেন মঙ্গলের মহিমা ও তাৎপর্যের নিমিত্ত। বৈপরীত্যকে মেনে নিলে ভালোর পাশে মন্দের, সুখের পাশে দুঃখের, সচ্ছলতার পাশে অভাবের, শৃঙ্খলার পাশে বিশৃঙ্খলার এবং বহুর পাশে একের তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব হয়। এসবকে লিবনিজ পূর্ণতার আবশ্যিক গুণ বলে মনে করেন। জগতে পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরাজমান। উপযোগিতার নিয়মে সৃষ্টিকর্তার পছন্দ নির্ধারিত হয়ে থাকে। বার্কলিও অমঙ্গল সম্পর্কে একই ধরনের মতবাদ ব্যক্ত করেন, তাঁর মতে, যখন আমরা কোনো

নির্দিষ্ট দুঃখের ধারণাকে গ্রহণ করি, তখন তা আমাদের কাছে বেদনাদায়ক বলে মনে হয় কিন্তু বস্তু বা ধারণাকে সামগ্রিক নিয়মের সঙ্গে বিবেচনা করলে তা অমঙ্গল বলে মনে হয় না।

ব্যক্তির সম্ভাবনা অভিধায় আমরা নৈরাশ্যবাদ (Pessimism) ও আশাবাদ (Optimism) মতবাদ দুটি বেশ কিছু বিস্তারে বিচার-বিবেচনা করেছি এবং লক্ষ করেছি যে, উভয় মতবাদই একদেশদর্শী। এ প্রসঙ্গে আর একটি মতবাদ রয়েছে তা হলো উন্নয়নবাদ বা সম্ভাবনাবাদ। আমাদের জগৎ ও আমাদের জীবন সম্ভাবনাময়– এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। এই বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে এদের সার্থকতা বা সত্যমূল্য। জগৎ বা জীবন নৈরাশ্যপীড়িতও নয় আবার আশাবাদ তাড়িতও নয়। এটাকে গড়ে তুলতে হবে। এই গড়ে তোলার মধ্যেই এর আসল মূল্য। কাজেই একদেশদর্শী নৈরাশ্যবাদ ও একদেশদর্শী আশাবাদ, উভয়কে অতিক্রম করে জীবনজগতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগালে দেখা যায় যে জগৎ ও জীবন চলমান, নবসৃষ্টির প্রেরণায় সমৃদ্ধ। মানব সভ্যতার অগ্রগতি এই সম্ভাবনাকে রূপ নিতে দিতে এগিয়ে চলেছে।

পরিভাষা

A

Ability – সামর্থ্য
Abiogenesis – অজীবজানি
Abiagenesis theory – অজীবজানিবাদ
Abnormal – অস্বাভাবিক, বিকারগ্রস্ত
Abbreviation – সংক্ষেপণ
Absent – অনুপস্থিত, অন্যমনস্কতা
Absolute – পরম, পরমাত্মা
Absolution – পরামার্থবাদ, অনপেক্ষবাদ
Abstract – বিমূর্ত, অমূর্ত
Abstractness – অমূর্তকরণ, বিয়োজন
Abstract idea – বিমূর্তন ধারনা
Abstraction – বিমূর্তন
Abstract knowledge – বিমূর্তজ্ঞান
Academic – শিক্ষাগত, শিক্ষাসম্বন্ধীয়
Acceptable – গ্রহণযোগ্য, গ্রহণীয়
Accident – দুর্ঘটনা, আকস্মিক
Achievement – অর্জন
Acquaintance – পরিচয়, সংস্পর্শ, প্রত্যক্ষ
Acquired – অর্জিত, লব্ধ
Acquistition – অর্জন
Action – কার্য, ক্রিয়া
Active – সক্রিয়
Acitve role –সক্রিয় ভূমিকা
Actual – প্রকৃত, যথাযথ
Actuality – বাস্তবতায়, প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্ততা

Acute – তীব্র, তীক্ষ্ণ
Adapt – খাপ খাওয়ানো
Adaptable – পরিবর্তনযোগ্য
Adjustment – খাপ খাইয়ে নেওয়া
Adult – প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক
Advantage – সুবিধা, সুফল
Adventitious – বহিরাগত, অস্থানিক, আগন্তুক
Adventure – অভিযান
Aesthetic – সৌন্দর্য বিষয়ক, সৌন্দর্য বিজ্ঞান, নান্দনিক
Affairs – কার্য, ব্যাপার, ঘটনা
Affect – অনুভূতি, আক্রান্ত
Affection – স্নেহ, অনুরাগ
Age – বয়স, আয়ু, কাল
Agent – প্রতিনিধি
Agitation – উত্তেজনা
Agnostic - অজ্ঞেয়বাদী
Agnosticism – অজ্ঞেয়তাবাদ, অজ্ঞেয়বাদ
Agony – প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব
Agreement – ঐকমত্য, সামঞ্জস্য
Agricultural civilisation – কৃষিসভ্যতা
Aim – লক্ষ্য, উদ্দেশ্য
All knowing – সর্বজ্ঞ
Alternate – একান্তর, পালানুযায়ী
Alternative – বিকল্প, অনুকল্প
Ambiguious – দ্ব্যর্থক, অস্পষ্ট
Ambitious – উচ্চাভিলাষী
Amusing – চিত্তাকর্ষক
Analysis – বিশ্লেষণ
Analyst – বিশ্লেষক
Analytical – বিশ্লেষণাত্মক
Ancestor – পূর্বপুরুষ
Ancestry – পূর্বপুরুষগণ
Ancient – প্রাচীন
Anger – রাগ, ক্রোধ
Antecedent – পূর্ব
Antecedent conditions – পূর্বশর্ত
Anthromorphic – মানব গুণার্পিত, মানবধর্মী
Anthromorphism – নবত্মা-রোপবাদ
Anticipation – প্রত্যাশা, পূর্বজ্ঞান

Antinomy – অসঙ্গতি
Antipathey – বিতৃষ্ণা, দ্বেষ
Antithesis – বিপক্ষ, প্রতিনয়, নঞর্থক ধারণা
Anxiety – উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠা
Apparent – বাহ্যত, আপাত
Appeal – আবেদন
Appearence – অবভাস, প্রতিভাস
Appetite – প্রবৃত্তি, বাসনা
Appreciation – প্রশংসা
Aposteriori – অভিজ্ঞতাভিত্তিক, পরতঃসাধ্য
Apriori – অভিজ্ঞতাপূর্ব, পূর্বসিদ্ধরূপে
Aptitude – স্বাভাবিক দক্ষতা
Argument – যুক্তি
Arrangement – ব্যবস্থা, বিন্যাস
Arbitrary – স্বেচ্ছাতান্ত্রিক
Artificial – কৃত্রিম
Aspiration – আকাঙ্ক্ষা
Association – অনুষঙ্গ
Association law of – অনুষঙ্গ নিয়ম
Astronomy – জ্যোতিঃশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা
Atheism – নাস্তিকতাবাদ, নাস্তিক্য
Atheist – নাস্তিক
Atomic theory – পরমাণু মতবাদ
Attachement – আসক্তি
Attention – মনোযোগ
Attitude – মনোভাব
Attraction – আকর্ষণ
Attribute – গুণ, লক্ষণ
Atrocities – নিষ্ঠুর, বর্বরোচিত
Autonomy – স্বাধীনতা
Autonomous – স্বাধীন, স্বশাসিত
Average – গড়পড়তা, পরিমাণ
Aversion – বিমুখ
Axiom – স্বতঃসিদ্ধ সত্য
Axiology – মানবিদ্যা, মূলবিদ্যা

B

Background – পটভূমি, পশ্চাদভূমি
Backing – সমর্থন
Backward – পশ্চাৎপদ
Balance – ভারসাম্য
Base – পাদদেশ, মূলদেশ
Basic – মৌলিক
Basic needs – মৌলিক প্রয়োজন
Beauty – সৌন্দর্য
Behaviour – আচরণ, স্বভাব
Behaviourism – আচরণবাদ
Behaviourist – আচরণবাদী
Being – সত্তা
Being and nothingness – সত্তা এবং শূন্য
Belief – বিশ্বাস
Bias – পক্ষপাত
Bio-data –জীবন-তথ্য
Biological – জীববিদ্যা সম্পর্কীয়
Biology – জীববিদ্যা
Bio-genesis – জীবজাত, জীবজনি
Biogenesis theory – জীবজনিবাদ
Black – কালো
Blessing – আশীর্বাদ
Blind – অন্ধ
Blind faith – অন্ধবিশ্বাস
Body – দেহ, শরীর
Bodily – দৈহিক
Boundless – সীমাহীন
Brahmanism – ব্রাহ্মণ্যবাদ
Brain – মস্তিষ্ক
Branch – শাখা
Branches of philosophy – দর্শনের শাখা
Breadth – প্রস্থ
Breathing – শ্বাস-প্রশ্বাস

Bright – উজ্জ্বল, চালাক
Broad outlook – উদার দৃষ্টিভঙ্গি
Broken world – ভগ্ন পৃথিবী
Brun – দহন, পোড়ানো
Burning – দহনকর, প্রজ্বলিত
Brute facts – মূল ঘটনা, বিষয়

C

Capacity – ধারণক্ষমতা
Cartesian doubt – কার্তেনীয় সন্দেহে
Category – জ্ঞানের মৌলিক ধারা
Case-history – জীবন-ইতিহাস
Causal – কারণিক
Causal relation – কার্যকারণ সম্পর্ক
Causality – কার্যকারণ
Causal Chain – অবিচ্ছিন্ন কারণ
Change – পরিবর্তন
Choas – বিশৃঙ্খলা
Chaotic – বিশৃঙ্খল
Character – চরিত্র
Character-complex – স্বভাবমিশ্র
Characteristic – বৈশিষ্ট্য
Chemical – রাসায়নিক
Chemical analysis – রাসায়নিক বিশ্লেষণ
Chemical method – রাসায়নিক পদ্ধতি
Chemical Substance – রাসায়নিক পদার্থ
Chemistry – রসায়নশাস্ত্র
Choose – পছন্দ করা
Chronic Disease – চির-রোগ
Civilization – সভ্যতা
Classification – শ্রেণীকরণ
Clearness – সুস্পষ্ট
Clear – পরিষ্কার, স্পষ্ট
Clear idea – স্পষ্ট ধারণা
Choherence – সঙ্গতি
Code – নীতিমালা

Ciognitive – জ্ঞানমূলক
Cognition – জ্ঞান, অবগতি
Cognitive faculty – জ্ঞানশক্তি
Collective – সমষ্টিগত, গোষ্ঠীগত
Coollective mind – গোষ্ঠীমন
Clour – রং
Command – আদেশ, হুকুম
Common sense – সাধারণ জ্ঞান, সহজ বুদ্ধি
Comparatively – তুলনামূলকভাবে
Comparison – তুলনা
Complement – পূরক
Complex – জটিল
Compromise – আপোষ, সন্ধি
Concatenation – শৃঙ্খলযোজন,
Concept – ধারণা, ভাব
Conceptual – ধারণাগত সার্বিক ধারণা প্রত্যয়
Conceputal Space – ধারণাগত দেশ
Conceputal time – ধারণাগত কাল
Conclusion – সিদ্ধান্ত
Conclusive – চূড়ান্ত
Concrete – বাস্তব, মূর্ত
Concrete idea – মূর্ত ধারণা
Condition – অবস্থা, পরিস্থিতি
Conflict – দ্বন্দ্ব, বিরোধ
Conjecture – কল্পনা
Copy – অনুলিপি, প্রতিলিপি
Conscience – বিবেক, নীতিবোধ
Conscious – সজাগ, সচেতন
Consequence – ফলাফল, পরিমাণ
Conservation – সংরক্ষণ
Conservatism – রক্ষণশীলতা
Consistent – সঙ্গতিপূর্ণ
Construction – গঠন
Constructive – গঠনমূলক
Concave – অবতল
Contemporary – সমসাময়িক
Contemporary philosophy – সমসাময়িককালের দর্শন
Content – উপাত্তা, আধেয়
Contex – প্রসঙ্গ

Contextual definition – প্রসঙ্গ ঘটিত সংজ্ঞা
Contingent – শর্তসূচক, আপতিক, সাপেক্ষ
Contradictory – বিপরীতার্থক
Contrary – বিপরীতভাবে
Contrast – বৈসাদৃশ্য
Control – নিয়ন্ত্রণ
Convention – চলিত প্রথা
Convex – উত্তল
Co-operation – সহযোগিতা
Co-ordination – সমন্বয় সাধন
Corpuscle – আলোক কণিকা
Correction – সংশোধন, নির্ভুল
Correct perception – নির্ভুল প্রত্যক্ষণ
Corespondence Theory – অনুরূপতাবাদ
Correspondence – পত্রযোগাযোগ
Cosmolagical – বিশ্বতাত্ত্বিক, বিশ্বতত্ত্ববিষয়ক
Created World – সৃষ্ট জগৎ
Creation – সৃষ্টি
Creative – সৃজনশীল, সৃজনমূলক
Creative evolution – সৃজনমূলক, বিবর্তনবাদ
Creative synthesis – সৃজনমূলক সংশ্লেষণ
Crime – অপরাধ
Criminology – অপরাধ তত্ত্ব
Criterion – মাপকাঠি, নির্ণায়ক
Critical – বিচারমূলক
Critical theory – বিচারবাদ
Critical realism – বিচারমূলক বাস্তববাদ
Criticise – সমালোচনা
Criticism – বিচারবাদ, সমীক্ষণ সমালোচনা
Crude – স্থূল
Cultural – সাংস্কৃতিক
Curious – ঔৎসুক
Curiosity – ঔৎসুক্য
Cynic – বৈরাগ্যধর্মী

D

Darwinism – ডারউইনের মতবাদ, ডাউইনের দর্শন
Data – উপাত্ত
Data sense – সংবেদোপাত্ত
Day of resurrection – শেষ বিচারের দিন, হাশরের দিন
Death – মৃত্যু
Decision – সিদ্ধান্ত
Deciding factor – নির্ধারক উপাদান
Decomposition – বিয়োজন
Decree – বিধির নিবন্ধ
Deduction – অবরোহ
Deductive Method – অবরোহ পদ্ধতি
Defect – দোষ, ত্রুটি
Definiendum – সংজ্ঞেয়
Definition – সূত্র
Definition-in-use – প্রায়োগিক সংজ্ঞা
Deficiency – অসম্পূর্ণতা, অভাব
Deformation – অঙ্গবিকৃতি
Degree – পর্যায়
Deism – অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ
Deity – দেবসত্ত
Deliberative – বিবেচনা প্রসূত
Delinquent – অপরাধী
Delusion – বিভ্রান্ত, বিভ্রম
Depressions – অবসাদ, বিষণ্ণতা
Depth – গভীরতা
Descriptive – বর্ণনামূলক
Design – পরিকল্পনা
Designer – পরিকল্পনাকারী
Desire – কামনা, আকাঙ্ক্ষা
Objective of desire – আকাঙ্ক্ষার বস্তু
Destructive – ধ্বংসাত্মক
Determination – সংকল্প
Determinism – অদৃষ্টবাদ
Development – উন্নয়ন
Deus ex machina – সঙ্কটতারণযন্ত্র
Diagram – চিত্র, নক্সা

Dialectical Materialism – দ্বান্দ্বিক জড়বাদ/বস্তুবাদ
Dialectical Method – দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি
Dialectics – তর্কশাস্ত্র
Dialogue – সংলাপ
Difference – তারতম্য, পার্থক্য
Differential – বৈষম্যমূলক, বিভেদ
Differential calculus – গণনা প্রণালির ভিন্নতা
Dignity – মর্যাদা
Dilemma – উভয় সঙ্কট
Dimension – আয়তন, আকৃতি
Dimensional – মাত্রিক
Directly – প্রত্যক্ষভাবে, সরাসরি
Direction – দিক
Disappointment – হতাশা, নৈরাশ্য
Discrimination – প্রভেদ
Disease – রোগ, ব্যাধি
Disgust – বিরক্তি, বিরাগ
Disorder – বিশৃঙ্খল, বৈকল্য
Disruption – বিচ্ছিন্নকরণ
Disposition – মেজাজ
Dissimilar – অমিল
Distinct – পরিস্ফুট
Distortion – বিকৃতি
Distress – দুঃখ, দুর্দশা
Divine – স্বর্গীয়, দৈব
Doctrine – মতবাদ
Dogmatice – নির্বিচারবাদ
Dogmatic method – নির্বিচারবাদ পদ্ধতি
Dominance – প্রাধান্য
Dominant – প্রভাবশালী
Doubt – সংশয়, সন্দেহ
Doubt of method – সংশয় পদ্ধতি
Doubtless – নিঃসন্দেহে
Drama – নাটক
Dread – ভীতিপ্রদ, ভয়ঙ্কর
Dualism –দ্বৈতবাদ
Duration – স্থায়িত্ব, স্থিতিকাল
Duty – কর্তব্য
Dynamic – গতিশীল, পরিবর্তনশীল
Dynanical theory – প্রক্রিয়াবাদ

E

Ease – আরাম, সহজ
Ecentric – অদ্ভুত, খামখেয়ালী
Economic – অর্থনৈতিক
Economic development – অর্থনৈতিক উন্নয়ন
Economic success – অর্থনীতিক সাফল্য
Education – শিক্ষা
Educational institution – শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
Educational success – শিক্ষাগত সাফল্য
Effect – ফল, পরিণতি
Efficient – যোগ্য
Efficient cause – নিমিত্ত কারণ
Efficiency – যোগ্যতা
Effort – প্রচেষ্টা
Ego – আত্মা, অহম
Egocentric – আত্মকেন্দ্রিক
Egocentric predicament – আত্মকেন্দ্রিক ধারণা
Egoism – অহমিকা
Either/or – হয়, অথবা
Elan Vital – জীবন প্রবাহ, জীবন শক্তি
Element – উপাদান
Elementary – প্রাথমিক, মৌলিক
Elimination – বাদ, বর্জন
Embodument – প্রমূর্তি
Emotion – আবেগ
Emotional – আবেগময়
Empirical – অভিজ্ঞতাভিত্তিক
Emprirical Proposition – অভিজ্ঞতাভিত্তিক বাক্য
Empiricism – অভিজ্ঞতাবাদ
Empiricist – অভিজ্ঞতাবাদী
Empty space – শূন্যস্থান
End – লক্ষ্য
End of life – জীবনের লক্ষ্য
Energy – শক্তি
Enjoy – উপভোগ
Entelechy – সাংগঠনিক শক্তি/ সত্তা

Entity – সত্তা
Environment – পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা
Epiphenomenalism – উপবস্তুবাদ
Epistenology – জ্ঞানবিদ্যা
Equation – সমীকরণ
Equilibrium – ভারসাম্য
Equivalent – তুল্য, সমান
Error – ভ্রম, ভুল
Escape – পরিত্রাণ, পলায়ন
Essence – সারসত্তা, সারবস্তু, সারধর্ম
Established – প্রতিষ্ঠিত
Estrangement – বিচ্ছিন্নকরণ
Eternal – চিরন্তন
Ethical – নৈতিক
Ethics – নীতিশাস্ত্র
Evaluation – মূল্যায়ন
Events – ঘটনা
Evolution – বিবর্তন
Evolution Scientific – বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ
Evolutionary Philospher – বিবর্তনবাদী দার্শনিক
Example – উদাহরণ, দৃষ্টান্ত
Exception – ব্যতিক্রম
Excited – উত্তেজিত
Excitement – উত্তেজনা
Exclusive particularity – সর্বাত্মক বিশিষ্টতা
Existence – অস্তিত্ব
Expansion – সম্প্রসারণ
Experience – অভিজ্ঞতা
Experimental – পরীক্ষামূলক
Experimental method – পরীক্ষামূলক পদ্ধতি
Expression – মত প্রকাশ, বাকধারা
Extension – প্রসার, বিস্তার
Extensive – ব্যাপক, বিস্তৃতি
Extermination – বিধ্বংস
External – বাহ্য
External World – বাহ্যজগৎ
Extinction – লোপ, অবলুপ্তি
Extreme – চরম
External – বহির্মুখী
Eye – চক্ষু

Formal – আকারগত
Formal Cause – আকারিক কারণ, আকারগত কারণ
Formal Science – আকারিক বিজ্ঞান
Formality – আনুষ্ঠানিকতা
Formation – গঠন
Formidable – ভয়ঙ্কর
Formula – সূত্র
Fortunate – ভাগ্যবান
Founder – প্রতিষ্ঠাতা
Fragment – খণ্ড
Fragmentary – খণ্ডাত্মক
Free – স্বাধীন
Freelance philosopher – স্বাধীনচেতা দার্শনিক
Free thinking – স্বাধীন চিন্তা
Freedom – স্বাধীনতা
Freedom of will – চিন্তার স্বাধীনতা
Fright – ভীতি
Fruitful – ফলপ্রসূ
Fruitless – নিরর্থক
Fulfilment – পূর্তি, পূরণ
Fully developed – পূর্ণ বিকাশ
Function – কার্য
Fundamental – মৌল, মৌলিক,
Fundamental belief – মৌল বিশ্বাস
Furious – প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ
Futile – ব্যর্থ, নিরর্থক
Future – ভবিষ্যৎ

G

General – সাধারণ
General ideas – সাধারণ ধারণা
General proposition – সাধারণ বাক্য
General terms – সাধারণ পদ
Generally – সাধারণত
Generic – জাতিবাচক
Genesis –উৎপত্তি, জন্ম
Genetics – প্রজনন শাস্ত্র

Formal – আকারগত
Formal Cause – আকারিক কারণ, আকারগত কারণ
Formal Science – আকারিক বিজ্ঞান
Formality – আনুষ্ঠানিকতা
Formation – গঠন
Formidable – ভয়ঙ্কর
Formula – সূত্র
Fortunate – ভাগ্যবান
Founder – প্রতিষ্ঠাতা
Fragment – খণ্ড
Fragmentary – খণ্ডাত্মক
Free – স্বাধীন
Freelance philosopher – স্বাধীনচেতা দার্শনিক
Free thinking – স্বাধীন চিন্তা
Freedom – স্বাধীনতা
Freedom of will – চিন্তার স্বাধীনতা
Fright – ভীতি
Fruitful – ফলপ্রসূ
Fruitless – নিরর্থক
Fulfilment – পূর্তি, পূরণ
Fully developed – পূর্ণ বিকাশ
Function – কার্য
Fundamental – মৌল, মৌলিক,
Fundamental belief – মৌল বিশ্বাস
Furious – প্রচণ্ড, ক্রুদ্ধ
Futile – ব্যর্থ, নিরর্থক
Future – ভবিষ্যৎ

G

General – সাধারণ
General ideas – সাধারণ ধারণা
General proposition – সাধারণ বাক্য
General terms – সাধারণ পদ
Generally – সাধারণত
Generic – জাতিবাচক
Genesis –উৎপত্তি, জন্ম
Genetics – প্রজনন শাস্ত্র

Genius – প্রতিভাবান
Geo-centric – ভূকেন্দ্রিক
Geographical – ভৌগোলিক
Geometrical method – জ্যামিতিক পদ্ধতি
Germ cell – জননকোষ
Germinal Variation – বৃদ্ধির প্রথমাবস্থায় পরিবর্তন
Germ Plasm – জীবাণু কণিকা
Gland – গ্রন্থি
Goal – লক্ষ্যস্থল
God – সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর, আল্লাহ্তায়া'লা
Golden mean – সুবর্ণ মধ্যক
Grade – স্তর, মান
Gradual development – ক্রমোন্নয়ন
Gratification – পরিতৃপ্তি
Gratitude – কৃতজ্ঞতা
Great – মহান
Greatest – মহৎ
Greek thinking – গ্রিক চিন্তাধারা,
Ground – পটভূমি, পশ্চাৎভূমি
Group – দল, সংঘ
Growth – জন্ম, বৃদ্ধি
Guarded – অবহিত
Guardian – অভিভাবক
Guilty – অপরাধী .

H

Habit – অভ্যাস
Habituated – অভ্যস্ত
Hallucination – ভ্রান্ত বিশ্বাস
Happy – সুখী
Hard – শক্ত, কঠোর
Harmful – ক্ষতিকর
Harmony – সুশৃঙ্খল, মিল
Harsh – কর্কশ
Hate – ঘৃণা
Head – মাথা, মস্তক
Hell – নরক, দোজখ

Hearty – আন্তরিক
Heaven – স্বর্গ, বেহেশ্‌ত
Helpless – অসহায়
Heriditary – বংশজ, বংশগত
Heroic – বীরোচিত
Hieraracy – স্তর বিন্যাস, ক্রমবিন্যাস
Higher mathematics – উচ্চ গণিতশাস্ত্র
Highest good – সর্বোচ্চ মঙ্গল
Heterogeneous – বিষমতাত্ত্বিক
Historic – ঐতিহাসিক
Hemogeneous – সমসাত্ত্বি
Horif – সম্মানসূচক
Horror – ভীতিকর, আতঙ্কজনক
Human – মানবিক
Human Civilization – মানবসভ্যতা
Human nature – মানব প্রকৃতি
Human problem – মানবিক সমস্যা
Human Society – মানব সমাজ
Human Value – মানব মূল্য
Humanism – মানবতাবাদ
Humanity – মানবতা
Humour – রসিকতা, ব্যঙ্গ-কৌতুক
Hurt – ক্ষতি, আঘাত
Hylozoum – সজীব জড়বাদ
Hypothetical – অনুমানসিদ্ধ
Hypothetical proposition – অনুমানসিদ্ধ বাক্য, শর্তসূচক বাক্য
Hypothesis – অনুমান, প্রকল্প

I

Idea – ধারণা
Ideal – আদর্শ
Ideal state – আদর্শ রাষ্ট্র
Idealism – ভাববাদ
Idealist – ভাববাদী
Ideological – ভাবতাত্ত্বিক
Ignorance – অজ্ঞতা

Ignorant – অজ্ঞ
Ignore – উপেক্ষা
Ill distribution – অসম বণ্টন
Ill treatment – অসদাচরণ
Illusion – ভ্রান্তি, ভুল প্রত্যক্ষণ
Illusory – ভ্রান্তিকর
Image – ধারণা
Imagination – কল্পনা
Immanence – সর্বব্যাপিতা
Immanent – পরিব্যাপ্ত
Immature – অপরিপক্ব
Immediate – অবিলম্বে, অনতিবিলম্বে, অব্যবহিত
Immedate experience – অব্যবহিত অভিজ্ঞতা
Immoral – নীতিগর্হিত, অনৈতিক
Immortal – অমর
Immortality of the soul – আত্মার অমরতা
Impartial – নিরপেক্ষ
Imperishable – অবিনশ্বর
Impersonal – নৈর্ব্যক্তিক
Imperative – আদেশ, নির্দেশ
Imperative Categorical – শর্তহীন নির্দেশ
Imperfection – অপূর্ণতা
Impression – মুদ্রণ, ধারণা, ইন্দ্রিয়জ, ইন্দ্রিয়জ ধারণা, ছাপা, সংবেদন
Improvement – উন্নতি
Important – গুরুত্বপূর্ণ
Impose – চাপানো
Impossible – অসম্ভব
Impulse – প্রেরণা
Innate – সহজাত
Innate ideas – সহজাত ধারণা
Inborn – জন্মগত, সহজাত
Incentive – প্রেরণা, উৎসাহ
Inclusion – সংযোজিত
Included – সংযোজিত
Incoherence – অসংলগ্নতা
Incomplete – অসম্পূর্ণ
Inconsistency – অসঙ্গতি
Indefinite – অনির্দিষ্ট
Independent – স্বাধীন, স্বতন্ত্র

Indestructible – অক্ষয়
Indetrminate – নির্বিশেষ, অপ্রকাশিত
Indeterminism – অনিয়ন্ত্রণবাদ
Indicate – নির্দেশ
Indirect – পরোক্ষ
Individual – ব্যক্তি
Individualistic – ব্যক্তিকেন্দ্রিক
Individual mind – ব্যক্তি মন
Indivisible – অবিভাজ্য
Induction – আরোহ
Inductive – আরোহী, আরোহমূলক
Indulgence – আসক্তি
Industrial – শিল্পভিত্তিক
Indeutrial civilization – শিল্পভিত্তিক সভ্যতা
Inertia – জাড্য
Infant –শিশু
Inference – অনুমান, অনুমিতি
Influence – প্রভাব
Infinite – অসীম
Infinite regress – অনবস্থা দোষ
Inherent – জন্মগত
Inheritance – বংশগত
Intial predication – প্রারম্ভিক গুণারোপ
Intention – উদ্দেশ্য, লক্ষ্য
Interactionism – ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াবাদ
Interest – আগ্রহ, কৌতূহল
Internal – অভ্যন্তরীণ
Internal conflict – অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব
Internal competition – অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা
Interpolation – প্রক্ষেপ
Interview – সাক্ষাৎকার
Intrinsic nature – অন্তর্নিহিত প্রকৃতি
Introspection – অন্তর্দর্শন
Intuition – স্বজ্ঞা
Irrational – অবৌদ্ধিক, অযৌক্তিক
Irrelevant – অপ্রাসঙ্গিক
Insight – অন্তর্দৃষ্টি
Instinct – সহজাত প্রবৃত্তি
Instrument – হাতিয়ার, যন্ত্র

Instrumentalism – করণবাদ,হাতিয়ারবাদ
Intellectual – বুদ্ধিগত
Intelligence – বুদ্ধি
Intensity – তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা

J

Jealous – ঈর্ষাপরায়ণ
Jesuit – ধর্মযাজক
Journal – সাময়িক পত্রিকা
Joy – আনন্দ, উল্লাস
Judgement – বিচার, অবধারণ
Just – ন্যায়
Justice – ন্যায়বিচার, ন্যায়পরতা
Justification – প্রমাণ, যৌক্তিকতা প্রদর্শন
Justify – সমর্থন করা

K

Key – চাবি
Kind – সদয়
Kindness – স্নেহশীলতা
Know – জানা, অবগতি
Knower – জ্ঞাতা
Knowing – জানা
Known – জ্ঞেয়
Knowledge – জ্ঞান
Knowldege by acquaintacne – প্রত্যক্ষ জ্ঞান
Knowdege by description – বর্ণনাশ্রয়ী জ্ঞান, বর্ণনামূলক জ্ঞান

L

Labour – শ্রমিক, মজুর
Language – ভাষা
Linguistic – ভাষাগত
Large – বৃহৎ, বড়

Law of causation – কার্যকারণ নিয়ম
Law of association – অনুষঙ্গ নিয়ম
Law of conservation of matter and energy – বস্তু ও শক্তিসংরক্ষণ নিয়ম
Law of climination – বর্জনের নীতি
Law of gravitation – মাধ্যাকর্ষণ সূত্র
Low of nature – প্রকৃতির নিয়ম
Law of parsimony – অতিশয় মিতব্যয়িতার নিয়ম
Lawyer – আইনজ্ঞ
Laxity – শৈথিল্য
Learn – শেখা, জানা
Legislature – আইন প্রণয়নকারী সংস্থা
Level – স্তর
Life – জীবন, প্রাণ
Lively – জীবন্ত, সজীব
Limit – সীমা
Limited – সীমিত
Literary work – সাহিত্য কর্ম
Locution – বাচন
Logic – যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র
Logical – যৌক্তিক
Logical positivism – যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ
Law of Uniformity of nature – প্রকৃতির সমতা নিয়ম
Logistic – ভাষা সম্বন্ধীয়
Logos – লগস, জ্ঞান
Lonely – নিঃসঙ্গ, নির্জন
Love – প্রেম, ভালোবাসা
Lover – প্রেমিক, সন্ধানী
Lover of truth – সত্যের সন্ধানী

M

Machine – যন্ত্র
Magnet – চুম্বক
Magnitude – আয়তন, পরিমাণ
Majority – অধিকাংশ, সংখ্যাধিক্য
Manifest – ব্যক্ত, প্রকাশ
Manner – আচার-আচরণ

Marks – চিহ্ন, লক্ষণ
Material – জড়, বস্তুগত, উপাদান
Materials – বস্তুগত উপাদান
Materials Cause – উপাদান কারণ
Materialism – বস্তুবাদ
Materialistic – বস্তুবাদী
Matter – বস্তু, বিষয়, জড়
Mathematical – আংকিক, গাণিতিক
Mature – পরিপক্ব
Meaning – অর্থ
Meaningful – অর্থপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ
Means – অবলম্বন, উপায়
Measure – পদক্ষেপ, ব্যবস্থা
Mechanical – যান্ত্রিক
Mechanical laws – যান্ত্রিক নিয়ম
Mechanical theory – যান্ত্রিক মতবাদ
Mechanism – যান্ত্রিকতা
Mediaeval – মধ্যযুগীয়
Meditation – গভীর চিন্তা, মনন
Memory – স্মৃতি
Mental – মানসিক
Mental disease – মানসিক ব্যাধি
Mentality – মানসিকতা
Mere experiences – নিছক অভিজ্ঞতা
Merits – সুবিধা, অনুকূল
Metaphysical – অধিবিদ্যাবিষয়ক, পরাতাত্ত্বিক, অধিবিদ্যা সংক্রান্ত
Metaphysics – অধিবিদ্যা
Method – পদ্ধতি
Method of dubt – সংশয় পদ্ধতি
Mind – মন
Mixed – মিশ্র, মিশ্রিত
Mixed feeling – মিশ্রানুভূতি
Mode – প্রণালি
Modern – আধুনিক
Modern philosophy – আধুনিক দর্শন
Monad – মোনাড, চেতন, চিৎপরমাণু
Monodalogy – মোনাডবাদ, চিৎপরমাণুবাদ
Monism – এককবাদ, অদ্বৈতবাদ
Money – অর্থকড়ি, টাকা

Monogamy – একবিবাহ
Montheism – একেশ্বরবাদ, তৌহিদ
Mood – মেজাজ, সাময়িক মানসিক অবস্থা
Moral – নৈতিক, নীতি
Moral duty – নৈতিক কর্তব্য
Moral secintist – নীতিবিজ্ঞানী
Morality – নৈতিকতা
Moral standard – নৈতিক মান
Motion – গতি
Motive – উদ্দেশ্য
Motivation – প্রেষণা
Mutual – পারস্পরিক
Mystic – অতীন্দ্রিয়বাদী, সাধু, সন্ন্যাসী
Mysticism – মরমিবাদ
Myth – উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী
Mythology – পুরা তত্ত্ব
Mutation – পরিব্যক্তি, পরিবর্তন

N

Naive Realism – সরল বস্তুবাদ
National laws – জাতীয় আইন
Naitonal crisis – জাতীয় সংকট
Nationalism – জাতীয়তাবাদ
Nature – প্রকৃতি
Natural – স্বাভাবিক
Natural Force – প্রাকৃতিক শক্তি
Natural science – প্রাকৃতিক বিজ্ঞান
Natural selection – প্রাকৃতিক নির্বাচন
Necessary – প্রয়োজনীয়, আবশ্যকীয়
Necessary condition – আবিশ্যিক শর্ত
Negative – নঞর্থক
Neighbour – প্রতিবেশী
Nervous system – স্নায়ুতন্ত্র
Neo-realism – নব্য বাস্তবাদ
Neutral entities – নিরপেক্ষ পদার্থ সত্তা
Nautral Monism – নিরপেক্ষ একত্ববাদ

Nisus – প্রেরণা, চেতন শক্তি
Nominalism – নামবাদ
Nuclear physics – আণবিক পদার্থবিদ্যা
Neutral – নিরপেক্ষ
Non-menta – অ-মানসিক
Non-rational – অযৌক্তিক
Non-relational – অসম্পর্কীয়
Normal – স্বাভাবিক
Normalcy – স্বাভাবিকতা
Normative – আদর্শনিষ্ঠ
Normative science – আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান
Not-being – অ-সত্তা
Notion – ধারণা
Nothingness – শূন্যতা
Noumena – অন্তরসত্তা/বস্তুর আসল রূপ
Noumenal world – অতীন্দ্রিয় জগৎ
Novel – নতুন
Novelty – নতুনত্ব
Number – সংখ্যা
Number Philosophy – সংখ্যা দর্শন
Nous – নাওস

O

Object – বস্তু, পদার্থ
Object of desire – কামনার বস্তু
Object of love – ভালোবাসার বস্তু
Objective – বস্তুনিষ্ঠ, বিষয়গত, বাস্তব
Objective method – বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি
Objective science – বস্তুবিজ্ঞান
Observation – পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ
Occasional – আকস্মিক
Occasionalism – প্রয়োজনবাদ
Occasionally – মাঝে মধ্যে
Occupation – পেশা, বৃত্তি
Ommission – বর্জন, বাদ
Omnipresent – সর্বব্যাপী
One-sided – একদেশদর্শী

Ontology – তত্ত্ববিদ্যা
Open – খোলা
Opinion – মতামত
Optimism – আশাবাদ
Order – ক্রম, ক্রমবিন্যাস
Ordinary Languge – সাধারণ ভাষা
Organ – অঙ্গ
Organic – জৈব, আঙ্গিক
Organaic unity – আঙ্গিক ঐক্য
Organism – অঙ্গী
Organised people – সংগঠিত জনগণ
Original – মূল, মৌল
Orthodox – গোঁড়া
Ostensive definition – প্রদর্শনমূলক সংজ্ঞা
Ought – উচিত
Outlook – দৃষ্টিভঙ্গি
Outstanding – খ্যাতনামা, প্রসিদ্ধ
Outstanding philosopher – খ্যাতনামা দার্শনিক
Over come – অতিক্রম

P

Painful – বেদনাদায়ক, কষ্টদায়ক
Parallel – সমান্তরাল
Parallelism – সমান্তরালবাদ
Panatheism – সর্বেশ্বরবাদ, সর্বখোদাবাদ
Panentheism – সর্বধরেশ্বরবাদ
Particulars – বিশেষ, নিছক
Particular object – বিশেষ বস্তু
Passionate – আবেগ প্রবণ
Passive – নিষ্ক্রিয়
Patient – রোগী
Patient, mental – মানসিক রোগী
Pattern – নমুনা
Peculiarity –অদ্ভুতভাব
Percept – প্রত্যক্ষ, ধারণা
Perception – প্রত্যক্ষণ
Perceptual – ধারণাগত

Perceptual space – ধারণাগত দেশ
Perceptual time – ধারণাগত কাল
Perfection – পূর্ণতা
Period – নির্দিষ্ট সময়, কাল
Permanent – স্থায়ী
Permissible – অনুমতিসাপেক্ষ
Personal evolution – ব্যক্তি বিবর্তনবাদ
Personal idealism – ব্যক্তিগত ভাববাদ
Personality – ব্যক্তিত্ব
Pessimism – নৈরাশ্যবাদ
Pessimist – নৈরাশ্যবাদী
Phenomenal world – অবভাসিক জগৎ
Phenomenology – অবভাসিক
Phenomenologist – অবভাসিক
Phenomenon – ঘটনা
Philosophical thinking – দার্শনিক চিন্তা
Philosophical outlook – দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি
Philosophy – দর্শন
Philosophy of ancient – প্রাচীন দর্শন
Philosophy, contemporary – সমসাময়িক দর্শন
Philosophy of education – শিক্ষার দর্শন
Philosophy of Management – ব্যবস্থাপনায় দর্শন
Philosophy, mediaeval age – মধ্যযুগীয় দর্শন
Physical – দৈহিক
Physicist – পদার্থবিদ
Plan – পরিকল্পনা, নকশা
Palnned – পরিকল্পিত
Plane – সমতল, মসৃণ
Plansible – আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত
Pleasant – মনোরম, চমৎকার
Pleasure – সুখ, আনন্দ
Pluralism – বহুত্ববাদ
Plurality of causes – বহু কারণ
Poetry – কবিতা
Points – বিন্দু
Political science – রাষ্ট্রবিজ্ঞান
Political turmoil – রাজনৈতিক অস্থিরতা
Polytheism – বহু ঈশ্বরবাদ
Polarity – মেরু প্রবনতা

Popular – জনপ্রিয়
Popularity – জনপ্রিয়তা
Position – অবস্থান, অবস্থিতি
Positive – হাঁ-সূচক
Positivism – দৃষ্টবাদ
Positivism, logical – যৌক্তিক দৃষ্টবাদ
Possibility – সম্ভাবনা
Possible – সম্ভব
Potentiality – সম্ভাবনা
Practical – ব্যবহারিক, বাস্তব
Practical experience – বাস্তব অভিজ্ঞতা
Pragamatic – প্রায়োগিক
Pragmatism – প্রয়োগবাদ
Pragmatist – প্রয়োগবাদী
Precedes – পূর্বগামী, আগে
Pre-established harmony – পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবাদ
Premature – অকাল, অকালীয়
Premise – আশ্রয়বাক্য
Preparation – প্রস্তুতি
Presentation – উপস্থাপন
Presumption – পূর্বানুমান
Primal – প্রাথমিক, আদিম
Primary – প্রাথমিক, মুখ্য
Primitive – আদিম, প্রাচীন
Principal – প্রধান
Principle – নীতি
Private – গোপনীয়, ব্যক্তিগত
Probable – সম্ভাব্য
Problem – সমস্যা
Producer – উৎপাদনকারী
Productive – উৎপাদনশীল
Profession – পেশা
Professional – পেশাদার
Profitable – লাভজনক
Progress – উন্নয়ন
Project – প্রকল্প
Projection – পরিকল্পনা
Proper – যথাযথ
Proper place – যথাস্থান

Property – সম্পদ
Proposition – বাক্য, প্রতিজ্ঞা
Prosperous – সমৃদ্ধশালী
Protection – সংরক্ষণ
Protoplasm – জীবকোষ, প্রাণকোষ
Psyche – মন
Psychic – মানস
Psychoanalysis – মনো-সমীক্ষণ
Psychoid – মনস্তাত্ত্বিক সত্তা
Psychological – মনস্তাত্ত্বিক
Puberty – বয়োসন্ধি, বয়োপ্রাপ্তি
Punishment – শাস্তি, দণ্ড
Pure thinking – বিশুদ্ধ চিন্তা
Pure sences – বিশুদ্ধ সংবেদন
Pure reason – বিশুদ্ধ বুদ্ধি
Purpose – উদ্দেশ্য
Puzzle – চমক লাগানো, হতবুদ্ধি করা
Pyrrhonism – সংশয়বাদ

Q

Qualitative – গুণগত
Quality – গুণ
Quantitative – মাত্রিক, পরিমাণগত
Quantitative relation – পরিমাণগত সম্পর্ক
Questions – প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা
Questions of life – জীবন জিজ্ঞাসা
Quits – সমতাসম্পন্ন
Quotation – উদ্ধৃতি

R

Race – জাতি
Radical – চূড়ান্ত, চরম
Rational procedure – যৌক্তিক পদ্ধতি
Rationalism – বুদ্ধিবাদ
Rationalist – বুদ্ধিবাদী

Reaction – প্রতিক্রিয়া
Ready made – পূর্বনির্মিত
Real – বাস্তব
Realism – বাস্তববাদ, বাস্তুবাদ
Realistic – বাস্তবধর্মী
Reality – বাস্তবতা, সত্তা, পরমসত্তা
Reason – যুক্তি, প্রজ্ঞা
Reasonably –যুক্তিযুক্তভাবে
Receptacle – আধার
Recognised – স্বীকৃত
Recognition – স্বীকৃতি
Regularities – নিয়মানুবর্তিতা
Recollection – স্মরণ, স্মৃতি
Reconcile – সমন্বয় করা
Reconcilation – সমন্বয়
Reflection – প্রতিবেদন, মানস প্রত্যক্ষণ
Rejection – বর্জন
Right – অধিকার, ঠিক, নির্ভুল
Relation – সম্পর্ক
Relation symbol – প্রতীক সম্পর্ক
Relational – সম্পর্কিত
Relative – আপেক্ষিক, সমন্ধ
Relativity – আপেক্ষিকতা
Reliable – বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য
Religion – ধর্ম
Relagious – ধর্মীয়, ধার্মিক
Remarkabale – উল্লেখযোগ্য
Removed – দূরীভূত
Resistance – বাধা, প্রতিবন্ধকতা
Research – গবেষণা
Retoric – অলঙ্কারশাস্ত্র
Report – বর্ণনা
Response – সাড়া, জবাব
Rest – বিশ্রাম, অবশিষ্ট
Restriction – বিধিনিষেধ
Reveal – উদ্ঘাটন
Revelation – প্রত্যাদেশ
Roman Catholic Philosphy – রোমান ক্যাথলিক দর্শন

S

Sacrifice – উৎসর্গ, ত্যাগ
Sad – দুঃখিত
Satisfaction – তৃপ্তি
Satisfactory – সন্তোষজনক
Say – বলা, বক্তব্য
Scale – মানদণ্ড, মান
Scene – দৃশ্য
Scepticism – সংশয়বাদ, সন্দেহবাদ
Sceptic – সন্দেহবাদী
School – সম্প্রদায়
Science – বিজ্ঞান
Scintific Realism – বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ
Scientific theory – বৈজ্ঞানিক মতবাদ
Scintific thinkig – বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা
Scientific writer – বৈজ্ঞানিক লেখক
Scope – পরিসর
Search –অন্বেষণ, খোঁজা
Search for knowledge – জ্ঞানান্বেষণ
Secondary – গৌণ
Secondary qualities – গৌণগুণাবলি
Selection – নির্বাচন
Self-consistent – আত্ম-শৃঙ্খল
Self-consciousness – আত্মসচেতন
Self-contradictory – আত্মবিরোধ, স্ববিরোধ
Self-determination – আত্মনির্ভরশীল
Self-evidence – স্বয়ংসিদ্ধ
Self-knowledge – আত্মজ্ঞান
Self-preservation – আত্মসংরক্ষণ
Self-statisfaction – আত্মতৃপ্তি
Series – ক্রম, পারম্পর্য, শ্রেণী
Sensation – সংবেদন,
Sense – অনুভূতি
Sense-data – ইন্দ্রিয়োপাত্ত
Sense Organ – জ্ঞানেন্দ্রিয়
Sense pleasure – আত্মসুখ
Sense perception – ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ

Sense of value – মূল্যবোধ
Sensible object – ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবস্তু
Sensitive – সংবেদনশীল
Sentiment – মেজাজ, ভাব
Serious problem – মারাত্মক সমস্যা
Sex – লিঙ্গ
Sight – দৃষ্টি
Similar – অনুরূপ
Similar condition – অনুরূপ অবস্থা
Similarly – অনুরূপভাবে
Similarity – সাদৃশ্য, মিল
Simple – সরল
Simple naturalism – সরল প্রকৃতিবাদ
Sin – পাপ, অন্যায় করা
Situation – পরিস্থিতি
Skill – দক্ষ
Social – সামাজিক
Social development – সামাজিক উন্নয়ন
Social environment – সামাজিক পরিবেশ
Social life – সমাজ জীবন
Social science – সমাজ বিজ্ঞান
Social success – সামাজিক সাফল্য
Sociology – সমাজ বিজ্ঞান
Solution – সমাধান
Soul – আত্মা
Source – উৎস
Space – দেশ
Spatial – দৈশিক, দেশিক
Specialistation – বিদেশীকরণ
Specialised Science – বিদেশীকরণ বিজ্ঞান
Species – উপজাতি, প্রজাতি
Speculation – চিন্তন
Speculative truth – চিন্তাগত সত্য
Sphere – ক্ষেত্র, পরিমণ্ডল, গোলক
Spirit – মেজাজ, শক্তি, বৈশিষ্ট্য
Spiritual – শক্তিবিশেষ
Spontaneous – স্বতঃস্ফূর্ত
Stable – স্থায়ী, স্থিতিশীল
Stage – স্তর, ক্রম

Standard – মান
Standpoint – দৃষ্টিকোণ
Statement – বিবরণ
Stimuli – উদ্দীপক
Strength – শক্তি
Structure – কাঠামো, আকার
Structural – কাঠামোগত
Struggle – সংগ্রাম
Study – অধ্যয়ন, পঠন
Subject – বিষয়, ব্যক্তি
Subject matter – বিষয়বস্তু
Subjective – আত্মগত
Subject idealism – আত্মগত ভাববাদ
Subjective mind – ব্যক্তিমন
Subjective Value – ব্যক্তিমূল্য
Sublimation – উদগতি
Substance – দ্রব্য
Substratum – ভিত্তি, একবটি স্তরের তলার স্তর
Subsumption – অন্তর্ভুক্তি
Suffering – দুঃখ, দুর্দশা
Sufficient – পর্যাপ্ত পরিমাণ
Suggestion – নির্দেশ
Suggestive – নির্দেশক
Superman – অতিমানব
Supply – সরবরাহ
Support – সহায়তা
Supposition – অনুমান
Suppression – অবদমন
Surface – উপরিভাগ
Surprising – বিস্ময়কর
Survey – জরিপ
Symbol – প্রতীক
Symbolism – প্রতীকবাদ
Symbolic method – প্রতীক পদ্ধতি
Sympathy – সহানুভূতি, সমবেদনা
Synthesis – সংশ্লেষণ
Synthetic judgement – সংশ্লেষণ বাক্য
System – পদ্ধতি, রীতি
Systematic – সংঘবদ্ধ
Systematic knowledge – সংঘবদ্ধ জ্ঞান
Synchronism – সমাকলীনতা

T

Taste – স্বাদ
Technical – প্রযুক্তি
Technology – প্রযুক্তি বিজ্ঞান
Temperament – মেজাজ
Tendency – প্রবণতা
Tender minded – কোমল চিত্তের, নমনীয় মনোভাবাপন্ন
Term – শব্দ
Test – পরীক্ষা
Threat – হুমকি
Theology – ধর্মতত্ত্ব
Theological – ধর্মীয়
Theoretical – পুথিগত, ধারণাগত
Thesis – সমর্থক ধারণা
Thinker – চিন্তাবিদ, চিন্তানায়ক
Thinking – চিন্তন
Thing-in-itself – আসল সত্তা
Thrist for knowledge – জ্ঞান পিপাসা
Thought – চিন্তা
Time – কাল, সময়
Though minded – কঠোর মনোভাবাপন্না
Totem – সম্প্রদায় প্রতীক
Tradition – ঐতিহ্য
Training – প্রশিক্ষণ
Translate – অনুবাদ
Transvaluation – মূল্যায়ন
Truth – সত্য
Totalitarious mass movement – একদলীয় বিপ্লবের উত্থান

U

Ultimate-aim – শেষ লক্ষ্য
Ultimate reality – প্রকৃত সত্তা
Unable – অসমর্থ
Unanimously – একবাক্যে
Unbeleiveable – অবিশ্বাস্য

Undoubtedly – নিঃসন্দেহে, সন্দেহাতীতভাবে
Unending process – অনন্ত প্রক্রিয়া
Unexamined –অপরিক্ষীত
Unfolding – উন্মুক্ত, খোলা
Unified whole – পূর্ণাঙ্গ সমষ্টি
Uncertainty – অনিশ্চয়তা
Unconscious – অচেতন
Uncreated – অসৃষ্ট
Understanding – বোধ
Uniform – একরূপ
Uniformity of nautre – প্রকৃতির সমত্য
Unquestionable – প্রশ্নাতীত
Unstable – অপ্রতিষ্ঠ
Unity – ঐক্য
Universe – জগৎ
Universal – সার্বজনীন
Univocal – একার্থক
Utility – উপযোগী
Utilitarianism – উপযোগবাদ, পরহিতবাদ
Unverifiable – অপ্রমাণযোগ্য

V

Vague – অস্পষ্ট
Vagueness – অস্পষ্টতা
Vaugely – অস্পষ্টভাবে
Valid – বৈধ
Valid knowledge – বৈধ জ্ঞান
Validity – বৈধতা
Value – মূল্যবোধ
Variety – নানারকম
Verbal – মৌখিক, শব্দগত
Verification – যাচাইকরণ, প্রতিপাদন
View – অভিমত
Vision – দৃষ্টি
Virtue – সদগুণ, পুণ্য
Vitalism – প্রাণবাদ
Vocational – বৃত্তিমূলক
Volume – খণ্ড
Voluntarism – ইচ্ছাবাদ

W

Weight – ওজন
Well known – সুপরিচিত
Western civilisation – পাশ্চাত্য সভ্যতা
Whole – সমগ্র
Wholeness – সমগ্রতা
Will – ইচ্ছা
Windowless – গবাক্ষহীন
Wonderful – বিস্ময়কর
Word – শব্দ
Working Hypothesis – সাময়িক প্রকল্প
World – পৃথিবী, জগৎ
World of ideas – ধারণার জগৎ
Worldy – জাগতিক
World soul – জগৎ আত্মা
Wrong – ভুল, ভ্রান্তি
Wrong idea – ভ্রান্ত ধারণা

X

X-Ray –এক্সরে, রঞ্জনরশ্মি
Xylophone – বাদ্যযন্ত্রবিশেষ

Z

Zoology – প্রাণিবিদ্যা
Zoologist – প্রাণিতত্ত্ববিদ

গ্রন্থপঞ্জি

1. George Thomas White Patric – *Introduction to Philosphy.*
2. D. Vinding Kruse L.L.D.– *Hume's Philosophy.*
3. Bertrand Russel– *An Outline of Philosophy.*
4. Bertrand Russel– *History of Western Philosophy.*
5. Bertrand Russel– *Sceptical Essays.*
6. Bertrand Russel– *The Analysis of Matter.*
7. H.M. Bhattacharyya– *Principles of Philosophy.*
8. S. K. Maitra– *The Main Problems of Philosophy.*
9. Albarey Castel–*An Introduction to Modern Philosophy.*
10. J.H. Randal
    J. Buchler
    E.U. Shirk– *Reading in Philosophy.*
11. Abdul Matin– *An Outline of Philosophy.*
12. Ernest Cassirer– *The Philosophy of the Enlightenment.*
13. Dr. J.N. Sinha– *Introduction to Philosophy.*
14. Monmoth Nath Ghose– *The Essence of General Philosophy.*
15. Aboni Mohan Dutta– *Essence of General Philosophy.*
16. Phani Bhusan Chatterjee– *Outlines of General Philosophy.*
17. John Wild– *Introduction to Realistic Philosophy.*
18. M.H. Ali– *A Handbook of General Philosophy.*
19. P. Watts Cunningham– *Problems of Philosophy.*
20. G.E. Moore– *Philosophical Papers.*
21. Palmer– *A Hundred Years of Philosophy.*
22. Prof. Abdul Khaleque– *Student's Problems of Philosophy.*
23. Dr. Muhammed Iqbal– *The Development of Metaphysics in Persia.*
24. Dr. Khaifa Abdul Hakim– *The metaphysics of Rumi.*
25. Frank Thilly– *A History of Philosophy.*
26. Richard Falkenberg– *History of Modern Philosophy.*
27. Radha Krisnan– *History of Philosophy Eastern and Western.*

28. Immanuel Kant– *Critique of pure Reason.*
29. W. T. Staca– *A Critical History of Greek Philosophy.*
30. C.E.M. Joad– *Introduction to Modern Philosophy.*
31. Burns and Ralph– *World Civilisations.*
32. Laird– *Recen Philosophy.*
33. Wright– *History of Modern Philosophy.*
34. M.H. Ali– *সাধারণ দর্শনশাস্ত্র।*
35. Prof. Akhtarul Huq– *দর্শনের রূপরেখা।*
36. আব্দুল জলিল– *দর্শন পরিচিতি।*
37. শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত– *দর্শনের মূলতত্ত্ব।*
38. শ্রী উমেষচন্দ্র ভট্টাচার্য– *দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি।*
39. ড. নীরদবরণ চক্রবর্তী– *দর্শনের ভূমিকা।*
40. ড. রশীদুল আলম– *সহজ যুক্তিবিদ্যা পরিচয়* ১ম ও ২য় খণ্ড।
41. ড. রশীদুল আলম– *নীতিশাস্ত্র পরিচয়।*
42. ড. রশীদুল আলম– *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা।*
43. হুমায়ুন কবীর– *ইমানুয়েল কান্ট।*
44. ড. গোবিন্দ দেব– *তত্ত্ববিদ্যা সার।*
45. শ্রী তারক চন্দ্র রায়– *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস।*
46. আমিনুল ইসলাম– *প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন।*
47. আমিনুল ইসলাম– *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন।*
48. আমিনুল ইসলাম– *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন।*
49. নীরুকুমার চাকমা– *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা।*
50. শরীফ হারুন (অনুবাদ : মূল লেখক জ্যাঁ পল সার্ত্রে)– *অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ।*
51. রশীদুল আলম (অনুবাদ : মূল লেখক বার্ট্রান্ড রাসেল)– *আমার দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশ।*

প্রশ্নপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা-১৯৯৫
দর্শন-প্রথম পত্র

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা দাও। দর্শনের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ হিসেবে বিচারবাদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।

৩। ভাববাদ কি? বার্কলির আত্মগত ভাববাদ আলোচনা কর।

৪। বিবর্তন কি? যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ও উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৫। দেহ ও মনের সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদ হিসেবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ অথবা পূর্ব-স্থাপিত শৃঙ্খলাবাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা কর।

৬। আত্মার অমরতা সম্পর্কে প্রধান যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা কর।

৭। খোদার অস্তিত্বের পক্ষে যে কোনো দুটি যুক্তি সমালোচনা কর।

৮। ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কি বুঝ? ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় মতবাদগুলো আলোচনা কর।

৯। মূল্য কি? মূল্য কি বিষয়গত না বিষয়ীগত। কারণ দর্শাও।

১০। নীচের যে কোনো দুটি বিষয় সম্পর্কে টীকা লিখ :

(ক) নির্বিচারবাদ;
(খ) অন্তর ধারণা;
(গ) সংশয়বাদ;
(ঘ) সর্বধরেশ্বরবাদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা-১৯৯৬
দর্শন-প্রথম পত্র

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শন বলতে কি বুঝ? দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা দাও।

৩। বাস্তববাদ কি? বাস্তববাদের বিভিন্ন রূপ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। সত্য সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে অনরূপতাবাদ ও প্রয়োগবাদ ব্যাখ্যা কর।

৫। দেশ ও কাল বলতে কি বুঝায়? দেশ ও কাল কি বিষয়ীগত না বিষয়গত? আলোচনা কর।

৬। জীবন বলতে কি বুঝায়? জীবনের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে প্রাণবাদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।

৭। সৃষ্টি ও বিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা দাও।

৮। সত্তা কি? সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে একত্ববাদও ও বহুত্ববাদ ব্যাখা কর।

৯। মনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। দেহ-মন সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ হিসেবে সমান্তরালবাদ আলোচনা কর।

১০। নিচের যে কোনো দুটি বিষয় সম্পর্কে টিকা লেখ-
(ক) জড়বাদ
(খ) স্বতঃমূল্য ও পয়তঃমূল্য
(গ) সর্বেশ্বরবাদ,
(ঘ) নিয়ন্ত্রণবাদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা–১৯৯৭
দর্শন–প্রথম পত্র

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দশনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। দর্শনের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কি?

২। জ্ঞানবিদ্যা কি? জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসবে বুদ্ধিবাদ ব্যাখ্যা কর এবং মন্তব্য দাও।

৩। ভাববাদ কি? সমালোচনাসহ বার্কলীর আত্মগত ভাববাদ ব্যাখ্যা কর।

৪। প্রাণের স্বরূপ সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।

৫। বিবর্তন বলতে কি বুঝায়? যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দাও।

৬। খোদা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? খোদার অস্তিত্বের পক্ষে তত্ত্ববিষয়ক যুক্তিটি আলোচনা কর।

৭। আত্মার অমরত্ব বলতে কি বুঝায়? আত্মার অমরত্বের পক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৮। ইচ্ছার স্বাধীনতা কি? ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় মতবাদ হিসাবে অনিয়ন্ত্রণবাদ ও স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ ব্যাখ্যা কর।

৯। মূল্য বলতে কি বুঝ? মূল্য কি বিষয়ীগত না বিষয়গত? আলোচনা কর।

১০। নিচের কোনো দুটি বিষয়ের উপর টীকা লিখ :

(ক) দর্শন ও জীবন;
(খ) সত্য সম্পর্কীয় সঙ্গতিবাদ;
(গ) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ;
(ঘ) একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা-১৯৯৮
দর্শন-প্রথম পত্র

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শনের স্বরূপ আলোচনা কর। দর্শন কিভাবে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত?

২। জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ হিসবে বুদ্ধিবাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা কর।

৩। ভাববাদ কি? সমালোচনাসহ আত্মগত ভাববাদ আলোচনা কর।

৪। সত্য বিষয়ক মতবাদ হিসেবে অনুরূপতাবাদের একটি বিচারমূলক ব্যাখ্যা দাও।

৫। বিবর্তন কি? ডারউইনের বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যা কর।

৬। 'মন প্রত্যক্ষণের সমষ্টি'—আলোচনা কর।

৭। দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ হিসেবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ পরীক্ষা কর।

৮। দেশ ও কালের স্বরূপ আলোচনা কর।

৯। তুমি কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যে কোনো দুটি প্রমাণ আলোচনা কর।

১০। নীচের যে কোনো দুটি বিষয়ের উপর টীকা লিখ :

(ক) মুখ্য ও গৌণ গুণ,

(খ) সহজাত ধারণা

(গ) সর্বেশ্বরবাদ

(ঘ) প্রাণবাদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা–১৯৯৯
দর্শন–প্রথম পত্র
দর্শনের সমস্যাবলি

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শন কি? দর্শনের সাথে ধর্মের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। জ্ঞানবিদ্যা কি? জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা দাও।

৩। বাস্তববাদ কি? বাস্তববাদের বিভিন্ন রূপ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। সত্য বিষয়ক মতবাদ হিসেবে প্রয়োগবাদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।

৫। দেশ ও কাল বলতে কি বুঝায়? দেশ ও কাল বিষয়ীগত না বিষয়গত? আলোচনা কর।

৬। সৃষ্টি ও বিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের সমালোচনমূলক ব্যাখ্যা কর।

৭। খোদা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? খোদার অস্তিত্বের পক্ষে তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিটি আলোচনা কর।

৮। মনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। দেহ ও মন সম্পর্কে বিষয়ক মতবাদ হিসেবে সমান্তারালবাদ আলোচনা কর।

৯। ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কি বুঝ? ইচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়ক মতবাদ হিসেবে অনিয়ন্ত্রণবাদ ও স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ ব্যাখ্যা কর।

১০। নিচের যে কোনো দুটি বিষয়ের উপর টীকা লিখ :
(ক) দর্শন ও জীবন;
(খ) সহজাত ধারণা;
(গ) নির্বিচারবাদ;
(ঘ) স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা-২০০০
দর্শন-প্রথম পত্র
দর্শনের সমস্যাবলি

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শনের স্বরূপ আলোচনা কর। দর্শন কিভাবে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত?
২। জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে বিচারবাদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।
৩। ভাববাদ কি? সমালোচনাসহ বার্কলির আত্মগত ভাববাদ ব্যাখ্যা কর।
৪। সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে অনুরূপতাবাদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।
৫। প্রাণের স্বরূপ সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে যন্ত্রবাদ ও প্রাণবাদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।
৬। বিবর্তন কি? সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের একটি বিচারমূলক ব্যাখ্যা দাও।
৭। সত্তা বিষয়ক মতবাদ হিসেবে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদের ব্যাখ্যা দাও।
৮। আত্মার অমরতা সম্পর্কে প্রধান যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা কর।
৯। মূল্য বলতে কি বুঝ? মূল্য কি বিষয়ীগত না বিষয়গত?-আলোচনা কর।
১০। নিচের যে কোনো দুটি বিষয়ের উপর টীকা লিখ :
(ক) সংশয়বাদ;
(খ) দেশ ও কাল;
(গ) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ;
(ঘ) সর্বেশ্বরবাদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা-২০০১
দর্শন-প্রথম পত্র
দর্শনের সমস্যাবলি

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শন কি? দর্শন পাঠের উপকারিতা কি?

২। জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।

৩। বাস্তববাদ কি? বাস্তববাদের বিভিন্ন রূপ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। প্রয়োগবাদ কি? সত্যতা সম্পর্কে প্রয়োগবাদী মতবাদের সমালোচমূলক ব্যাখ্যা দাও।

৫। দেশ এবং কাল সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদসমূহ আলোচনা কর।

৬। দেহ-মনের সম্পর্কের সমস্যাটি ক? দেহ ও মনের সম্পর্কে বিষয়ক মতবাদ হিসেবে সমান্তরালবাদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।

৭। খোদা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? খোদার অস্তিত্বের পক্ষে তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিটি আলোচনা কর।

৮। ইচ্ছার স্বাধীনাত কি?ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে অ-নিয়ন্ত্রণবাদ ও স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ ব্যাখ্যা কর।

৯। স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।

১০। নিচের যে কোনো দুটি বিষয়ের উপর টিকা লিখ :

(ক) নির্বিচারবাদ;
(খ) দর্শন ও বিজ্ঞান;
(গ) প্রাণবাদ;
(ঘ) প্রাণপ্রবাহ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা–২০০২
দর্শন–প্রথম পত্র
দর্শনের সমস্যাবলি

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। দর্শন কিভাবে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত?

২। জ্ঞানবিদ্যা কি? জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসাবে বিচারবাদ আলোচনা কর।

৩। ভাববাদ কি? বার্কলির আত্মগত ভাববাদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।

৪। সত্য সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে সঙ্গতিবাদ আলোচনা কর। এ মতবাদ কতটুকু গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা কর।

৫। সৃষ্টি ও বিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। এ প্রসঙ্গে যান্ত্রিক বিবর্তন ব্যাখ্যা কর ও মন্তব্য দাও।

৬। সত্তা বলতে কি বুঝ? সত্তা বিষয়ক মতবাদ হিসেবে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ আলোচনা কর।

৭। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে উদ্দেশ্য বিষয়ক যুক্তিটি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।

৮। আত্মার অমরত্বের যে কোনো দুটি যুক্তি ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।

৯। মূল্য বলতে কি বুঝায়? মূল্য ব্যক্তিগত না বস্তুগত? আলোচনা কর।

১০। টীকা লেখ : (যে কোনো দুটি)

(ক) দর্শন ও জীবন;
(খ) দেশ ও কাল;
(গ) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ;
(ঘ) ইচ্ছার স্বাধীনতা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা-২০০৩
দর্শন-প্রথম পত্র
দর্শনের সমস্যাবলি

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শন কি? দর্শনের সাথে ধর্মের সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।

৩। বাস্তববাদ কি? বাস্তবাদ ও ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

৪। সত্য সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে প্রয়োগবাদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।

৫। দেশ ও কাল বলতে কি বুঝায়? দেশ ও কাল কি বিষয়ীগত না বিষয়গত? আলোচনা কর।

৬। প্রাণের স্বরূপ সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে প্রাণবাদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।

৭। দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ক মতবাদ হিসেবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ ও সমান্তরালবাদ আলোচনা কর।

৮। খোদা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? খোদার অস্তিত্বের পক্ষে যে কোনো একটি যুক্তি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।

৯। ইচ্ছার স্বাধীনতা কি? ইচ্ছার স্বাধীনতা বিষয়ক মতবাদ হিসেবে অনিয়ন্ত্রণবাদ ও স্বনিয়ন্ত্রণবাদ ব্যাখ্যা কর।

১০। টীকা লেখ : (যে কোনো দুটি)
(ক) জড়বাদ;
(খ) নির্বিচারবাদ;
(গ) স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য;
(ঘ) আত্মার অমরত্ব।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা–২০০৪
দর্শন–প্রথম পত্র
দর্শনের সমস্যাবলি

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। দর্শন কিভাবে বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত।

২। জ্ঞানবিদ্যা কি? জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ হিসেবে বিচারবাদ আলোচনা কর।

৩। ভাববাদ কি? বার্কলির আত্মগত ভাববাদ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।

৪। সত্য সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে সঙ্গতিবাদ ব্যাখ্যা কর। এ মতবাদ কতকটুকু গ্রহণযোগ্য?

৫। বিবর্তন কি? যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের একটি বিচারমূলক ব্যাখ্যা কর।

৬। সত্তা বিষয়ক মতবাদ হিসেবে একত্ববাদ ও বহুত্ববাদ ব্যাখ্যা কর।

৭। খোদার অস্তিত্বের পক্ষে তত্ত্ববিষয়ক ও উদ্দেশ্যবিষয়ক যুক্তিগুলো আলোচনা কর।

৮। আত্মার অমরত্বের সপক্ষে প্রধান যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা কর।

৯। মূল্য বলতে কি বোঝায়? স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।

১০। টীকা লিখ : (যে কোনো দুটি)
(ক) দর্শন ও জীবন;
(খ) সংশয়বাদ;
(গ) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ;
(ঘ) দেশ-কাল;
(ঙ) সর্বেশ্বরবাদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. (পাস) পরীক্ষা-২০০৫
দর্শন-প্রথম পত্র
দর্শনের সমস্যাবলি

[দ্রষ্টব্য : সকল প্রশ্নের মান সমান। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। দর্শন কি? দর্শনের সাথে ধর্মের সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। জ্ঞানবিদ্যা বলতে কি বুঝায়? জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ হিসেবে অভিজ্ঞতাবাদ ব্যাখ্যা কর।

৩। বাস্তববাদ কি? বাস্তববাদ ও ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

৪। সত্য সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে প্রয়োগবাদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা কর।

৫। দেশ ও কাল বলতে কি বুঝায়? দেশ ও কাল কি বিষয়ীগত, না বিষয়গত?

৬। সৃষ্টি ও বিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা দাও।

৭। দেহ ও মনের সম্পর্কে বিষয়ক মতবাদ হিসেবে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াবাদ ও সমান্তরালবাদ আলোচনা কর।

৮। খোদা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? খোদার অস্তিত্বের পক্ষে যে কোনো একটি যুক্তি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন কর।

৯। ইচ্ছার স্বাধীনতা কি? ইচ্ছার স্বাধীনতাবিষয়ক মতবাদ হিসেবে অনিয়ন্ত্রণবাদ ও স্ব-নিয়ন্ত্রণবাদ ব্যাখ্যা কর।

১০। টীকা লিখ : (যে কোনো দুটি)

(ক) জড়বাদ;
(খ) নির্বিচারবার;
(গ) সহজাত ধারণা;
(ঘ) আত্মার অমরত্ব।